কলকাতার পুরাকথা

কলকাতার পুরাকথা

দেবাশিস বসু

সম্পাদিত



পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর, ১৯৯০

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ
নির্মলেন্দু মণ্ডল

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ওয়েলনোন প্রিণ্টার্স
১২৪বি, রাজা রামমোহন সরণি
কলকাতা ৯

মুদ্রক
রাধাবল্লভ মণ্ডল
ডি. বি. প্রিণ্টার্স
৪ কৈলাস মুখার্জী লেন
কলকাতা ৬

বাংলাভাষায় কলকাতা-চর্চার
চার প্রয়াত পথিকৃৎ

প্রাণকৃষ্ণ দত্ত
পূর্ণচন্দ্র দে
মহেন্দ্রনাথ দত্ত
ও
যতীন্দ্রমোহন দত্তের
স্মৃতির উদ্দেশে

কলকাতা-বিষয়ক আমাদের আরও কয়েকটি বই

কলিকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য রচনা / প্রাণকৃষ্ণ দত্ত : দেবাশিস বসু সম্পাদিত
কলির শহর কলকাতা / হরিপদ ভৌমিক
সচিত্র গুলজার নগর / কেদারনাথ দত্ত (ভাঁড়) : চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলকাতার স্ট্যাচু / কমল সরকার

সূচীপত্র

ভূমিকা

ভাগীরথীর তীরে গড়ে উঠেছে শহর কলকাতা। কি তার ইতিহাস? কেমন করে তিনটি গ্রামের নিরাড়ম্বর, নিস্তরঙ্গ জীবন ক্রমে চঞ্চল হয়ে উঠল নাগরিক কর্মব্যস্ততায়? এসব প্রশ্ন প্রথমে বাঙালিদের মনে জাগেনি। যাঁদের মনে জেগেছিল, তাঁরা সবাই ছিলেন ব্রিটিশ। ইতিহাস-চেতনার অভাবে কলকাতার বাঙালিরা যখন আত্মবিস্মৃত ঔদাসীন্যে ভুগছিলেন, তখন লং-কোর-ফারমিংগার-কটন-ব্লেশিনডেনের মতো লেখকরা ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করে একের পর এক রচনা করছিলেন কলকাতা-বিষয়ক বই। কলকাতা-চর্চার ক্ষেত্রে পথিকৃতের মর্যাদা এই বিদেশী লেখকদের প্রাপ্য। তবে তাঁদের সীমাবদ্ধতাও ছিল। তাঁদের কলকাতা-চর্চা প্রধানত ইংরেজ সমাজ এবং সাহেবপাড়ার মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে থাকার ফলে বিবরণগুলি প্রায় সব ক্ষেত্রেই একান্ত একমুখী।

ব্রিটিশ লেখকদের অনুকরণে এবং তাঁদের রচনার নির্যাসের উপর নির্ভর করেই উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাভাষায় কলকাতা-চর্চা শুরু হয়। প্রথমদিকের বাংলা বইগুলি ছিল প্রতিষ্ঠান, দেবস্থান বা ঘটনা-কেন্দ্রিক, নয়তো গাইড বুক-ধর্মী। বাংলাভাষায় কলকাতার সামগ্রিক ইতিহাস লেখার জন্য যিনি প্রথম কলম ধরেছিলেন, তিনি সম্ভবত কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গলালের 'কলিকাতা কল্পলতা'-র অনুমিত রচনাকাল উনিশ শতকের পাঁচ ও ছয়ের দশক। কিন্তু লেখাটি প্রকাশিত হয় একশো বছর পরে, ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে।

উনিশ শতকের শেষদিকে ও বর্তমান শতকের গোড়ায় বাংলা সাময়িকপত্রে কলকাতা-বিষয়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশে গতি আসে। 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় শরচ্চন্দ্র দেবের 'কলিকাতার ইতিহাস' (১২৯২-১২৯৩ বঙ্গাব্দ), 'নব্যভারত' পত্রিকায় ছাপা হয় প্রাণকৃষ্ণ দত্তের 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত' (১৩০৮-১৩১০ বঙ্গাব্দ)। কিন্তু এই ধারাবাহিক রচনা-দুটি গ্রন্থাকার পেয়েছে মাত্র ন' বছর আগে।

বাঙালি লেখকরা কলকাতার ইতিহাস নিয়ে ইংরেজিতেও বই লিখতে শুরু করেন এই শতকের গোড়ায়। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে জনগণনার সময়ে মুনশিয়ানার সঙ্গে কলকাতার কালানুক্রমিক ইতিহাস সংকলন করেন অতুলকৃষ্ণ রায়। শোভাবাজার রাজবংশের সন্তান বিনয়কৃষ্ণ দেবের **'The Early History and Growth of Calcutta'** প্রকাশিত হয় ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে। দু'বছর পরে ছাপা হয় বইটির সুবলচন্দ্র মিত্র-কৃত অনুবাদ: 'কলিকাতার ইতিহাস'। বর্তমান সংকলনের শেষ নিবন্ধে দেখা যাবে, এই বইটিই মুদ্রিত আকারে বাংলাভাষায় কলকাতার প্রথম সামগ্রিক ইতিহাস গ্রন্থ। এরপর ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা সেকালের ও একালের: উপন্যাস আকারে গঠিত ইতিহাস'। তারও দীর্ঘকাল পরে আত্মপ্রকাশ করে প্রমথনাথ মল্লিকের

'কলিকাতার কথা'-র দুটি 'কাণ্ড'। ইতিমধ্যে ১৩৪১ বঙ্গাব্দে 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের' জন্য হরিহর শেঠ সংকলন করেন 'কলিকাতা পরিচয়', পরবর্তীকালে 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়' (১৯৫২) নামে প্রকাশ পায় তার পরিবর্ধিত সংস্করণ। অন্যদিকে যোগেশচন্দ্র বাগল কলকাতার সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিন্যস্ত করেন 'কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র' (১৯৫৯) গ্রন্থে।

এইভাবে যখন কলকাতার সামগ্রিক ইতিহাস আলোচনার একটা রেওয়াজ গড়ে উঠল, তখনই এল সুপাঠ্য রম্যরচনার জোয়ার। যতীন্দ্রমোহন দত্ত (যমদত্ত), প্রাণতোষ ঘটক, বিনয় ঘোষ, নিখিল সরকার (শ্রীপান্থ), পূর্ণেন্দু পত্রী (সমুদ্রগুপ্ত), নকুল চট্টোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র দাস, নারায়ণ দত্ত, হরিপদ ভৌমিক, কমল চৌধুরী প্রমুখর সহজবোধ্য নিবন্ধ সাধারণ মানুষকে আগ্রহী করে তুলল পুরনো কলকাতা সম্পর্কে। পাঠকদের চাহিদার চাপে নতুন-নতুন বই বেরোতে আরম্ভ করল। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে লেখা মহেন্দ্রনাথ দত্তের 'কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা' মুদ্রণের সুযোগ পেল ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে। পুরনো পত্রিকার বিবর্ণ পাতায় ছড়িয়ে থাকা প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, শরচ্চন্দ্র দেবের প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে গ্রথিত হল, নিশীথরঞ্জন রায় ও অশোক উপাধ্যায়ের উদ্যোগে বিভিন্ন লেখকের বিক্ষিপ্ত কিছু প্রবন্ধ একত্রিত হল 'প্রাচীন কলিকাতা' (১৯৮২) সংকলনে।

অদূর অতীতে অনুবাদের দৌলতে কিছু ইংরেজি বই বাংলা কলকাতা-সাহিত্যে সংযোজিত হয়েছে। তার মধ্যে অতুলকৃষ্ণ রায়ের বই বা লোকনাথ ঘোষের গ্রন্থের কলকাতা-সংক্রান্ত অংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূল ইংরেজি গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদিও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। কটন-ব্লেশিনডেন-লণ্ডের বই তাই আজ সহজলভ্য। বহু দুষ্প্রাপ্য নিবন্ধ ও পুস্তিকার পুনর্মুদ্রণ সম্পাদন করে সুধীবর্গের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন অধ্যাপক অলোক রায়।

কলকাতা-চর্চার ভিন্ন একটি ঘরানার জন্ম দিয়েছেন রাধারমণ মিত্র। খণ্ডনমূলক বিতর্কের সাহায্যে একদিকে তিনি তথ্যকে বিশুদ্ধ করায় আগ্রহী, অন্যদিকে সরেজমিন অনুসন্ধানের মাধ্যমে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের অতীত অন্বেষণে তিনি অভিনিবিষ্ট।

কলকাতার 'ত্রিশতবার্ষিকী' উদযাপনের এই মুহূর্তে কলকাতা-চর্চার ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ করলে আবিষ্কৃত হবে ভিন্নমুখে বহমান কয়েকটি ধারা। বাংলাভাষায় কলকাতা-চর্চার প্রধান ধারা রম্যরচনাকেন্দ্রিক। পূর্বোক্ত লেখকরা ছাড়াও সাম্প্রতিককালে রাধাপ্রসাদ গুপ্ত এ-ধরনের সরস রচনায় নতুনত্ব এনেছেন, তাঁর বৈশিষ্ট্য মজলিসী ঢঙে পুরনো দিনের কথা পরিবেশন। রম্যরচনার জন্য আমরা প্রধানত ইংরেজদের বইগুলির উপর নির্ভরশীল। অবশ্য বেশ কিছু বাংলা সূত্রও তথ্যবহুল। লোকনাথ ঘোষ ও প্রাণকৃষ্ণ দত্তের লেখায় আছে পারিবারিক ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান, মহেন্দ্রনাথ দত্তের রচনায় রয়েছে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের বিশ্বস্ত ছবি। সাময়িকপত্রে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বা যতীন্দ্রমোহন দত্তের (যমদত্ত) নিবন্ধগুলিতেও প্রচুর মূল্যবান তথ্য নিহিত রয়েছে, কিন্তু অগ্রথিত হওয়ার ফলে সেগুলির হদিস পাওয়া মুশকিল।

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত আক্ষেপ করে লিখেছেন, 'কি দুঃখের কথা, পুরনো কলকাতার নানান দিক নিয়ে যমদত্তর সেই চমৎকার লেখাগুলি আজও কেউ উদ্যোগী হয়ে জোগাড় করে ছাপালেন না।' এ আক্ষেপোক্তি বধির কর্ণে নিপতিত হয়েছে!

কলকাতা নিয়ে প্রথাসিদ্ধ ঐতিহাসিক গবেষণা বাংলাভাষায় হয়নি বললেই চলে। ইংরেজিতে অবশ্য তার সার্থক প্রয়াস চালিয়েছেন সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রদীপ সিংহ। কলকাতা নিয়ে তাত্ত্বিক গবেষণার প্রধান অসুবিধা নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্রের দুরধিগম্যতা। পারিবারিক দলিল-দস্তাবেজের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু পুরসভা বা হাইকোর্টের অমূল্য নথিপত্রের এমন দুর্দশা কেন? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সুরক্ষিত লটারি কমিটির রিপোর্টের সামান্য অংশ ব্যবহার করেছিলেন বিনয় ঘোষ। আজও সে-রিপোর্টের নির্বাচিত অংশ প্রকাশিত হল না। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো রাজ্য লেখ্যাগারের (State Archives) নথিপত্রও সুসংবদ্ধ। কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠান থেকেও কলকাতা-বিষয়ক নথির সুনির্বাচিত সংকলন প্রকাশ জরুরি।

কলকাতা-চর্চার এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আমরা বর্তমান সংকলন প্রকাশ করলাম। মহেন্দ্রনাথ দত্তের বইটির প্রসঙ্গে একবার সপ্রশংস মন্তব্য করেছিলেন শ্রীপান্থ, 'এ পুঁথির আর-এক বৈশিষ্ট্য এই, সাহেবদের দিকে পুরোপুরি পিঠ ফিরিয়ে বসে লেখা। এ রচনার স্বাদ অনবদ্য নয় কি?' শ্রীপান্থ-প্রশংসিত মহেন্দ্রনাথের গুণটি অনুসরণ করে আমরা 'নেটিভ কলকাতার' উপর জোর দিয়েছি, তবে প্রসঙ্গক্রমে সাহেবদের কথাও এসেছে।

কলকাতার এই 'ত্রিশতবার্ষিকী'-কালে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগছে, ইংরেজদের কলকাতা না হয় তিনশো বছরের, কিন্তু ভূখণ্ড হিসাবে এ অঞ্চল কত প্রাচীন? এখানে কি আগে কোনো জনপদ ছিল? প্রাচীন বিবরণী, ভূতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব এবং রেণুবিজ্ঞানীদের চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের আলোকে প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছেন ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী। কলকাতা যে সুপ্রাচীন এক ভূখণ্ড, সে-কথা তাঁর নিবন্ধে প্রমাণিত। অন্যদিকে প্রাক্-চার্নক যুগে কলকাতা যে একটি বিশিষ্ট জনপদ ছিল, তার সাক্ষ্য সমকালীন বাংলা পুঁথির পাতা থেকে উদ্ধার করেছেন সুখময় মুখোপাধ্যায়।

প্রাক্-চার্নক স্থাপত্য কলকাতায় দৃষ্টিগোচর না হলেও, ইংরেজ আমলের পুরাকীর্তির কিন্তু অভাব নেই। বেশ কয়েকটি জেলার পুরাকীর্তি-পরিচয় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রকাশিত হলেও আজও কলকাতার পুরাসম্পদ নিয়ে কোনো বিশদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। কলকাতার মন্দির-স্থাপত্য নিয়ে রচিত তারাপদ সাঁতরার নিবন্ধটি সে-অভাব আংশিকভাবে মেটাবে।

উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে আগত একটি সম্প্রদায় কলকাতাকে উপহার দিয়েছে স্থাপত্যগরিমায় গরীয়ান কয়েকটি মন্দির। আজও সে-মন্দিরগুলি কলকাতাবাসী তথা পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। কলকাতার সেই জৈনমন্দিরগুলির প্রসঙ্গ সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন গণেশ লালওয়ানী।

হিন্দু বা জৈনদের মতো খ্রীস্টানদের ধর্মীয় স্থাপত্যও কলকাতার উল্লেখযোগ্য সম্পদ।

তবে এ-শহরের অধিকাংশ গির্জাই নির্মিত হয়েছিল সাহেবপাড়ায়, ইউরোপীয়দের প্রয়োজনে। দেশীয় খ্রীস্টানদের জন্য উত্তর কলকাতায় যে তিনটি 'নেটিভ গির্জা' স্থাপিত হয়েছিল, পঞ্চম নিবন্ধে সেগুলির ইতিহাস বিবৃত করেছেন অলোক রায়।

কলকাতার মসজিদ-দরগা-আস্তানা-খানকা-ইমামবাড়াগুলি কম আকর্ষণীয় নয়। একাধিক লেখককে অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমরা মুসলিম উপাসনালয়গুলি সম্বন্ধে কোনো নিবন্ধ সংগ্রহ করতে পারিনি। এজন্য আমরা আন্তরিক আক্ষেপ প্রকাশ করছি।

নতুন উপাদান সংগ্রহ করতে হলে সরেজমিন অনুসন্ধানের বিকল্প নেই। সম্ভ্রান্ত-গৃহের প্রাঙ্গণে ক্ষেত্রানুসন্ধান করে পাঁচটি দুর্গাদালানের বিবরণ সংকলন করেছেন ষষ্ঠ নিবন্ধকার বিমলকুমার পাল।

ধর্মীয় স্থাপত্যের সীমানা পেরিয়ে এবার প্রবেশ করা যাক নাগরিক জীবনের প্রসঙ্গে। কোম্পানির আমলে কলকাতাবাসীদের উপর আরোপিত করব্যবস্থার রূপরেখা রচনা করেছেন পূর্ণেন্দুনাথ নাথ। করের বিনিময়ে কলকাতার অধিবাসীদের স্বাচ্ছন্দ্য দিতে ব্রিটিশ শাসকরা ছিল দায়বদ্ধ। নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য ইংরেজ শাসককুল যে পুলিশ প্রশাসন সংগঠিত করেছিল, তার পরিচয় মিলবে স্বপন বসুর নিবন্ধে।

নিশীথরঞ্জন রায় তাঁর 'কলকাতা : ইতিহাসের উপাদান' গ্রন্থে (আনন্দ, ১৯৮৯, পৃ. ৭২) গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক রিপোর্টের তালিকায় ফিভার হাসপাতাল কমিটির রিপোর্ট ও কলকাতার নিকাশীব্যবস্থা-বিষয়ক দুটি প্রতিবেদনের নাম উল্লেখ করেছেন। কলকাতার 'নেটিভ' অধিবাসীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসাব্যবস্থার উন্মেষ কিভাবে ঘটেছিল, ফিভার হাসপাতাল কমিটির রিপোর্টের সাহায্যে তা বর্ণনা করেছেন বিনয়ভূষণ রায়। অন্যদিকে নিকাশীব্যবস্থার প্রতিবেদন-দুটির সঙ্গে অন্য তথ্যের মিশ্রণ ঘটিয়ে 'কলকাতার নিকাশীব্যবস্থার ইতিহাস' লিখেছেন আদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

ব্রিটিশদের সঙ্গে এদেশে এসেছিল শিল্পবিপ্লবের ফসল। কলকাতা-সমাজ কিভাবে সেগুলি গ্রহণ করেছিল, কেমন করে বাঙালিদের মধ্যে স্ফুরিত হয়েছিল প্রযুক্তি-প্রয়াস, তার বিবরণ পাওয়া যাবে সিদ্ধার্থ ঘোষের 'পুরনো কলকাতার কলকব্জা' নিবন্ধে।

কলকাতার শৈল্পিক প্রচেষ্টার কাহিনী তার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনেকটাই জুড়ে আছে। এ-শহরের চারুকলা সমিতিগুলির জন্ম ও বিবর্তনের কথা বিভিন্ন সূত্র থেকে সংকলন করেছেন কমল সরকার।

পূর্বোক্ত নিবন্ধগুলিতে যেসব তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, তার অনেকটাই ইতিপূর্বে অনালোচিত। কিন্তু পূর্বসূরিদের রচনা থেকেও তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন রয়েছে। মুদ্রিত সূত্র থেকে সংগৃহীত উপাদানের সঙ্গে নতুন উপকরণের মিশেল ঘটালে যে মণিকাঞ্চন-যোগের সৃষ্টি হয়, তা সর্বজনবিদিত। কাজেই প্রকাশিত তথ্যকে অবহেলা না করাই বিধেয়।

কলকাতার সাধারণ নাট্যশালা বিষয়টি নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। সেসব আলোচনার প্রধান বিষয় অভিনয়ের প্রয়োগ বা কলাকুশলীদের কৃতিত্ব। কলকাতার ইতিহাসের দিক থেকে কিন্তু নাট্যগৃহগুলির কাহিনীও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। শঙ্কর ভট্টাচার্য

তাঁর নিবন্ধটিতে কলকাতার সাধারণ নাট্যশালার সেই দিকটিই তুলে ধরেছেন। লেখক উল্লেখপঞ্জী ব্যবহার করেননি। তাঁর প্রধান তথ্যসূত্র সংবাদপত্র। আগ্রহী পাঠক তাঁরই লেখা 'বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান' (রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮২) গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক আরও তথ্য পেতে পারেন।

হরিপদ ভৌমিকও তথ্য চয়ন করেছেন মুদ্রিত সূত্র থেকে। সাময়িকপত্র ও গ্রন্থাদি থেকে তিনি সংকলন করেছেন কলকাতার প্রধান কয়েকটি পুকুরের কথা। একটি পুকুরের ইতিহাসের জন্য অবশ্য তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে লিপিফলকের উপরে।

কলকাতার ইতিহাস আলোচনা করতে হলে হাতের কাছে কিছু তালিকা প্রয়োজন। কিন্তু পঞ্জীকারের কাজ অনেকটাই নীরস ও গৌরবহীন বলে কলকাতা-চর্চার এই দিকটি বেশ অবহেলিত। বর্তমান সংকলনের শেষ তিনটি নিবন্ধ আসলে তিনটি তালিকা। প্রথম তালিকায় কলকাতার পল্লীনামের ৬০৯টি নমুনা সংগৃহীত হয়েছে মানচিত্র, পথপঞ্জী প্রভৃতি সূত্র থেকে। দ্বিতীয় তালিকাটি রাজ্য লেখ্যাগারে রক্ষিত কোম্পানির চিঠি-পত্রের। সকলেই জানেন, লেখ্যাগারে কলকাতা-বিষয়ক অজস্র নথিপত্র আছে। কিন্তু সেইসব নথি ঠিক কি জাতীয়, উদয়ন মিত্রের এই তালিকা থেকে তার আভাস মিলবে। অশোক উপাধ্যায় রচিত শেষ নিবন্ধে স্থান পেয়েছে ইতিপূর্বে প্রকাশিত কলকাতা-বিষয়ক বাংলা গ্রন্থের একটি তালিকা।

সংকলনটির নানা সীমাবদ্ধতা রয়ে গেল। মুসলিম উপাসনালয়ের মতো অনালোচিত থেকে গেল আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিবন্ধগুলিতে প্রধানত তথ্যই পরিবেশিত হল, তত্ত্ব নয়। এ-সংকলনের লেখকবৃন্দের মধ্যে মাত্র একজনেরই পেশা ইতিহাস-চর্চা, এখানে তাই পেশাদারি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুপস্থিত।

প্রাথমিকভাবে স্থিরীকৃত আয়তনের তুলনায় বইটির কলেবর বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বাধ্য হয়ে কিছু নিবন্ধের অঙ্গচ্ছেদ করতে হয়েছে, স্থানাভাবের কারণে সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে প্রায় প্রতিটি লেখাই। চেষ্টা সত্ত্বেও সর্বত্র রক্ষা করা যায়নি বানানের সমতা, নিবন্ধগুলির আয়তনগত বা চারিত্রিক সাযুজ্য। মুদ্রণপ্রমাদও বেশ কিছু ঘটেছে, তার মধ্যে যেগুলি তথ্যগত ভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে সেগুলি যথাসাধ্য সংশোধিত হল শুদ্ধিপত্রে। এইসব ত্রুটির জন্য আমরা মুক্তকণ্ঠে মার্জনাপ্রার্থী।

পুস্তক বিপণির কর্ণধার বন্ধুবর অনুপকুমার মাহিন্দার এই অলাভজনক সুবৃহৎ বই প্রকাশ করে তাঁর কলকাতা-প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন।

এই সংকলন সম্পাদনার কাজে সমস্ত লেখকসহ বহু ব্যক্তি সহায়তা করেছেন। গ্রন্থের অঙ্গসজ্জা এবং প্রুফ সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেছেন বন্ধুবর বিমলকুমার পাল। 'নির্দেশিকা' প্রস্তুত করেছেন অরুণচাঁদ দত্ত। আলোকচিত্রগুলি গ্রহণের কৃতিত্ব তারাপদ সাঁতরা (চিত্রসংখ্যা ৮-১৪), ভাস্কর পাল (চিত্রসংখ্যা ১৫-১৭), সুমন দত্ত (চিত্রসংখ্যা ১৯) ও অরূপ সেনগুপ্তের (চিত্রসংখ্যা ১-৪, ৬-৭)। চিত্র-বিন্যাসের দায়িত্ব শ্রীসেনগুপ্তই বহন করেছেন।

সুষ্ঠুভাবে মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমরা ডি. বি. প্রিন্টার্সের রাধাবল্লভ

মণ্ডল ও সংশ্লিষ্ট কর্মিবৃন্দের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁরা হাসিমুখে আমাদের অনেক অত্যাচার সয়েছেন। চার্লস ডয়লির আঁকা ছবি অবলম্বনে প্রচ্ছদ রচনা করেছেন শিল্পী নির্মলেন্দু মণ্ডল। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্নভাবে সহায়তা করার জন্য শ্রদ্ধেয় অশোক উপাধ্যায়ের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ। তাঁর কাছে আমাদের ঋণ সর্বাধিক।

সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

কলকাতা
৩০ অক্টোবর, ১৯৯০

দেবাশিস বসু

ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী

কলকাতার প্রাচীনত্ব

নিদর্শনের নিরিখে

ইংরেজের কলকাতার বয়স ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দে তিনশো বছর পূর্ণ হল। শেঠ-বসাক-সাবর্ণ চৌধুরীদের কলকাতা না হয় আরও একটু পুরনো। কিন্তু সুদূর অতীতে এখানে কী ছিল? প্রচলিত ইতিহাস সে ব্যাপারে নীরব। কলকাতার প্রথম যুগের বিবরণী লেখকদের অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজ। তাঁদের হাতে সেই আদিপর্বের ইতিহাস রচনা করবার মতো পর্যাপ্ত উপকরণ ছিল না ঠিকই, কিন্তু তাঁরা তা নিয়ে মাথাও ঘামাতে চাননি। বরং বোঝাতে চেয়েছেন, সমুদ্র থেকে অর্বাচীনকালে উত্থিত এই ভূখণ্ডে ইংরেজাধিকারের আগে বস্তুত জলা-জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। একথা বলার মতো যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণও যে তাঁরা হাজির করতে পেরেছিলেন, তা-ও কিন্তু নয়। অথচ বাঙালি লেখকরাও মোটের উপর নির্বিবাদে এই 'তত্ত্ব' মেনে নিয়েছিলেন। পৌরাণিক ও অন্যান্য ঐতিহ্য অনুসারে কালীঘাট তীর্থের প্রাচীনত্বের কথা অবশ্য অনেকেই বলেছেন। কিন্তু 'পাথুরে প্রমাণে'র ভিত্তিতে গবেষণার চেষ্টা কেউই করেননি। দু-একজনই মাত্র অন্য কথা বলতে চেয়েছেন—তাঁরা নেহাতই ব্যতিক্রম। বর্তমান শতকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা-অনুসন্ধানের ফলে প্রচুর নতুন নতুন তথ্য-প্রমাণ জানা গিয়েছে। নতুন তথ্যের প্রেক্ষিতে গত শতকের বহু তথ্য-প্রমাণও পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অথচ এইসব নতুন-পুরনো তথ্য সমন্বিত করে তার ভিত্তিতে প্রাচীন যুগে কলকাতা-ভূখণ্ডের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা প্রায় হয়নি বললেই চলে। বরং সাম্প্রতিক কিছু নিবন্ধেও অতীতের সেইসব ধারণারই চর্বিতচর্বণ নজরে পড়ছে। বর্তমান আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার ফলাফল একত্রে উপস্থাপিত করে সুদূর অতীতে এই অঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কে একটা সার্বিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে দেখাতে চাওয়া হয়েছে, কলকাতা-অঞ্চল অর্বাচীনকালে সমুদ্র থেকে উত্থিত কোনো ভূখণ্ড নয়; প্রাগৈতিহাসিক যুগেও এই ভূখণ্ডের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলেছে। আর এর সংলগ্ন অঞ্চলে সভ্যতার ধারাবাহিকতাও যথেষ্ট প্রাচীন।

স্বভাবতই এই আলোচনায় প্রত্নতত্ত্বের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে, কারণ এর উপর ভিত্তি করে অনেক সিদ্ধান্ত যতটা নির্দ্বিধায় করা যায়, অন্য অনেক তথ্যের ভরসায় তা করা যায় না। কলকাতার তুলনায় সংলগ্ন ভূখণ্ডের অতীত সম্বন্ধে অনেক বেশি

আলোচনা করা হয়েছে—এমন অভিযোগও তোলা যেতে পারে। একটাই কারণে তার দরকার ছিল। গাঙ্গেয় বদ্বীপের দক্ষিণপ্রান্তকে যদি সুপ্রাচীন বলে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, তা হলে কলকাতা-ভূখণ্ডের প্রাচীনত্ব নিয়ে আর সংশয়ের অবকাশ থাকে না। সংলগ্ন অঞ্চলে দু'হাজার বছর ধরে সভ্যতার বিকাশ ঘটে থাকলে এখানেও তার প্রভাব পড়তেই পারে—এ অনুমিতির ভিত্তি হিসাবেও ওইসব প্রমাণের উপস্থাপনা প্রয়োজন ছিল। তাই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে। তারপর কলকাতা-প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। ধান ভানতে এটুকু শিবের গীত অপরিহার্য ছিল বলেই মনে হয়। এ ছাড়া বক্তব্যের সূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখতে কিছু পুনরুক্তিও অনিবার্যভাবেই এসেছে।

কলকাতার প্রাচীনত্ব : প্রচলিত মতামত

কলকাতার ইতিহাস বিষয়ে এ শতাব্দীর গোড়ায় প্রকাশিত এ. কে. রায়ের বইটি বিশিষ্ট বলেই স্বীকৃত।[১] বইটির পুনর্মুদ্রিত সংস্করণের ভূমিকায় নিশীথরঞ্জন রায় বলেছেন, 'Ray is the first among the writers of Calcutta's history to make a serious attempt to reconstruct the story from a point of time, separated at least by nearly two centuries from that of Charnock, if we lay aside the antiquity of the site and early traditions.'[২] চার্নকের আগের দুশো বছর নয়, তারও আগের অবস্থা সম্বন্ধে এ. কে. রায় কী বলেছেন সেটাই আমরা দেখব।[৩] তিনি এ কাজে নির্ভর করেছেন একদিকে বরাহ-মিহির ও হিউয়েন সাং, অন্যদিকে ব্ল্যানফোর্ড ও ফার্গুসনের উপর। তাঁর মতে, কলকাতা এবং সন্নিহিত অঞ্চলসহ দক্ষিণবঙ্গকে বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা'য় সমতট, অর্থাৎ সমুদ্রের জোয়ারে প্লাবিত জলাভূমি (tidal swamp) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি হিউয়েন সাংয়ের বিবরণী থেকে অনুমান করা যাচ্ছে, পূর্ববঙ্গে সপ্তম শতক নাগাদ সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হওয়ার মতো জনবসতি সদ্য গড়ে উঠলেও খুলনা, যশোর, সুন্দরবন ও কলকাতাসহ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ তখনও গড়ে ওঠেনি—পলি জমে জমে আস্তে আস্তে গঠিত হচ্ছে। এ ছাড়া এ. কে. রায় বলেছেন, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের সূচনাই হচ্ছে সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে—রাজা আদিশূরকে দিয়ে। ফলে এখানেও আগের সিদ্ধান্তই সমর্থিত। অন্যদিকে ইংরেজ লেখকদের বিবরণ থেকে তাঁর মনে হয়েছে, চার থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে রাজমহল পাহাড়ের দক্ষিণে নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমি পলি-সহযোগে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। কলকাতার কাছে ভূমির অবনমনও ঘটেছিল একবার। আর প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে তিনি স্থির করেছেন, দ্বাদশ শতকের মধ্যেই কলকাতা-ভূখণ্ড বাসযোগ্য হয়ে উঠেছিল, নাম ছিল কালীক্ষেত্র। এখানে বাস করত আদিবাসী জেলে-পোদ, জালিয়া, দুলিয়া, বাগদি আর শিকারী, ব্যাধ, দোয়াই প্রভৃতিরা। সপ্তম থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের বাসযোগ্য হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন ভোলানাথ চন্দ্রও।[৪]

অথচ এ. কে. রায়ের গ্রন্থপ্রকাশের অনেকদিন আগেই সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'কোন কোন স্থানে গভীর কূপ ও পুষ্করিণী খননকালে প্রাচীন ক্ষেত্র-তলোৎপন্ন উদ্ভিদ এবং মনুষ্যের ও ভূচর জন্তুর কঙ্কাল ভূগর্ভের অনেক হস্ত নিম্নে প্রাপ্ত হওয়া গিয়েছে। ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে যে, যে স্থান এখন কালীঘাট বলিয়া অভিহিত, তাহার ভূগর্ভস্থ অনেক হস্ত নিম্নের ভূমিতে বহুপূর্বে মনুষ্য বিচরণ করিয়াছিল। পরে রসাতল প্রবেশ করাতে মানব সমাগম শূন্য হইয়া থাকে। কাল সহকারে ভাগীরথী আনীত বালুকারাশির স্তর ক্রমশঃ পতিত হইয়া নিবিড় অরণ্যে পরিণত হয় ও ক্রমে তাহা আবার মনুষ্যের বাসভূমি হইয়াছে। কলিকাতার সন্নিকৃষ্ট স্থানের রসাতল প্রবেশ ও পুনরুত্থান হইতে অবশ্য অনেক শতাব্দী লাগিয়াছিল সন্দেহ নাই। সুতরাং রামায়ণের সময় যে প্রদেশে কপিলাশ্রম ও তপোবন, মহাভারতীয় সময়ে তাহা অপরিজ্ঞেয় এবং পৌরাণিক সময়ে তাহা নিবিড় অরণ্যগর্ভে।'[৫] এ. কে. রায় তাঁর গ্রন্থে একাধিকবার 'কালীক্ষেত্র দীপিকা'র উল্লেখ করলেও[৬] কলকাতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে যুক্তি খণ্ডন দূরে থাক, আলোচনাও করেননি। এ. কে. রায়ের সমসাময়িক কালে প্রাণকৃষ্ণ দত্তও এ প্রসঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করতেন। প্রাণকৃষ্ণ বলেছেন, 'যদিও এই জনপদের উল্লেখ প্রাচীন পুরাণাদিতে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, এমনকি সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গাধিপ সিংহবাহুর পুত্র বিজয়ের সিংহল-যাত্রার বর্ণনায় দক্ষিণ-বাঙ্গালার কোনো উল্লেখ নাই। তত্রাচ ইহাও যে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।'[৭] এর কিছুদিন পরে সতীশচন্দ্র মিত্রও সরেজমিন তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে সুন্দরবন তথা দক্ষিণবঙ্গ প্রসঙ্গে ইংরেজ লেখকদের মতামত অসার প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন।[৮]

কিন্তু বাঙালি লেখকদের এইসব বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ ঔপনিবেশিক চিন্তায় আচ্ছন্ন তথাকথিত পণ্ডিতমহলকে বিশেষ নাড়া দিতে পারেনি। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের দ্বাবিংশ অধিবেশন উপলক্ষে অভ্যর্থনা-সমিতির তরফে প্রকাশিত কলকাতা-বিষয়ক একটি পুস্তিকায় শহরের আদিপর্ব সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা থেকেই এই ঔদাসীন্যের পরিচয় মিলবে : 'But Calcutta came into existence only towards the end of the 17th Century...If we go to still earlier times we have practically no evidence to prove the existence of any agglomeration of people worth mentioning on that side of the river on which Calcutta came to be founded.'[৯] এ মন্তব্যের যুক্তি হিসাবে পরবর্তী পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে সেই এ. কে. রায় তথা ফার্গুসন প্রমুখের সিদ্ধান্তগুলি! পুনর্বিবেচনার কোনো চেষ্টাই করা হয়নি, ভেবে দেখা হয়নি এর মধ্যে অন্য কেউ যুক্তিসহ কিছু বলেছেন কিনা। অথচ ভাগীরথীর পূর্বতীরে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতার প্রমাণ ১৯৩৫ সালের আগে যে একেবারে অজ্ঞাত ছিল তাও নয়।[১০] তবু বিজ্ঞানী-সম্মেলনেও নির্বিবাদে প্রশ্রয় পেয়েছে অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা।

স্বভাবতই এই ধারার অনুবর্তনে পূর্বসূরিদের এমন বিরোধহীন মতৈক্য অতি-সাম্প্রতিক কালেও অনেককে প্রভাবিত করেছে। বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ সঙ্কর্ষণ রায়

ফার্গুসনের কথাতেই বলেছেন, 'প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে গঙ্গা ও পদ্মার অববাহিকা অর্থাৎ গঙ্গা, ভাগীরথী, হুগলী ও পদ্মার মধ্যবর্তী অঞ্চল ছিল বঙ্গোপসাগরের আওতায়। তখন রাঢ়ের মালভূমি, রাজমহল পাহাড় ও শ্রীহট্টের পাহাড়ী অঞ্চলকে ছুঁয়ে যেত বঙ্গোপসাগরের জল।'[১১] আর নিশীথরঞ্জন রায় আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, '...বঙ্গদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলটি বয়সের হিসেবে অর্বাচীন। ...প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিহ্ন এখানে শুধু দুষ্প্রাপ্য নয়, অপ্রাপ্য। এখানকার প্রত্নতত্ত্বের ভাণ্ডার জুড়ে শুধুই নুড়ি পাথর, বালি উদ্ভিজ্জ অঙ্গারক আর এক অথবা একাধিক শ্রেণীর উদ্ভিদের মূল। এখানকার ভূ-পৃষ্ঠের তলদেশ থেকে আবিষ্কৃত হয়নি কোন জীবাশ্ম কিংবা প্রাচীন যুগের মানুষের ব্যবহৃত কোন স্মারকচিহ্ন, অথবা শিলালেখ, তাম্রলেখ, অভিলেখ ইত্যাদি। ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে (তার মধ্যে বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলও অন্তর্ভুক্ত) যখন সমৃদ্ধ সভ্য নাগরিক জীবনের প্রমাণবহ বহু নিদর্শনের ছড়াছড়ি, পরবর্তীকালে কলকাতা নামে পরিচিত অঞ্চল শুধু অনাধ্যুষিত নয়, অস্তিত্বের দাবী প্রমাণে অপারগ। সুতরাং কলকাতার ইতিহাসের উপকরণের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব অপাংক্তেয়।...মাটির তলদেশ থেকে যে-সব উপাদান পাওয়া গেছে, যেমন কালীঘাটের মুদ্রা ইত্যাদি, তা কলকাতার উদ্ভব, উৎপত্তি কিংবা নগরবিন্যাসের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত।'[১২]

তা হলে দেখা যাচ্ছে, কলকাতাকে অর্বাচীন এবং তাদের দান বলে চিহ্নিত করবার জন্য ঔপনিবেশিক শক্তি যে প্রয়াস চালিয়েছিল, প্রায় একশো বছরেও তার প্রভাব কাটিয়ে ওঠা খুব একটা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত কোন্ কোন্ নিদর্শনের বিচারে, বা পূর্বজ্ঞাত তথ্যের পুনর্বিচারের মাধ্যমে আমরা সূর্যকুমার-প্রাণকৃষ্ণ-সতীশচন্দ্রের প্রদর্শিত পথে অনেকদূর এগোতে পেরেছি, এবার সেগুলি দেখা যেতে পারে।

নিম্নবঙ্গের ঐতিহাসিক স্থান

কলকাতা অঞ্চলের প্রাচীনত্ব বিচার করতে হলে অতীতে কলকাতার দক্ষিণে ভাগীরথীর পূর্বতীরে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের পরিস্থিতি কী ছিল তা-ও বিবেচনা করা প্রয়োজন। এরই সঙ্গে বিবেচ্য বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রসঙ্গ। মোটামুটিভাবে এই সমগ্র এলাকাকে নিম্নবঙ্গ ধরে নিয়ে এগোনো যেতে পারে। কলকাতা সংলগ্ন এই অঞ্চলের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করা গেলে এটুকু নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব হবে যে, দূর অতীতেই কলকাতা অঞ্চল বাসযোগ্য ভূখণ্ডে পরিণত হয়েছিল—সামান্য কয়েকশো বছর আগে সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়নি।

জানা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে অবিভক্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন ভূভাগ একাধিক নামে চিহ্নিত হয়েছে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভৌগোলিক সীমারেখার সঙ্কোচন-প্রসারণ ঘটেছে স্বাভাবিকভাবেই। তাই এক যুগে এক নামে চিহ্নিত ভূভাগ দীর্ঘকাল একই নাম বহন করেনি। তা ছাড়া প্রাচীন সাহিত্য, পুরাণ বা অন্যান্য গ্রন্থে উল্লিখিত স্থান-নাম প্রায় সব ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার পরিচয় দিতে ব্যর্থ। বিভিন্ন রাজবংশের তাম্রশাসনে উল্লিখিত স্থানগুলির প্রকৃত অবস্থানও বহুক্ষেত্রেই নির্ণয় করা যায়নি।

ফলে প্রাচীন উল্লেখপঞ্জীর ভিত্তিতে অতীত-বাংলার ভৌগোলিক রূপরেখা নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব। তবু স্বাভাবিকভাবেই ঐতিহাসিকরা হাল ছাড়েননি। রমেশচন্দ্র মজুমদার, নীহাররঞ্জন রায় এবং দীনেশচন্দ্র সরকার প্রমুখের রচনা থেকে প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক বিভাগগুলির একটা সার্বিক পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে তার বিস্তারিত বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক, শুধু নিম্নবঙ্গ সংক্রান্ত উল্লেখগুলির কথাই সংক্ষেপে বলা যেতে পারে।

আদি বৈদিক সাহিত্যে বঙ্গের কোনো উল্লেখ নেই। সম্ভবত ঐতরেয় আরণ্যকেই প্রথম মগধের (বগধ) প্রতিবেশী দেশ হিসাবে বঙ্গের উল্লেখ দেখা যায়।[১৩] এরপর রামায়ণ, মহাভারত, সিংহলি মহাবংশ, জৈন প্রজ্ঞাপনা সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ থেকে মোটামুটি অনুমান করা যায়, বঙ্গের অবস্থান ছিল পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত ও সুহ্মের সংলগ্ন অঞ্চলেই।[১৪] অশোকের লিপিতে বঙ্গের উল্লেখ নেই। তবে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' বঙ্গের সুতিবস্ত্রের কথা আছে।[১৫] কিন্তু এইসব উল্লেখের কোনোটি থেকেই খ্রীস্টপূর্ব যুগে বঙ্গের ভৌগোলিক সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে রচিত কালিদাসের 'রঘুবংশে' নিম্নবঙ্গের উল্লেখ অনেকটা স্পষ্ট—'অধিনায়ক রঘু রণতরীসহ সংগ্রামে উদ্যত বঙ্গদেশের রাজাদের সবলে উৎখাত করে গঙ্গাস্রোতের মধ্যবর্তী দ্বীপ-গুলোতে বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করলেন।'[১৬] 'গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু' পদের ব্যাখ্যা নিয়ে পণ্ডিতদের মতান্তর আছে। নীহাররঞ্জনের মতে, এর অর্থ 'গঙ্গাস্রোতের পূর্বে।'[১৭] তবে 'গঙ্গাস্রোতের মধ্যবর্তী' পদেও তখনকার নিম্নবঙ্গের যে পরিচয় বিধৃত, তা খুব অসম্ভব কিছু নয়। ভাগীরথীর অজস্র শাখানদীর জালের মধ্যে এই ভূভাগকে তখন সম্ভবত দ্বীপ-সমষ্টি বলেই বোধ হত।[১৮] Ptolemy-র দ্বিতীয় শতকের মানচিত্রেও যেন এই রূপই প্রকাশ পেয়েছে। বৈদেশিক বিবরণে বঙ্গের উল্লেখ প্রসঙ্গে পরে Ptolemy-র কথা আলোচিত হবে।

পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত গুপ্ত-পাল-সেন ও অন্য দু'-একটি রাজবংশের তাম্রশাসনের সাহায্যে সমসাময়িক বাংলার ভৌগোলিক পরিচয় কিছুটা উদ্ধার করা যায়। এই যুগে বাংলার প্রধান 'ভুক্তি' (প্রদেশ) হিসাবে বারবার পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির নাম পাওয়া গিয়েছে। পালযুগের শেষদিকে ভাগীরথীর পশ্চিমাঞ্চল বাদে বাংলার মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ—প্রায় সব অংশকেই এই ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। ঐতিহাসিকেরা এর প্রকৃত তাৎপর্য এখনও নির্ণয় করতে পারেননি। দীনেশচন্দ্র সরকারের অনুমান, এই অঞ্চলের রাজারা হয়ত এইভাবে তাঁদের ভূতপূর্ব পালসামন্তত্ব সূচিত করতেন।[১৯] এ ছাড়াও ছিল বর্ধমানভুক্তি, দণ্ডভুক্তি, কঙ্কগ্রামভুক্তি, ইত্যাদি।

পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি যে নিম্নবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাতে খুব একটা সন্দেহ নেই। এই ভুক্তির মধ্যে যেসব জেলা (বিষয় বা মণ্ডল) এবং মহকুমা (ভাগ, বীথী, মণ্ডল) ইত্যাদি ছিল, তার সবগুলির অবস্থান নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও কয়েকটি বর্তমান আলোচনায় উল্লেখযোগ্য। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন (নবম শতক), দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসন (নবম শতক) এবং লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া তাম্রশাসনে (দ্বাদশ শতক) পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত 'ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলে'র উল্লেখ আছে।[২০] নামটি নদী বা সমুদ্রতটের

ব্যাঘ্র-অধ্যুষিত জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলের কথাই মনে করায়। এজন্য অনেকেই বর্তমান সুন্দরবনে এই মণ্ডল অবস্থিত বলে মনে করেছেন। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, 'মনে হয়, চব্বিশ-পরগনা, খুলনা, বাখরগঞ্জের দিকেই যেন স্থানটির ইঙ্গিত।'[২১] ব্যাঘ্রতটী থেকে বাগড়ি—এই অনুমিতি অনুসারে 'আইন-ই-আকবরী'র 'মহাল বাগড়ি' (উত্তর মেদিনীপুরে), রেনেলের মানচিত্রে উল্লিখিত Bagree (বিষ্ণুপুর ও মেদিনীপুরের মধ্যে), বা মুর্শিদাবাদে লালগোলার কাছে 'বাগড়ি'র সঙ্গেও ব্যাঘ্রতটীর অভিন্নতা কল্পনা করেছেন অনেকে।[২২] শেষোক্ত মত দীনেশচন্দ্রের। এ ছাড়া প্রাচীন বাংলায় রচিত 'সারাবলী' নামক জ্যোতিষগ্রন্থের লেখক কল্যাণবর্মাকে 'ব্যাঘ্রতটীশ্বর' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[২৩]

পাল-সেন আমলের লিপি থেকে অনুমিত হয়, বঙ্গের উত্তরভাগ 'বিক্রমপুর' এবং দক্ষিণভাগ 'নাব্য' বলে পরিচিত ছিল।[২৪] ষষ্ঠ শতকে ধর্মাদিত্য ও গোপচন্দ্রের ফরিদপুর শাসনে 'নব্যাবকাশিকা'র বা 'নাব্যাবকাশিকা'র উল্লেখ আছে।[২৫] দ্বাদশ শতকে বিশ্বরূপসেনের সাহিত্যপরিষৎ লিপিতে আছে 'নাব্য'-এর উল্লেখ।[২৬] শ্রীচন্দ্রের রামপাল শাসনে (দশম শতক)[২৭] উল্লিখিত 'নান্য-মণ্ডল' আসলে 'নাব্য-মণ্ডল' বলেই অনুমিত হয়েছে।[২৮] 'নাব্য' বলতে নৌ-চলাচলের উপযুক্ত অঞ্চলকেই বোঝায়, এবং নদ-নদী-খাল-বিল বেষ্টিত দাক্ষিণবাংলার পক্ষে তা অবশ্যই প্রযোজ্য। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে, ফরিদপুর শাসনের 'নব্যাবকাশিকা'ও আসলে 'নাব্য-অবকাশিকা'।[২৯] তবে নীহাররঞ্জন 'নব্যাবকাশিকা' অর্থে নবসৃষ্ট ভূভাগ ধরেছেন,[৩০] এবং এই সূত্রে অনুমান করেছেন, ফরিদপুর অঞ্চল ষষ্ঠ শতকে সদ্য বসবাসযোগ্য হয়ে উঠেছিল আর বাখরগঞ্জ আরও পরের সৃষ্টি।[৩১] সাহিত্যপরিষৎ ও রামপাল-লিপির দুটি জায়গা বাখরগঞ্জে ছিল বলে স্থির হয়েছে।[৩২] সাহিত্যপরিষৎ-লিপি অনুসারে, এর পূর্ব সীমায় ছিল সমুদ্র। অতএব একে নিম্নবঙ্গে অবস্থিত বলা যাচ্ছে না, যদিও নিম্নবঙ্গও ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সে যুগে নিশ্চয়ই 'নাব্য' ছিল। তবে 'ব্যাঘ্রতটী' ও 'নাব্য' নিম্নবঙ্গে ছিল কিনা, তা নিয়ে সংশয় থাকলেও 'খাড়ি' সম্পর্কে বিশেষ সন্দেহ নেই। বিজয়সেনের ব্যারাকপুর শাসনের (দ্বাদশ শতক) 'খাড়ি-বিষয়', লক্ষ্মণসেনের বকুলতলা (সুন্দরবন) শাসনের (দ্বাদশ শতক) 'খাড়ি-মণ্ডল', এবং ডোম্মনপালের রাক্ষসখালি শাসনের (দ্বাদশ শতক) 'পূর্ব খাটিকা' নিশ্চয়ই এক। এটি ভাগীরথীর পূর্ব তীরে অবস্থিত ছিল, কারণ লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর শাসনে (দ্বাদশ শতক) ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত 'পশ্চিম খাটিকা'রও উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। এই 'খাড়ি' বা 'পূর্ব-খাটিকা' বর্তমান চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশে গঙ্গাসাগর অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এখনও ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার 'খাড়ি' তার স্মৃতি বহন করছে।[৩৩] নলিনীকান্ত ভট্টশালী ব্যারাকপুর ও বকুলতলা শাসনে উল্লিখিত কয়েকটি স্থানকে বর্তমান 'খাড়ি'র নিকটবর্তী এলাকায় চিহ্নিত করেছেন।[৩৪] লিপি-প্রমাণ থেকে এই অঞ্চলের অতীত সমৃদ্ধির পরিচয় মেলে।

বর্মবংশীয় ভোজবর্মার বেলাব তাম্রশাসনে (দ্বাদশ শতক), পৌণ্ড্র-ভুক্তির অধঃপত্তন-মণ্ডলে অবস্থিত 'কৌশাম্বী-অষ্টগচ্ছ খণ্ডলে'র উল্লেখ আছে।[৩৫] বকুলতলা শাসনের

'শান্ত্যাগারিক রামদেব' এবং বেলাব শাসনের 'শান্ত্যাগারিক রামদেব শর্মা'র নামসাদৃশ্যে নলিনীকান্ত ভট্টশালী 'অধঃপত্তনমণ্ডল'কে খাড়ি-মণ্ডলেরই দ্যোতক বলে অনুমান করেছেন।[৩৬] অবশ্য বর্মবংশের শাসনকেন্দ্র ছিল বিক্রমপুর, তবু দীনেশচন্দ্র 'কৌশাম্বী'কে রাজশাহী জেলার কুসুম্বা বলে মনে করেন না।[৩৭] রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলৈ অভিলেখে (একাদশ শতক) আছে, চোলসৈন্য দণ্ডভুক্তির ধর্মপাল ও দক্ষিণরাঢ়ের রণশূরকে পরাজিত করার পর বঙ্গালদেশের গোবিন্দচন্দ্র এবং উত্তররাঢ়ের মহীপালকে পরাজিত করে।[৩৮] বর্মবংশের আগে বিক্রমপুরে চন্দ্ররাজদের আধিপত্য ছিল, এবং ওই বংশের গোবিন্দচন্দ্র একাদশ শতকের প্রথমার্ধে রাজত্ব করেন। তিরুমলৈ লিপির গোবিন্দচন্দ্র তিনিই। এ-প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন বলেছেন, 'স্বতই অনুমান হয়, দক্ষিণরাঢ়ের পরই ছিল বঙ্গালদেশ, এবং এই দুই দেশের মধ্যসীমা ছিল বোধহয় গঙ্গা-ভাগীরথী।'[৩৯] অর্থাৎ তখন নিম্নবঙ্গ ছিল বঙ্গালদেশের মধ্যেই। বিধুভূষণ ঘোষ অবশ্য স্বতঃসিদ্ধের মতো ধরে নিয়েছেন নিম্নবঙ্গ তখনও সমুদ্রগর্ভে, তাই তিরুমলৈ অভিলেখ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁকে রূপনারায়ণের মোহনায় বঙ্গালরাজের অধীন দ্বীপের কল্পনা করতে হয়েছে।[৪০]

একাদশ শতকেই পালরাজ কুমারপালের প্রধানামাত্য বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে 'অনুত্তর-বঙ্গে' সমরবিজয়ের বর্ণনা দেখা যায়। নৌযুদ্ধ প্রভৃতির প্রসঙ্গ থেকে 'অনুত্তর-বঙ্গ'কে নিম্নবঙ্গ বলেই মনে হয়। নীহাররঞ্জনের মতে, অনুত্তর বঙ্গ হয় সমুদ্রশায়ী খাল-নালা-সমাকীর্ণ বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল, বা দক্ষিণ ও পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলের বর্ণনাত্মক নামমাত্র।[৪১]

কলকাতা কি সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল?

পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির আরেকটি অঞ্চলের সঙ্গে নিম্নবঙ্গের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য অনেক ঐতিহাসিক অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন। লেখমালার প্রমাণে সে চেষ্টার অসারতা মোটের উপর নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে দীর্ঘদিনই। তবু সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনার গাইঘাটার কাছে শিমুলিয়ায় মাটি খুঁড়তে গিয়ে আবিষ্কৃত প্রাচীন স্থাপত্যের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে অনেকে আবার দেখাতে চেয়েছেন, এই অঞ্চল হিউয়েন সাং বর্ণিত 'সমতটে'র অংশ ছিল, এবং যেহেতু ওই চীনা পরিব্রাজক 'সমতটে' বহু বৌদ্ধবিহার দেখেছিলেন, তাই শিমুলিয়ার স্থাপত্য নিদর্শনটি বৌদ্ধকীর্তি হতে পারে।[৪২] এখন 'সমতটে'র ভৌগোলিক সীমার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

'সমতট' নামে কোনো জনপদের উল্লেখ প্রথম দেখা যায় গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে (চতুর্থ শতক)। সেখানে ডবাক-নেপাল-কর্তৃপুর-কামরূপের সঙ্গেই এর নাম করা হয়েছে।[৪৩] 'সমতট' তখনও গুপ্তরাজগণের রাজ্যসীমার বাইরে।[৪৪] ষষ্ঠ শতকে বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা'য় সমতটের নাম দেখা যাচ্ছে পুণ্ড্র-তাম্রলিপ্তক-বর্ধমান-বঙ্গের সঙ্গে।[৪৫] কুমিল্লার কাছে গুনাইঘরে প্রাপ্ত ৫০৭ খ্রীস্টাব্দের তাম্রশাসনে যে বৈন্যগুপ্তের উল্লেখ আছে, তাঁকে গুপ্তরাজবংশের উত্তরাধিকারী হিসাবে মেনে নিলে বলা যায়, সমতট তখন গুপ্তসাম্রাজ্যের অধীন।[৪৬] সপ্তম শতকে হিউয়েন সাং কামরূপ থেকে দক্ষিণে সমতটে এসে তারপর পশ্চিমে তাম্রলিপ্তে গিয়েছিলেন।[৪৭] ওই শতকেরই

শেষদিকে সেং চি নামে অপর এক চীনা পর্যটক সমতটে রাজভট নামক বৌদ্ধ উপাসককে রাজত্ব করতে দেখেন। এই রাজভট এবং খড়্গবংশীয় দেবখড়্গের আশরফপুর শাসনের রাজপুত্র রাজরাজভট্ট একই ব্যক্তি বলে অনেকের অনুমান।[৪৮] মোটামুটিভাবে সপ্তম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত সমতটে রাত, খড়্গ, দেব ও চন্দ্রবংশীয় রাজাদের রাজত্বের কথা বিভিন্ন তাম্রশাসন থেকে প্রমাণিত হয়েছে। জীবধারণরাত সম্ভবত সমতটে স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতেন। কুমিল্লায় আবিষ্কৃত সামন্ত লোকনাথের শাসন (৬৬৩ খ্রীঃ) অনুসারে, জীবধারণ তাঁর কাছে পরাজিত হন। লোকনাথ কিছুদিন সামন্তরাজ হিসাবে সমতট শাসন করেন। কইলান তাম্রশাসন থেকে মনে হয়, জীবধারণের পুত্র শ্রীধারণও সামন্ত নরপতি ছিলেন। তাঁকে উৎখাত করে বঙ্গের খড়্গবংশীয় দেবখড়্গ সমতট অধিকার করেন।[৪৯] খড়্গদের পর অষ্টম শতকে সমতটে দেববংশীয় রাজাদের দেখা যায়। সিয়ান শিলালেখ থেকে অনুমান করা হয়েছে, গোপাল সমতট জয় করেছিলেন। তা অষ্টম শতকেরই ঘটনা।[৫০] নবম শতকে কান্তিদেবের পর অনেকদিন সমতটের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। দশম শতকের সূচনায় কম্বোজেরা সমতট-রাজধানী অধিকার করেছিল। এরপরই সমতট জয় করেন ত্রৈলোক্যচন্দ্র।[৫১] তবে চন্দ্রবংশের রাজত্বেও কখনও কখনও যে কুমিল্লায় দ্বিতীয় গোপাল বা মহীপালের অধিকার স্বীকৃত হতো, তা জানা গিয়েছে।[৫২] একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে সমতটের উল্লেখযোগ্য অংশ পট্টিকেরা রাজবংশের অধীন ছিল। এই পট্টিকেরার অবস্থান ময়নামতী ও কুমিল্লার কাছে। ত্রয়োদশ শতকে দামোদরদেব তা ধ্বংস করেন।[৫৩] দামোদরদেবের মেহার তাম্রশাসনে সমতটকে বলা হয়েছে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত। এই ত্রয়োদশ শতকেই বঙ্গের সমীপবর্তী দেশটির নাম লিখতে গিয়ে মিনহাজউদ্দিন তাঁর 'তবকাৎ-ই-নাসিরি'তে যা লিখেছেন, পাণ্ডুলিপিতে তার আকার পাওয়া গিয়েছে Saknat, Sankat এবং Sanknat। তবে তিনি অবশ্যই 'সমতট' লিখেছিলেন বলে দীনেশচন্দ্রের অনুমান। সম্ভবত সমতট সম্পর্কে এটিই শেষ উল্লেখ।[৫৪]

দেবখড়্গের আশরফপুর শাসন জয়-কর্মান্ত-বাসক (কুমিল্লার কাছে বড়কান্তা) থেকে প্রদত্ত। এজন্যই আগে মনে করা হতো, সমতটের রাজধানী ছিল এখানে।[৫৫] কিন্তু শ্রীধারণরাতের কইলান তাম্রশাসন (সপ্তম শতক), ভবদেবের তাম্রশাসন (অষ্টম শতক) এবং শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন (দশম শতক) থেকে স্পষ্ট জানা যায়, সমতটের রাজধানী ছিল দেবপর্বত, বর্তমান কুমিল্লার কাছে ময়নামতী পাহাড়ের দক্ষিণপ্রান্তে চণ্ডীমুড়া নামক শৃঙ্গে অবস্থিত। অতএব সমতট দেশ যে আধুনিক কুমিল্লা জেলার নিকটবর্তী অঞ্চল (ত্রিপুরা, নোয়াখালি প্রভৃতি) জুড়ে অবস্থিত ছিল,[৫৬] দীনেশচন্দ্রের এ মত অগ্রাহ্য করার কারণ নেই। তাই, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরে নিয়ে 'গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বতীর হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে মেঘনা-মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রশায়ী ভূখণ্ডকেই বোধহয় বলা হইত সমতট'—নীহাররঞ্জনের এ সিদ্ধান্ত[৫৭] প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ। বিজয়সেনের ব্যারাকপুর শাসন অনুসারে, 'খাড়ি'-মণ্ডলে ভূমির পরিমাপ হতো 'সমতটীয় নল' দ্বারা।[৫৮] শুধু এই যুক্তিতে নিম্নবঙ্গকে সমতটের অন্তর্ভুক্ত করার কোনো কারণ নেই। তা ছাড়া সমতটের

সাতশো বছরের ইতিহাসে কোনো তাম্রশাসনেই নিম্নবঙ্গের নিকটবর্তী কোনো ভূখণ্ডের উল্লেখ নেই। রাজত্বের কেন্দ্রও ছিল সুদূর কুমিল্লায়। অতএব সমতট রাজ্য যে কোনো সময়েই বর্তমান কলকাতা অঞ্চল তথা নিম্নবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এমন কথা এখনও বলা যাচ্ছে না।

এই অঞ্চল : গ্রীক-রোমক বিবরণীতে

প্রাচীন গ্রীক ও রোমক লেখকদের রচনায় পূর্বভারতে বসবাসকারী Gangarid (গ্রীকে একবচনে Gangarides, বহুবচনে Gangaridai, লাতিন বহুবচন Gangaridae) জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে Quintus Curtius Rufus আলেকজান্দারের ভারত অভিযানের (৩২৬ খ্রীঃ পূঃ) বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, বিপাশার পশ্চিমতীরে পৌঁছে আলেকজান্দার শুনলেন, গঙ্গার অপরতীরে Gangaridae এবং Prasii জাতির বাস। তাদের রাজা Agrammes-এর সেনাদলে কুড়ি হাজার অশ্বারোহী, দু'লক্ষ পদাতিক, দু'হাজার রথ এবং তিন হাজার হাতি আছে।[৫৯] খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতকে Diodorus Siculus একই বিষয়ের বর্ণনায় বলেছেন, জাতিদুটি Praisioi এবং Gandaridai, রাজার নাম Xandrames, এবং সেনাদলে হাতির সংখ্যা চার হাজার।[৬০] Justin-এর বর্ণনায় আলেকজান্দারের হাতে Praesidae এবং Gangaridae-এর পরাজয়ের কথা আছে।[৬১] Plutarch কোনো রাজার নাম না করে বলেছেন, Gandaritai এবং Praisiai-এর রাজাদের সেনাদলে আশি হাজার অশ্বারোহী, দু লক্ষ পদাতিক, আট হাজার রথ এবং ছ'হাজার হাতি আছে।[৬২] Siculus অন্যত্র বলেছেন, গঙ্গা উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পড়েছে, আর এই নদীই Gangaridai-দের রাজ্যের পূর্বসীমা। হাতির জন্যই এই রাজ্য অপরাজেয়।[৬৩] খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে রচিত ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য ও নৌচলাচল সংক্রান্ত Periplus Maris Erythraei গ্রন্থে ভারতের পূর্ব সীমায় উপকূলের কাছে গঙ্গানদীর উপর গঙ্গে বন্দরের সমৃদ্ধির কথা আছে।[৬৪] একই সময়ে Pliny বলেছেন, সমুদ্রে পড়ার আগে গঙ্গা Gangarides রাজ্যের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে।[৬৫] একটি অনুবাদে এই রাজ্যকে Gangaridaes Calingae এবং তার রাজধানীর নাম Protalis বা Parthalis বলা হয়েছে।[৬৬] খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি Ptolemy-র বর্ণনা ও মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে, গঙ্গার মোহনার কাছে সমগ্র রাজ্যই Gangaridai-এর অধিকারে। তাদের রাজধানীর নাম Gange। সে সময় পাটলিপুত্র অন্য রাজার রাজধানী। এ ছাড়াও Ptolemy গঙ্গার পাঁচটি মোহনা এবং Poloura ও Tilogrammon নামে এই অঞ্চলের আরও দুটি শহরের নাম করেছেন।[৬৭] খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকে Gaius Julius Solinus এর মতে, (দেশের) প্রত্যন্ত অঞ্চলে Gangarides জাতি বাস করে। তাদের রাজার এক হাজার ঘোড়া, সাতশো হাতি এবং ষাট হাজার পদাতিক সেনা আছে। অন্যদিকে, Prasian-দের রাজত্ব অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, তাদের রাজধানীর নাম Palibotra। রাজার অধীনে আছে ষাট হাজার পদাতিক, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী আর আট হাজার হাতি।[৬৮]

গ্রীক-রোমক বিবরণী-লেখকদের উল্লিখিত নাম ও অন্যান্য খুঁটিনাটি তথ্য নিয়ে সংশয় থাকলেও এই উল্লেখপঞ্জী থেকে এটুকু বোঝা যায়, খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেই গাঙ্গেয় বদ্বীপে এক শক্তিশালী জাতির অধিষ্ঠান ছিল। Prasioi যদি প্রাচ্য, অর্থাৎ পূর্বদেশবাসী হয়, তা হলে Gangarid-দের কেন বা কিসের ভিত্তিতে তাদের থেকে পৃথক করা হয়েছিল, তা স্পষ্ট নয়। দীনেশচন্দ্রের অনুমান, নন্দরাজারা Gangarid বংশোদ্ভূত ছিলেন বলেই এই পৃথক মর্যাদা।[৬৯] কিন্তু এর সপক্ষে কোনও প্রমাণ এখনও মেলেনি। তা ছাড়া Gangarid থেকে গাঙ্গেয় রাষ্ট্রটির নাম খুঁজে বার করার যে-চেষ্টা হয়েছে বা হচ্ছে, তা-ও নেহাতই অনুমাননির্ভর। তবে এখানে ওই সময় একটি সমৃদ্ধ, শক্তিশালী জাতির অস্তিত্বে সংশয়ের কোনো কারণ নেই। প্রথমে তা নন্দরাজের অধীনে থাকলেও পরবর্তী বিবরণে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বই যেন স্বীকৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে 'রঘুবংশে' বঙ্গজাতির উল্লেখের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে।[৭০] অন্যদিকে, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যাবে, নিম্নবঙ্গের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে প্রাক্-মৌর্য যুগ থেকে সভ্যতা-সংস্কৃতির চিহ্ন বর্তমান। একই সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে কয়েকটি বন্দর-নগরীর চিহ্ন—চন্দ্রকেতুগড় বা হরিনারায়ণপুরে। তবে Ptolemy-র গঙ্গে বা অন্যান্য নগরীর অবস্থান নির্ণয় করা এখনও সম্ভব হয়নি। গাঙ্গেয় রাষ্ট্রটির ভৌগোলিক সীমা নির্ধারণও কঠিন হয়েছে গ্রাক-রোমক লেখকদের বর্ণনার অনৈক্যে। এইসব বর্ণনায় উল্লিখিত 'গঙ্গা'র প্রবাহপথ তখন কোন্‌টি ছিল, তা নিয়ে ঐতিহাসিকরা একমত নন। রামায়ণ-মহাভারত-মৎস্যপুরাণের ভিত্তিতে নলিনীকান্ত ভট্টশালী স্থির করেছেন, সুপ্রাচীনকালে কলকাতার পাশ দিয়ে গঙ্গাসাগরগামী ভাগীরথীর বর্তমান প্রবাহপথটিই প্রধান ছিল। পরে এটি পলি পড়ে রুদ্ধ হয়ে যেতে থাকে। আবার Megasthenes, Ptolemy-র বিবরণ ও Periplus গ্রন্থের বিবরণ থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত, খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের আগেই গঙ্গার প্রধান শাখা হিসাবে পদ্মার উৎপত্তি হয়, এবং তখন থেকেই তা গঙ্গার অধিকাংশ জল বহন করছে। যদিও গঙ্গা বা ভাগীরথীই পবিত্র বলে গণ্য হতো। Ptolemy উল্লিখিত mega মোহনাকে রায়মঙ্গল বা হাড়িয়াভাঙ্গা মোহনার সঙ্গে এক দেখিয়ে ভট্টশালী বলতে চেয়েছেন, এটি আদিগঙ্গার প্রবাহপথ হতে পারে, এবং mega (great) নামের মধ্যে এর গুরুত্বও প্রকাশ পাচ্ছে।

Ptolemy-র মানচিত্র থেকে ভট্টশালী যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তার ভিত্তি হল দ্রাঘিমাসংক্রান্ত একটি সূত্র, যা তাঁর মতে, সকলেরই চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। এই মানচিত্র ও বিবরণ থেকে জানা যায়, Tamalites (তাম্রলিপ্ত) শহর এবং গঙ্গার সর্বপশ্চিম মোহনা Kambyson-এর দ্রাঘিমা একই—১৪৪°৩০′। এ থেকে নিশ্চিত বোঝা যাচ্ছে, Kambyson আসলে সাগরদ্বীপের মোহনাই। এরপর Ptolemy-র দেওয়া পরবর্তী দ্রাঘিমাগুলি থেকে আনুমানিক দূরত্ব হিসাব করে আধুনিক মানচিত্রে গঙ্গার অন্য চারটি মোহনাকেও চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন ভট্টশালী, এবং আরও দেখাতে চেয়েছেন, পূর্বসীমার শেষ মোহনা Antibole আড়িয়ালখাঁ-র মোহনা হতে পারে—এবং এই পথেই গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের জলরাশি সমুদ্রে পড়ত। এই প্রবাহকেই Gange বলেছেন মেগাস্থিনিস,

আর পেরিপ্লাসেও তাই বলা হয়েছে।[৭১] কিন্তু Ptolemy-র দ্রাঘিমা-অক্ষরেখা সংক্রান্ত ধারণা যে আদৌ বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, তা বহুদিন আগেই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে।[৭২] তাঁর মানচিত্রে অসঙ্গতিও প্রচুর। তাই এর উপর বিশেষ নির্ভর করা যায় না। অবশ্য গঙ্গার পাঁচটি মোহনা সম্পর্কে ভট্টশালীর মত অনেকেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু সে সময় পদ্মার প্রবাহপথে গঙ্গার অধিকাংশ জল বহনের কথা মেনে নেওয়া কঠিন। গঙ্গা ছিল Gangaridae রাজ্যের পূর্বসীমা, বা পেরিপ্লাস-গ্রন্থে পূর্বাঞ্চলের শেষসীমায় গঙ্গার কথা রয়েছে—শুধু এই যুক্তিতে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না।

প্রাচীন যুগ থেকে ভাগীরথী-হুগলির বর্তমান প্রবাহপথই যে গঙ্গা নামে অভিহিত হতো, আর এই পথেই প্রবাহিত হতো অধিকাংশ জল—এতে সংশয়ের বিশেষ কারণ নেই। খ্রীস্টপূর্ব যুগ থেকে খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে তাম্রলিপ্ত বন্দরের মাধ্যমে ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্য চলেছে।[৭৩] এই তাম্রলিপ্ত যে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে সমুদ্রের মোহনার কাছেই অবস্থিত ছিল, তমলুকের বর্তমান অবস্থান থেকে তা নিঃসন্দেহে বোঝা যায়। অন্যদিকে Ptolemy পাঁচটি মোহনার দুই প্রান্তের মধ্যে চার ডিগ্রি দ্রাঘিমার ফারাক দেখিয়েছেন;[৭৪] আজকের তমলুক ও চট্টগ্রামের অবস্থানে দ্রাঘিমার ফারাক ৪°১৮´। এর ভিত্তিতে সে যুগেও আজকের পদ্মার মোহনায় একটি মোহনার অস্তিত্ব স্বীকৃত হচ্ছে।[৭৫] এ ছাড়া একাদশ শতকে শ্রীচন্দ্রের ইদিলপুর শাসনে 'সতট-পদ্মাবাটি বিষয়ে'র উল্লেখ, মহাভাগবত ও বৃহদ্ধর্মপুরাণে গঙ্গার শাখা হিসাবে পদ্মার নামোল্লেখ থেকে অনুমান করা যায়, পদ্মার অস্তিত্ব হয়ত অনেকটাই প্রাচীন, কিন্তু তা গঙ্গার মর্যাদা কখনোই পায়নি।[৭৬] হিউয়েন সাং পুণ্ড্রবর্ধন যেতে গঙ্গা, আর কামরূপ যেতে সম্ভবত করতোয়া পার হওয়ার কথা বলেছেন, কিন্তু কামরূপ থেকে দক্ষিণে সমতট আসতে পদ্মার কথা বলেননি। অর্থাৎ পদ্মা নিশ্চয়ই তখনও এই বিপুল জলরাশি বহন করত না।[৭৭] তবে ষোড়শ শতক থেকেই বিভিন্ন সূত্রে পদ্মার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে—যেমন জাও দে বারোসের মানচিত্র (আনুমানিক ১৫৫০ খ্রীঃ), মানরিকের বিবরণী (১৬২৮ খ্রীঃ) এবং ষোড়শ শতকে আবুল ফজল ও বিভিন্ন বিদেশী পর্যটকের রচনা। স্টিভেনসন-মুর কমিটির মত পর্যালোচনা করে রমেশচন্দ্র মজুমদারও মেনে নিয়েছেন, পঞ্চদশ শতকের শেষেই গঙ্গার এই শাখাপথে অধিকাংশ জল প্রবাহিত হতে শুরু করে।[৭৮] দীনেশচন্দ্রও একথা মেনেছেন।[৭৯] নীহাররঞ্জন এই সময় আরেকটু পিছিয়ে দিতে চেয়েছেন।[৮০] সে যাই হোক, খ্রীস্টপূর্ব যুগ থেকে ভাগীরথীর বর্তমান প্রবাহের গুরুত্ব অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। এর সংলগ্ন এলাকায় নদীমাতৃক প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ-বিস্তৃতিরও পরোক্ষ প্রমাণ এ থেকেই মিলছে। এরই পাশাপাশি মোটামুটি সমসাময়িক কালেই আদিগঙ্গা এবং বিদ্যাধরীর গুরুত্বও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে প্রমাণিত হয়েছে। বাণিজ্যপথ হিসাবে প্রতিটিই সে যুগে সমধিক উল্লেখযোগ্য ছিল।

সুন্দরবনের প্রাচীন জনপদ

নিম্নবঙ্গের ভৌগোলিক পরিচয় আলোচনা প্রসঙ্গে সুন্দরবন পৃথক অভিনিবেশের দাবি

রাখে। সুপ্রাচীন কোনো বিবরণীতে এই অঞ্চলে এমন বিস্তৃত বনভূমির উল্লেখ নেই। হিউয়েন সাং সমতট থেকে তাম্রলিপ্ত আসার পথে এমন দুর্গম অরণ্য পেরিয়ে আসার কথা বলেননি।[৮১] 'ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলে'র সঙ্গে এই অঞ্চলের সম্পর্ক সন্দেহাতীত নয়। নীহাররঞ্জনের অনুমান স্বীকৃত হলে বলা যাবে, নবম-দ্বাদশ শতকে দক্ষিণবঙ্গের কিছু অংশে গভীর অরণ্য ছিল।[৮২] ষোড়শ শতকের পর অবশ্য এর যথেষ্ট উল্লেখ মিলছে।[৮৩] কিন্তু এ নিবন্ধের সর্বশেষ পরিচ্ছেদে রেণুবিজ্ঞানীদের গবেষণা প্রসঙ্গে দেখা যাবে, সাত হাজার বছর আগে থেকেই কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলে সুন্দরবনের মতো বনভূমি ছিল। ভূতাত্ত্বিক নানা আবিষ্কার থেকেও প্রাচীনযুগে এই অঞ্চলে, তথা নিম্নবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় সুন্দরবনের অস্তিত্ব বহুদিন আগেই স্বীকৃত হয়েছে। আবার প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান থেকেও নিশ্চিতভাবেই নিম্নবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে, প্রধানত চব্বিশ পরগনার দক্ষিণপ্রান্তে খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকে অন্তত দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সমৃদ্ধ, ঘনবসতিপূর্ণ জনপদের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে এবং হচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং ব্যাপক প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কারের আগে সুন্দরবনে মনুষ্যাবাস প্রসঙ্গে ধারাবাহিক বিতর্ক হয়েছে। বেভারিজ, ব্লকম্যান, ওয়েস্টল্যাণ্ড প্রমুখ ইংরেজদের মত ছিল, সুন্দরবনে কোনোকালেই তেমন উল্লেখযোগ্য বসতি ছিল না। রেনি কিন্তু এই মত মানতেন না। ফকাস ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। আর সতীশচন্দ্র সরেজমিন অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এই মত খণ্ডন করার সার্থক উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল।[৮৪] এইচ. জে. রেনি বলতে চেয়েছিলেন, সুন্দরবন 'গোড়ায়' যে শুধু জনাকীর্ণ ছিল তাই নয়, তার উত্তরদিকের এলাকার মতোই সভ্যতা-সংস্কৃতিতেও অগ্রসর ছিল। মন্দির, মসজিদ এবং অন্যান্য চমৎকার অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ থেকেই তা প্রমাণিত হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কীর্তিচিহ্ন থাকলেও শেষোক্ত শ্রেণীরই বেশি রয়েছে বলে রেনি মন্তব্য করেন। এরপর তিনি প্রতাপাদিত্যের সময় সুন্দরবনের সভ্যতার কথা বর্ণনা করেন। প্রাসঙ্গিক আলোচনায় রেভারেণ্ড জেমস লঙ কিছু নতুন তথ্য জানিয়েছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে বিবলিওতেক রয়ালের ভূগোল বিভাগের প্রধান মঁসিয়ে জোমার তাঁকে সে সময় থেকে দুশো বছরেরও বেশি পুরনো এক পোর্তুগিজ মানচিত্র দেখান। ভারতের সেই মানচিত্রে সুন্দরবনকে উর্বর ভূখণ্ড হিসাবেই দেখানো ছিল, আরও ছিল এই অঞ্চলে পাঁচটি নগরীর উল্লেখ। দে বারোসের 'দা এশিয়া' গ্রন্থের এক মানচিত্রেও এর সমর্থন মেলে। লঙ পোর্ট ক্যানিংয়ের কাছে 'তাদা' নামে এক পোর্তুগিজ বন্দরের কথাও বলেন। কলকাতার আগে এটিই নাকি বড় বন্দর ছিল। তবে লঙ সেখানে কোনো ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাননি। ক্যানিংয়ের ৪০ মাইল দক্ষিণে অবশ্য লঙ একটি চমৎকার হিন্দু মন্দির দেখেছিলেন—আনুমানিক সপ্তদশ শতকের। লঙের মতে, মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়ই সুন্দরবনে সভ্যতা ধ্বংসের কারণ। লঙের পর ব্লকম্যান মন্তব্য করেন, ঘূর্ণিঝড় নয়, পোর্তুগিজ ও মগদের আক্রমণই সুন্দরবনের জনহীন অবস্থার জন্য দায়ী। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ বলেন, অষ্টম শতকে সুলেমানের ভ্রমণকাহিনী থেকে এই অঞ্চলে অনেক শহরের কথা জানা যায়,

যাদের সঙ্গে আরাকানের বাণিজ্য ছিল। ঘোষের মতে, পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত সুন্দরবনে এমন জঙ্গল ছিল না। এ অঞ্চলের পূর্ব সমৃদ্ধির প্রমাণ দিতে গিয়ে তিনি পোর্তুগিজ লেখকদের কথা বলেন, এবং অনেক পুরাকীর্তিরও বিবরণ দেন। এ আলোচনার আঠারো বছর আগেই ত্রিপুরার 'রাজমালা' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রেভারেণ্ড লঙ সাগর-দ্বীপের প্রাচীনত্বের কথা বলেছিলেন।[৮৫]

কিন্তু বেভারিজ বা ব্লকম্যান এগুলিকে কোনো গুরুত্ব দিতে চাননি। ভূমির অবনমন এবং অতলস্পর্শের (Swatch of no ground) জন্যই সুন্দরবনের দুর্দশা—এই সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে না দিলেও কখনও যে এখানে ঘনবসতি ছিল, বা এখানকার শহরে শহরে সভ্য মানুষজন বাস করত একথা বেভারিজ মানতে নারাজ ছিলেন।[৮৬] পোর্তুগিজ ও ডাচ মানচিত্রে (দে বারোস, ফান ডেন ব্রোক) সুন্দরবনের সমুদ্রকূলে প্যাকাকুলি, কুইপিটাভাজ, নলদি, ডাপারা ও টিপারিয়া নামে পাঁচটি বন্দরের কথা আছে। ব্লকম্যানের মত ছিল, এসব মানচিত্র কিছুই প্রমাণ করে না।[৮৭] সতীশচন্দ্র প্রথমত বেভারিজের যুক্তি বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে খণ্ডন করেছেন, দ্বিতীয়ত সরেজমিন অনুসন্ধানের ভিত্তিতে সুন্দরবনে প্রাচীন সভ্যতার সুনিশ্চিত প্রমাণও দেখাতে পেরেছেন।[৮৮] ফকাস স্বীকার করেছেন, সত্যিই কর্দমাক্ত জলাভূমির ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের ভিতরেও জমকালো বাড়িঘর এবং মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব আছে। জনাকীর্ণ সুন্দরবন অবনমনের ফলে আজকের অবস্থায় পৌঁছেছে—এর অকাট্য প্রমাণ হিসাবে অবশ্য ওইসব নিদর্শনকে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না ফকাস।[৮৯] সাম্প্রতিক কালে রমেশচন্দ্র সুন্দরবনে সভ্যতা ছিল বলেই মত দিয়েছেন।[৯০] নীহাররঞ্জনও বিভিন্ন বিবরণী ও প্রত্নকীর্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করেছেন, ত্রয়োদশ শতকের কোনো সময় চব্বিশ পরগনা জেলার নিম্নভূমি কোনো অজ্ঞাত, অনির্ধারিত কারণে পরিত্যক্ত হয়। এই কারণ প্রাকৃতিক হতে পারে, রাষ্ট্রীয় বা সামাজিকও হতে পারে। এরপর ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে বন্যা এবং মগ ও পোর্তুগিজ জলদস্যুদের অত্যাচারে এই অঞ্চল জনশূন্য হয়ে পড়ে। রেনেলের মানচিত্রে (১৭৬১) বাখরগঞ্জ জেলার সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে লেখা আছে, 'Country depopulated by the Maghs.'[৯১]

রেণুবিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে এ অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরেই সুন্দরবনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এই গবেষণাতেই দেখা গিয়েছে, এখানে তৃণভূমিও ছিল—শুধুই সমুদ্রের জোয়ারে প্লাবিত নিম্নভূমি ছিল না। ফলে বাসযোগ্যতার অভাব ছিল না। এ ছাড়া পুরাকীর্তির প্রমাণ থেকে আরও বোঝা গিয়েছে, এখানে ধারাবাহিক সংস্কৃতিও ছিল। অর্থাৎ অনেক জায়গায় জঙ্গল থাকলেও বিস্তীর্ণ অঞ্চল সভ্যতার লীলাভূমি ছিল। পরে মূলত প্রাকৃতিক কারণেই হয়ত তা জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে। ভাগীরথীর ক্ষীণতার সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলের নদীগুলির স্রোতও ক্ষীণতর হয়ে আসে। সমুদ্রের জল বেশি করে ভিতরে চলে আসতে থাকে, জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়। বড় নদীগুলির নৌবাহনযোগ্যতা হ্রাস পায়। এভাবেই বিস্তীর্ণ এলাকায় সভ্যতা বিলুপ্ত হয়। এই ঘটনা মুঘলযুগে ঘটে বলেই অনুমান করা যেতে পারে।

কলকাতার ভূতত্ত্ব

গত ও বর্তমান শতকের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলের মাটি খোঁড়া হয়েছে। এইসব খননে বিভিন্ন গভীরতা পর্যন্ত ভূগর্ভের পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। অনেকগুলি ক্ষেত্রে প্রাপ্ত নিদর্শনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাদির অভাব রয়েছে। বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রেও আধুনিক ব্যবস্থাদি না থাকায় বিভিন্ন স্তরের কালনির্ণয় করা যায়নি। অতি সম্প্রতি রেণুবিজ্ঞানীরা কার্বন-১৪ পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত শিলীভূত পরাগরেণুর কালনির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। গত শতকে তার প্রশ্নই ছিল না। তবুও প্রাপ্ত নিদর্শনের ভিত্তিতে এবং অন্যান্য তথ্যের সাহায্যে ভূস্তর সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা গিয়েছিল। বিভিন্ন খননে কী পাওয়া গিয়েছিল, এবং সে সম্বন্ধে সে যুগে কী মত প্রকাশ করা হয়েছিল তা দেখা যাক।

এই অঞ্চলে সম্ভবত প্রাচীনতম খননের বিবরণ দিয়েছেন হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি লিখেছিলেন, ‘কলিকাতার নিকটবর্তী অনেক স্থানে ৩০ ফিট এবং ১৫০ ফিটের মধ্যে ঈষদঙ্গারীভূত তৃণের সহিত সুন্দরীবৃক্ষের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে দমদমে একটি পুষ্করিণী খনন করার সময়ে সুন্দরীবৃক্ষের সহিত কতকগুলি জীবাশ্ম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত হাড় কোন্ জীবের তাহা বিশেষভাবে নির্ণীত হওয়ার পূর্বেই এই হাড়গুলি হারাইয়া যায়; কিন্তু ইহারা বর্তমান সময়ে সুন্দরবনে যে সমস্ত জীব বাস করে তাহাদের অপেক্ষা অনেক বড় কোন জীবের বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।’[২২]

১৮১৪ খ্রীস্টাব্দের মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যে পানীয় জলের সন্ধানে কলকাতার কাছে হুগলি নদীর ধারে এক কূপ খনন করা হয়। স্যার এডোয়ার্ড হাইড ইস্ট এর বিবরণ দিয়েছেন।[২৩] সেবারে ১৪০ ফিট পর্যন্ত খোঁড়ার পর খনন পরিত্যক্ত হয়, এবং পানীয় জলেরও সন্ধান মেলেনি। কিন্তু ৩২ থেকে ৫২ ফিটের মধ্যে নীলচে কাদামাটির স্তরে গাছের অবশেষ মিলেছিল। ৫৭ থেকে ৬৫ ফিটের মধ্যে কাদামাটির সঙ্গে মিশে ছিল কিছু কাঁকরও। হাইড ইস্ট অনুমান করেছেন, প্রথমোক্ত গভীরতায় প্রাচীন কোনো বনভূমির অবশেষ রয়েছে। কোনো গুরুতর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলেই সে বনভূমি বিনষ্ট হয়—পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় আবিষ্কৃত এমন নিদর্শনের সঙ্গে তুলনার পর হাইড ইস্ট এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। এই খনন প্রসঙ্গে হাইড ইস্ট ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে চৌরঙ্গি রোডের মুখে বিশাল পুকুর খোঁড়ার সময় প্রাপ্ত নিদর্শনের কথাও উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথায়, ভূত্বকের ৩৫ ফিট নীচে প্রচুর বৃক্ষাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল। পূর্বোক্ত কূপের থেকে এই পুকুরের দূরত্ব ছিল মাত্র আধ মাইল। এ. কে. রায় অবশ্য বলেছেন, ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলে চৌরঙ্গির উত্তরে এসপ্লানেড ট্যাঙ্ক ফের খুঁড়তে গিয়ে তলদেশের চার ফিট নীচে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় প্রচুর সুন্দরী গাছের গুঁড়ি দেখা গিয়েছিল।[২৪]

১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলের মধ্যে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে এক গভীর কূপ খনন করা হয়েছিল। এবারেও উদ্দেশ্য ছিল সুপেয় জলের

সন্ধান। ৪৮১ ফিট পর্যন্ত খোঁড়ার পর খনক অকেজো হয়ে যাওয়ায় অনুসন্ধান পরিত্যক্ত হয়। এই খনন নানাদিক থেকেই উল্লেখযোগ্য, কারণ কলকাতার বুকে বা সন্নিহিত অঞ্চলে আর এ পর্যন্ত এত গভীরতায় কোনো খননকার্য হয়নি। তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন (ও এন জি সি) অবশ্য সম্প্রতি সোনারপুরের কাছে এবং মাহিনগরে মাটির অনেক নীচে অনুসন্ধান চালিয়েছে বা চালাচ্ছে। কিন্তু এইসব অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য সাধারণ্যে প্রকাশ করা হয় না। ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের (জি এস আই) সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। আর সরকারি-বেসরকারি কোনো উদ্যোগই গত দেড়শো বছরে ব্যয় করা হয়নি ফোর্ট উইলিয়াম খননের ফলাফল নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক উপায়-উপকরণের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখার জন্য। ফলে ভারত ও ব্রহ্মদেশের ভূতাত্ত্বিক বিবরণীর তৃতীয় সংস্করণেও[৯৫] ভূতত্ত্ববিদ এডুইন এইচ প্যাস্কো গাঙ্গেয় বদ্বীপের কথা বলতে গিয়ে সেই ফোর্ট উইলিয়ামের খননে প্রাপ্ত তথ্যের অতিরিক্ত কিছুকেই ভিত্তি করতে পারেননি যা তাঁর পূর্ববর্তী সম্পাদকরাও করেছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ামে ভূত্বকের ৮০ ফিট নীচে 'পিট'স্তরের সন্ধান মিলেছিল। এই স্তরে প্রাপ্ত বৃক্ষাবশেষ প্রধানত সুন্দরী গাছের বলেই নির্ণীত হয়েছে। ৩৫০ ফিট গভীরতায় যে অঙ্গারীভূত হাড় পাওয়া গিয়েছিল তা কুকুরের বলে মনে করা হয়। পরে স্থির হয়েছে, এটি কোনো গবাদি পশুর। ৩৬০ ফিট নীচে এবং তারপরেও কচ্ছপের খোলার মতো কিছু নিদর্শন মিলেছিল। ৩৭২ ফিটে আরও একটি হাড়ের সন্ধান পাওয়া গেলেও সেটি খনকের আঘাতে নষ্ট হয়ে যায়। ৩৯২ ফিট গভীরতায় পাওয়া যায় কিছু কয়লার নমুনা এবং বৃক্ষাবশেষ। ৪০০ থেকে ৪৮১ ফিট গভীরতায় সমুদ্রোপকূলের মতো বালির স্তর দেখা গিয়েছিল।[৯৬]

ফোর্ট উইলিয়ামের এই খননে কোনো marine deposit-এর সন্ধান মেলেনি। ৩৮০ ফিট গভীরতায় শামুকের যে অবশেষ মিলেছে, তাও fresh water প্রজাতির বলেই মনে করা হয়েছে। যতদূর পর্যন্ত খোঁড়া হয়েছিল, তার সব স্তরই নদীবাহিত পলি জমে জমে গড়ে উঠেছে, কিংবা এই অঞ্চল কোনো মোহনার নিকটবর্তী ছিল বলে ভূতাত্ত্বিকরা সিদ্ধান্ত করেন। পিট স্তর এবং বৃক্ষাবশেষ থেকে প্রাচীন ভূখণ্ডের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। অন্যদিকে বিভিন্ন স্তরে নুড়ি, কাঁকরের উপস্থিতি থেকে প্রাচীনকালে নিকটবর্তী এলাকায় পাহাড়ের অস্তিত্ব অনুমিত হয়, যা পরে পলিস্তরে চাপা পড়ে গিয়েছে। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, খননের অধিকাংশ স্তরে যে বালি ও নুড়ি পাথর দেখা গিয়েছে, তা নদীবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। বরং এটাই সম্ভাব্য যে, সে সময় কলকাতা-ভূখণ্ড পলিগঠিত গাঙ্গেয় সমভূমির সীমাবর্তী ছিল।[৯৭]

১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে এইচ. এফ. ব্ল্যানফোর্ড সার্কুলার রোডের পূর্বে শিয়ালদহে এক পুকুরে খোঁড়াখুঁড়ির বিবরণ দিয়েছেন।[৯৮] মোট ৪৬ ফিট পর্যন্ত ভূস্তরের পরিচয় এই বিবরণে পাওয়া গিয়েছে। উপরিতলের ২০ ফিট নীচে একফিট পুরু 'পিট'স্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। পুকুরের সব অংশেই এই স্তরের অস্তিত্ব বর্তমান। এই স্তর থেকে শুরু করে নীচের বালি-কাদার স্তরে প্রচুর সংখ্যায় সুন্দরীগাছের গুঁড়ি দেখা গিয়েছিল। ৩১ ফিটের

পর ছিল নীলচে কাদার স্তর—তাতে সুন্দরীগাছের শিকড় ছিল অজস্র। গুঁড়িগুলি সবই ছিল দাঁড়ানো অবস্থায়।

ব্ল্যানফোর্ডের মতে, শিয়ালদহের পুকুরে স্বস্থানে গাছের গুঁড়ি পাওয়ার বিষয়টিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, এবং এতে বদ্বীপ অঞ্চলে সামগ্রিক অবনমনের প্রমাণ মিলছে। অবশ্য একে অতিরিক্ত প্রমাণ বলা যায়, কেননা ফোর্ট উইলিয়ামের কূপ থেকেও অবনমনের নানা প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। ব্ল্যানফোর্ডের কথায়, সুন্দরীগাছ এমন জায়গায় জন্মায় যেখানকার জমি বারবার প্লাবিত হওয়ায় ঘাস গজাতে পারে না, কিন্তু শিকড়গুলোর বাতাস পেতে অসুবিধা হয় না, কারণ জমি শুকনোও থাকে অনেকক্ষণ। তাই শিয়ালদহে যে স্তরে সুন্দরীর গুঁড়ি মিলেছিল, খননের সময়কার নদীপৃষ্ঠের সঙ্গে তুলনায় দেখা যায় সে স্তরে তা জন্মানো অসম্ভব। একমাত্র ভূপৃষ্ঠের অবনমনই এর কারণ হতে পারে। তিনি আরও অনুমান করেন, শিয়ালদহে প্রাপ্ত 'পিট'স্তর সমগ্র কলকাতা জুড়ে, এমনকি হাওড়া অঞ্চলেও বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। তবে সর্বত্র একই গভীরতায় নয়। উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন, গার্ডেনরিচের দক্ষিণে নদীবক্ষে ভাটার সময় এই স্তর দেখা যায়, বোটানিক গার্ডেনসেও দেখা যায় নদীতীরে, কিন্তু এই দুই জায়গাতেই প্রকৃত গভীরতা শিয়ালদহের তুলনায় ৬ ফিট কম। আবার ফোর্ট উইলিয়ামে 'পিট'স্তর মিলেছে ভূপৃষ্ঠের ৫১ ফিট নীচে। স্তরের অবস্থানগত এই পার্থক্য সত্ত্বেও ব্ল্যানফোর্ড মনে করতেন, মোটামুটিভাবে সর্বত্র একই স্তরের খোঁজ মিলছে। কোথাও অবনমন কম হয়েছে, কোথাও বেশি। তবে এইসব স্তরের অবনমনের সমসাময়িকতা সম্পর্কে কিছু বলার মতো প্রমাণ তাঁর হাতে ছিল না।

হাওড়াতেও এই স্তরের ব্যাপ্তির যে কথা বলেছেন ব্ল্যানফোর্ড, সে প্রসঙ্গে ডঃ অ্যাণ্ডারসন তাঁকে জানিয়েছিলেন, স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস অতীতে হুগলি নাকি কাশীপুরের পর বর্তমান হাওড়ার কয়েক মাইল পশ্চিম দিয়ে বইত। বর্তমান খাত আসলে ছিল এক পুরনো খাল মাত্র। শ'দেড়েক বছর আগে হুগলি পুরনো খাত ছেড়ে বর্তমান খাতে বইতে শুরু করে। বর্তমান খাতের দুই তীরে তাই একই ভূতাত্ত্বিক পরিচয় বিধৃত। প্রসঙ্গত বলা যায়, চন্দ্রনাথ ব্যানার্জিও একথা বলেছেন। তাঁর বিবরণ[৯] অনুসারে, ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে সালকিয়ায় একটি পুকুর খুঁড়তে গিয়ে ১৫ ফিট নীচে ডিঙি নৌকার ভগ্নাবশেষ দেখা গিয়েছিল। নৌকার সঙ্গে দড়ির গাছা এবং হুঁকোও ছিল। হাত ছোঁয়াতেই সব গুঁড়ো হয়ে যায়। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে নুনের গোলার এক কর্মচারী সালকিয়াতেই পুকুর খুঁড়তে গিয়ে ৩০ ফিট নীচে বৃক্ষাবশেষ পেয়েছিলেন। ওই সময়েই শিবপুরে বাড়ি তৈরির জন্য ভিত খুঁড়তে গিয়ে সাত-আট ফিট নীচে অক্ষত অবস্থায় একটি কুয়োর সন্ধান মেলে। এ ছাড়া দু' জায়গাতেই এধরনের আরও নিদর্শন মিলেছে। চন্দ্রনাথের মতে, এ থেকে তাঁর পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয় যে, অতীতে হুগলি বর্তমান খাতের থেকে আরও পশ্চিমে বইত।

লিওনার্ড এবং গ্যাস্ট্রেলের দেওয়া তথ্য অনুসারে ব্ল্যানফোর্ড আরও সিদ্ধান্ত করেন, বদ্বীপে অবনমনের ব্যাপ্তি ছিল যথেষ্ট। লিওনার্ড জানিয়েছিলেন, মাতলা নদীর উপর

ক্যানিং শহরে মাটির ২০ ফিট নীচে 'পিট'স্তর দেখা গিয়েছে। ক্যানিংয়ের ভূপৃষ্ঠ কলকাতার থেকে অনেকটাই নীচে অবস্থিত। গ্যাস্ট্রেলের বিবরণ অনুসারে, খুলনার কাছে একটা পুকুর খুঁড়তে গিয়ে সাড়ে ১৬ ফিট থেকে ২০ ফিট গভীরতায় 'পিট'স্তরের নিদর্শন, এবং ১৮ থেকে ২৪ ফিটের মধ্যে বহু গাছের গুঁড়ি পাওয়া গিয়েছিল। গ্যাস্ট্রেল অনুমান করেছিলেন, সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চল জুড়েই সার্বিক অবনমন ঘটেছিল—সমগ্র বদ্বীপ অঞ্চলেও তা ঘটে থাকতে পারে। তাঁকে উদ্ধৃত করে সতীশচন্দ্রও বলেছেন, '…সুন্দরবনে ২।৩ বার ভীষণ অবনমন (subsidence) হইয়াছিল।' প্রসঙ্গত সতীশচন্দ্র ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে খুলনার দৌলতপুর কলেজপ্রাঙ্গণে খুলনা-ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের দ্বারা যে পুকুর খোঁড়া হয়েছিল, তার কথাও বলেছেন।[১০০] সেখানে ২১ ফিট নীচে 'পিট'স্তর (জোবমাটি) এবং তা থেকে ২৬ ফিট পর্যন্ত তলভাগে অসংখ্য সুন্দরী প্রভৃতি গাছের গুঁড়ি পাওয়া গিয়েছিল। তা ছাড়া মাতলায় এক পুকুর খুঁড়তে গিয়ে ৮।১০ ফিট মাটির নীচে অল্প জায়গায় ৪০টি সুন্দরীগাছ দেখা গিয়েছিল, সেখানে শিয়ালদহ বা খুলনার মতো শুধু গুঁড়ি নয়, প্রায় পুরো গাছই দাঁড়িয়ে ছিল।

১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে হুগলি জেলার বৈদ্যবাটির কাছে পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার জন্য মাটি খুঁড়তে গিয়ে ভূপৃষ্ঠের ২৫ ফিট নীচে শায়িত অবস্থায় সারি সারি গাছের গুঁড়ি দেখা গিয়েছিল। কাঠ ছিল একদম নরম। এর নীচেই ছিল নীল কাদা—অর্থাৎ 'পিট'স্তর। উপরে ছিল বালি-কাদার স্তর। এফ. এইচ. পেলিউ-র মতে, এই গাছগুলিকে বদ্বীপের কর্দমাক্ত মোহনায় আটকে থাকা গাছের মতো দেখাচ্ছিল। একই ধরনের কাদায় অর্ধেক পোঁতা অবস্থায় এমন শত শত গাছ তিনি নাকি সুন্দরবনের খালের মুখে দেখেছিলেন। পেলিউ অনুমান করেন, এই স্তরটি গড়ে ওঠার পর বদ্বীপে আর অবনমন ঘটেনি। সাগরদ্বীপের পূর্বদিকের ভূখণ্ডের মতোই বৈদ্যবাটি তখন নিচু মোহনা অঞ্চল ছিল, খাল-নালায় ভর্তি। দামোদর ও গঙ্গা বালি, কাদা দিয়ে নিচু জমি ভরাট করেছে, আর একই সঙ্গে মোহনা আরও সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। পেলিউ এই অনুমানের ভিত্তিতে বলেছিলেন, অন্যান্য খননে যে তথ্য মিলেছে, তা এর সঙ্গে মেলে না। স্তর সঠিকভাবে নির্ণীত হয়ে থাকলে সেসব ক্ষেত্রে গাছগুলি হয় অনেক প্রাচীন, নয়তো কিছু কিছু অঞ্চল আংশিক অবনমনের কবলে পড়েছিল।[১০১] ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'কোন কোন স্থানে গভীর কূপ ও পুষ্করিণী খননকালে প্রাচীন ক্ষেত্রতলোৎপন্ন উদ্ভিদ এবং মনুষ্যের ও ভূচর জন্তুর কঙ্কাল ভূগর্ভের অনেকহস্ত নিম্নে প্রাপ্ত' হওয়ার কথা বলেছিলেন—সে কথা নিবন্ধের প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে।[১০২] চন্দননগরের ফরাসি উপনিবেশে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে ২৪৩ ফিট পর্যন্ত একটি কূপ খনন করা হয়েছিল। মাটির ৪০ ফিট নীচে আট ফিট পুরু 'পিট'স্তরের সন্ধান মিলেছিল। প্রায় ১৫০ ফিট নীচে ছিল কোয়ার্ৎজ ও ফেলস্পার সমন্বিত নুড়ির স্তর। ফেলস্পারের পরিমাণ এতই বেশি ছিল যে, বহুদূর থেকে তা আসা সম্ভব নয়। এর উপস্থিতি এবং আকার থেকে নিকটবর্তী নিস বা গ্রানাইট স্তরের অস্তিত্বের ইঙ্গিত মেলে।[১০৩]

এ শতাব্দীর গোড়ায় কলকাতার ক্লাইভ স্ট্রিটে বাড়ি তৈরির জন্য মাটি খুঁড়তে গিয়ে

পাঁচ-ছয় ফুট নীচে একটি Oyster-bed পাওয়া গিয়েছিল। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'এই স্তরে নানা প্রকার সামুদ্রিক জীবের চিহ্ন (Ostraea, telescopium প্রভৃতি) পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত জীবচিহ্ন পরীক্ষিত হইয়াছে ও সুন্দরবনে প্রাপ্ত সামুদ্রিক জীবের সহিত ইহাদের একতা স্থাপিত হইয়াছে।' প্রেসিডেন্সি কলেজের নতুন বাড়ি—বেকার ল্যাবরেটরি তৈরির সময় ভিত খুঁড়তে গিয়েও telescopium সহ 'অনেকগুলি সামুদ্রিক জীবের কপাট (shell) ভগ্ন অবস্থায়' পাওয়া গিয়েছিল বলে হেমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন।[১০৪] প্যাস্কো এই Oyster-bed-কে জমির উত্থানের প্রমাণ বলে উল্লেখ করে প্রাপ্ত নিদর্শনের বিস্তারিত বিবরণ তুলে দিয়েছেন।[১০৫] বিবরণ অনুসারে, সুন্দরবনে খাল-নালায় মোহনায় তীরভূমিতে Ostraea প্রচুর পাওয়া যায়। Telescopium ও ম্যানগ্রোভ জলাভূমিতে সহজপ্রাপ্য, কলকাতার আশেপাশে খাল-নালাতেও মেলে। এ ছাড়া Paludina, Ampullaria, Planorbis ইত্যাদির বাস নদীতে, আর কয়েকটি নোনা জলের শামুকের নমুনাও একই সঙ্গে ছিল। এর সঙ্গে পাওয়া গিয়েছিল বড় নেকড়ে বা কুকুরের হাড়ের টুকরো, আর হাতির হাড়। হাতটি সম্ভবত Elephas indicus প্রজাতির ছিল।

কিন্তু এই নিদর্শনসমষ্টি সমসাময়িক পরিবেশ সম্পর্কে সম্ভবত সঠিক ধারণা দিতে পারছে না। প্যাস্কোর কথায়, কর্নেল এইচ. এইচ. গডউইন-অস্টেনের অনুমিতি স্বীকার করে নিউটন ও স্মিথ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, পুড়িয়ে চুন তৈরি করার জন্যই এগুলি একসঙ্গে এনে জড়ো করে রাখা হয়েছিল। এ কথা ঠিকই যে Ostraea ও Telescopium-এর খোলা চুন তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। অন্যদিকে প্যাস্কো আরও উল্লেখ করেছেন, সোয়ালো লেন এলাকায় মাটি খুঁড়তে গিয়ে রাস্তার পাঁচ-ছয় ফিট নীচে প্রচুর শামুকের খোলার মধ্যে ছাই এবং মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়েছিল। এ থেকে নিশ্চিতই বোঝা যায়, মানুষই এইসব শামুকের খোলা এনে রেখেছিল। এ থেকে প্যাস্কো সিদ্ধান্ত করেছেন, 'The older theory that the deposits immediately underlying Calcutta are of fresh water or estuarine origin without any traces of marine sediments, therefore stands'. প্যাস্কো আরও বলেছেন, Pleistocene এবং তার পরবর্তী যুগের প্রথম পর্বে গাঙ্গেয় বদ্বীপের নিম্নভূমি সমুদ্রের তলায় ছিল—প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও মোটামুটি এ কথা বলা যায়।[১০৬]

আরও কিছু নিদর্শনের খবর অন্যান্য সূত্রে মিলছে। শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন, Ostraea পাওয়া গিয়েছে ডায়মণ্ডহারবার এলাকা থেকে, আর কলকাতায় মেট্রো রেলের খোঁড়াখুঁড়ির সময়।[১০৭] ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের তরফে ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে গোবরার কাছে আবিষ্কার করা হয়েছে একটি গণ্ডারের কঙ্কাল (Rhinoceros sondaicus)। এই প্রজাতি সুন্দরবনে শ'খানেক বছর আগেও বিচরণ করত বলে সর্বেক্ষণের বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তবে এই নিদর্শনটি সম্ভবত অনেক পুরনো। ১৯৮০-র গোড়ায় যাদবপুরে খননকার্যের সময় ঘোড়া বা হরিণের হাড় মিলেছিল। বড়িশায় পাওয়া গিয়েছে হাতির (Elephas noadicus) দাঁত, মগরায় খুলি। এই প্রজাতি

পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। মছলন্দপুরে বুনো মোষের হাড় পাওয়া গিয়েছে। এই প্রজাতির মোষ সামান্য পরিবর্তিত আকারে এখনও বিচরণ করছে।[১০৮]

বিভিন্ন খননে প্রাপ্ত নিদর্শনের কথা বলা হল। এবার মতামতের দিকটা খুঁটিয়ে দেখা যেতে পারে। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে ফার্গুসন বলেছিলেন, হাজার পাঁচেক বছর আগেও গাঙ্গেয় বদ্বীপ বাসযোগ্য ছিল না। তিন হাজার বছর আগে পলিগঠিত সমভূমিতে শুধু শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল ছাড়া কোনো এলাকাই বাসযোগ্য ছিল না। মাত্র খ্রীস্টজন্মের হাজার বছর পরে নিম্ন-গাঙ্গেয় সমভূমিতে গৌড়ের মতো নগর গড়ে ওঠার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আর চতুর্দশ শতকে মুসলিম অধিকারের আগে বদ্বীপ অঞ্চল ব্যাপকভাবে বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি।[১০৯] উত্তর ভারত তথা উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে ফার্গুসনের এই মত যে অনেকদিনই বাতিল হয়ে গিয়েছে, তা বলা বাহুল্য। কিন্তু নিম্নবঙ্গ সম্পর্কে এই মত টিকে গিয়েছে শতাব্দীকালেরও বেশি। গবেষণাগ্রন্থে এর নির্বিচার পুনরুক্তির কথা আগেই বলা হয়েছে। বহুলপ্রচারিত পাঠ্যবইতেও কোনো ব্যতিক্রম নেই।[১১০] সুনিশ্চিত ভূতাত্ত্বিক প্রমাণের অভাব যে আছে, তা অনস্বীকার্য। কিন্তু অন্যান্য সূত্রের প্রমাণকে কেন যথোচিত মূল্য দেওয়া হবে না? বিশেষত এ যুগে যখন জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে আদানপ্রদানের উপরেই বারবার গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। আর ফার্গুসনও তখনকার ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতেই কালনির্ণয় সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছিলেন। তা হলে পরবর্তী শতাব্দীর ঐতিহাসিক ও অন্যান্য গবেষণার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকার কূপমণ্ডুকতা কেন আমাদের গ্রাস করবে?

প্যাস্কো কিন্তু তাঁর গ্রন্থে[১১১] ফার্গুসনকে শিরোধার্য করেননি। গাঙ্গেয় বদ্বীপের 'অন্যতম সেরা বর্ণনা' এখনও ফার্গুসনের নিবন্ধই, এ কথা বললেও প্যাস্কোর মত ছিল, পাঁচ হাজার বছর আগে গাঙ্গেয় উপত্যকায় হয়ত এতটাই জলাভূমি ছিল যে চাষবাস সম্ভব ছিল না; কিন্তু তা পুরোপুরি বাসযোগ্য ছিল না, এ কথা বোধহয় ঠিক নয়। আর জলাভূমি থাকলেও এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, সেই অঞ্চলের অধিকাংশ অল্পকাল আগেই সমুদ্রের তলায় ছিল। অবনমনের জন্য জলাভূমির সৃষ্টি হতে পারে। গাঙ্গেয় বদ্বীপে অবনমনের প্রমাণ আগেই আলোচিত হয়েছে।

চিন্তার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পেয়েছে গাঙ্গেয় বদ্বীপ সংক্রান্ত কাননগোপাল বাগচির গ্রন্থেও।[১১২] ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থে বাগচি প্রথমত দেখিয়েছেন,[১১৩] প্রকৃতি অনুসারে এই বদ্বীপকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—mature, moribund এবং active. এক কাল্পনিক রেখা দিয়ে কলকাতা এবং খুলনাকে যুক্ত করে সোজা পুবে মধুমতী পর্যন্ত সেই রেখা বর্ধিত করলে এর উত্তরে বদ্বীপের যে অঞ্চল পড়ে, সেটি moribund delta. এখানকার নদীগুলি মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন, অবক্ষয়িত। ভূমি-গঠনের কাজ সেখানে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চব্বিশ পরগনা ও খুলনার কিছু অংশ এর অন্তর্ভুক্ত। কল্পিত রেখার দক্ষিণে সুন্দরবন পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডেও নদীগুলি ভূমিগঠনে আর বিশেষ সহায়তা করতে পারছে না—কারণ কোনো পলি তারা বহন করে না। একমাত্র পূর্বাংশে এ কাজ কিছুটা হচ্ছে। এই অঞ্চল তাই mature delta. এর দক্ষিণে

সুন্দরবন অঞ্চল— সেখানে ভূমিগঠনের কাজ এখনও চলছে। এ অঞ্চলকে active delta বলা হয়েছে। চব্বিশ পরগনার অধিকাংশই mature delta-র অন্তর্ভুক্ত, সমুদ্রোপকূলবর্তী কিছু অংশ active delta-র মধ্যে। বলা বাহুল্য, কলকাতা-ভূখণ্ড mature delta-রই মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ এ অঞ্চল মোটেই নবীন নয়।

এ ছাড়া মূলত ভট্টশালীর আলোচনার ভিত্তিতে বাগচি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, টলেমি-র মানচিত্র প্রণয়নের সময়েই (১৫০ খ্রীস্টাব্দে) গাঙ্গেয় বদ্বীপ মোটের উপর বর্তমান আকৃতিতে পৌঁছেছিল। অর্থাৎ এই অঞ্চল অন্তত দু'হাজার বছরের পুরনো।[১৪] ভট্টশালীর নিবন্ধ[১৫] সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে— ভাগীরথী-আদিগঙ্গা-পদ্মার উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত পুরোপুরি যুক্তিসহ না হলেও গঙ্গার মোহনা সম্বন্ধে তাঁর মত অনেকটাই স্বীকৃত। ফলে বদ্বীপের নিম্নাংশ যে খ্রীস্টাব্দের সূচনায় বাসযোগ্য ছিল, এ অনুমান এ থেকে নির্ভয়েই করা যেতে পারে। প্রত্নতত্ত্বের প্রমাণে এ অনুমান প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।

বস্তুত কালনির্ণয় না করতে পারলে ভূতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে কোনো ইতিহাস-রচনা সম্ভব নয়। এজন্যই ফার্গুসনের অনুমিতির গণ্ডি পেরিয়ে পা বাড়ানো বিশেষ কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু অন্যান্য নিদর্শনের নিরিখে সে উদ্যোগ নেওয়ার যে সময় এসেছে, তা পরবর্তী আলোচনাতেই পরিস্ফুট হবে।

প্রত্নতত্ত্বে নিম্নবঙ্গ

প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে নিম্নবঙ্গের অবহেলিত অবস্থা আজ প্রায় প্রবাদ-প্রতিম হয়ে উঠেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত অধিকাংশ অমূল্য প্রত্ননিদর্শনই মাটি খুঁড়তে গিয়ে হঠাৎ পাওয়া, কিংবা শখের প্রত্নতাত্ত্বিকের অনুসন্ধানে সংগৃহীত। অথচ এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ যে পুরাসম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ তাতে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নেই। তবু প্রত্নতত্ত্ববিভাগ হাতে গোনা দু'-একটি জায়গা ছাড়া কোথাও বিজ্ঞান-সম্মত উৎখননে উদ্যোগী হননি। চন্দ্রকেতুগড়ের মতো পুরাক্ষেত্রে এখনও ব্যাপক খননের অবকাশ আছে। অবহেলায় হারিয়ে গেল হরিনারায়ণপুর। কলকাতার নিকটবর্তী বোড়ালেও যেভাবে জনবসতির ঘনত্ব দ্রুত বাড়ছে তাতে সেখানে আর খননের সুযোগ পাওয়া সম্ভব হবে কিনা তা বলা কঠিন। অথচ বোড়াল তথা আদিগঙ্গার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অনুসন্ধানে ধারাবাহিক সভ্যতার নিদর্শন মেলার সম্ভাবনা যথেষ্ট—যা স্বভাবতই কলকাতার আদিপর্বের উপর আলোকপাত করবে বলে আশা করা যায়। সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পুরাকীর্তির যেসব নিদর্শন মিলেছে বা মিলছে, তাতে সেখানেও উৎখননের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চন্দ্রকেতুগড়ের আংশিক উৎখনন তো নিম্নবঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসে দিকচিহ্ন হয়ে আছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আরও অনেক জায়গায় খননকার্য চালানো হলে এই ইতিহাস যে নতুন করে লিখতে হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প। বর্তমান পরিস্থিতিতে অবশ্য বিচ্ছিন্নভাবে প্রাপ্ত নিদর্শনের ভিত্তিতে সন্তর্পণে কিছু অনুমান প্রকাশ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। প্রথমে দক্ষিণ চব্বিশ

পরগনার প্রত্ননিদর্শনের পরিচয় দিয়ে তারপর কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলের প্রসঙ্গে আসা যাবে।

এই শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত গাঙ্গেয় বদ্বীপে প্রাগৈতিহাসিক পর্বের সভ্যতা-সংস্কৃতির নিদর্শন ছিল অজ্ঞাত। এরপরেই পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের উদ্যোগে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের তরফে বদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুসন্ধান ও উৎখনন চালিয়ে নানা বিস্ময়কর নিদর্শনের সন্ধান মেলে। নিম্নবঙ্গে এ ধরনের নিদর্শন-প্রাপ্তি সম্বন্ধে পরেশচন্দ্র লিখেছেন, 'চব্বিশ পরগনার একটি স্থানের ভূগর্ভেও প্লাইসটোসীন যুগের কোন এক তুলনীয় স্তরের উপস্থিতি অনুমান করা যায় আবিষ্কৃত নানা নিদর্শনাবলীর ভিত্তিতে। আবিষ্কৃত এই দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারটি, ফ্লিন্ট ও চ্যালসেডোনি জাতীয় বিভিন্ন প্রস্তরপিণ্ড এবং শেষ প্রত্নাশ্মীয় (আপার পেলিওলিথিক) কালের অসংখ্য স্বল্পায়তন হাতিয়ার। আপাতদৃষ্টিতে চব্বিশ-পরগনার সংগঠন নবীন অনুভূত হলেও এই জেলার বিভিন্ন স্থানে আদি-ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক কালের বিভিন্ন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।'[১১৬] শেষ-প্রত্নাশ্মীয় নিদর্শন সম্বন্ধে পরেশচন্দ্র জানিয়েছেন, '…একদিক থেকে স্বতন্ত্র গুরুত্বের অধিকারী ২৪ পরগনা জেলায় গঙ্গার তটভূমিতে অবস্থিত দেউলপোতায় আবিষ্কৃত শেষ-প্রত্নাশ্মীয় নিদর্শনাবলীর বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য। এখানে সংগৃহীত ফ্লিন্ট জাতীয় চার্ট ও কোন কোন ক্ষেত্রে চ্যালসেডোনি প্রস্তরে নির্মিত বিভিন্ন ক্ষুদ্রায়তন আয়ুধ, শল্ক ও প্রস্তরপিণ্ড যে এক প্রাগৈতিহাসিক জনজীবনের সাক্ষ্য দেয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার ফলে চার্ট প্রস্তরের আয়ুধগুলির গায়ে ঘন বেগুনী-নীল রং-এর 'মরিচা' অর্থাৎ 'প্যাটিনা' (Patina) দেখা যায়। আয়ুধ, শল্ক ও প্রস্তরপিণ্ডসমূহের পারস্পরিক সামীপ্য দেখে অনুমান করা যায় যে, ডায়মণ্ডহারবারের সামান্য উত্তরে অবস্থিত এই স্থানে হয়ত কোন উচ্চতর ও কঙ্করাবৃত ধ্বংসাবশেষ নিহিত আছে গাঙ্গেয় পাললিক সমাবেশের নীচে। দেউলপোতার বাঁকে সম্ভবতঃ ভূমিক্ষয়জনিত কারণে আলোড়িত স্তরবিন্যাস থেকে উদ্ঘাটিত হয়েছে এক হারানো প্রত্নক্ষেত্রের এক অসামান্য রহস্য।'[১১৭]

নবাশ্মীয় (Neolithic) নিদর্শন সম্বন্ধে পরেশচন্দ্র লিখেছেন, 'নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকার কয়েকটি স্থানেও আবিষ্কৃত হয়েছে মসৃণ নবাশ্মীয় কুঠার। এইগুলির উপস্থিতি দেখা যায় মূলতঃ আদি-ঐতিহাসিক পর্বের নিদর্শনাবলী সমৃদ্ধ বিভিন্ন অধিবসতি ক্ষেত্রে, ডায়মণ্ড-হারবার-এর সামান্য দক্ষিণে ও উত্তরে যথাক্রমে অবস্থিত হরিনারায়ণপুরে ও দেউলপোতায় এবং বিদ্যাধরী নদীর অদূরে অবস্থিত চন্দ্রকেতুগড়ে। যদিও এই তিনটি স্থানেই প্রাক-মৌর্য সভ্যতার চিহ্নস্বরূপ বিভিন্ন পুরাবস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে তবুও এই তিন অধিবসতি ক্ষেত্রে নবাশ্মীয় নিদর্শনাদির প্রকৃত দিগন্ত এখনও অজ্ঞাত।…দেউল-পোতায় সংগৃহীত হয়েছে হাড়ের অস্ত্র এবং তাম্রনির্মিত ক্ষুদ্রাকৃতি অর্ণবযান ও অন্যান্য রহস্যময় সামগ্রী। নানা দিক বিবেচনা করে মনে হয়, এই প্রাচীন অধিবসতিত্রয়ে নবাশ্মীয় কুঠারের উপস্থিতি ঘটে মৌর্য-পূর্বকালের কোন বিস্মৃত অধ্যায়ে।'[১১৮] এর আগে অবশ্য পরেশচন্দ্রই লিখেছিলেন, 'The tools from Deulpota,…

recovered from Diamond sands have perhaps been derived from a source much higher up in the upper-reaches of the Bhagirathi where some of its tributaries drain off the load carried over from the valley....'[১১৯]

আপাতদৃষ্টিতে পরেশচন্দ্র-উল্লিখিত এইসব নিদর্শনের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। কিন্তু উৎখননের মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্তরবিন্যাসের মধ্যে প্রাপ্ত না হওয়ায় এইগুলির কালনির্ণয় সম্পর্কে আদৌ নিশ্চিত হওয়া যায় না। এইসব আবিষ্কারের যথাযথ কোনও বিবরণী আজও অপ্রকাশিত। ফলে এগুলি সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার অবকাশ থেকেই গিয়েছে। এইচ ডি সাংকালিয়া মন্তব্য করেছেন,[১২০] 'The Middle Stone age tools have also been reported from Deulpota in the 24 Pargana District, though these seem to be washed out material and not in situ.' পরেশচন্দ্রের নিজের বিবরণেও স্ববিরোধিতা দেখা যায়। তবু এটুকু নির্দ্বিধায় বলা চলে, এইসব নিদর্শন প্রাপ্তির মাধ্যমে এই অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা-সংস্কৃতির চিহ্ন আবিষ্কারের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এজন্যই তাঁর বিবরণ থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া হল। দেউলপোতা ও অন্যান্য সম্ভাবনাময় পুরাক্ষেত্রে উৎখননের মাধ্যমে হয়ত এই সভ্যতার প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটিত হতে পারে।

ডায়মণ্ডহারবারের ৯.৬ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত দেউলপোতা থেকে আদি-ঐতিহাসিক ও পরবর্তী যুগের মৃৎপাত্রের অংশও যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছে। গঙ্গাতীরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই কৌলাল ছড়ানো ছিল। এর উৎসের খোঁজে দেউলপোতার কাছে পরীক্ষামূলক উৎখনন চালিয়ে বিশেষ ফল হয়নি। ছ'ফিট গভীরতা পর্যন্ত কিছুই পাওয়া যায়নি; সাড়ে সাত ফিট নীচে শুঙ্গ-কুষাণ যুগের লোহিত কৌলালের সন্ধান মিলেছে।[১২১]

ডায়মণ্ডহারবারের সাত-আট কিলোমিটার দক্ষিণে গঙ্গাতীরে হরিনারায়ণপুর ছিল অত্যন্ত সম্ভাবনাময় প্রত্নক্ষেত্র। নদীর ভাঙনে ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে এ অঞ্চলে শত শত পুরানিদর্শন পাওয়া যাচ্ছিল। পাঁচ ও ছ'য়ের দশকে একাধিক প্রত্নতাত্ত্বিকের ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এসব নিদর্শন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা সম্ভব। আজ এই প্রত্নস্থলটি সম্পূর্ণতই নদীগর্ভে নিমজ্জিত। নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় অনুমান করেছেন, সম্ভবত প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে পাল-সেন আমল পর্যন্ত এখানে ধারাবাহিক সভ্যতার চিহ্ন বর্তমান ছিল। এখানে প্রাপ্ত নিদর্শনের মধ্যে আছে অজস্র টেরাকোটা মূর্তি, ও খেলনা হিসাবে ব্যবহৃত কিছু বিচিত্র মোটিফযুক্ত পুতুল যেগুলি চালানোর জন্য নীচের দিকে শলাকা দিয়ে চাকা লাগানোর ব্যবস্থা ছিল। মোটিফের মধ্যে হাতি, ঘোড়া, ভেড়া, গণপতি উল্লেখযোগ্য। রোমক বা সেই ধরনের সূক্ষ্ম বৃত্তাকার রেখাঙ্কিত পানপাত্রও মিলেছে। বিভিন্ন সিলমোহরে আছে মিথুন-চিত্র, জাতক-কাহিনী ইত্যাদি। সংগৃহীত হয়েছে একাধিক মাতৃকা মূর্তি—যেগুলি সম্ভবত প্রাগৈতিহাসিক যুগের বলে পণ্ডিতদের অনুমান। রয়েছে মৌর্য-শুঙ্গ-কুষাণ প্রভাবযুক্ত বেশ কিছু যক্ষিণী মূর্তি।

অন্যান্য দেবমূর্তির মধ্যে ভগ্ন-অভগ্ন গণপতি, অগ্নি, বীণাপাণি, লক্ষ্মী, বাসুদেব, সূর্য উল্লেখযোগ্য। সর্প-উপাসনা ও বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বেরও প্রমাণ মিলেছে। এ ছাড়া হরিনারায়ণপুরে অসংখ্য অঙ্কচিহ্নযুক্ত রুপো ও তামার মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। কয়েকটি মুদ্রায় ব্যবহৃত অক্ষর খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে ব্যবহৃত ব্রাহ্মী লিপির অনুরূপ। একপিঠে চিত্রযুক্ত এবং অন্যপিঠে সমান্তরাল রেখাঙ্কিত মুদ্রাও মিলেছে। কোনো কোনো মুদ্রায় এই সমান্তরাল রেখার উপর দু-তিনটি বিন্দুচিহ্নও আছে। মুদ্রার প্রতিকৃতির মধ্যে উট এবং এক মাস্তুলযুক্ত দীর্ঘাকৃতি জাহাজ উল্লেখযোগ্য। সোনা, রুপো, তামা ও হাতির দাঁতের অলঙ্কারও পাওয়া গিয়েছে। নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় ছাড়া কালিদাস দত্ত এবং পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের কয়েকটি নিবন্ধেও এই পুরাক্ষেত্রের নিদর্শনগুলির আংশিক বিবরণ মেলে।[১২২]

প্রাচীনকালে মূলত নদীতীরবর্তী অঞ্চলেই সভ্যতার কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল। নদী-মাতৃক বাংলাদেশের পক্ষে এটি আরও বেশি করে সত্যি না হওয়ার কারণ নেই। তাই এখানে অতীতের গুরুত্বপূর্ণ নদীপথের কাছাকাছি এলাকায় প্রাচীন কীর্তির অবশেষ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, এবং সেই খাত বরাবর অনুসন্ধানে ধারাবাহিক ইতিহাস উদ্ঘাটনের সম্ভাবনাও প্রচুর। অজয় নদীর তীরবর্তী পাণ্ডুরাজার ঢিবি বা দামোদর তীরবর্তী বীরভানপুরে বাঙালির প্রাচীনতম সভ্যতা-সংস্কৃতির চিহ্ন আবিষ্কার[১২৩] এই সম্ভাবনাকে দৃঢ়ভিত্তি দিয়েছে। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি, ভাগীরথী হুগলির বর্তমান মূলস্রোতের তীরবর্তী দেউলপোতা-হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ মোটামুটি খ্রীস্টপূর্ব যুগ থেকে খ্রীস্টোত্তর দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই নদীপথের অস্তিত্ব ও গুরুত্বের পরিচয় বহন করছে। এবার সরস্বতীর বিস্মৃত শাখা বিদ্যাধরীর তীরবর্তী আর এক বন্দর-নগরী চন্দ্রকেতুগড়ের কথায় আসা যাক।

গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল হিসাবে বেড়াচাঁপা অঞ্চলের পরিচিতি অনেক দিনের হলেও ১৯৫৬-৫৭ মরশুমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী প্রথম এখানে উৎখননের কাজে হাত দেন।[১২৪] তারপর এখানে দীর্ঘদিন কাজ চলেছে। কলকাতার উত্তর-পূর্বে প্রায় ৩৭ কিলোমিটার দূরবর্তী এই অঞ্চলে খননের ফলে নিম্নবঙ্গের ইতিহাস নতুন মোড় নেয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। এ শতাব্দীর গোড়ায় সতীশচন্দ্র মিত্র দেগঙ্গা, বালাণ্ডা, চন্দ্রকেতুগড় সম্বন্ধে যে অনুমান ব্যক্ত করেছিলেন,[১২৫] তার যাথার্থ্যও এই খননে অনেকাংশে প্রমাণিত হয়েছে।[১২৬] কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, সে খননের পর দু'দশক অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত তার কোনও বিজ্ঞানভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশিত হয়নি। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণের বার্ষিক পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন নিবন্ধ থেকে এই খননে প্রাপ্ত নিদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যেতে পারে।

দেবপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন, চন্দ্রকেতুগড় (বেড়াচাঁপা) এবং তার নিকটবর্তী এলাকায় অনুসন্ধান ও উৎখননে দুই বর্গমাইল এলাকায় এক বিশাল প্রাচীরবেষ্টিত শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে, আর এর ফলে **Periplus**-লেখক ও **Ptolemy**-

উল্লিখিত 'গঙ্গে' যে দেগঙ্গা অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল, সতীশচন্দ্রের এ অনুমানও প্রায় মিলে গিয়েছে। এই উৎখননে মৌর্য থেকে গুপ্তোত্তর যুগ পর্যন্ত বহু নিদর্শন মিলেছে, এমনকি লোহিতাভ কৌলাল থেকে এখানে প্রাক্-মৌর্য যুগের অস্তিত্বও অনুমিত হয়েছে। বিদ্যাধরীর গুরুত্ব প্রমাণিত হয়েছে নিম্নাভিমুখে প্রবাহপথের ধারে চন্দ্রকেতুগড় ছাড়াও খাস-বালান্দা, ধারা ও ভাঙ্গরে অনুসন্ধানের ফলে। চন্দ্রকেতুগড় থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার দূরে হাড়োয়ায় মসজিদে রূপান্তরিত প্রস্তরনির্মিত এক মন্দিরের খোঁজ মিলেছে। এটি গুপ্তযুগের বলে মনে করা হয়। খাস-বালান্দা নেপালি পুঁথির বালান্দা মহাবিহারও হতে পারে। সতীশচন্দ্র এই অনুমান করেছিলেন। বালান্দা থেকে সামান্য দূরে ভাঙ্গর থেকে দশম-একাদশ শতকের এক চমৎকার বোধিসত্ত্ব-মঞ্জুশ্রী মূর্তি উদ্ধার করা হয়েছে।[১২৭]

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের বিবরণ অনুসারে,[১২৮] বেড়াচাঁপা গ্রামের বিভিন্ন অংশে, যথা চন্দ্রকেতুগড় ও খনা-মিহিরের ঢিবি এবং ইটখোলায় প্রাক্-মৌর্য থেকে পাল যুগ পর্যন্ত ছ'টি পর্বের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। প্রাক্-মৌর্য যুগে (প্রথম পর্বে) লোহিত মৃৎপাত্রের ব্যবহার দেখা যায়। এরই সঙ্গে ছিল হাতির দাঁতের মাল্যদানা (beads), বলয় ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্বটি সম্ভবত মৌর্য ও শুঙ্গ শাসনের সমসাময়িক। এই সময়ে উত্তরভারতীয় কৃষ্ণচিক্কণ কৌলাল (N. B. P. Ware) দেখা যায়। তা ছাড়াও ছিল চিক্কণ ও অচিক্কণ ধূসর কৌলাল। বৃত্তাকার রেখাঙ্কিত পাত্রের (Rouletted Ware) টুকরো, অল্পদামি পাথরের মাল্যদানা, টেরাকোটা মূর্তি এবং তামার অঙ্কচিহ্নিত মুদ্রা এই স্তর থেকে পাওয়া গিয়েছে। তৃতীয় পর্বটি শুঙ্গশাসনের শেষপর্ব বলে অনুমিত হয়েছে। এই সময় একধরনের মুদ্রাঙ্কিত লোহিত মৃৎপাত্র ব্যবহৃত হতো বলে মনে হয়। শুঙ্গরীতির টেরাকোটা ছাড়াও পাথরের মাল্যদানা, ঢালাই তামার মুদ্রা, স্টিয়াটাইটের কাস্কেট প্রভৃতি এই স্তর থেকে পাওয়া গিয়েছে। চতুর্থ পর্ব কুষাণ যুগের সমসাময়িক। এই স্তরেও যুগলক্ষণযুক্ত টেরাকোটা মূর্তি, ঢালাই তামার মুদ্রা, কাচ ও পাথরের মাল্যদানা, টেরাকোটা ফলক ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে। প্রথম চারটি পর্বের কোনোটিতেই বাড়িঘরের বিশেষ সন্ধান মেলেনি। যেটুকু নিদর্শন পাওয়া যায় তাতে মনে হয় মাটি, বাঁশ, কাঠের বাড়িই ছিল, আর তার চাল ছিল টালির। ভাটিতে পোড়ানো ইট প্রচলিত হয় পঞ্চমপর্বে, গুপ্তযুগে। এ সময় ধূসর বা কালো মৃৎপাত্র ব্যবহৃত হতো, কখনও কখনও সেগুলি হতো মুদ্রাঙ্কিত। টেরাকোটা ফলকে পশু ও মানুষের মূর্তি দেখা যায়, অনেক মিথুন-ফলকও মিলেছে।

খনা-মিহিরের ঢিবিতে আটটি অধিবসতি স্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এখানেই দেখা গিয়েছে একটি ইটের তৈরি বহুভুজ স্থাপত্য—যেটি সম্ভবত গুপ্তযুগের সর্বতোভদ্র-রীতির এক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। পূর্ববর্তী ক্ষুদ্রাকার এক স্থাপত্যেরই এটি পরিবর্ধিত রূপ। পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের বার্ষিক পর্যালোচনায় সঙ্কলিত বিবরণ থেকে আরও জানা যায়, উত্তরমুখী এই মন্দিরের কেন্দ্রে ছিল এক বিশাল বর্গাকার গর্ভগৃহ। তিনদিকে ছিল উদ্গত অংশ, আর ঢাকা প্রদক্ষিণপথ। সামনে কুড়িটি সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে

আয়তাকার খোলা বারান্দা (Porch), তারপরেই আয়তাকার ঢাকা প্রবেশপথ। গর্ভগৃহ, প্রবেশপথ ও বারান্দা ঘিরে আরেকটি আয়তাকার স্থাপত্য, ভিতরের মতো তারও তিনদিকে একরকম উদ্গত অংশ। মূল মন্দিরের সামনে এবং দু'পাশে প্রবেশপথ পর্যন্ত অনেক অগভীর কুলুঙ্গি—যেগুলি সম্ভবত পঙ্খ-পলেস্তারা মণ্ডিত ছিল। ভিতর ও বাইরের উদ্গত অংশের মাঝে ইটের স্থূল ঠেকনোও (buttress) দেখা গিয়েছে। এরানের বিষ্ণু মন্দিরেও এরকম ছিল। এ ছাড়া চন্দ্রকেতুগড়ের মন্দিরে ছিল দুটি উন্মুক্ত প্রদক্ষিণপথ। ঢিবির পশ্চিমকোণে মূল মন্দিরের একটি ক্ষুদ্রায়তন প্রতিরূপ ছাড়াও সিঁড়ির পাশে নিবেদন স্তূপের ভিত্তির চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তী যুগে মন্দিরটি সংস্কার এবং পরিবর্ধনের চিহ্নও স্পষ্টভাবে বোঝা গিয়েছে। মন্দিরের দ্বিতীয় স্তর থেকে শামুকের খোল পুড়িয়ে চুন বানানোর দুটি ফার্নেস আবিষ্কৃত হয়েছে—কাছেই রয়েছে পোড়া খোলভর্তি পাত্র। অবশ্যই এই চুন গাঁথনির কাজে এবং কুলুঙ্গির সজ্জার জন্য পঙ্খ-পলেস্তারা তৈরিতেও লাগতো। খননের সময় এই সজ্জার ভাঙা অংশ পাওয়া গিয়েছে।

ঢিবির বিভিন্ন স্তর থেকে পাওয়া পুরাবস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিষ্ণুমূর্তিখোদিত অষ্টম শতকের এক প্রস্তরফলক, ব্রোঞ্জের তৈরি ক্ষুদ্রাকার মৈত্রেয় মূর্তি, ইত্যাদি। একই মন্দির-চত্বরে আনুমানিক সপ্তম-অষ্টম শতকে নির্মিত উত্তর ভারতীয় শৈলীর আর একটি বিশাল মন্দিরের (১৫·৭৫ মি × ২৯·৫৮ মি) ভিত্তিও পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তীকালে এটিরও অনেকবার সংস্কার-পরিবর্ধন-পরিবর্তন করা হয়েছিল।

পালযুগেও (ষষ্ঠ পর্বে) এখানে বসতির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। মৌর্য-শুঙ্গ-গুপ্ত-পালযুগের নিদর্শন মিলেছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুরের আটঘরা গ্রামেও। এখানে ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব দপ্তর ঘোষের চক, মাহিনগর-মালঞ্চ, কলকাতার নিকটবর্তী বোড়ালেও কিছু কিছু অনুসন্ধান-উৎখননের কাজ করেছেন। ঘোষের চকে একটি স্তূপ পাওয়া গিয়েছে।[১২৯]

প্রাচীন বঙ্গের মূল নদীপ্রবাহ আদিগঙ্গা ছিল কিনা তা আজ নিঃসন্দেহে বলা সম্ভব নয়। কলকাতার দক্ষিণে হুগলি নদীর বর্তমান প্রবাহপথ, বা উত্তর-পূর্বে বিদ্যাধরীর প্রবাহপথ খ্রীস্টজন্মের অন্তত চারশো বছর আগে থেকে শুরু করে খ্রীস্টোত্তর দ্বাদশ-ত্রয়োদশ বা দশম-একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে গুরুত্ব বজায় রেখেছিল, দেউলপোতা-হরিনারায়ণপুর ও চন্দ্রকেতুগড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান থেকেই তা মোটের উপর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ দুটি অঞ্চলে যেটুকু প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান হয়েছে, কলকাতার পর আদিগঙ্গার তীর বরাবর সমুদ্রসঙ্গম পর্যন্ত তার সিকিভাগও হয়নি। তবুও বিচ্ছিন্নভাবে যেসব পুরাবস্তুর সন্ধান মিলেছে, তাতে বোঝা যায়, প্রাচীনযুগে অন্যান্য প্রবাহের পাশাপাশি আদিগঙ্গার পথও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কালিদাস দত্ত, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখের আলোচনায় এই নদীর মজাখাতের তীরবর্তী এলাকার পুরা-নিদর্শন ও প্রত্নসম্ভাবনার চিত্র কিছুটা অনুমান করা যায়।[১৩০] কলকাতার সামান্য দক্ষিণে বোড়াল থেকে শুরু করে গোবিন্দপুর পর্যন্ত প্রায় টানা দক্ষিণমুখী প্রবাহে যাওয়ার

পর আদিগঙ্গা পশ্চিমে বাঁক নিয়ে কাকদ্বীপের দক্ষিণে মুড়িগঙ্গা হয়ে সাগরদ্বীপের উপর দিয়ে সঙ্গমে মিশেছিল। মজাখাতের পূর্বতীরে উত্তর থেকে দক্ষিণে রাজপুর, মালঞ্চ, মাহিনগর, হরিহরপুর, আটঘরা, বারুইপুর, সূর্যপুর, সরিষাদহ, ময়দা, খনিয়া, মজিলপুর, বাইশহাটা, মনিরতট, খাড়ি, রাধাকান্তপুর, নলগোড়া, রায়দিঘি, কঙ্কণদিঘি, গোবিন্দপুর প্রভৃতি, এবং পশ্চিমতীরে বোড়াল, দক্ষিণ গোবিন্দপুর, কল্যাণপুর, শাসন, মুলটি, বহড়ু, জয়নগর, বিষ্ণুপুর, ছত্রভোগ, বড়াশী, কাশীনগর, গঙ্গাদ্বার প্রভৃতি এলাকায় প্রাচীনত্বের নানা নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। পরে কলকাতার পুরানিদর্শন প্রসঙ্গে বোড়ালের কথা বলা হবে। আগে অন্য জায়গাগুলির উল্লেখযোগ্য প্রত্নসম্পদের কথা সংক্ষেপে বলা হচ্ছে।

আদিগঙ্গার মজাখাত ধরে বোড়ালের কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণে গোবিন্দপুর। এখানে এক প্রাচীন দিঘি 'হেঁদুয়ার পুকুর' থেকে কালো পাথরের ভগ্ন দেবমূর্তি, 'রাজবাড়ির ভিটে' নামের জঙ্গলাকীর্ণ ঢিবি থেকে নক্‌শা-কাটা ইট ও পোড়ামাটির মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এ এলাকার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল রাজা লক্ষ্মণ-সেনের একটি তাম্রলিপি। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে একটি পুকুর খুঁড়তে গিয়ে এটি পাওয়া যায়। এই শাসনে প্রদত্ত গ্রামের নাম বিড্ডার-শাসন এবং সেটি বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত পশ্চিম-খাটিকার (খাড়ি) বেতড্ড-চতুরকে (হাওড়া জেলার বেতড় অঞ্চল) অবস্থিত ছিল। আনুমানিক ১১৮১ খ্রীস্টাব্দে এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হয়।[১৩১]

গোবিন্দপুরের দক্ষিণ-পূর্বে আদিগঙ্গা ও প্রাচীন বিদ্যাধরীর মজাখাতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে আর একটি প্রত্নসম্পদে ভরা গ্রাম সীতাকুণ্ড-আটঘরা। এখানে পাওয়া কৌলালের কোনো কোনোটি উজ্জ্বল-মসৃণ ও কালো প্রলেপযুক্ত (N. B. P. ?)। এ ছাড়া আছে ধূসর বর্ণের গলাযুক্ত পানপাত্র, পোড়ামাটির যক্ষ-যক্ষিণী, নানা মোটিফযুক্ত ক্রীড়নক, মিথুন-ফলক, জাতক-কাহিনীর আলেখ্য ইত্যাদি, তামার ঢালাই মুদ্রা, অঙ্ক-চিহ্নিত রুপো ও তামার মুদ্রা, কুষাণ ও গুপ্ত মুদ্রা, প্রাচীন হরফ-উৎকীর্ণ ও মোটিফযুক্ত সিল, পাল ও সেন শৈলীর একাধিক বিষ্ণুমূর্তি, নবগ্রহফলকের ভগ্নাংশ, নৃসিংহমূর্তি, সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যমূর্তি, মঞ্জুশ্রী মূর্তি ইত্যাদি। আটঘরার পর দক্ষিণ-পশ্চিমে বর্তমান শাসন রেলস্টেশনের লাগোয়া শিখরবালি-বনবেড়িয়া অঞ্চলে আরবি হরফে উৎকীর্ণ আনুমানিক চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতকের তাম্রলিপি মিলেছে। বনবেড়িয়ার দক্ষিণ-পূর্বে রামনগর গ্রামের প্রান্তে আদিগঙ্গার ক্ষুদ্র মজা উপধারা 'চঙ্গের দহ'। এখানে পাথরের চতুর্ভুজা মহিষমর্দিনী, দ্বিভুজ বিষ্ণু ও গণেশ মূর্তি, অঙ্কচিহ্নিত তাম্রমুদ্রা, ও পোড়ামাটির যক্ষিণী মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। রামনগরে 'তিন সতীনের পুকুর' থেকেও চতুর্ভুজা বৃষারূঢ়া দেবীমূর্তি মিলেছে।

এরপরই দক্ষিণ-পূর্বে শরবেড়িয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল। শরবেড়িয়া মৌজায় চাষ-বাসের সময় মাটির প্রায় একমিটার গভীরে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রস্তরনির্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এর মধ্যে আছে মকর-বাহিনী গঙ্গামূর্তি, দ্বারপাল, কীর্তিমুখ-শোভিত স্তম্ভশীর্ষ ইত্যাদি। নিকটবর্তী জলাশয় থেকে বড় আকারের ইটের গাঁথুনি, বিষ্ণুমূর্তির অংশ ও পুরী-কুষাণ মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। পুরাতত্ত্ব বিভাগের বিবরণী অনুসারে,[১৩২]

পিয়ালি নদীর প্রবাহ বরাবর অনুসন্ধানের সময় শরবেড়িয়ার কাছে ব্রাহ্মণবাড়িতে গুপ্তোত্তর যুগের মন্দিরের নিদর্শন মিলেছে। শরবেড়িয়ার বিপরীতে মজাখাতের অপর তীরে অবস্থিত নামাজগড়-জাঙ্গালিয়া মৌজায় অনেকগুলি ঢিবি আছে। এখানে পোড়া-মাটির মূর্তি, নানা বর্ণ ও আকৃতির পোড়ামাটির পাত্র, সিল, পাথরের তৈরি বীণাপাণি, বামনরূপী বিষ্ণু ও কার্তিক মূর্তি পাওয়া গিয়েছে।

আরও দক্ষিণে সরিষাদহে গঙ্গার মজাখাতের মাটি খুঁড়তে গিয়ে বিশাল বিষ্ণুমূর্তি, উমা-মহেশ্বর, নৃসিংহমূর্তি, কারুকার্যময় প্রস্তরস্তম্ভ, শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়েছে। আনুমানিক একাদশ শতকের একটি দ্বাদশ শলাকাযুক্ত প্রস্তরচক্রের মধ্যে খোদিত গরুড়পৃষ্ঠে নৃত্যরত নটরাজ বিষ্ণুমূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চৈতন্যের নীলাচল যাত্রাপথের বিবরণীতে উল্লিখিত ছত্রভোগে ত্রিপুরসুন্দরীর বর্তমান মন্দিরের পিছনে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। লাগোয়া কৃষ্ণচন্দ্রপুরে আবিষ্কৃত হয়েছে একাধিক প্রস্তর ও ধাতুমূর্তি। ধাতুমূর্তির মধ্যে একটি ব্রোঞ্জের দীপলক্ষ্মী উল্লেখ্য। কৃষ্ণচন্দ্রপুরের দক্ষিণে কাশীনগর থেকে খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের একটি সপ্তাশ্ব-বাহিত সূর্যমূর্তি মিলেছে। এর এক কিলোমিটার পূর্বে বর্তমান খাড়ি গ্রামেও কিছু পুরাকীর্তি পাওয়া গিয়েছে। লাগোয়া বকুলতলা গ্রামে ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে পুকুর খুঁড়তে গিয়ে লক্ষ্মণসেনের আনুমানিক ১১৮০ খ্রীস্টাব্দের এক তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছিল।[১৩৩] পরে সেটি হারিয়ে যায়। শাসনে প্রদত্ত ভূমির অবস্থান ছিল পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির খাড়ি-মণ্ডলের কান্তল্লপুর-চতুরকের মণ্ডলাগ্রামে। নলিনীকান্ত ভট্টশালী এই শাসনে উল্লিখিত স্থানগুলিকে খাড়ির নিকটবর্তী এলাকায় শনাক্ত করার চেষ্টা করেছেন।[১৩৪] চব্বিশ পরগনার ব্যারাকপুরে প্রাপ্ত বিজয়সেনের (শাসনকাল আনুমানিক ১০৯৬-১১৫৯ খ্রীস্টাব্দ) ৬২তম রাজ্যবর্ষের তাম্রশাসনেও প্রদত্তভূমির অবস্থান ছিল পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত খাড়ি বিষয়ের ঘাসসম্ভোগভুক্ত ভাট্টবড়া গ্রামে। নলিনীকান্তের মতে, এগুলির অবস্থানও নির্ণয় করা গিয়েছে। তবে এইসব স্থানকে ভাগীরথীতীরবর্তী বলে চিহ্নিত করে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'বর্ম্মদের আমল হইতে ভাগীরথীর বর্ত্তমান প্রবাহের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং আদিগঙ্গাতে ভাগীরথীর স্রোত যদি কোন যুগে প্রবাহিত হইয়া থাকে, তবে সেই যুগ ইহারও পূর্ব্ববর্ত্তী।' নির্মলেন্দুবাবুর নিবন্ধসংলগ্ন মানচিত্রে খাড়িকে স্পষ্টই আদি-গঙ্গার তীরে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১৩৫] চৈতন্য এই পথেই নীলাচল গিয়েছিলেন। এ ছাড়া সপ্তদশ শতক পর্যন্তও কলকাতার সঙ্গে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের যোগাযোগের প্রধানপথ আদিগঙ্গাই ছিল। তাই ভট্টশালীর মতামত পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। আদিগঙ্গার তীরে বিশেষ খননকার্য হয়নি বলে প্রত্নস্থলগুলির সঠিক প্রাচীনত্ব নির্ণয় করা এখনও সম্ভব নয়। তবে আটঘরার খননে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের কর্মীরা শুঙ্গযুগের প্রচুর নিদর্শন ছাড়া N. B. P.ও পেয়েছেন।[১৩৬] বোড়ালের প্রাচীনত্বও প্রমাণিত। তাই প্রাচীন যুগে হুগলির বর্তমান প্রবাহের পাশাপাশি আদিগঙ্গার গুরুত্বও অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। নিম্নতর প্রবাহে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লাট অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে আদিগঙ্গার স্রোত সাগরাভিমুখে যেত। লাটের প্রত্নস্থলগুলি গঙ্গার

অসংখ্য শাখাপ্রশাখার তীরেই অবস্থিত ছিল। নির্মলেন্দুবাবু উল্লেখ করেছেন, সাগরের কাছে বুড়াবুড়ির তটে 'জি' প্লটে অনেকগুলি ঢিবির আশেপাশে শুঙ্গ-কুষাণ যুগের পোড়ামাটির পুতুল, কুষাণ ও পাল আমলের মৃৎপাত্র, নানা বর্ণ ও আকৃতির মাল্যদানা, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। দক্ষিণ-গোবিন্দপুরে ১৪৪ নম্বর লটে ছিল গুপ্তযুগের মন্দিরের অবশেষ। করঞ্জলি-কাঁটাবেনিয়া, নেত্রা, পাকুড়তলা থেকে জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি, বৃষসহ শিব-নটরাজ, অনন্তশয়ান বিষ্ণু, ব্রোঞ্জের উমা-মহেশ্বর, ভূমিস্পর্শমুদ্রায় বুদ্ধ, নৃত্যরত গণেশ, আদিনাথ, বীণাবাদনরতা সরস্বতী মূর্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে। রায়দিঘি থেকে ধাতুনির্মিত বিষ্ণু, পাথরের উমা-মহেশ্বর, তীর্থঙ্কর মূর্তি, এবং কঙ্কণদিঘি থেকে গুপ্তযুগের সূর্যমূর্তি, নবগ্রহফলক ও ব্রোঞ্জের বিষ্ণু-জনার্দন মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

রায়দিঘি-কঙ্কণদিঘির প্রায় সাত কিলোমিটার পূর্বে, ১১৬ নং লটে আদিগঙ্গার লুপ্তধারা ও মণি নদীর সংযোগস্থলে বিখ্যাত জটার দেউল অবস্থিত। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের সরকারি বিবরণ অনুসারে,[১৩৭] এর তৎকালীন উচ্চতা ছিল প্রায় ৬০ ফিট, তবে শিখরদেশ ভেঙে যাওয়ায় আসল উচ্চতা নির্ণয় করা যায়নি। কঙ্কণদিঘির কাছে ধ্বংসস্তূপে যে ধরনের ইট দেখা গিয়েছিল, জটার দেউলও সেইরকম ইটে তৈরি।

জটার দেউল ওড়িশারীতির রেখদেউল। অসীম মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, সংস্কারপূর্ব আলোকচিত্র থেকে মন্দিরটির প্রকৃত সৌন্দর্য কিছুটা বোঝা যায়। কালিদাস দত্তের মত উদ্ধৃত করে অসীমবাবু লিখেছেন, 'মন্দিরের শীর্ষদেশ ভগ্ন হলেও বাড় ও গণ্ডীগাত্রে অলংকরণের সমারোহ ছিল। বাড় ছিল পঞ্চাঙ্গ এবং রথ-পগ ছিল তিনটি, অর্থাৎ মন্দিরের আসন ছিল ত্রিরথ। গণ্ডীর গাত্রে ক্ষুদ্র দেউল, ও চৈত্য-অলিন্দের অসংখ্য অনুকৃতি ছিল। এ ছাড়া অগণিত ক্ষুদ্র অঙ্গশিখর রথ-পগের ভাঁজে ভাঁজে উপরে উঠে গিয়েছিল। ...সাধারণত রেখ দেউলের ক্ষেত্রে রথ-পগের যে কাঠিন্য বর্তমান, তা জটার দেউলে ছিল অনুপস্থিত। ভূমি-আমলক এবং সুমার্জিত রথ-পগের সযত্ন বিন্যাসে জটার দেউলের বাহ্যিক আকৃতি ছিল প্রায় বর্তুলাকার। বাঁকুড়া জেলার বাহুলাড়া গ্রামের সিদ্ধেশ্বর দেউলটি দেখলে জটার প্রকৃত অবস্থার কিছুটা অনুধাবন করা যায়।' মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ১০০ ফিট, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৩২ ফিট এবং গর্ভগৃহের অভ্যন্তরও বর্গাকার—১০ ফিট ৯ ইঞ্চি এক একটি বাহু। সরদাল (corbelled) পদ্ধতিতে নির্মিত প্রবেশপথের উচ্চতা ১৬ ফিট, প্রস্থ সাড়ে ৯ ফিট।[১৩৮] জটার দেউলের নির্মাণকাল নিয়ে মতভেদ আছে। সরকারি বিবরণ অনুসারে,[১৩৯] ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে ডায়মণ্ডহারবারের ডেপুটি কালেক্টর জটার দেউলের সামান্য উত্তরে রাজা জয়ন্তচন্দ্রের ৮৯৭ শকাব্দে (৯৭৫ খ্রীস্টাব্দ) উৎকীর্ণ এবং এই মন্দির নির্মাণের তথ্য সংবলিত একটি তাম্রলিপি পেয়েছিলেন। এটি পরে হারিয়ে যায়। তবে শৈলীবিচারে নীহাররঞ্জন এই মন্দিরকে সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের সমসাময়িক বলেছেন (অর্থাৎ দশম-একাদশ শতাব্দী)।[১৪০] সরসীকুমার সরস্বতীর মতে, এটি একাদশ শতক বা তার পরে তৈরি।[১৪১] সে যাই হোক, পালযুগের শেষে বা সেনযুগের গোড়ায় নির্মিত এই মন্দির নিঃসন্দেহে সে যুগে নিম্নবঙ্গের এই অঞ্চলের সমৃদ্ধির দ্যোতক।

মন্দিরের কাছাকাছি এলাকা থেকে স্তম্ভশীর্ষের অনুরূপ প্রস্তরখণ্ড ও কুষাণরাজ হুবিষ্কের কয়েকটি তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল। কালিদাস দত্ত সুন্দরবনের আরও অনেকগুলি পুরাকীর্তির বর্ণনা দিয়েছেন। ১২২নং লটের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে দেলবাড়ির দূরত্ব জটার দেউল থেকে মাত্র ৯ কিলোমিটার। সেখানেও একটি মন্দির সম্ভবত কালিদাসবাবুর নিবন্ধ রচনার সময় ৩০ ফিট উচ্চতা পর্যন্ত টিকে ছিল। মথুরাপুর থানার 'এইচ' প্লটের উত্তর-পূর্বাংশে জগদ্দল গাঙের কাছে ছিল আরেকটি মন্দির। ১১৬নং লট থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে এর দূরত্ব প্রায় ২০ কিলোমিটার। বনশ্যামনগরের এই মন্দিরটিও তখন ৩৫ ফিট অবধি টিকে ছিল। এর প্রায় ১৩ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ১১৪নং লটের (গোবিন্দপুর) ৮নং প্লটে আরেকটি মন্দিরের ভিত্তি আবিষ্কৃত হয়। এখানে চারটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি ও একটি নটরাজ মূর্তিও পাওয়া গিয়েছিল। কালিদাসবাবুর বর্ণনা অনুসারে, 'এইচ' প্লট ও ১১৪নং লটের দক্ষিণে সাগরতীরবর্তী পাথরপ্রতিমা, 'ই' প্লট, রাক্ষসখালি, 'এফ' প্লট, বুড়োরতট, 'জি' প্লট এবং লোথিয়ান দ্বীপে বহু ধাতু, পাথর ও টেরাকোটার মূর্তি এবং স্থাপত্যনিদর্শন মিলেছে।[১৪২]

রাক্ষসখালি থেকে একাদশ শতকের হরফ উৎকীর্ণ পোড়ামাটির সিল পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন নলিনীকান্ত ভট্টশালী।[১৪৩] তবে এই দ্বীপের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার ডোম্মনপালের তাম্রশাসন। দ্বীপে বহু ঢিবি ছিল। তাম্রশাসন প্রাপ্তির বিবরণ[১৪৪] অনুসারে, প্রতিটি ঢিবিতে ছিল ইটের এক বর্গাকার কক্ষ, তার দেওয়াল যথেষ্ট পুরু। একটু তফাতে আরেকটি দেওয়ালে ঘেরা ছিল প্রতিটি কক্ষ। দেওয়ালের প্রস্থ থেকে অনুমান করা হয়েছে, উপরে আরও তল ছিল। তাম্রশাসনটি ১১১৮ শকাব্দের (১১৯৬ খ্রীস্টাব্দ)। লক্ষ্মণসেনের রাজ্যে জনৈক উচ্চশ্রেণীর শাসনকর্তা ডোম্মনপাল পূর্ব-খাটিকায় বামহিট্ঠা গ্রাম দান করেছিলেন। শাসনের সপ্তম পঙ্‌ক্তিতে উল্লেখ আছে, 'বামহিট্ঠা গ্রামোঽয়ং রত্নত্রয় বহিঃ চতুঃসীমাবচ্ছিন্নাঃ··· ।' 'রত্নত্রয় বহিঃ' শব্দে প্রদত্ত গ্রামের সন্নিকটে বৌদ্ধ বিহারের উপস্থিতি সূচিত করছে। রাক্ষসখালিতে আবিষ্কৃত স্থাপত্যনিদর্শনও একই সম্ভাবনার দ্যোতক। এ সমাপতন নেহাত কাকতালীয় বলে মনে হয় না।

সাগরসঙ্গমে সাগরদ্বীপে জঙ্গল হাসিলের সময় উঁচু পাড়বিশিষ্ট বড় বড় জলাশয়, ইমারত ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, অসংখ্য মূর্তি, মুদ্রা ও পোড়ামাটির ফলক, মৃৎপাত্র ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে। ত্রিপুরা রাজবংশের কাহিনী 'রাজমালা'র কথা আলোচনা করতে গিয়ে রেভারেণ্ড জেমস লঙ উল্লেখ করেছিলেন,[১৪৫] সাগরদ্বীপে কপিলমুনির মন্দির ৪৩০ খ্রীস্টাব্দ থেকেই ছিল, ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে তা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়। কোন্ সূত্র থেকে এ তথ্য জেনেছিলেন, তা উল্লেখ করেননি লঙ।

সুন্দরবন তথা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিপুল প্রত্নসম্পদের সামান্য অংশের কথাই পূর্বসূরিদের রচনার ভিত্তিতে তুলে ধরা সম্ভব হল। তবে এই চিত্র থেকে এটুকু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কাননগোপাল যে অনুমান করেছিলেন[১৪৬] তা ঠিকই—অর্থাৎ অন্তত দু'হাজার বছর আগেই এর বিভিন্ন অঞ্চলে নদীপ্রবাহভিত্তিক সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল।

সতীশচন্দ্রও এ অঞ্চলে এবং বর্তমান বাংলাদেশের অন্তত সুন্দরবনে বহু প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন সরেজমিনে দেখে বিস্তারিত বিবরণ রেখে গিয়েছেন।[১৪৭] তাঁর মতে, বারংবার ভূমির উত্থানপতনে সুন্দরবনে মনুষ্যাবাস বিঘ্নিত হয়েছে। 'অনেকবার সুন্দরবনের উত্থানপতন হইয়াছে ; ইহা বৌদ্ধযুগের শেষভাগে পড়িয়াছিল এবং হিন্দুরাজত্বে পুনরায় জাগিয়াছিল ; সেই হিন্দুর সময় পড়িয়াছিল, আবার পাঠানযুগে জাগিয়াছিল। পরে মোগলের মধ্যযুগে পড়িয়াছে, আর উঠে নাই। মোগল আমলের প্রথমভাগে পাশ্চাত্য যে সকল জাতি বাণিজ্যের জন্য এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাহারা সুন্দরবনকে এমন পতিত, অগম্য, হিংস্রসেবিত এবং অরণ্যাবৃত দেখেন নাই। তাহারা যাহা দেখিয়াছিলেন, এখন তাহার চিহ্নমাত্রও নাই।'[১৪৮] বদ্বীপ অঞ্চলে ভূমির অবনমনের প্রমাণ একাধিক ভূতাত্ত্বিক খননেই পরিস্ফুট হয়েছে, কিন্তু তার কালনির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। সর্বত্র এক-সঙ্গে অবনমন ঘটেছে এমনও নয়। তাই কালনির্ণয়ের প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্রের মত প্রমাণের মতো উপযুক্ত তথ্য হাতে না থাকলেও মোটামুটি বলা যায়, এই অবনমন, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ঝড়-ঝঞ্ঝা ইত্যাদির জন্য কোথাও কোথাও বসতি বিলুপ্ত হলেও সভ্যতার ধারাবাহিকতা এ অঞ্চলে মুঘলযুগ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। আবার পাশাপাশি কিছু কিছু অংশে হয়ত গভীর জঙ্গলও ছিল। এ ছাড়া কাননগোপালের আরেকটি অনুমিতি—Ptolemy-র সময়েই (১৫০ খ্রীস্টাব্দ) বদ্বীপ বর্তমান রূপ গ্রহণ করেছিল—প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্যে সমর্থিত হচ্ছে। কারণ বদ্বীপের দক্ষিণতম প্রান্তে সাগরসংলগ্ন ভূখণ্ডে প্রাচীন যুগ থেকে দশম-একাদশ শতক পর্যন্ত প্রত্ননিদর্শন মিলেছে।

কলকাতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

আদিগঙ্গার প্রবাহপথের গুরুত্বপূর্ণ অংশেই বর্তমান কলকাতা-ভূখণ্ড অবস্থিত ছিল। এর উত্তরে দেউলপোতা (ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্তী দেউলপোতা থেকে পৃথক) এবং দক্ষিণে বোড়ালে প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। সরকারি বিবরণ অনুসারে,[১৪৯] আড়িয়াদহে ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে দেওয়ান হরনাথ ঘোষাল প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে শিবের যে লিঙ্গমূর্তি আছে, তা নাকি গঙ্গাতীরের একটি প্রাচীনতর মন্দির থেকে সংগৃহীত। লিঙ্গটি কিছুটা অসাধারণ। নিম্নাংশ মাটিতেই প্রোথিত, মাঝের অংশের (গৌরীপট্ট ?) বেড় সাত ফিট, উপরের অংশের বেড় তিন ফিট এবং উচ্চতা দু'ফিট। স্থানীয় ঐতিহ্যে বলা হয়, চারশো গজ দূরে নদীর ধারের এক জঙ্গলে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে এটি ছিল। সরকারি বিবরণী প্রণয়নের সময়েও দশ থেকে কুড়ি ফিট উঁচু ভূখণ্ডের উপর দেড় মাইল লম্বা এবং সিকি মাইল চওড়া এলাকায় জঙ্গলটি বিস্তৃত ছিল। এরই নাম দেলপোতা (বা দেউলপোতা)। চতুর্দিকে ছড়ানো ছিল ছোট ছোট ইট এবং ইটের তৈরি স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ। দেউলপোতার মাঝখানে এক পুকুরের কাছে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ছিল। বর্তমানে এই অঞ্চলে এসব পুরাকীর্তির কোনো চিহ্ন নেই।

কলকাতার দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত বোড়ালও গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তিবহুল স্থান। এ শতকের মাঝামাঝি সেখানে কিছু কিছু খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছিল। তা ছাড়া নানাভাবে

অজস্র প্রত্নবস্তুর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মতে,[১৫০] এখানে ইটখোলার জন্য ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১২ মিটার গভীরতা পর্যন্ত মাটি খোঁড়ার মধ্যে দুটি প্রধান আবাসিক স্তরের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। দুটি স্তরের মধ্যে প্রায় দু'মিটার পুরু একটি স্বাভাবিক মৃত্তিকাস্তর আছে। নিম্নতর স্তরের পুরাবস্তুর শিল্পরীতি শুঙ্গ-কুষাণ-গুপ্তযুগের অনুরূপ। এ স্তরের কোথাও কোথাও পানীয় জলের কূপ বা আবর্জনা সঞ্চিত করার জন্য কূপের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। দু'-একটি জায়গায় এ স্তরের অপেক্ষাকৃত উপরের অংশে প্রাচীন দালানের ভিত্তিভূমির সামান্য চিহ্ন, পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা দেখা গিয়েছে। দ্বিতীয় আবাসিক স্তরটি ভূপৃষ্ঠের প্রায় দু'মিটার নীচে থেকে বিস্তৃত। আনুমানিক একাদশ-দ্বাদশ শতক থেকে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক পর্যন্ত এ স্তরে বসতি ছিল বলে মনে করা হয়। সর্বনিম্ন আবাসিক স্তরের নীচে মাটির স্তরে অঙ্গারীভূত বৃক্ষের কাণ্ড, জীব-জন্তুর ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে। বিভূতিভূষণ মিত্রের কথায়,[১৫১] বোড়ালের মাটির নীচে খননে তিন ফুট পুরু 'পিট' স্তরের সন্ধান মিলেছে। এরও নীচে ছিল অঙ্গারীভূত অসংখ্য সুন্দরী গাছের মূল ও ডালপালা। এই স্তরের উপরে-নীচে প্রস্তরীভূত বহু জীব-দেহাংশের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে একটি হাতির পা (হাঁটু থেকে পদতল পর্যন্ত—লম্বায় প্রায় ৩৭ ইঞ্চি), হাতির দাঁত, চোয়াল, বাঘের পা, হরিণের অসংখ্য শিং, সম্ভবত গণ্ডার ও অন্য জীবদেহের অংশ এবং নরকঙ্কাল ছিল। জীবতাত্ত্বিকেরা নাকি এই-সব দেহাংশ প্রায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন বলে মতপ্রকাশ করেছিলেন। এ ছাড়া বোড়াল, ডিঙেলপোতা ও আশপাশের গ্রামে ইট-পাথরের স্থাপত্যনিদর্শনের পাশাপাশি পোড়ামাটি ও পাথরের অজস্র ভাস্কর্যনিদর্শন, কৌলাল ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে। ভাস্কর্যের মধ্যে আছে কারুকার্যময় ও মূর্তিখোদিত মন্দিরের অংশ, অনন্তশয়ান বিষ্ণুমূর্তির ভগ্নাংশ, নবগ্রহফলক, পদ্মদিঘিতে প্রাপ্ত কষ্টিপাথরের বাসুদেব-বিষ্ণু বিগ্রহ, পদ্মাসনা বীণাপাণি মূর্তি, ক্ষুদ্রকায় নৃত্যরত গণেশ, বেলেপাথরের কুবের ইত্যাদি। তামার ঢালাই মুদ্রাও অনেক পাওয়া গিয়েছে।

কলকাতা থেকে মাত্র এগারো কিলোমিটার দূরে হরিহরপুরেও বহু প্রাচীন নিদর্শন মিলেছে। এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্রের অংশ পাওয়া গিয়েছে।[১৫২]

কলকাতার সংলগ্ন এলাকায় যেমন পুরাকীর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, কলকাতার মাটির নীচে এখনও তত কিছু মেলেনি। দ্রুত নগরায়ণের চাপে অনেক-কিছুই যে চিরকালের মতো হারিয়ে গিয়েছে বা যাচ্ছে জনচক্ষুর অগোচরেই, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনের কথা সময়মতো নথিভুক্ত হওয়ায় কিছু তথ্য জানা গিয়েছে। এর মধ্যে সর্বপ্রথম বোধহয় কালীঘাটের গুপ্তমুদ্রার সঞ্চয়। মার্সডেন, উইলসন এবং নিকল্‌স—তিনজনের বিবরণী উদ্ধৃত করে মুদ্রাতত্ত্ববিদ জন আলান বলেছেন,[১৫৩] এঁরা সকলেই যে একই আবিষ্কারের কথা বলেছেন তাতে সন্দেহ নেই। ভিনসেন্ট স্মিথও এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত। তিনটি বিবরণী থেকে জানা যায়, ওয়ারেন হেস্টিংস যখন বাংলার গভর্নর, তখন কালীঘাটে নদীর ধারে একটি পাত্রে শ'দুয়েক মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল। মার্সডেনের বিবরণীই তিনটির মধ্যে বিস্তারিত।

তাঁর কথায়, হুগলি নদীর পূর্বতীরে কলকাতার দশ মাইল উত্তরে (!) কালীঘাট নামক স্থানে ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ হঠাৎই এই মুদ্রাভাণ্ডার পাওয়া যায়। নিকল্‌স অবশ্য 'বেনারস প্রদেশে' এক নদীর ধারে এগুলি পাওয়ার কথা লিখেছেন। আলানের মতে, নিকল্‌স ভুল করেছেন, কারণ অন্যান্য তথ্য মোটামুটি উভয় বিবরণীতেই এক—শুধু মার্সডেন পিতলের পাত্রে, এবং নিকল্‌স মাটির পাত্রে মুদ্রাপ্রাপ্তির কথা লিখেছেন। এ পার্থক্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। মার্সডেন আরও লিখেছেন, নবকৃষ্ণ নামে এক ব্যক্তি এই মুদ্রা পেয়ে হেস্টিংসের হাতে তুলে দেন। হেস্টিংস তখন অধিকাংশ মুদ্রাই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'কোর্ট অব ডিরেক্টর্সে'র কাছে পাঠিয়ে দেন, এবং অনুরোধ করেন যে, এগুলি বিশিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংগ্রহে দেওয়া যেতে পারে। এজন্য চব্বিশটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, প্রায় সমসংখ্যক জনৈক হান্টারকে, এবং আরও কিছু মুদ্রা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দেওয়া হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে অনেকগুলিই থেকে গিয়েছিল। হোরেস হেম্যান উইলসনের মতে, ব্রিটিশ মিউজিয়াম ছাড়া অক্সফোর্ডের অ্যাশমোলিন মিউজিয়াম এবং কেমব্রিজের পাবলিক লাইব্রেরিতে এই ভাণ্ডারের কিছু মুদ্রা আছে। নিকল্‌স বলেছেন, হেস্টিংস ১৭২টি 'ডেরিক' উপহার পাঠিয়েছিলেন, এবং সেগুলি নাকি সবই গালিয়ে ফেলা হয়। আলানের মতে, বেনারস তথা গাঙ্গেয় উপত্যকায় পারস্যের 'ডেরিক' পাওয়ার সম্ভাবনা কম, আর অষ্টাদশ শতকে ধনুর্ধর রাজমূর্তিযুক্ত গুপ্তমুদ্রাকে 'ডেরিক' বলে ভুল করা খুবই সম্ভব ছিল। তবে এটা ঠিক যে, কিছু মুদ্রা বিভিন্ন সংগ্রহে রক্ষা পেলেও ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে যেগুলি থেকে গিয়েছিল সেগুলি পরে গালিয়ে ফেলা হয়। ব্রিটিশ মিউজিয়াম, হান্টার ও বডলেয়ান সংগ্রহের মুদ্রাগুলি থেকে আলান মত প্রকাশ করেছেন, কালীঘাট সঞ্চয়ে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ধনুর্ধর মূর্তিযুক্ত স্বর্ণমুদ্রা, নরসিংহগুপ্ত, দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত ও বিষ্ণুগুপ্তের মুদ্রা ছিল। নিশীথরঞ্জন মন্তব্য করেছেন, এই নিদর্শন 'কলকাতার উদ্ভব, উৎপত্তি কিংবা নগরবিন্যাসের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত।'[১০৪] এমন এক আবিষ্কারকে এত সহজে উড়িয়ে দেওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। গুপ্তযুগের মুদ্রা পাওয়া মানেই গুপ্তযুগে এই অঞ্চলে বসতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় না ঠিকই, কিন্তু সুদূর অতীতে এখানে যে জনবসতি থাকতে পারে, তার ইঙ্গিত এ থেকে মেলে বইকি!

কলকাতা থেকে গুপ্তযুগের আরও একটি স্মারক পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—যে স্মারকের সঙ্গে জনবসতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। তাঁর কথায়, 'গুপ্ত রাজশক্তির আনুকূল্যে বাংলার বিচ্ছিন্নতার অবসান হয়ে বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে যে সাযুজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই যোগাযোগের প্রভাব তার সাংস্কৃতিক জীবনে প্রতিফলিত হতে বিলম্ব ঘটেনি। অচিরকালের মধ্যেই উত্তরভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্ধনের ফল পরিলক্ষিত হয়—বৌদ্ধশিল্পকেন্দ্র সারনাথ থেকে আনীত পঞ্চম শতকের চুনারের লাল বেলেপাথরে গড়া একটি দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তিতে। বর্তমানে রাজশাহি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালায় রক্ষিত এই মূর্তিটি বাংলাদেশের রাজশাহি জেলার বিহারৈল গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছিল।…নিশ্চিতভাবেই মূর্তিটি সারনাথের মূর্তি-

নির্মাণের অতিব্যস্ত কর্মশালারই সৃষ্টি, কিন্তু একই ছাঁচে গড়া অসংখ্য মূর্তির মধ্যে এই বিহারৈলে পাওয়া মূর্তিটি নিঃসন্দেহে যথেষ্ট পরিমাণে এমন বৈশিষ্ট্যম গুত যা গৌড়ীরীতির মূর্তিকলায় পরবর্তীযুগে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। সম্পূর্ণ এই বৈশিষ্ট্যেই সমৃদ্ধ দক্ষিণ কলকাতার চেতলার এক পঞ্চাননতলায় রাখা, চুনারের লাল বেলেপাথরের অন্য একটি বুদ্ধমূর্তি; কালের প্রভাবে এই মূর্তির দেহ বর্তমানে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। গুপ্ত আমলে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই যে এই ধরনের গাম্ভার্য সম্পদে সমৃদ্ধ মূর্তি নিয়ে আসার পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।···গঙ্গার এই প্রাচীন অববাহিকার তীরে গুপ্ত আমলে হয়তো একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ গড়ে উঠেছিল এবং এখানকার বিত্তশালী বুদ্ধানুরাগী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানই ভগবান বুদ্ধের এই রাগানুগ মূর্তিটিকে সারনাথ থেকে আনিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে ধর্মকীর্তি অর্জন করেছিল বলে অনুমান করা যায়।'[১৫৫]

কলকাতার মাটির তলা থেকে আরও তিনটি প্রত্নিনিদর্শন প্রাপ্তির কথা জানা যায় শ্যামলকান্তি চক্রবর্তীর বিভিন্ন নিবন্ধে। ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে বেহালা ব্লাইণ্ড স্কুলের ধারে ডায়মণ্ডহারবার রোড চওড়া করতে গিয়ে মাটির আটফিট নীচে পাওয়া গিয়েছিল একটি বিষ্ণুমূর্তির উর্ধ্বাংশ। শিল্পরীতির বিচারে এটি গুপ্তযুগের বলে সাব্যস্ত হয়েছে। সময় আনুমানিক পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক। চেতলার কাছে আদিগঙ্গার পাড়ে পাওয়া গিয়েছিল কালো ব্যাসল্ট পাথরের এক বিষ্ণুমূর্তি। এর নির্মাণকাল আনুমানিক দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী, অর্থাৎ সেনযুগে। এ ছাড়া ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে ধাপা অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয় দুটি ছোট কালো পাথরের ফলক—যার গায়ে কচ্ছপের রূপ উৎকীর্ণ। এগুলি চতুর্দশ-ষোড়শ শতকের হতে পারে।[১৫৬]

প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরেক ধরনের নিদর্শনও কলকাতা থেকে দু'বার পাওয়া গিয়েছিল। দুঃখের বিষয়, কোনোটিই সংরক্ষিত হয়নি। 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি'র অফিস তৈরির জন্য পুরনো ফোর্ট উইলিয়ামের ভিত খোঁড়া হয়েছিল ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে। পুরনো কেল্লার কোথায় কী ছিল, বিশেষ করে 'অন্ধকূপ হত্যা' সংক্রান্ত বিতর্কের অবসান ঘটাতে আর. আর. বেইন একটু বিশদভাবেই খোঁড়াখুঁড়ি করেছিলেন।[১৫৭] কত গভীরতা পর্যন্ত খনন চালানো হয়েছিল, বিবরণীর কোথাও তা উল্লেখ করা হয়নি। তবে সংলগ্ন ২৭ ও ২৮ নং ছবি থেকে অনুমান করা যায়, অন্তত দশ-বারো ফুট পর্যন্ত নিশ্চয়ই খোঁড়া হয়েছিল। পূর্বদিকের প্রাচীরের কাছে মৃত্তিকাস্তরে বিশেষ ওলটপালট তাঁর নজরে আসেনি, কিন্তু সেখানে মাটির মধ্যে কিছু মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ছিল। পশ্চিমের প্রাচীরের কাছে পৌঁছে বেইন দেখেছিলেন, জমি (natural ground) প্রাচীরের দিকে ঢালু হয়ে গিয়েছে, এবং প্রাচীরের কাছবরাবর প্রায় একটা খালের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর কথায়, '···the soil there was black, stinking river mud, full of potsherds, and here we found a great many boars' tusks of a small size.' আদতে এই প্রাচীর ছিল গঙ্গার ধারেই। নদী পরে আরও পশ্চিমে সরে গিয়েছে। মৃৎপাত্রের এই ভগ্নাংশ এবং শুয়োরের দাঁতের সঙ্গে পুরনো

কেল্লার কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা, নাকি বেশ কিছুটা মাটির নীচে পাওয়া এসব নিদর্শন আরও অনেক পুরনো কোনো জনবসতিরই চিহ্ন, তা আজ আর কোনোভাবেই বলা সম্ভব নয়। কলকাতায় যে আরও একবার মাটির নীচে মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ মিলেছিল, সে কথা আগেই ভূতত্ত্ব প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি আবিষ্কৃত হয় সোয়ালো লেন এলাকায়, মাটির পাঁচ-ছয় ফিট নীচে।[১৫৮]

বর্তমান শতাব্দীর চারের দশকের গোড়ায় হাওড়া ব্রিজ তৈরির সময় ব্রেথওয়েট, বার্ন ও জেসপ কোম্পানি যখন কলকাতার দিকে পাইলিংয়ের কাজ চালাচ্ছিল, তখন মাটির বেশ নীচে থেকে নাকি কিছু ফসিল এবং পাথরের জিনিস পাওয়া গিয়েছিল। খবর পেয়ে আশুতোষ সংগ্রহশালার তরফ থেকে সেগুলি সংগ্রহ করার চেষ্টা হয়। কিন্তু কিছুই সংগ্রহ করা যায়নি, তার আগেই সেগুলি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।[১৫৯]

কিন্তু সম্প্রতি আরেকটি প্রত্নকীর্তি আবিষ্কারের সম্ভাবনা যেভাবে অঙ্কুরেই বিনাশ করা হয়েছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হাওড়া স্টেশনের লাগোয়া পুরনো রেল গুদাম ভেঙে রেলযাত্রী-নিবাস তৈরির সময় ভিতের নীচে থেকে ইটের দেওয়াল দেওয়া শ'খানেক ঘর এবং পাঁচটি গোলাকৃতি কুয়োর সন্ধান পাওয়া যায়। একটি ঘরের মেঝেয় বারো ফুট নীচে একটি কঙ্কালও পাওয়া গিয়েছিল। এ ছাড়াও ছিল প্রায় পাথর হয়ে যাওয়া বিশাল গাছের গুঁড়ি। এই বিশাল ইমারতের গঠন কীরকম ছিল, বা এর নীচে আরও কোনো নিদর্শন লুকিয়ে আছে কিনা, তা দেখবার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও কিন্তু সরকারের কোনও মহলেই দেখা গেল না। কঙ্কালটিও তুলতে গিয়ে গুঁড়ো হয়ে যায়, কাজেই কালনির্ণয়ের সূত্রটিও হেলায় নষ্ট করা হল। পোর্তুগিজদের অনাথ আশ্রম, কিংবা ক্রীতদাসদের জলপথে বিভিন্ন দেশে পাচারের আগে আটকে রাখার কেন্দ্র হিসাবে এটি ব্যবহৃত হতো বলে কেউ কেউ মতপ্রকাশ করেছেন, কিন্তু কোনো যুক্তি দেখাননি। কারও মতে, এটি ছিল আর্মেনীয় বণিকদের কুঠিবাড়ি। কিন্তু কোনো মতই পরীক্ষা করা হল না—রেকর্ড সময়ে যাত্রী-নিবাস তৈরির জন্য সব নিদর্শন ভেঙে মাটি চাপা দিয়ে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেল। কলকাতার ইতিহাসের সঙ্গে নদীর অপর পারের এই পুরাকীর্তির সম্পর্ক নির্ণীত হলে কিছু অন্ধকার দিক হয়ত আলোকিত হয়ে উঠত।[১৬০]

রেণুবিজ্ঞান ও কলকাতার সুদূর অতীত

কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরের রেণুবিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের কলকাতা সম্পর্কে অনেক বিস্ময়কর তথ্য জানা গিয়েছে। এর আগে প্রত্নতত্ত্ব ও অন্যান্য ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণের বিচারে আজ থেকে অন্তত দু'হাজার বছর আগেই যে নিম্নবঙ্গে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল, সে সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছতে পেরেছি। কিন্তু কলকাতা সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থানের পর কবে মানুষের বসবাসের যোগ্য হয়ে উঠেছিল, তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। রেণুবিজ্ঞানীদের গবেষণায় সেই অনিশ্চয়তার অন্ধকার আজ অনেকখানি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। কোন্ ফলাফলের ভিত্তিতে এতদূর

এগোনো গিয়েছে, তা বলার আগে তাঁদের গবেষণার বিষয়টির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।[১৬১]

পরাগকোষ বা রেণুর মাধ্যমে উদ্ভিদের বংশবিস্তারের কথা সকলেরই জানা আছে। এই রেণুর অধিকাংশই মাটিতে পড়ে এবং সেখানেই থেকে যায়। অন্যান্য জৈব পদার্থের মতো এই রেণু কিন্তু কালক্রমে পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে যায় না। ভিতরের অংশ নষ্ট হয়ে গেলেও বহিঃপ্রাচীরের (exine) প্রতিরোধ ক্ষমতা খুবই বেশি হওয়ায় শিলীভূত অবস্থায় এগুলি হাজার হাজার বছর সংরক্ষিত থেকে যায়। এই বহিঃপ্রাচীরের গঠন এক এক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এক এক রকম। ফলে এ থেকেই উদ্ভিদের পরিচয় বুঝে নেওয়া সম্ভব। ভূপৃষ্ঠের নীচে বিভিন্ন স্তর থেকে শিলীভূত পরাগরেণু সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই স্তরের সমসাময়িক যুগে ওই অঞ্চলের উদ্ভিদ জগৎ, পরিবেশ প্রভৃতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা জানা যায়। মাটির নীচে সব স্তরে অবশ্য রেণু ভালোভাবে সংরক্ষিত থাকে না। বালির পরিমাণ বেশি থাকলে সেই স্তরে রেণু নষ্ট হয়ে যায়। জৈব-মৃত্তিকা বা 'পিট'স্তরে শিলীভূত পরাগরেণু অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত থাকে। আংশিক অঙ্গারীভূত জলাভূমির উদ্ভিদ দ্বারা সংগঠিত জৈব এবং অজৈব পদার্থের সংমিশ্রণে এই 'পিট'স্তর গড়ে ওঠে। কলকাতায় এবং আশেপাশে বিস্তীর্ণ এলাকায় মাটির নীচে বিভিন্ন গভীরতায় এইরকম একাধিক 'পিট'স্তরের সন্ধান মিলেছে।

ভূতাত্ত্বিক যুগবিভাগ অনুযায়ী, কেনোজোয়িক যুগের সূচনা ধরা হয় মোটামুটি সাড়ে ছ'কোটি বছর আগে। এর অন্তর্গত টার্শিয়ারি পর্ব শেষ হয়ে কোয়াটার্নারি পর্বের সূচনা হয় পাঁচ থেকে কুড়ি লক্ষ বছর আগে। কোয়াটার্নারি পর্বকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমটি প্লেইস্টোসিন, দ্বিতীয়টি হলোসিন। বর্তমানকাল এই হলোসিনেরই অন্তর্গত—এর শুরু ধরা হয় দশ-এগারো হাজার বছর আগে। ভূত্বকের কোয়াটার্নারির পূর্ববর্তী পর্বের সঞ্চিত স্তরে যেসব রেণুর সন্ধান পাওয়া যায়, তা থেকে নির্দিষ্ট গাছটিকে চিনে নেওয়া সম্ভব নয়। সে যুগের শিলীভূত নমুনার সঙ্গে আজকের পৃথিবীর উদ্ভিদের সম্পর্ক সুনিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায়নি বলেই এই অসুবিধা রয়েছে। কিন্তু কোয়াটার্নারি পর্বের উদ্ভিদজগতের সঙ্গে আজকের গাছপালার মিল অনেক স্পষ্ট। তাই এই পর্বের স্তর থেকে সংগৃহীত নমুনা বিশ্লেষণ করে মোটামুটি বলে দেওয়া যায় সে যুগে গাছপালা কেমন ছিল।

ভূমণ্ডলের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে রেণু-বিশ্লেষণ তুলনামূলকভাবে অনেকটাই সহজ, কারণ সেখানে উদ্ভিদের প্রজাতি-সংখ্যা নেহাতই সীমিত। উত্তর ইউরোপের দেশগুলিতে (বিশেষত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায়) অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও সমন্বিত গবেষণার ফলে পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন যুগে উদ্ভিদজগতের পরিবর্তনের ইতিহাসও বিস্তারিতভাবে জানা সম্ভব হয়েছে। এরই সাহায্যে যে মূলসূত্রগুলি স্থির করা গিয়েছে, তা অঞ্চলভেদে সামান্য পরিবর্তনসাপেক্ষে পৃথিবীর অন্যত্র এ ধরনের গবেষণায় প্রয়োগ করা সম্ভব। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, উত্তর ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকার সঙ্গে ভারতের পরিবেশ তুলনীয় নয়।

এদেশের উত্তর থেকে দক্ষিণে, পুব থেকে পশ্চিমে সুউচ্চ পর্বত, মরুভূমি, মালভূমি, অজস্র নদনদী, সমুদ্র, বদ্বীপ প্রভৃতি নানা কিছুর প্রভাব রয়েছে। গাছপালার সংখ্যা ও বৈচিত্র্য এখানে অনেক বেশি (ভারতে আনুমানিক কুড়ি হাজার প্রজাতির গাছপালার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে)। একটা বিশেষ অঞ্চলের সব গাছপালা সম্বন্ধে ভালোভাবে জানা না থাকলে শিলীভূত রেণু থেকে গাছকে চিনে নেওয়া সম্ভব নয়। আবার সুন্দরবনের মতো বনাঞ্চলে যদি অধিকাংশ গাছপালার ক্ষেত্রে পতঙ্গবাহিত পরাগরেণুর মাধ্যমে বংশবিস্তার ঘটে, তা হলে মাটির স্তরে সঞ্চিত রেণুর নিদর্শন থেকে সে ধরনের গাছের উপস্থিতির কথা বিশেষ বোঝা যাবে না। কোনও কোনও গাছের ক্ষেত্রে রেণুর (pollinia) প্রতিরোধক্ষমতা কম থাকায় সেগুলি বেশিদিন অবিকৃত থাকে না, বা তার নমুনা গবেষণাগারে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অটুট থাকে না। Zoogamous বা autogamous প্রজাতির উদ্ভিদের রেণু মাটিতে বিশেষ পাওয়া যায় না। ফলে ওই অঞ্চলের মাটিতে পাওয়া রেণু বিশ্লেষণ করে যে রেণুচিত্র (pollen diagram) তৈরি করা হবে, তা স্বভাবতই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং সে যুগের পরিবেশ সম্পর্কে ভুল তথ্য দেবে। অন্যদিকে, বাতাসে অনুভূমিকভাবে ভেসে আসা রেণু কোনো অঞ্চলের রেণুর সঙ্গে মিশে গিয়ে ভুল ধারণার উদ্ভব ঘটাতে পারে। তবে বনাঞ্চলে সবসময় প্রবল হাওয়ার অভাব, ঘন গাছপালা এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের দরুন এভাবে রেণু ভেসে আসার সম্ভাবনা কম। কিন্তু জোয়ারে প্লাবিত জলাভূমি অঞ্চলে জলবাহিত রেণুর মিশ্রণ ঘটতেই পারে। রেণুচিত্রের উপর কৃষিকাজের প্রভাবও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনও ভূখণ্ড কৃষির জন্য পরিষ্কার করে প্রস্তুত করার পরেই সেখানকার গাছপালায় নানা পরিবর্তন সূচিত হয়। সে অঞ্চলে দেখা যেত না এমন সব উদ্ভিদ নজরে পড়ে। বহু শস্যই রেণু ছড়ায়, কিন্তু অধিকাংশ খাদ্যশস্য self-pollinating —তাই খুব কম রেণুই ছড়িয়ে দেয় তারা। যেমন ধানগাছ cleistogamous। তবু কোনো অঞ্চলে আগাছা বা শস্যের রেণু সংখ্যায় কম পাওয়া গেলেও অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপীয় রেণুচিত্রে শস্য ধরনের উদ্ভিদের উপস্থিতি থেকে ওই অঞ্চলে কৃষিকর্মের সূচনার কথা বোঝা গিয়েছে। ভারতের সভ্যতা প্রাচীনতর, এবং দেশের বিভিন্ন অংশে আদিম মানুষের অনেক নিদর্শনই মিলেছে। তাই প্রত্নতত্ত্বের সঙ্গে উদ্ভিদতত্ত্বের মিলিত গবেষণায় বিস্ময়করভাবে নির্ভুল ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা এ দেশে খুবই বেশি। দুঃখের বিষয়, সেরকম কোনও উদ্যোগ এখানে সরকারি বা বেসরকারি কোনো তরফেই নেওয়া হয়নি।

তবে আদিম মানুষের কৃষিকাজের প্রমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য কর্ষিত ও অকর্ষিত ঘাসের রেণুর মধ্যে আকৃতিগত প্রভেদের যে সূত্র ইউরোপে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা গিয়েছে, ভারতে তা করা যায়নি। এখানে কিছু অকর্ষিত বা বুনো ঘাসের রেণুর আকৃতিও কর্ষিত ঘাসের রেণুর মতোই তুলনামূলকভাবে বড় হয় বলে কেউ কেউ বলেছেন। সে ক্ষেত্রে শুধু আকৃতি দেখে চিহ্নিতকরণের কাজ অনেকটাই দুরূহ হয়ে পড়েছে। অন্যান্য প্রমাণের কথা বিবেচনার পরেই কেবল কৃষিকাজের নজির সম্বন্ধে অনুমান করা যেতে পারে।

ভারতে রেণুবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা এ শতকের গোড়ায় শুরু হলেও গত তিন দশকেই তা সবে অনেকটা এগোতে পেরেছে। কাশ্মীর উপত্যকাসহ উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ে, কুমায়ুন ও হিমাচল প্রদেশ, নীলগিরি, রাজস্থান এবং নিম্নবঙ্গে কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে। পূর্বভারতে 'বেঙ্গল পিট' নিয়ে ত্রিশ বছরে অনেক কাজ হয়েছে। কলকাতায় রেণুবিজ্ঞানীদের অসুবিধা হল, বড় রকমের খননকার্য না হলে ভূস্তরের গভীরতর অংশ থেকে নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। নিজস্ব উদ্যোগে তেমন খনন সম্ভব নয়, তাই সরকারি-বেসরকারি প্রকল্পের উপরেই নির্ভর করতে হয়। কিন্তু ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বা তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন কলকাতার বুকে গভীর উৎখননে উৎসাহী নয়—তাদের সংস্থার প্রয়োজনীয় তথ্য বোধহয় এখান থেকে বিশেষ কিছু পাওয়ার নেই। তবু সম্প্রতি ও. এন. জি. সি কলকাতার কাছাকাছি তেলের সন্ধানে যে গভীর খনন চালিয়েছে, তার তথ্যাদি নাকি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগকে গবেষণার কাজে দেওয়া হবে স্থির হয়েছে। এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। আশা করা যায় এর ফলে এই অঞ্চলের ভূতত্ত্ব সম্পর্কে এযাবৎ অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান মিলবে। কিন্তু রেণুবিজ্ঞানীরা এখনও সেরকম সুযোগ পাননি। প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁরা নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন কলকাতার পনেরো কিলোমিটার দক্ষিণে ডায়মণ্ডহারবার রোডের উপর বাগিয়াহাটে (ইটভাটার জন্য মাটি খুঁড়তে গিয়ে 'পিট'স্তরের সন্ধান মেলে), বৈদ্যবাটি রেলস্টেশনের এক কিলোমিটার উত্তরে হাওড়া-ব্যাণ্ডেল রেললাইনের পাশে (পুকুর খুঁড়তে গিয়ে), উত্তর কলকাতার যশোর রোডের পাশে বেলগাছিয়া অঞ্চলে (জলনিকাশী ব্যবস্থার জন্য পাম্প বসাতে সরকারি প্রকল্পে মাটি খোঁড়া হয়), আর পূর্ব কলকাতায় ভি আই পি রোডের পাশে সল্টলেক থেকে (পাম্প বসানোর জন্য মাটি খোঁড়া হয়েছিল)।[১৬২] এরপর সম্প্রতি কলকাতা জুড়ে পাতাল রেলের খোঁড়াখুঁড়ির সময় বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নমুনা সংগ্রহের সুযোগ মেলে। বেলগাছিয়া, চৌরঙ্গি রোড, এলগিন রোড ও চৌরঙ্গি রোডের সংযোগস্থল, ভবানীপুর ও রাসবিহারী এভিনিউতে বিভিন্ন গভীরতা থেকে নমুনা নেওয়া হয়।[১৬৩] এইসব নমুনা বিশ্লেষণ করে কিছু কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গিয়েছে।

বিজ্ঞানীদের মতে, কলকাতার মাটিকে পৃষ্ঠদেশ থেকে পঞ্চাশ মিটার গভীরতা পর্যন্ত কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা যায়। তলদেশ থেকে পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত স্তরগুলি বিভিন্ন উপাদান দ্বারা গঠিত। পৃষ্ঠদেশের স্তরটি পালমাটি, কাঁকর, কাদা, বালি ইত্যাদির সংমিশ্রণ ও দ্বিতীয় স্তরটি পাঁচ থেকে এগারো মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দ্বিতীয় স্তর গাঢ় খয়েরি রঙের বালি মেশানো নরম পলিমাটি দ্বারা গঠিত। এই স্তরের ভিতরেই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় অনেক বড় বড় সুন্দরী গাছের গুঁড়ি পাওয়া গিয়েছে। তার অনেকগুলি আবার দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল—যা থেকে বোঝা যায় গাছগুলি এখানেই হয়েছিল, অন্য জায়গা থেকে জলস্রোতে বা অন্য কোনো উপায়ে আসেনি। এই পুরু স্তরটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, এতে দুটি বা তিনটি পাতলা 'পিট'স্তর আছে যাকে সাধারণভাবে

'ক্যালকাটা পিট' বলা হয়। কলকাতার বিভিন্ন স্থানে সংগৃহীত 'পিটে'র নমুনা থেকে পরাগরেণু বিশ্লেষণের কাজ হয়েছে।[১৬৪]

প্রাথমিক পর্যায়ে মোটামুটি সর্বত্রই দ্বিতীয় 'পিট'স্তর থেকে সংগৃহীত জৈব মৃত্তিকার রেডিও কার্বন পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, তার বয়স কমবেশি পাঁচ হাজার বছর। অর্থাৎ ওই সময় নাগাদ পরাগরেণু ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ অংশ স্তরীভূত হয়েছিল, এবং কালক্রমে জীবাশ্মে পরিণত হয়েছিল। এই স্তরে পাওয়া গাছপালার পরাগরেণু থেকে বোঝা গিয়েছে, তাদের অধিকাংশই আজকের সুন্দরবনের গাছপালার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত—আজকের কলকাতার গাছপালার সঙ্গে তা একেবারেই মেলে না। সুন্দরী, গর্জন, কেওড়া, বানি, কাঁকড়া, গোলপাতা, গরান ইত্যাদি রেণু ওই 'পিট'স্তরে পাওয়া গিয়েছে। এর সঙ্গে যেসব গাছের গুঁড়ি পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির কোষসমষ্টি বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে, সেগুলিও লবণাক্ত মাটিতে শ্বসনমূলধারী গাছ (যা সাধারণত সুন্দরবন অঞ্চলে হয়), যথা, সুন্দরী, কেওড়া, ধুধুল, গরান ইত্যাদি। গবেষণার এই ফলাফল থেকে সাধারণ-ভাবে অনুমান করা হয়েছিল, আজ যেখানে কলকাতা, পাঁচ হাজার বছর আগে সেখানে একটি বিস্তৃত গভীর বন অধ্যুষিত, বাঘ-কুমীর পরিবৃত লবণাক্ত জলাভূমি ছিল।[১৬৫]

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত থেকে পাঁচহাজার বছর আগে এই ভূখণ্ডের পরিস্থিতি পুরোপুরি স্পষ্ট হয় না। বিভিন্ন নমুনা বিশ্লেষণ করে আরও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। বাগিরহাটের একটি নমুনায় অজস্র শস্যজাতীয় উদ্ভিদের রেণু দেখা গিয়েছে। বায়ুবাহিত রেণু এখানে প্রায় নেই বললেই চলে। কৃষি-বিস্তারের সঙ্গে সম্পর্কিত কাঁটানটে প্রভৃতি উদ্ভিদও (*Amaranthus*) পাওয়া গিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এটি বসতিবিস্তারের সূচক। নিম্নতম স্তরের এই নিদর্শনের পরে মাঝামাঝি স্তরে ফের জঙ্গল ছড়িয়ে পড়ে বলে মনে হয়। বড় বড় গাছের রেণুও এই স্তরে মিলেছে। উচ্চতর স্তরে ধারাবাহিক কৃষিকাজের প্রমাণ আছে, এবং *Plantago*, *Crotalaria* প্রভৃতি উদ্ভিদের উপস্থিতি থেকেও বসতি ও কৃষির অস্তিত্ব সমর্থিত হচ্ছে। বাগিরহাটের দ্বিতীয় নমুনাতেও নিম্নতর স্তরে কৃষির চিহ্ন রয়েছে। পরবর্তী স্তরে *Capparis* (আশ্চর্যলতা) রেণুর প্রাচুর্য থেকে অনুমিত হয়, কোনও অজ্ঞাত কারণে এ অঞ্চল জলশূন্য হয়ে পড়ে। তৃতীয় নমুনায় বসতিহীন জলমগ্ন অবস্থার পরিচয় মেলে। পরে জল সরে যাওয়ার ফলে বসতিস্থাপন, এবং ফের জলপ্লাবিত হওয়ার কথাও বোঝা যায়। তবে উচ্চতর স্তরে শস্যের রেণুর পরিমাণ বৃদ্ধি থেকে মনে হয়, অধিকাংশ এলাকা জলমগ্ন থাকলেও বাঁধ দিয়ে এবং জঙ্গল পরিষ্কার করে আদিম পদ্ধতিতে কৃষিকাজ অসম্ভব ছিল না।[১৬৬]

বাগিরহাটের মতো বেলগাছিয়া, সল্টলেক প্রভৃতি অঞ্চলে সংগৃহীত নমুনা থেকেও বিভিন্ন পর্যায়ে কৃষির বিস্তার, জলপ্লাবিত হওয়ায় বসতির অবলুপ্তি, জল সরে যাওয়ার পর কৃষির পুনরাবির্ভাব অথবা জঙ্গলের বিস্তার, পরিবেশ পরিবর্তনের এই বিচিত্র ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। বদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত নমুনায় দেখা যাচ্ছে, কৃষির জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করা কোনো একটা অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন নমুনার রেণুচিত্রে বনভূমির বিস্তার ও হ্রাসের সঙ্গে শস্যরেণুর পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি থেকে

কৃষিকর্মের যে ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে না দিলেও কিছু অনুমানের জন্য দৃঢ় ভিত্তি রচনা করেছে। বিস্তীর্ণ জলাজমির মাঝে মাঝেই খোলা ঘাসজমি, ধানজাতীয় ঘাসের রেণুর প্রাদুর্ভাব, বন কেটে বসতিস্থাপনের জন্য গাছপালার স্বল্পতা, চষাজমির আশেপাশে বেশি দেখা যায় এমন উদ্ভিদের উপস্থিতি—এসব থেকেই বারিদবরণ মুখার্জি কলকাতা ভূখণ্ডে পাঁচ হাজার বছর আগে মনুষ্যবসতির সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। অন্যদিকে, কলকাতার ভিতরে ও আশেপাশে এক aeropalynological Survey (বাতাসে রেণুর উপস্থিতি সংক্রান্ত সমীক্ষা)-র ভিত্তিতে সুনির্মল চন্দও মত প্রকাশ করেছিলেন, 'পিট'স্তরে কর্ষিত ঘাসের রেণুর উপস্থিতি একেবারে অসম্ভব বলে ভাবা উচিত নয়। তা ছাড়া সব স্তরেই বড় আকারের রেণুর নিয়মিত উপস্থিতি দেখা গিয়েছে। পাশাপাশি পাওয়া গিয়েছে এমন কিছু উদ্ভিদের রেণু, যা এখনকার সুন্দরবনেও নতুন বসতি এলাকায় দেখা যায়। বিশেষ ধরনের পরাগরেণুর (non-arboreal pollen) সংখ্যাবৃদ্ধি মনুষ্যবসতির ইঙ্গিতবহ, আর শুধু ঘাসের রেণুর সংখ্যাবৃদ্ধিও এ দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে।[১৬৭]

ফার্গুসনের মত (জলাজমির জন্য পাঁচ হাজার বছর আগে এই অঞ্চল বাসযোগ্য ছিল না) উদ্ধৃত করে বারিদবরণ বলেছেন, পাশাপাশি এ কথাও সত্যি যে, বদ্বীপে নতুন ভূখণ্ড গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পলিমাটিতে চাষবাসও ভালো হতে পারে। নবগঠিত সেই ভূখণ্ড বসতিস্থাপন এবং কৃষির জন্য মানুষকে আকৃষ্ট করবে। এভাবেই বসতির বিস্তার ঘটে। রাঢ়ের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার কেন্দ্রগুলি থেকে এইভাবে বসতি ছড়িয়ে পড়েছিল বদ্বীপের দক্ষিণপ্রান্তে—এমন অনুমানও অসম্ভব মনে করেননি বারিদবরণ।[১৬৮]

সাতের দশকের এই কাজের পর আটের দশকে কলকাতায় মেট্রো রেলের জন্য খোঁড়াখুঁড়ির সময় রেণুবিজ্ঞানীরা ব্যাপকভাবে নমুনা সংগ্রহের সুযোগ পেয়েছিলেন। এই দ্বিতীয় পর্যায়ে এলগিন রোড ও চৌরঙ্গি রোডের সংযোগস্থলে ভূপৃষ্ঠের ছ'মিটার ও সাড়ে বারো মিটার গভীরতা থেকে সংগৃহীত 'পিটে'র নমুনার বয়স রেডিও কার্বন পরীক্ষায় যথাক্রমে ২৬৪০±১৫০ এবং ৭০৩০±১০০ বছর দেখা গিয়েছে। ১১·১০ থেকে ১২·৬০ মিটার গভীরতায় যে তৃতীয় 'পিট'স্তরের সন্ধান মিলেছে, তাতেও বিভিন্ন অংশে হেঁতাল, সুন্দরী, গেঁওয়া, হোগলা, ফার্নের পাশাপাশি ধানি ঘাসের নমুনাও পাওয়া গিয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের নমুনা বিশ্লেষণ করে রেণুবিজ্ঞানীরা যে ফলাফল পেয়েছেন, তাতে মোটের উপর আগের অনুমানেরই সমর্থন মিলেছে। এমনকি তৃতীয় 'পিট'স্তরেও (সাত হাজার বছরের পুরনো) খোলা ঘাসজমি, কর্ষিত ও অকর্ষিত ঘাসের রেণুর উপস্থিতি দেখা গিয়েছে। অপর দুটি স্তরেও একই রকম চিত্র পরিস্ফুট।[১৬৯]

রেণুবিজ্ঞানীদের গবেষণা অবশ্যই এখনও শেষ হয়নি। সংগৃহীত নমুনা থেকেও এখনই কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব নয়। শুধু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যই উপযুক্ত গভীরতা পর্যন্ত খনন এবং বিভিন্ন স্তরের নমুনা সংগ্রহের সুযোগ পেলে নিঃসন্দেহে আরও অনুমান প্রমাণের অবকাশ পাওয়া যাবে। তবু এই মুহূর্তে তাঁদের

গবেষণার ফলাফল থেকে এটুকু নির্দ্বিধায় বলা যায়, অন্তত সাত হাজার বছর আগেই কলকাতা অঞ্চলে ভূখণ্ড গড়ে উঠেছিল—শুধু সমুদ্রের জল এখানে খেলা করতো না। মাঝে মাঝে নোনাজলে প্লাবিত হলেও সে ভূখণ্ড ছিল নদীজলবিধৌত—যেসব নদী টাটকা জল নিয়ে আসতো। এই জল না পেলে সুন্দরী গাছ বাঁচতে পারে না—আর সুন্দরীর নিদর্শন তো এখানে অজস্র। পূর্ববর্তী ভূতাত্ত্বিক খননেও বিভিন্ন গভীরতায় সুন্দরী গাছের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত সুন্দরবনে নদীগুলি দীর্ঘদিন ধরেই আর টাটকা জল নিয়ে আসে না—গঙ্গাস্রোতের মূলধারা বর্তমান বাংলাদেশের পদ্মা দিয়েই প্রবাহিত। এভাবেই বদ্বীপের এই অঞ্চল moribund হয়ে পড়ে—যে কথা আগেই বলা হয়েছে।[১৭০] তাই এদিকের সুন্দরবনে নোনা জলের প্রাবল্যে সুন্দরী গাছ প্রায় নিশ্চিহ্ন, অথচ বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবনে তা যথেষ্টই দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়া রেণুবিজ্ঞানীদের গবেষণায় জলাভূমি শুকিয়ে কৃষি ও বসতিস্থাপনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির চিহ্নের সঙ্গে নোনাজলে প্লাবিত হওয়ার ফলে চাষবাস বন্ধ হওয়া এবং বনভূমি বিস্তারের প্রমাণও মিলেছে। এ চিত্র সুন্দরবনে এখনও নিত্যনৈমিত্তিকের মধ্যে পড়ে—যেখানে নদীর তীরবর্তী এলাকায় মানুষের বসতিস্থাপন এবং আবার সেই বসতি লুপ্ত হওয়া প্রকৃতির খামখেয়ালের উপর নির্ভরশীল।

বাসযোগ্য ভূমি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত মানুষের বসতি এ অঞ্চলে শুরু হয়নি। জীবজন্তুর যে কয়েকটি নিদর্শন ভূতাত্ত্বিক খননে পাওয়া গিয়েছে, তাতে সে যুগের জীব-জগৎ সম্পর্কে সামান্য ইঙ্গিত মেলে। কিন্তু অন্তত পাঁচহাজার বছর আগেই আদিম মানুষ যে নিম্নবঙ্গের সদ্য গড়ে ওঠা ভূখণ্ডের কিছু কিছু অঞ্চলে বন কেটে বসতিস্থাপনের চেষ্টা করেছিল, সে অনুমানের পিছনে যুক্তির কথা আগেই বলা হয়েছে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। প্রত্ননিদর্শনের বিচারে পশ্চিমবঙ্গে তাম্রাশ্মীয় পর্বের (Chalcolithic) সূচনা প্রায় খ্রীস্টপূর্ব ১৩০০/১২০০ বছর থেকে। এর পূর্ববর্তী নবাশ্মীয় (Neolithic) ও প্রত্নাশ্মীয় (Palaeolithic) পর্বের নিদর্শনও প্রাচীন রাঢ়ভূমির বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া গিয়েছে—যদিও সেখানে প্রাগৈতিহাসিক নবাশ্মীয় পর্বের বিশিষ্ট লক্ষণ শস্যোৎপাদনের সূচনা, বন্যপশুকে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করা, ইত্যাদির কোনও প্রমাণ মেলেনি।[১৭১] কিন্তু রেণুবিজ্ঞানীদের গবেষণায় খ্রীস্টপূর্ব ২০০০/২৫০০ বছর নাগাদ এই লক্ষণ অনুমিত হয়েছে কলকাতা অঞ্চলে। কালের বিচারেও সেটি স্বাভাবিক।

রাঢ়ের ময়ূরাক্ষী-বক্রেশ্বর-কোপাই-অজয়-কুনুর-দামোদর-বিধৌত অঞ্চলে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার যে অজস্র নিদর্শন মিলেছে, তা থেকে নীহাররঞ্জন অনুমান করেছেন, ময়ূরাক্ষী-বক্রেশ্বর-অজয় অঞ্চলে তাম্রাশ্মীয় পর্বের এবং লোহা-ব্যবহারকারী মানুষের পর নিরবচ্ছিন্ন জনবসতি তেমন নেই। কিন্তু অজয়-কুনুর-দামোদর-ভাগীরথী অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান লোহার যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে লক্ষণীয় বৈষয়িক সমৃদ্ধি ঘটেছে। এখানে লৌহ-ব্যবহার-চিহ্নিত সমৃদ্ধ জনবসতি (সূচনা আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৭০০/৬০০) নিরবচ্ছিন্নভাবে ঐতিহাসিককালে এসে মিশে গিয়েছে। এবং খ্রীস্টপূর্ব ৩০০ থেকে শুরু করে খ্রীস্টপরবর্তী

২০০ বছরের মধ্যে পূর্ব বীরভূম (যেমন কোটাসুর) থেকে শুরু করে সমুদ্রশায়ী মেদিনীপুর (যেমন তমলুক), নিম্নগাঙ্গেয় চব্বিশ পরগনা (যেমন চন্দ্রকেতুগড়), ভাগীরথী-ধৃত মুর্শিদাবাদ (যেমন চিরুটি), গাঙ্গেয় উত্তরবঙ্গ (যেমন মহাস্থানগড়) পর্যন্ত বিস্তৃত এক সমাজজীবন ও সংস্কৃতি যে গড়ে উঠেছিল তার পাথুরে প্রমাণ যথেষ্টই পাওয়া গিয়েছে।[১৭২] অন্যদিকে, খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকেই যে দক্ষিণবঙ্গে ধারাবাহিক নদী-মাতৃক সভ্যতা বর্তমান ছিল, তার প্রমাণ আগেই আলোচিত হয়েছে। কলকাতা ভূখণ্ডও ভাগীরথীর তীরে—আদিগঙ্গার বাঁকের মুখে তার অবস্থানও কম উল্লেখযোগ্য নয়। তাই জনবহুল সমৃদ্ধ সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র না হলেও আজ থেকে দু'হাজার বছর আগে কলকাতা পুরোপুরি জলা-জঙ্গলে ভরা জনশূন্য অঞ্চল ছিল এমন অনুমানও বোধকরি যথার্থ নয়। সেখানে বিচ্ছিন্ন জনবসতি থাকা খুবই সম্ভব।

উপসংহার

উপসংহারে পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা সত্ত্বেও আরেকবার ফিরে দেখা যেতে পারে, এই নিবন্ধে কী দেখাতে চাওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন অনুসন্ধানের ফলাফল পুনর্বিবেচনা এবং সাম্প্রতিকতম গবেষণার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, বদ্বীপের ভূতাত্ত্বিক গঠন সম্পর্কে ফার্গুসনের মতামত[১৭৩] প্রামাণ্য হতে পারে. কিন্তু তাঁর কালনির্ণয় এখন আর মেনে নেওয়া যায় না। এখানে সাত হাজার বছর আগে ভূখণ্ডের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে, তাই 'পরবর্তীকালে কলকাতা নামে পরিচিত অঞ্চল…অস্তিত্বের দাবী প্রমাণে অপারগ।'[১৭৪]—এ কথাও অর্থহীন। প্রসঙ্গত বলা যায়, মাত্র এগারো-বারো মিটার গভীরতায় যে 'পিট'স্তরের সন্ধান মিলেছে, তার বয়সই সাত হাজার বছর। এলগিন রোড ও চৌরঙ্গি রোডের সংযোগস্থলের ভূগর্ভে প্রাপ্ত এই স্তরের কালনির্ণয় থেকে বিজ্ঞানীরা স্থির করেছেন, দেড় মিটার পুরু স্তর জমতে ৬৪০ বছর লেগেছে।[১৭৫] সর্বত্র এই হার এক না হলেও, বা বিভিন্ন জায়গায় অবনমনের কথা মনে রেখেও এ থেকে অনুমান করা যায়, ফোর্ট উইলিয়ামের খননে ৮০ ফিট নীচে প্রাপ্ত 'পিট'স্তর আরও অনেকটাই পুরনো। সে স্তরেও সুন্দরী গাছের অবশেষ মিলেছিল। অর্থাৎ এই ভূখণ্ড আরও আগেই সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত হয়েছিল। প্যাস্কোর বইতে যে ইঙ্গিত ছিল, তারও সমর্থন মিলেছে সাম্প্রতিক গবেষণায়—পাঁচ হাজার বছর আগে এখানে জলাভূমির পাশাপাশি বাসযোগ্য ভূমিও ছিল। এরপর নগর-বন্দর কেন্দ্রিক সমৃদ্ধ সভ্যতার বিস্তারে আরও কয়েক হাজার বছর কেটেছে। প্রত্নাশ্মীয়, নবাশ্মীয় পর্বের নিদর্শন সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলেও পরবর্তী প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে খ্রীস্টপূর্ব যুগেই এই সভ্যতার নিশ্চিত প্রমাণ মিলেছে। অর্থাৎ বঙ্গের কলকাতা-সন্নিহিত অঞ্চল ঐতিহাসিক বিচারে বিশেষ অর্বাচীন নয়। সব থেকে বড় কথা, কলকাতার ইতিহাস মানে তো শুধু নগরায়ণের ইতিহাস নয়। অতীতে সংলগ্ন অঞ্চলের সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে এ অঞ্চলের জনবসতির (তা সে যে বর্গের মানুষেরই হোক না কেন) পরিচয় ও সম্পর্ক নির্ধারণের গুরুত্বও কম নয়। তাই কলকাতার ইতিহাসের উপকরণের আলোচনায় 'প্রত্নতত্ত্ব অপাংক্তেয়' এমন কথা বলা যায় না।

রেণুবিজ্ঞানীরা যে সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন, বিশ্বের অন্যত্র তার নিদর্শনের পাশাপাশি প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার সেই সম্ভাবনাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ ছাড়া ঐতিহাসিক যুগের নিদর্শন পাওয়ার সম্ভাবনা তো আছেই। অথচ এখানে সে রকম অনুসন্ধানই হয়নি। এ ধরনের অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজন ওএনজিসি, জিএসআই প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণের সমান্বত উদ্যোগ। কলকাতার বয়স মাত্র তিনশো বছর, তাই এখানে urban archaeology অপ্রয়োজনীয়,—এই ধুয়ো তুলে হাত গুটিয়ে বসে থাকার দিন আর নেই। তবু এ শহরের মাটির নীচে তাকানোর কোনো উদ্যোগ কই? বরং দৈবাৎ উঠে আসা নিদর্শনকেও তাড়াহুড়ো করে যাহোক ব্যাখ্যা দিয়ে ধামাচাপা দেওয়ারই চেষ্টা হচ্ছে। হুগলি নদীর অপর তীরে হাওড়ার রেলযাত্রীনিবাসের তলায় হারিয়ে গেল এমনই এক সম্ভাবনাময় পুরানিদর্শন। রেলেরই আরেক অফিস তৈরির প্রাথমিকপর্বে আর. আর. বেইন ইতিহাসের গ্রন্থিমোচনে যেটুকু উদ্যোগী হয়েছিলেন, একশো বছর পরে স্বাধীন দেশে তাও কোনো মহলে দেখা গেল না।

সি এম ডি এ-র খোঁড়াখুঁড়িতে কলকাতার মাটির তলা থেকে কিছুই পাওয়া যায়নি বলে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আক্ষেপ করে কলকাতাকে 'শূন্যগর্ভ' বলেছিলেন।[১৭৬] একেবারেই কিছু পাওয়া যায়নি এ কথা ঠিক নয়। ময়দানে পাওয়া গিয়েছিল একটা লোহার কামান—আয়তনে নেহাত কম নয়। সেটা এখন জওহরলাল নেহরু রোডের (পূর্বতন চৌরঙ্গি রোড) উপর মেট্রোরেল ভবনের সামনে বসানো রয়েছে। আর এটাও ঠিক যে, ছোটখাট অথচ মূল্যবান পুরাবস্তু (মুদ্রা ইত্যাদি) পাওয়া গেলেও সঙ্গে সঙ্গে বেহাত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। শ্যামলকান্তি চক্রবর্তীও এরকম সম্ভাবনারই ইঙ্গিত দিয়েছেন।[১৭৭] অন্যদিকে, প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে মূল্যবান, অথচ এমনিতে হেলাফেলার জিনিস—মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া গেলেও কর্মরত শ্রমিক বা ঠিকাদাররা সেগুলিকে গুরুত্ব দেবে এটা আশা করা যায় না। ফলে এ ধরনের খননে বড় আকারের ভাস্কর্য বা স্থাপত্যনিদর্শন ছাড়া অন্য কিছু উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা নেহাতই কম। সবার উপরে মনে রাখতে হবে, কোথায় খনন করা হচ্ছে। ভাগীরথীর তীর থেকে শুরু করে আদিগঙ্গার তীর বরাবর দক্ষিণে অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে, কলকাতা শূন্যগর্ভ কিনা। চিড়িয়াখানা বা জাতীয় গ্রন্থাগারের জমিতে পরীক্ষামূলক খননের যথেষ্ট সুযোগ আছে। বাগবাজারে যেখানে ছিল পেরিনের বাগান, আজ সেটি সরকারি জমি, প্রতিবছর দুর্গাপূজা হয়। সেখানেও খনন করে দেখা যেতে পারে। কালীঘাটের মুদ্রা এবং চেতলা, বেহালার একাধিক মূর্তি ওইসব অঞ্চলের প্রত্ন-সম্ভাবনার ইঙ্গিতবাহী। দক্ষিণে বোড়াল ও উত্তরে দেউলপোতা সেই ইঙ্গিতকে জোরদার করে তুলেছে—আর রেণুবিজ্ঞানীদের গবেষণা আরও বিস্ময়কর আবিষ্কারের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করেছে। এরপরেও urban archaeology-র গুরুত্ব কীভাবে অস্বীকার করা সম্ভব?

উল্লেখপঞ্জী

১. A. K. Ray, 'A Short History of Calcutta, Town and Suburbs', Census of India, 1901, Vol. VII, Part I, Published 1902.
২. ibid, Rddhi-India edition, 1982, p. VIII (পরে 'Ray' বলে উল্লিখিত)।
৩. Ray, p. 1-9.
৪. Bholanath Chunder, 'Antiquity of Calcutta and its Name,' Calcutta University Magazine, Vol. IV, No. 1, Jan 1897. [As reprinted in Alok Ray (ed.), Calcutta Keepsake, Rddhi-India, 1978, p. 4.]
৫. সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'কালীক্ষেত্র দীপিকা', হরিপদ ভৌমিক সম্পাদিত ২য় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৬, পৃঃ ৩০-৩১ (১ম সংস্করণ ১৮৯১)।
৬. Ray, p. 26-27.
৭. প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত', পুস্তক বিপণি, ১৯৮১, পৃঃ ২ (সাময়িকপত্রে প্রথম প্রকাশ : 'নব্যভারত', আশ্বিন ১৩০৮—মাঘ ১৩১০)।
৮. সতীশচন্দ্র মিত্র, 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস', ১ম খণ্ড, শিবশঙ্কর মিত্র সম্পাদিত ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৩, পৃঃ ৬৬-৯০ (পরে 'সতীশচন্দ্র' বলে উল্লিখিত)। (১ম সংস্করণ ১৯১৪)।
৯. Calcutta and Suburbs, published by the Local Secretaries, Prof. S. K. Mitra and Principal B. M. Sen, on behalf of the Reception Committee, Twenty-Second Session of the Indian Science Congress Association, Calcutta, 1935, p. 1-2.
১০. বিভিন্ন পর্যটকের বিবরণী, প্রাচীন মানচিত্র ছাড়াও রেনি, রেভারেণ্ড জেমস লঙ, সতীশচন্দ্রের মতামত, নলিনীকান্ত ভট্টশালীর নিবন্ধ, হরিনারায়ণপুর, চন্দ্রকেতুগড়ের কিছু কিছু প্রত্ননিদর্শন, দেউলপোতা থেকে সুন্দরবনে জটার দেউল—বিবিধ পুরাকীর্তির খবর, লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর ও বকুলতলা তাম্রশাসন উদ্ধার, ডোম্মনপালের রাক্ষসখালি তাম্রশাসন, এবং কালীঘাটের গুপ্ত মুদ্রার সঞ্চয় আবিষ্কারের খবর ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। এইসব প্রসঙ্গই পরবর্তী বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।
১১. সঙ্কর্ষণ রায়, 'ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিম বাংলা', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৭৯, পৃঃ ৫।
১২. নিশীথরঞ্জন রায়, 'কলকাতা : ইতিহাসের উপাদান', আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৯, পৃঃ ১২-১৩।
১৩. R. C. Majumdar (ed), 'The History of Bengal', Vol. I, 1st edition, 3rd impression, The University of Dhaka, Dhaka, 1976,

p. 7 (পরে 'Dhaka History' বলে উল্লিখিত)। এ ছাড়াও দ্রষ্টব্য, নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব,' ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৮০, পৃঃ ১৪২। (পরে 'নীহাররঞ্জন ১ম' বলে উল্লিখিত)।

১৪. নীহাররঞ্জন ১ম, পৃঃ ১৪২।

১৫. Romila Thapar, 'Asoka and the Decline of the Mauryas', 2nd edition, 6th impression, Oxford University Press, Delhi, 1985, p. 77.

১৬. কালিদাস, 'রঘুবংশ', ৪র্থ সর্গ, ৩৬ শ্লোক (সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, ১০ম খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮১, পৃঃ ১৮৪, জ্যোতিভূষণ চাকী ও রত্না বসুর অনুবাদ)।

১৭. নীহাররঞ্জন ১ম, পৃঃ ১৪৩।

১৮. ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার. 'পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত,' সাহিত্যলোক, ১৯৮৫, পৃঃ ৩৬-৩৭, ৪৩। (পরে 'পাল-পূর্ব' বলে উল্লিখিত)।

১৯. পাল-পূর্ব, পৃঃ ৫৫।

২০. নীহাররঞ্জন ১ম, পৃঃ ১০৯।

২১. তদেব।

২২. পাল-পূর্ব, পৃঃ ৫৭-৫৮।

২৩. নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব', ২য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৮০, পৃঃ ৭৩৭। (পরে 'নীহাররঞ্জন ২য়' বলে উল্লিখিত)।

২৪. পাল-পূর্ব, পৃঃ ৫৮।

২৫. Ramaranjan Mukherji and Sachindra Kumar Maity, 'Corpus of Bengal Inscriptions', Firma K. L. Mukhopadhayay, 1967, p. 79-87 (পরে 'Corpus' বলে উল্লিখিত)। আরও দ্রষ্টব্য, 'পাল-পূর্ব', পৃঃ ১০৯-১০।

২৬. Corpus, p. 321-32.

২৭. Corpus, p. 221-29.

২৮. নীহাররঞ্জন ১ম, পৃঃ ১০৮।

২৯. পাল-পূর্ব, পৃঃ ৪৪।

৩০. নীহাররঞ্জন ১ম, পৃঃ ১০৮।

৩১. তদেব, পৃঃ ১৩৪।

৩২. তদেব, পৃঃ ১০৮।

৩৩. পাল-পূর্ব, পৃঃ ৫৮।

৩৪. নলিনীকান্ত ভট্টশালী, 'লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত শক্তিপুর-শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিভাগ', 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ৩৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৯, পৃঃ ৭৩-১০৪।

৩৫. Corpus, p. 234-44
৩৬. পাদটীকা ৩৪ দ্রষ্টব্য।
৩৭. ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, 'পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত', সাহিত্যলোক, ১৯৮২, পৃঃ ১৪০। (পরে 'পাল-সেন' বলে উল্লিখিত)।
৩৮. পাল-সেন, পৃঃ ৮২-৮৩।
৩৯. নীহাররঞ্জন ১ম, পৃঃ ১৪৮।
৪০. বিধুভূষণ ঘোষ, 'গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রবাহপথ', 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ৬০ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৬০, পৃঃ ১৬৩-৭৪।
৪১. নীহাররঞ্জন ১ম, পৃঃ ১৪৪।
৪২. দৈনিক 'বর্তমান' পত্রিকা, ১৬ জুলাই ১৯৮৯ সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধঃ সমীরকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'গাইঘাটায় হয়ত ছিল বৌদ্ধবিহার' এবং ডঃ অতুল সুরের 'বাংলার গৌরবময় অধ্যায় শিমুলিয়া সভ্যতার রহস্য' দ্রষ্টব্য।
৪৩. নীহাররঞ্জন ১ম, পৃঃ ১৪৭।
৪৪. পাল-পূর্ব, পৃঃ ৯৭।
৪৫. নীহাররঞ্জন ১ম, পৃঃ ১৪৭।
৪৬. পাল-পূর্ব, পৃঃ ১০৫।
৪৭. T. W. Rhys Davids and S. W. Bushell (ed.), 'On Yuan Chwang's Travels in India', by Thomas Watters, Munshiram Manoharlal, 1973, p. 185-91.
আরও দ্রষ্টব্য, পাল-পূর্ব, পৃঃ ১২৫-২৬।
৪৮. পাল-পূর্ব, পৃঃ ১৪৭।
৪৯. তদেব, পৃঃ ১৪৪-৪৫।
৫০. পাল-সেন, পৃঃ ৫১। আরও দ্রষ্টব্য, দীনেশচন্দ্র সরকার, 'সিয়ান গ্রামের শিলালেখ', 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ৮৩ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, ১৩৮৩, পৃঃ ১-২২।
৫১. পাল-সেন, পৃঃ ১০৩।
৫২. তদেব, পৃঃ ১০৮-৯।
৫৩. তদেব, পৃঃ ১৪৩।
৫৪. পাল-পূর্ব, পৃঃ ৪৭।
৫৫. তদেব, পৃঃ ১৪৭, এবং ৪৮।
৫৬. তদেব, পৃঃ ৪৭।
৫৭. নীহাররঞ্জন ১ম, পৃঃ ১৪৮।
৫৮. তদেব।
৫৯. Dr. R. C. Majumdar, 'The Classical Accounts of India', Firma KLM, 1981 reprint, p. 128. (পরে 'Accounts' বলে উল্লিখিত)।
৬০. ibid, p. 172.

৬১. ibid, p. 190.
৬২. ibid, p. 198.
৬৩. ibid, p. 234.
৬৪. ibid, p. 308.
৬৫. ibid, p. 341.
৬৬. ibid, p. 350.
৬৭. ibid, p. 367 এবং 504 পৃষ্ঠার পর সংলগ্ন Ptolemy's Map of India.
৬৮. ibid, p. 457-58.
৬৯. পাল-পূর্ব, পৃঃ ৭৭।
৭০. পাদটীকা ১৬ দ্রষ্টব্য।
৭১. N. K. Bhattasali, 'Antiquity of the Lower Ganges and Its Courses', 'Science and Culture,' Vol. VII, No. 5, Nov. 1941, p. 233.
৭২. Accounts, p. 351-55.
৭৩. নীহাররঞ্জন ১ম, পৃঃ ২০০-১, ২১০।
৭৪. Accounts, p. 367.
৭৫. পাদটীকা ৭১ দ্রষ্টব্য।
৭৬. নীহাররঞ্জন ১ম, পৃঃ ১০৪-৬।
৭৭. R. C. Majumdar, 'Physical Features of Ancient Bengal', D. R. Bhandarkar Volume, ed. by B. C. Law, Indian Research Institute, 1940, p. 346 (পরে 'Physical Features' বলে উল্লিখিত)।
৭৮. ibid, p. 34[illegible].
৭৯. পাল-পূর্ব, পৃঃ ৩১-৩২।
৮০. পাদটীকা ৭৬ দ্রষ্টব্য।
৮১. 'Physical Features', p. 356.
৮২. নীহাররঞ্জন ১ম, পৃঃ ১০৯।
৮৩. তদেব, পৃঃ ১১০ এবং পরবর্তী পাদটীকায় উল্লিখিত P. C. Ghosh-এর মন্তব্য দ্রষ্টব্য।
৮৪. H. J. Rainey, 'What was the Sunderban originally, and when, and wherefore did it assume its existing state of utter desolation ?' With notes by Rev. J. Long, H. Blochmann, and P. C. Ghosh, Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Dec. 1868, p. 264-73.
৮৫. Rev. James Long, 'Analysis of the Bengali poem Raj Mala, or Chronicles of Tripura', 'Journal of the Asiatic Society of

Bengal' (পরে JASB বলে উল্লিখিত), Vol. XIX, 1850, p. 538 (foot-note).

৮৬. H. Beveridge, 'Were the Sunderbans inhabited in ancient times ?' (With remarks by W. T. and H. F. Blanford), JASB, Vol. XLV, (1), 1876, p. 71-76.

৮৭. Henry Blochmann, 'Contributions to the geography and history of Bengal (Muhammadan Period)', JASB, Vol. XLII (1), 1873, p. 231.

৮৮. পাদটীকা ৮ দ্রষ্টব্য।

৮৯. L. R. Fawcus, 'Final Report on the Khulna Settlement (1920-26)', as quoted by Kanangopal Bagchi, in 'The Ganges Delta', (পরে 'Bagchi' বলে উল্লিখিত)। University of Calcutta, 1944, p. 87.

৯০. 'Physical Features', p. 358-59.

৯১. নীহাররঞ্জন ১ম, পৃঃ ১১০।

৯২. হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, 'কলিকাতার ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা,' 'মানসী,' অগ্রহায়ণ ১৩২০ (নিশীথরঞ্জন রায় ও অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রাচীন কলিকাতা', সাহিত্যলোক, ১৩৯০, পৃঃ ৪৯-৫৩তে পুনর্মুদ্রিত)।

৯৩. Edward Hyde East, 'Abstract of an account, containing the particulars of a boring made near the Hooghly, in the vicinity of Calcutta, from May to July 1814, inclusive, in search of a spring of pure water, Asiatick Researches, Vol. XII, 1816, p. 542-46.

৯৪. Ray, p. 1.

৯৫. E. H. Pascoe, 'A Manual of the Geology of India and Burma', Govt. of India, Vol. III, 3rd ed. 1964 (1st ed. by H.B. Medlicott, W. T. Blanford, V. Ball and F. R. Mallet, 2nd ed. by R. D. Oldham). (পরে 'Pascoe' বলে উল্লিখিত)।

৯৬. D. Mcleod, 'Abstract report of the Proceedings of the Committee appointed to superintend the boring operations in Fort William from their commencement in December, 1835, to their close in April 1840', JASB, Vol. IX, 1840, p. 677-87.

৯৭. Pascoe, p. 1987-88.

৯৮. Henry F. Blanford, 'Note on a Tank Section at Sealdah, Calcutta', JASB, Vol. XXXIII (2), 1864, p. 154-58.

৯৯. C. N. Banerjei, 'An Account of Howrah : Past and Present', Calcutta, 1872, p. 5.

১০০. সতীশচন্দ্র, পৃঃ ৫৩-৫৫ ।

১০১. F. H. Pellew, 'Note on some specimens of wood and soil dug out near Baddibati, Hughli District', Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, March 1873, p. 78-79.

১০২. পাদটীকা ৫ দ্রষ্টব্য ।

১০৩. Pascoe, p. 1988.

১০৪. পাদটীকা ৯২ দ্রষ্টব্য ।

১০৫. Pascoe, p. 1982 ff.

১০৬. ibid.

১০৭. Shyamalkanti Chakravarti, 'How Eternal is the City', 'The Telegraph Colour Magazine', 22 January 1989, p. 10. আরও দ্রষ্টব্য, শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী, 'ভূগর্ভস্থ কলকাতা', 'আবর্ত,' ১৭ বর্ষ, ৩-৫ সংখ্যা, মে—অক্টোবর ১৯৮৮, পৃঃ ১২১-২৩, এবং এই লেখকেরই 'কলকাতার মাটি খুঁড়ে', 'দেশ' বিনোদন ১৩৯৬/১৯৮৯, পৃঃ ২০৩-৮ ।

১০৮. ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ সূত্রে এ তথ্য জানা গিয়েছে ।

১০৯. James Fergusson, 'On Recent changes in the Delta of the Ganges,' The Quarterly Journal of the Geological Society of London, Vol. XIX, 1863, p. 321-54.

১১০. D. N. Wadia, 'Geology of India', 4th edn., 5th reprint 1981, Tata Mcgraw-Hill, New Delhi, p. 370-71.

১১১. পাদটীকা ৯৫ দ্রষ্টব্য ।

১১২. পাদটীকা ৮৯ দ্রষ্টব্য ।

১১৩. Bagchi, p. 63-66.

১১৪. ibid, p. 48.

১১৫. পাদটীকা ৭১ দ্রষ্টব্য ।

১১৬. পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, 'প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা', অণিমা প্রকাশনী, ১৯৮১, পৃঃ ১৩ ।

১১৭. তদেব, পৃঃ ৬১ ।

১১৮. তদেব, পৃঃ ৮৬ ।

১১৯. Pareshchandra Dasgupta (ed.), 'Exploring Bengal's Past', 1966.

১২০. H. D. Sankalia, 'The Prehistory and Protohistory of India and Pakistan', Deccan College Postgraduate and Research Institute, Poona, 2nd ed, 1974, p. 51.

১২১. A. Ghosh (ed.), Indian Archaeology—A Review, Archaeo-

logical Survey of India, New Delhi, 1963-64, p. 59, also see, ibid, 1964-65, p. 46, 51-52.

১২২. নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, 'নিমজ্জিত নগরী হরিনারায়ণপুর', 'অমৃত', ১২ বর্ষ ২৫ সংখ্যা, শুক্রবার ১০ কার্তিক ১৩৭৯, পৃঃ ৯১৯-২৪। Kalidas Datta, 'Some Primitive Antiquities from the Sundarbans', 'Science and Culture,' Vol. 27, June 1961. Kalidas Datta, 'Some Early Archaeological Finds of the Sundarban', 'The Modern Review,' July 1963, p. 39-44. P. C. Dasgupta, 'Archaeological Discovery in West Bengal', 'A Bulletin of the Directorate of Archaeology, West Bengal', No. 1, 1963. পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, 'অতীত বাংলায় হরপ্পা যুগ', 'আন্তর্জাতিক', ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৬৫, পৃঃ ৩২৩-২৫।

১২৩. Paresh Chandra Dasgupta, 'The Excavations at Pandu Rajar Dhibi,' 'A Bulletin of the Directorate of Archaeology, West Bengal', No. 2., 1964. আরও দ্রষ্টব্য, নীহাররঞ্জন ২য়, পৃঃ ৯১৭-২৬।

১২৪. A. Ghosh (ed.), 'Indian Archaeology—A Review', 1956-57, p. 29-30.

১২৫. সতীশচন্দ্র, পৃঃ ৭৪-৭৫, ১৮০-৮৩।

১২৬. তদেব, পৃঃ ৪৬৭-৬৯।

১২৭. তদেব।

১২৮. 'Indian Archaeology—A Review', 1956-57 to 1967-68.

১২৯. পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার সূত্রে এ তথ্য জানা গিয়েছে।

১৩০. পাদটীকা ১২২ দ্রষ্টব্য। তা ছাড়াও দেখুন, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, 'আদিগঙ্গা পরিক্রমা', 'পুরাতাত্ত্বিক', ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৮৬/মার্চ ১৯৮০, পৃঃ ৩৬-৪৩। Kalidas Datta, 'The Antiquities of Khadi', Varendra Research Society Monograph No. 3, 'The Antiquities of North-West Sundarbans', Monograph No. 4, 'The Antiquities of Sundarbans', Monograph No. 5. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কালিদাস দত্তের অন্যান্য নিবন্ধের জন্য দ্রষ্টব্য, অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, 'প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক কালিদাস দত্তের গ্রন্থপঞ্জী', 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৮৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, ১৩৮৪, পৃঃ ৫৩-৫৯।

১৩১. 'Corpus', p. 271-72. আরও দ্রষ্টব্য, 'পাল-সেন', পৃঃ ২৮, ১২৭।

১৩২. 'Indian Archaeology—A Review', 1971-72, p. 51.

১৩৩. 'Corpus', p. 290.

১৩৪. পাদটীকা ৩৪ দ্রষ্টব্য।

১৩৫. পাদটীকা ১৩০, 'আদিগঙ্গা পরিক্রমা'।

১৩৬. পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার সূত্রে জানা গিয়েছে।

১৩৭. 'List of Ancient Monuments in the Presidency Division, Revised and Corrected upto 31 Aug. 1895', Govt. of Bengal, Public Works Dept., 1896, p. 2-3. (পরে 'List' বলে উল্লিখিত)।

১৩৮. অসীম মুখোপাধ্যায়, 'চব্বিশ পরগণার মন্দির', আনন্দধারা প্রকাশন, ১৩৭৭, পৃঃ ৩৭-৪৬।

১৩৯. পাদটীকা ১৩৭ দ্রষ্টব্য।

১৪০. নীহাররঞ্জন ২য়, পৃঃ ৮৬৬।

১৪১. 'Dhaka History', p. 501.

১৪২. Kalidas Datta, 'The Antiquities of Sundarbans', Varendra Research Society, Rajshahi, Monograph No. 5, March, 1934.

১৪৩. পাদটীকা ৭১ দ্রষ্টব্য।

১৪৪. Benoy Chandra Sen, 'Indian Historical Quarterly', Vol. X, 1934, p. 321. আরও দ্রষ্টব্য, 'পাল-সেন', পৃঃ ১৩৩।

১৪৫. পাদটীকা ৮৫ দ্রষ্টব্য।

১৪৬. Bagchi, p. 48.

১৪৭. পাদটীকা ৮ দ্রষ্টব্য।

১৪৮. সতীশচন্দ্র, পৃঃ ৮৭।

১৪৯. List, p. 8-9.

১৫০. পাদটীকা ১৩০, 'আদিগঙ্গা পরিক্রমা'।

১৫১. বিভূতিভূষণ মিত্র, 'বোড়াল ও প্রাচীন ভাগীরথী-কূল', 'যুগান্তর', রবিবার ৭ আষাঢ় ১৩৬৫; 'ভাগীরথী কূলের প্রাচীন কীর্তি', 'যুগান্তর', সোমবার ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭ (মফঃস্বল সং)। আরও দ্রষ্টব্য, বিনয় ঘোষ, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', ৩য় খণ্ড, প্রকাশ ভবন, ১৯৮০, পৃঃ ২২৮-৩০।

১৫২. P. C. Dasgupta, 'Arch Discovery'. (দ্রঃ. পাদটীকা ১২২)।

১৫৩. John Allan, 'Catalogue of the coins of the Gupta Dynasties and of Sasanka, King of Gauda (in the British Museum)', London, 1914, p. 60-61, 124-26.

১৫৪. পাদটীকা ১২ দ্রষ্টব্য।

১৫৫. কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, 'বাংলার ভাস্কর্য', সুবর্ণরেখা সংস্করণ, ১৯৮৬. পৃঃ ৩৫-৩৬.

১৫৬. শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী, 'কলকাতার মাটি খুঁড়ে', 'দেশ' বিনোদন ১৩৯৬/১৯৮৯, পৃঃ ২০৮। লেখকের অন্য নিবন্ধের জন্য পাদটীকা ১০৭ দ্রষ্টব্য।

১৫৭. R. R. Bayne, 'Notes on the Remains of Portions of Old Fort William discovered during the erection of the East Indian

Railway Company's Offices', JASB, Vol. LII (1), 1883, p. 105-119. [as quoted in C. R. Wilson (ed), 'Old Fort William in Bengal', Vol. II, p. 196-99.]

১৫৮. 'Pascoe' দ্রষ্টব্য।

১৫৯. কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ তারিখে এক সাক্ষাৎকারে লেখককে এ তথ্য জানিয়েছেন।

১৬০. 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'মাটির নিচে কঙ্কাল, একশ ঘর', ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮; 'ফসিল' (কলকাতার কড়চা), ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮; 'হেলায় নষ্ট করা হল ইতিহাসের মূল্যবান গ্রন্থি', তারাপদ সাঁতরা, (সম্পাদক সমীপেষু), ১০ মার্চ ১৯৮৮।

১৬১. Sunirmal Chanda, 'Potentiality and Problems of Quaternary Pollen Analysis in India', Reprinted from the 'Proceedings of the Seminar on Paleopalynology and Indian Stratigraphy, 1971', Dept. of Botany, Calcutta University, 1972, p. 336-43. এবং Sunirmal Chanda and Kashinath Bhattacharya, 'Quaternary Pollen Analysis in India with Reference to Vegetational History', 'Indian Journal of Earth Sciences', Vol. 14, Nos. 3-4, 1987, p. 283-95.—বিষয় পরিচিতি অংশ মূলত এ দুটি নিবন্ধের ভিত্তিতে রচিত।

১৬২. Barid Baran Mukherjee, 'Pollen Analysis of a Few Quaternary Deposits of Lower Bengal Basin', Reprinted from the 'Proceedings of the Seminar on Paleopalynology and Indian Stratigraphy, 1971', Dept. of Botany, Cal. Univ., 1972, p. 357-73.

১৬৩. Nimai Chandra Barui and Sunirmal Chanda, 'Late-Quaternary Palaeoecology of Lower Bengal Basin, India', IPPCCE News letter No. 5 (1989), p. 11-12.

১৬৪. ডঃ সুনির্মল চন্দ, 'পরাগরেণু এবং প্রাগৈতিহাসিক কলকাতা', 'দেশ', ৪০ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা, ৮ ভাদ্র ১৩৮০।

১৬৫. তদেব।

১৬৬. Barid Baran Mukherjee, 'Quaternary Pollen Analysis as a Possible Indicator of Prehistoric Agriculture in Deltaic Part of West Bengal, India', 'Journal of Palynology', Vol. VIII, 1972, p. 144 51.

১৬৭. তদেব।

১৬৮. তদেব।

১৬৯. Nimai Chandra Barui, Sunirmal Chanda and Kashinath Bhattacharya, 'Late Quaternary Vegetational History of the Bengal Basin', 'Bulletin of the Geological, Mineral, Meteorological Society of India, No. 54', 1986, p. 197-201.

১৭০. Bagchi, p. 62-63.

১৭১. নীহাররঞ্জন ২য়, পৃঃ ৯১৮।

১৭২. তদেব, পৃঃ ৯২৫-২৬।

১৭৩. পাদটীকা ১০৯ দ্রষ্টব্য।

১৭৪. পাদটীকা ১২ দ্রষ্টব্য।

১৭৫. পাদটীকা ১৬৯, (পৃঃ ২০০ দ্রঃ)।

১৭৬. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 'শূন্যগর্ভ কলকাতা' ['আপন মনের মাধুরী মিশায়ে', বিশ্বভারতী, (১৩৯৩) গ্রন্থ থেকে 'আবর্ত', ১৭ বর্ষ, ৩-৫ সংখ্যা, মে-অক্টোবর ১৯৮৮-তে পুনর্মুদ্রিত]।

১৭৭. পাদটীকা ১৫৬ দ্রষ্টব্য।

সুখময় মুখোপাধ্যায়

প্রাক্-চার্নক 'কলিকাতা'

সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সাক্ষ্য

মহানগরী হিসাবে কলকাতা বা 'কলিকাতা'র অভ্যুদয় ব্রিটিশ আমলের ঘটনা। কিন্তু স্থান হিসাবে 'কলিকাতা'র ঐতিহ্য কত দিনের পুরনো? ইংরেজ বণিকেরা ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশে বাণিজ্য করার সরকারী অনুমতি পান মোগল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। অল্পকালের মধ্যেই তাঁরা বাংলাদেশে কতকগুলি কুঠি স্থাপন করেন। তার মধ্যে অন্যতম ছিল হুগলীর কুঠি। ইংরেজরা বাংলার শাসনকর্তার কাছে বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বাণিজ্য করার অধিকার পেলেও এদেশের রাজকর্মচারীরা নানা চক্রান্ত করে তাঁদের সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করত। ইংরেজরা তখন শক্তিবৃদ্ধি করে তাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করতে থাকেন। এরই প্রতিক্রিয়া স্বরূপে হুগলীর শাসনকর্তা ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইংরেজদের হুগলীর কুঠি আক্রমণ করেন। তখন ইংরেজদের কুঠির তৎকালীন এজেন্ট জব চার্নক হুগলীর ২৪ মাইল দক্ষিণে—ভাগীরথীর পূর্ব তীরে অবস্থিত সুতানুটি গ্রামে তাঁদের কুঠি সরিয়ে নেন। এরপর ইংরেজরা হিজলীতে তাঁদের কুঠি স্থানান্তরিত করেন এবং মোগলদের সঙ্গে তাঁদের বারবার সংঘর্ষ বাধতে থাকে। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয় এবং ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা সুতানুটিতে ফিরে যান। কিন্তু অল্পকাল পরেই চট্টগ্রামে স্থায়ী বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করার অভিপ্রায় নিয়ে ইংরেজরা সুতানুটি ত্যাগ করেন। সে অভিপ্রায় ব্যর্থ হয়। মাঝখান থেকে লাভ হয় মুঘলদের, সঙ্গে আর এক দফা সংঘর্ষ ও পরিণামে মীমাংসা। অবশেষে বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজদের বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার এদেশের শাসকশক্তির কাছে চূড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ করে এবং ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে ইংরেজরা সুতানুটিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলার তৎকালীন শাসনকর্তা আজিমুদ্দীনের (পরে যাঁর নাম হয় আজিমুস্‌সান) কাছ থেকে ইংরেজরা সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর—এই তিনটি গ্রাম ক্রয় করেন। এই তিনটি গ্রাম অল্পকালের মধ্যেই মিলিতভাবে 'কলিকাতা' নাম পায় এবং ক্রমশ মহানগরীতে পরিণত হয়।[১]

এই ইতিহাস সকলেরই জানা। কিন্তু এর আগের ইতিহাস কী? সাধারণের বিশ্বাস, ইংরেজদের আসার আগে 'কলিকাতা' ছিল একটি নগণ্য গ্রাম। কোনো কোনো

ঐতিহাসিকও এই ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু এই ধারণার প্রতিকূলে যে বহু প্রমাণ আছে চার্নক-পূর্ব যুগের বাংলা সাহিত্যে, সে সম্বন্ধে বিশেষ কেউ অবহিত হননি। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা এই প্রমাণগুলি বিশ্লেষণ করব এবং দেখাব যে ইংরেজরা আসার আগে 'কলিকাতা' ছিল একটি বিশিষ্ট ও বিখ্যাত জনপদ।

২

১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে জব চার্নক 'কলিকাতা'র মাটিতে প্রথম পদার্পণ করেন। তারও দশ বছর আগে ১৫৯৮ শকাব্দ বা ১৬৭৬-৭৭ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকামঙ্গল' রচিত হয়। কৃষ্ণরাম দাস পুরনো বাংলা সাহিত্যের একজন অতি-পরিচিত গ্রন্থকার এবং তাঁর 'কালিকামঙ্গল' কাব্যের বহু পুঁথি এ পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং এর প্রামাণিকতা অবিসংবাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহের ২৩৭৬ নং পুঁথিতে 'কালিকামঙ্গলে'র রচনাকাল নিম্নোদ্ধৃত হেঁয়ালি শ্লোকের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়,

'সারসাসানের (সারসাসনের) নেত্র ভীমাক্ষিবর্জিত মিত্র
তেজিয়া ঋষির পক্ষ তবে।
বিধুর মধুর ধাম রচনাতে কহিলাম
বুঝ সকল (শক) বিচারিয়া তবে।'

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এই হেঁয়ালির সমাধান করে ১৫৯৮ শকাব্দ পেয়েছেন ('সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', ১৩৫০, পৃঃ ৬৪)। তাঁর ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য হলেও সকলে তা না মানতে পারেন। কিন্তু কৃষ্ণরামের 'কালিকামঙ্গল'-এর আর একটি পুঁথিতে এই একই রচনাকাল আর একটি শ্লোকের মধ্য দিয়ে খুব পরিষ্কারভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। সেই শ্লোকটি এই,

'বলে কবি কৃষ্ণরাম নিমিতা তাহার গাম
জথা হৈল কালির মঙ্গল।
বসু নব বাণ ইন্দু শক এই গুণসিন্ধু—
বিচারিয়া বুঝহ সকল ॥'[২]

বসু=৮, নব=৯, বাণ=৫, ইন্দু=১। সুতরাং 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' নীতি অনুসারে এর থেকে ১৫৯৮ শকাব্দ পাওয়া যায়।

এটি যে কৃষ্ণরামের 'কালিকামঙ্গল'-এর রচনাকাল, তার আরও প্রমাণ আছে। পূর্বোদ্ধৃত ('সারসাসানের নেত্র' ইত্যাদি) রচনাকালবাচক শ্লোকটির ঠিক আগেই কৃষ্ণরাম 'অরংসাহা ক্ষিতিপাল' অর্থাৎ ভারতসম্রাট আওরঙ্গজেব এবং 'নবাব সারিস্তা খাঁ' অর্থাৎ বাংলার নবাব শায়েস্তা খাঁর উল্লেখ করেছেন।

যা হোক, ১৫৯৮ শকাব্দ বা ১৬৭৬-৭৭ খ্রীস্টাব্দে যে কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকামঙ্গল' রচিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া গেল। কৃষ্ণরামের বাসভূমি ছিল নিমিতা বা নিমতা গ্রামে (বেলঘরিয়ার কাছে অবস্থিত)।

'কালিকামঙ্গলে' কৃষ্ণরাম যখনই তাঁর গ্রামের নামের উল্লেখ করেছেন, তখনই

'কলিকাতা'রও উল্লেখ করেছেন। এই জাতীয় উল্লেখ সংবলিত অংশগুলি আমরা নীচে উদ্ধৃত করছি,

(১) 'অতি পুণ্যময় ধাম সরকার সপ্তগ্রাম
কলিকাতা পরগণা তায়
ধরণী নাহিক তুল জাহ্নবীর পূর্ব্বকূল
নিমিতা নামেতে গ্রাম যায়।'

(২) 'ভাগীরথীর পূর্ব্বতীর অপুরুব নাম।
কলিকাতা বন্দিনু নিমিতা জন্মস্থান।'

(৩) 'সপ্তগ্রাম সরকার কলিকাতা নাম তার
পরগণা অনুপম ক্ষিতি।
সাবর্ণি চৌধুরী জায় সর্ব্বলোকে গুণ গায়
পশ্চিমে আপনি ভাগীরথী॥'

কৃষ্ণরাম দাস যখন 'কলিকাতার' কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে তাঁর স্বগ্রাম নিমিতা বা নিমতার পরিচয় দিয়েছেন, তখন 'কলিকাতা' যে ঐ সময়ে একটি বিখ্যাত স্থান ছিল—তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

কৃষ্ণরামের একজন সমসাময়িক কবি—সনাতন ঘোষাল বিদ্যাবাগীশের লেখা থেকেও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। সনাতন ঘোষাল কটকে বসে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের কয়েকটি স্কন্ধ বাংলায় অনুবাদ করেন।[৩] প্রথম স্কন্ধের অনুবাদ কবে সম্পূর্ণ হয়েছিল—তা তিনি নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকের মধ্য দিয়ে জানিয়েছেন,

'কাল কলানিধি বিষ্ণুপদ কাল শশী।
শাকে মিত্র তুলা ধরে পদ্মকান্ত বসি॥
কৃষ্ণপক্ষ রবি তিথি তৃতীয় প্রহরে।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ কটক নগরে॥'

এই শ্লোকের প্রথম শব্দ 'কাল'-এর অর্থ সময়। এর রচনাকাল 'কলানিধি বিষ্ণুপদ কাল শশী' শকাব্দ। কলানিধি=চন্দ্র=১, বিষ্ণুপদ=আকাশ=০, কাল=ঋতু=৬, শশী=১। সুতরাং ১৬০১ শকাব্দ বা ১৬৭৯-৮০ খ্রীস্টাব্দে সনাতন ঘোষাল প্রথম স্কন্ধের অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন।

কিন্তু আরও আগে যে তিনি নবম স্কন্ধের অনুবাদ সম্পূর্ণ করেছিলেন—তা ঐ স্কন্ধের শেষে প্রদত্ত এই শ্লোক থেকে জানা যায়,

'গগনযুগল ঋতু সমুদ্রকুমার।
শাক পরিমিত বীর বিক্রম বাজার॥'

গগনযুগল=দুটি শূন্য, ঋতু=৬, সমুদ্রকুমার=চন্দ্র=১। অতএব ১৬০০ শকাব্দ বা ১৬৭৮-৭৯ খ্রীস্টাব্দে নবম স্কন্ধের অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়।[৪]

নবম স্কন্ধের শেষে সনাতন ঘোষাল এই আত্মপরিচয় দিয়েছেন,

'কলিকতা ঘোষাল বংশে কৃষ্ণানন্দ।
তাঁর পুত্র ভুবনবিদিত রামচন্দ্র ॥
তাঁহার মধ্যম পুত্র করি শিশুলীলা।
ভাষাভাগবত বিদ্যাবাগীশ রচিলা ॥'

এর থেকেও প্রমাণ পাওয়া গেল যে ইংরেজরা 'কলিকাতা'য় আসার আগে কলিকাতা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল—তা না হলে এখানকার একজন অধিবাসীর পৌত্র সুদূর কটকে বসে কাব্য লেখার সময় 'কলিকাতা'র নাম উল্লেখ করে নিজের পরিচয় দিতেন না। এই উদ্ধৃতি থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে, 'কলিকাতা' এই বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল সনাতন ঘোষালের ভাগবত অনুবাদের অনেক আগে—অন্ততপক্ষে ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের আগে। কারণ সনাতনের পিতামহের জন্ম হয়েছিল অন্ততপক্ষে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। তিনিও 'কলিকতা (কলিকাতা) ঘোষাল বংশে'র সন্তান।

উদ্ধৃতিটি আরও এক দিক দিয়ে মূল্যবান। অনেকেরই ধারণা আছে যে ইংরেজদের আসার পূর্ববর্তী 'নগণ্য' 'কলিকাতা'তে অল্প কিছু জেলে ও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বাস করত। কিন্তু সনাতন ঘোষালের সাক্ষ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে ১৬০০ খ্রীস্টাব্দ বা তারও আগে থেকে এখানে 'ঘোষাল' উপাধিধারী ব্রাহ্মণরা বাস করতেন। কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকামঙ্গল' থেকে ইতিপূর্বে যে তিনটি অংশ উদ্ধৃত করেছি তার তৃতীয়টি থেকে জানা যায় যে, ১৬৭৬-৭৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় 'সাবর্ণি চৌধুরী' অর্থাৎ সাবর্ণ গোত্রীয় 'চৌধুরী' উপাধিধারী ব্রাহ্মণেরা বাস করতেন, যাঁদের 'সর্ব্বলোকে গুণ' গাইত।

এই 'কলিকাতা' ইংরেজ-আগমনের আগেই ইউরোপীয়দের কাছে Calcutta নামে পরিচিত ছিল এবং তা ছিল বড় না হোক ছোট একটি বন্দর। এই দুই তথ্য জানা যায় ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে অঙ্কিত ওলন্দাজ বণিক ফান্‌ডেন্ ব্রকের মানচিত্র থেকে। ঐ মানচিত্রে ভাগীরথীর পূর্ব তীরে Calcutta বন্দরের নাম স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে।[৫]

১৬০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে 'কলিকাতা' যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল, তার প্রমাণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' থেকেও পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থের এক জায়গায় লেখা আছে,

'ধালিপাড়া মহাস্থান কলিকাতা কুচিনান
দুই কূলে বসাইয়া বাট।
পাষাণে রচিত ঘাট দু'কূলে যাত্রীর নাট
কিঙ্করে বসায় নানা হাট ॥'[৬]

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' ১৫৯৪ থেকে ১৬২৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়।[৭] এর বহু পুঁথিতে, এমনকি সুপ্রাচীন পুঁথিতেও উপরে উদ্ধৃত অংশটি মেলে। সুতরাং এর অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

'কলিকাতা'র ইতিহাসকে আরও পিছিয়ে ১৫৮৫ খ্রীস্টাব্দেরও আগে নিয়ে যাওয়া যায় অত্যন্ত অনায়াসেই। ১৫৮৫ খ্রীস্টাব্দে আবুল ফজলের 'আইন-ই আকবরী'র রচনা

সম্পূর্ণ হয়। ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আবুল ফজল আকবরের রাজ্যের অন্তর্গত 'সরকার' ও মহাল বা পরগনার এক তালিকা দিয়েছেন। তার মধ্যে সাতগাঁও সরকারের অন্তর্গত 'কলিকাতা' মহাল বা পরগনার উল্লেখ আছে।[৮]

'আইন-ই-আকবরী'তে 'কলিকাতা'র এই উল্লেখ গত শতাব্দীর শেষদিক থেকেই পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে। কিন্তু যারা ইংরেজদের আসার আগে 'কলিকাতা'র নগণ্যতা সম্বন্ধে বদ্ধমূল সংস্কার পোষণ করতেন, তাঁরা ঐ উল্লেখের গুরুত্ব লাঘব করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে, এক্ষেত্রে 'আইন-ই-আকবরী'র পুঁথিতে লিপিকর-প্রমাদের দরুন 'কালনা' বা 'পলতার' জায়গায় 'কলিকাতা' হয়েছে। কিন্তু তাঁদের কেউই কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকামঙ্গল' পড়েননি। আকবরের আমলের সরকার ও মহাল বা পরগনার বিভাগ ও নাম তাঁর প্রপৌত্র আওরঙ্গজেবের আমলেও অক্ষুণ্ণ ছিল। আওরঙ্গজেবের আমলে রচিত কৃষ্ণরামের 'কালিকামঙ্গলে' খুব স্পষ্টভাবে লেখা আছে,

'অতি পুণ্যময় ধাম সরকার সপ্তগ্রাম
কলিকাতা পরগণা তায়।'

এবং

'সপ্তগ্রাম সরকার কলিকাতা নাম তার
পরগণা অনুপম ক্ষিতি ॥'

সুতরাং 'আইন-ই-আকবরী'র বিভিন্ন পুঁথি, ছাপা বই ও ইংরেজী অনুবাদে উল্লিখিত সপ্তগ্রাম সরকারের অন্তর্গত আলোচ্য মহাল বা পরগনাটি যে কলিকাতা পরগনাই, তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হল। এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৫৮৫ খ্রীস্টাব্দেরও কিছু আগে থাকতে 'কলিকাতা' ছিল বাংলার একটি বিশিষ্ট জনপদ এবং তা ছিল একটি পরগনা বা প্রশাসনিক অঞ্চলের প্রধান কেন্দ্র।

৩

আরও কতকগুলি সূত্রে 'কলিকাতা' সম্বন্ধে আমাদের ধারণার সমর্থন যোগায়। এদের মধ্যে কোনো কোনো সূত্র থেকে 'কলিকাতা'র ইতিহাস আরও একশো বছর পিছিয়ে যায়। 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম'-এ (১৯৫৮) আমরা এই সূত্রগুলি ব্যবহার করেছিলাম। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছি—এগুলি প্রামাণিক বা নির্ভরযোগ্য নয়।

যেমন কৃষ্ণদাস নামে জনৈক কবি তাঁর 'নারদপুরাণ' কাব্যে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তার মধ্যে এই পয়ারটি পাওয়া যায়,

'আপনি কনিষ্ঠ মোর রামকৃষ্ণ নাম।
সাকিম কলিকাতা বহুবাজারে ধাম ॥'[৯]

এই পয়ারটির ঠিক পরেই 'নারদপুরাণে'র রচনাকাল উল্লিখিত। দুটি পুঁথিতে রচনাকালবাচক পয়ারটির পাঠ এইরকম,

'দশ দশ শত নিরেনব্বুই সালে।
মাহ্ জ্যৈষ্ঠ মাসে এই পুস্তক রচিলে ॥'[১০]

এর থেকে ১০৯৯ সাল (বঙ্গাব্দ) অর্থাৎ ১৬৯২-৯৩ খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়। এই সময়ে 'কলিকাতা' বেশ বিশিষ্ট স্থান ছিল ও তার 'বহুবাজার' পাড়ার অস্তিত্ব তখন থেকেই ছিল—উদ্ধৃত ছত্রগুলি পড়ে তা'ই মনে হয়। যে দুটি পুঁথিতে উপরে উদ্ধৃত রচনাকাল পাওয়া গিয়েছে, তাদের লিপিকাল নাকি ১১০৮ সাল (১৭০১-০২ খ্রীঃ) ও ১১৩৪ সাল (১৭২৭-২৮ খ্রীঃ)। সুতরাং এদের সাক্ষ্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু 'সাল' বলতে এক্ষেত্রে বঙ্গাব্দ না বুঝিয়ে যদি মল্লাব্দ বোঝায়, তা হলে ১১০৮ সাল হয় ১৮০২-০৩ খ্রীস্টাব্দ এবং ১১৩৪ সাল হয় ১৮২৮-২৯ খ্রীস্টাব্দ। সেক্ষেত্রে পুঁথি দুটির সাক্ষ্য আর ততটা গুরুত্বপূর্ণ থাকে না। তাছাড়া অন্য কোনো কোনো পুঁথিতে 'নারদপুরাণে'র রচনাকাল-বাচক পয়ারটির এই পাঠান্তর পাওয়া যায়,

'সন এগার শত নিরানব্বই সালে।
মাহ জ্যৈষ্ঠ মাসে এই পুস্তক রচিলে ॥'[১১]

এর থেকে ১১৯৯ বঙ্গাব্দ বা ১৭৯২-৯৩ খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়। এই সময়ে 'কলিকাতা'র উল্লেখ বা 'বহুবাজার' পাড়ার অস্তিত্ব মোটেই অসাধারণ ব্যাপার নয় এবং তা আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে প্রাসঙ্গিকও নয়।

১৪১৭ শকাব্দ বা ১৪৯৫-৯৬ খ্রীস্টাব্দে রচিত বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসাবিজয়' কাব্যেও 'কলিকাতা'র উল্লেখ মেলে। কাব্যের নবম পালায় চাঁদো অর্থাৎ চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনার একাংশে আছে,

'পূর্ব্ব কূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা।
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদো মহারথা ॥'[১২]

এর থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে 'কলিকাতা'র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় বলে অনেকে মনে করেন ; কিন্তু আলোচ্য অংশটি বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের রচিত নয়—পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত। তার প্রমাণ, চাঁদোর এই বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনায় 'খড়দহ শ্রীপাট'-এর উল্লেখ আছে, কিন্তু ১৫২০ খ্রীস্টাব্দের মতো সময়ে নিত্যানন্দ খড়দহে বসতি স্থাপন করলে তা 'শ্রীপাট খড়দহ' নামে পরিচিত হয়। চাঁদোর ঐ বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনায় 'নিমাইতীর্থ' নামে একটি স্থানেরও উল্লেখ দেখা যায় ; চৈতন্যদেব পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করার পরেই কোনো স্থানের এরকম নামকরণ হতে পারে। অথচ ১৪৯৫-৯৬ খ্রীস্টাব্দে চৈতন্যদেবের বয়স ছিল নয়-দশ বছরের মতো। ঐ বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনায় হুগলী, ভাটপাড়া, কাঁকীনাড়া, পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, চাপাদানি, ইছাপুর, রিসিড়া, সুখচর, কোন্নগর, কোতরং, কামারহাটি, ঘুসুড়ি, চিতপুর প্রভৃতি আধুনিক স্থানের উল্লেখ মেলে। সুতরাং ঐ বর্ণনা থেকে 'কলিকাতা'র ইতিহাস সম্বন্ধে কোনো আলোক পাওয়া যায় না।

উল্লেখপঞ্জী

১. 'History of Bengal' (D. U.), Vol. II. pp, 383-86.
২. সুখময় মুখোপাধ্যায়, 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' (পরবর্তী পাদটীকা 'ম. বা. সা. ত. কা' নামে উল্লিখিত), ১৯৭৪, পৃঃ ২৬০ ।
৩. বিশ্বভারতীর পুঁথিশালার ৯০১ থেকে ৯০৯ সংখ্যক পুঁথি ।
৪. যুগল=২ ধরলে 'গগন যুগল ঋতু সমুদ্রকুমার'=১৬২০ হয় । কিন্তু বাংলায় 'যুগল' স্বতন্ত্র শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয় না । যা হোক ১৬২০ শকাব্দ বা ১৬৯৮-৯৯ খ্রীস্টাব্দে সনাতন ঘোষাল নবম স্কন্ধ রচনা করেছিলেন ধরলেও আমাদের সিদ্ধান্তের কোনো তারতম্য হয় না । কারণ 'কলিকাতা ঘোষাল বংশে'র সন্তান হিসাবে তাঁর পিতামহের জন্মগ্রহণ সেক্ষেত্রেও ১৬২০ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তী ঘটনা হয় না ।
৫. নীহাররঞ্জন রায়, 'বাংলার নদনদী', ১ম সং, পৃঃ ১৫, পৃঃ ২৪-২৫ ।
৬. 'ম. বা. সা. ত. কা.' পৃঃ ৩৪২ ।
৭. ঐ, পৃঃ ১৬২-৬৩ ।
৮. 'Ain-i-Akbari', Vol. II, Jarrett's Translation, ed. by, J. N. Sarkar, 1949, p. 154.
৯. দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', ৭ম সং, পৃঃ ৬১৮-১৯ ।
১০. ঐ, পৃঃ ৬১৯ ।
১১. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড (অপরার্ধ), ২য় সং, পৃঃ ৩৬৭ ।
১২. 'Vipradasa's Manasa-Vijaya', ed. by Sukumar Sen, 1953, pata IX.

তারাপদ সাঁতরা

কলকাতার মন্দির-স্থাপত্য

রীতি-অলংকরণ-রূপান্তরের আলেখ্য

তিনটি অখ্যাত গ্রাম থেকে মহানগরে রূপান্তরিত এই কলকাতার লৌকিক দেব-দেবী এবং মন্দির-দেবালয়ের মধ্যে ছড়িয়ে আছে নগর-ইতিহাসের বহু মূল্যবান উপাদান। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে কলকাতার চেহারা যেভাবে দ্রুত বদলাচ্ছে, তাতে হারিয়ে যাচ্ছে তার অতীত ইতিহাসের বহু উপকরণ, মন্দির-দেবালয়ও সেই রূপান্তরের প্রকোপ থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

এই শহরে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের সমাবেশ ঘটায় কলকাতার ধর্মীয় স্থাপত্যের মধ্যে রয়েছে আকর্ষণীয় বৈচিত্র্য। প্রতিটি সম্প্রদায়ের উপাসনালয়গুলি যেমন স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী, কলকাতার বাঙালি হিন্দুদের মন্দির-স্থাপত্যও তেমনই এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। দুঃখের বিষয়, বিরামহীন নগরায়ণের ফলে কলকাতার বহু প্রাচীন মন্দিরসৌধ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবু অবহেলা ও অযত্নের আক্রমণ এড়িয়ে টিকে থাকা মন্দিরের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এইসব মন্দিরের স্থাপনকাহিনী ও স্থাপত্য-ভাস্কর্যের মধ্যে সামাজিক ইতিহাসের যেসব তথ্য আত্মগোপন করে আছে, তা কলকাতার পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত রচনায় সহায়ক হতে পারে। অথচ এই অবহেলিত বিষয়টি নিয়ে সঠিক অনুশীলন বা বিশদ বিশ্লেষণ আজও হয়ে ওঠেনি।

বিদেশী লেখকদের রচিত কলকাতা-বিষয়ক গ্রন্থসমূহে প্রাধান্য পেয়েছে খ্রীস্টীয় ভজনালয়ের প্রসঙ্গ। মন্দির-মসজিদের বিবরণ সে তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'Newman's Handbook to Calcutta'-য় একুশটি খ্রীস্টীয় উপাসনাস্থলের উল্লেখপ্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে, 'There is not, so far as we are aware, any Hindu temple worth naming in the city.' কলকাতার তৎকালীন সীমানার বহির্ভূত হওয়ার কারণে কালীঘাট বা দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের নাম বইটিতে স্থান পায়নি, তা বোঝা যায়। কিন্তু কুমোরটুলিতে অবস্থিত বনমালী সরকার ও গোবিন্দরাম মিত্রের দুটি বা বৌবাজারের ত্রিলোকরাম পাকড়াশীর মন্দিরগুলির অনুল্লেখ বিস্ময়কর লাগে। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে পূর্ত বিভাগ প্রকাশিত 'List of Ancient Monuments in Bengal'-এ কলকাতার কয়েকটি মন্দিরের ইতিহাস সংকলিত হয়েছিল। কটন তাঁর 'Calcutta Old and New' (১৯০৯) গ্রন্থে এই তালিকাটি

হুবহু অনুসরণ করেছিলেন। ফারাক মাত্র একটি। তালিকায় বিবৃত বড়বাজারের জগন্নাথ মন্দিরের বিবরণ কটন বর্জন করেছিলেন।[১] এরপর দীর্ঘদিন চর্বিতচর্বণ ও পুনরাবৃত্তি চলেছিল, কলকাতার মন্দিরগুলির ইতিহাস বা স্থাপত্য সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত ঘটেনি বললেই চলে। কিছু পুস্তিকায় এবং সাময়িকপত্রে এ বিষয়ে বিচ্ছিন্ন আলোচনা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আকারে-আয়তনে বা গভীরতায় সেগুলি ছিল সীমাবদ্ধ। পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর[২] বা পঞ্চানন রায়ের[৩] মতো দু-একজনের রচনার কথা বাদ দিলে, এই শ্রেণীর লেখাগুলি থেকে বিশেষ নতুন তথ্য পাওয়া যায় না।

কলকাতার মন্দির-স্থাপত্য-বিষয়ক আলোচনার নবপর্ব শুরু হয় আজ থেকে বছর কুড়ি আগে, 'Bengal Past and Present' পত্রে। দুটি প্রবন্ধে তখন বিষয়টি বিশ্লেষণ করেন দুই প্রয়াত গবেষক—ডেভিড ম্যাককাচ্চন[৪] ও অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[৫]। তারপর বিনয় ঘোষ তাঁর 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।[৬] অন্যদিকে শ্রীরাধারমণ মিত্র ম্যাককাচ্চন ও বিনয় ঘোষের ভুল-ত্রুটির দিকে বোদ্ধাবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[৭] একেবারে সাম্প্রতিককালে কিছু পত্রপত্রিকায় এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।[৮] কলকাতার মন্দির-স্থাপত্য-বিষয়ক আলোচনার ধারাবাহিক রূপরেখা মোটামুটি এইটুকুই।

কলকাতার আদিপর্বে পরিবহণের প্রধান উপায় ছিল নদীপথ। তাই প্রাথমিক পর্বে কলকাতা ছিল এক নদীমাতৃক উপনিবেশ। এ কারণেই কলকাতার আদিম ধনিকশ্রেণী নদীতীরবর্তী সুবিধাজনক ও সম্মানিত পল্লীগুলিকে বসবাসের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। মন্দির-নির্মাণের ব্যয়বহুল অভিলাষ চরিতার্থ করতে পারেন শুধু ধনীরাই। তাই ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে মন্দিরগুলিও কেন্দ্রীভূত হয়েছিল নদীতীরস্থ অঞ্চলগুলিতে। যেসব বিত্তশালী মন্দির-নির্মাতা নদীতীরে বাস করেননি, তাঁরাও গঙ্গার 'কলুষনাশিনী' মাহাত্ম্যের কথা ভেবে গঙ্গাতীরে দেবস্থাপন করে পুণ্যার্জনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। প্রধানত এই দুটি কারণে কলকাতার মন্দিরবহুল অঞ্চলগুলির অবস্থিতি ভাগীরথী ও আদিগঙ্গার নিকটবর্তী এলাকাগুলিতে।

কলকাতার মন্দিররীতি

কলকাতার মন্দির নিয়ে আলোচনা করার আগে বাংলার মন্দির-স্থাপত্য সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা উপস্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে। বাংলার দেবালয়গুলিকে চারটি প্রধান শৈলীতে বিভক্ত করা হয়। এই শৈলীগুলির আবার কয়েকটি উপ-বিভাগ আছে। সব মিলিয়ে বাংলার মন্দিররীতির শ্রেণীবিন্যাস এইরকম :

বাংলার মন্দিররীতি

চালা	রত্ন	শিখর (রেখ)	দালান	মিশ্ররীতি
১. দোচালা	১. একরত্ন	১. নাগর দেউল	১. একতলা	
২. জোড়বাংলা	২. পঞ্চরত্ন	২. পীঢ়া দেউল	২. দোতলা	
৩. চারচালা	৩. নবরত্ন	৩. বঙ্গীয় শিখরশৈলী		
৪. আটচালা	৪. ত্রয়োদশরত্ন			
৫. বারোচালা	৫. সপ্তদশরত্ন			
	৬. একবিংশরত্ন			
	৭. পঞ্চবিংশরত্ন			

বাংলার প্রতিটি অঞ্চলে বা জেলায় একটি বিশেষ শৈলী বা রীতির প্রাধান্য দেখা যায়, যেমন মেদিনীপুর অঞ্চল রত্নপ্রধান। কলকাতার ঠাকুরদালান ও ঠাকুরবাড়িগুলি দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে কলকাতা দালানমন্দির-প্রধান অঞ্চল। কিন্তু ক্ষেত্রানুসন্ধানে দেখা গেছে যে কলকাতার প্রকৃত প্রবণতা আটচালা রীতির দিকে।

দোচালা মন্দির

গ্রামবাংলার বাঁশ, কাঠকুটো ও খড় দিয়ে তৈরি কুঁড়েঘরের আদলটিই মন্দির-স্থপতিরা 'চালা' মন্দির নির্মাণকালে অনুকরণ করেছিলেন। দোচালা কুঁড়ের আদলে যে মন্দির নির্মিত হয়, তারই নাম 'দোচালা' বা 'একবাংলা' মন্দির। এখানে 'বাংলা' শব্দটির প্রয়োগ সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন। বাংলার খোড়ো কুঁড়েঘর যে শুধু মন্দির-স্থপতিদের প্রভাবিত করেছিল তাই নয়, বাংলার জলবায়ুর উপযোগী লঘুভার এই গৃহশৈলী বিদেশী শাসকদেরও আকৃষ্ট করেছিল। অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে নির্মাণ-যোগ্য এই পদ্ধতি তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন নিজেদের বিশ্রামগৃহ নির্মাণকালে।[৯] বাংলার গৃহশৈলীর অনুরূপ হওয়ার কারণে তাঁদের বাড়িগুলির নামকরণ করা হয় 'বাংলো' বা 'ডাকবাংলো'। ক্রমে 'bunglow' শব্দটি ইংরেজি অভিধানেও স্থান পেয়েছে।[১০] একই সাদৃশ্যের কারণে কুঁড়েঘর-সদৃশ দেবালয় 'বাংলা' নামে অভিহিত হয়েছে মন্দির-স্থাপত্যের পরিভাষায়।

চালার বাঁকানো শীর্ষ ও কার্নিস সমগ্র চালা-স্থাপত্যেই অল্পাধিক অনুসৃত হয়েছে। এই বিশেষত্বটি দোচালা মন্দিররীতির প্রধান ও অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ। দোচালা নির্মাণ-রীতি যে পাঠান ও মুঘল স্থপতিদের কাছেও সমাদৃত হয়েছিল তার নিদর্শন আজও বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়। কিন্তু রাজস্থানে এই রীতির পুনরভ্যুদয়ের পিছনে ছিল এক বাঙালি স্থপতিরই প্রয়াস—একথা কিংবদন্তি নয়, তথ্যানুগ ঐতিহাসিক সত্য।[১১]

কলকাতায় দোচালা দেবালয়ের দৃষ্টান্ত খুবই অল্প। পূর্বসুরি মন্দির-গবেষকদের মতে অন্যান্য রীতির তুলনায় দোচালারীতি ভঙ্গুর।[১২] হয়তো তাই বাংলার অন্যান্য

জায়গার মতো কলকাতার দোচালা মন্দিরগুলিও কালের প্রভাবে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। আরেকটি কারণ থাকাও বিচিত্র নয়। অন্যান্য শৈলীর তুলনায় দোচালা মন্দির আড়ম্বরহীন। এই সারল্যের জন্য হয়তো কলকাতার বিত্তবান সম্প্রদায় রীতিটির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেননি।

বাগবাজারের ২৬/১ দুর্গাচরণ মুখার্জি স্ট্রিটে (বর্তমানে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ অ্যাভেনিউয়ের উপর) জগৎরাম হালদার প্রতিষ্ঠিত একটি দোচালা শিবমন্দির আছে। স্থাপত্যের বিচারে মন্দিরটি আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলে মনে হয়।

দ্বিতীয় দোচালার অবস্থান কুমোরটুলিতে। এটি 'ব্ল্যাক জমিদার' গোবিন্দরাম মিত্রের নবরত্নের জগমোহন হিসাবে নির্মিত। এই মন্দিরের পাশে একটি বিরাটাকার পঞ্চরত্ন ছিল, যার স্মৃতি ধরা আছে উইলিয়াম হিকি (১৭৮৯) ও ড্যানিয়েলদ্বয়ের (১৭৯৮) আঁকা ছবিতে। ছবিদুটি থেকে দেখা যায়, অবলুপ্ত সেই পঞ্চরত্নের দু'পাশে ছিল দুটি উঁচু দোচালারীতির স্থাপত্য। কলকাতার মাটিতে যে দোচালাশৈলী একদা আদৃত হয়েছিল, ছবিদুটি তার নীরব সাক্ষী।

জোড়বাংলা মন্দির

জোড়বাংলাশৈলী দোচালা রীতিরই একটি পরিবর্ধিত ও উন্নততর রূপ। পাশাপাশি স্থাপিত দুটি দোচালা বা একবাংলা মন্দিরের শীর্ষদেশ বা চূড়া সংযুক্ত হলে যে রীতির জন্ম হয়, সেটিই 'জোড়বাংলা' নামে পরিচিত। এই সুঠাম শৈলীটি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কোথাও যোগ্য সমাদর পায়নি। কলকাতায় কোনো জোড়বাংলার উদাহরণ খুঁজে না পাওয়া গেলেও, তার সাক্ষ্য রয়েছে কালীময় ঘটকের রচনায়: '...কলিকাতার যোড়বাঙ্গালাস্থিত কোন দেবমন্দিরে সংযোজিত প্রস্তরফলকে একটি সংস্কৃত কবিতা খোদিত ছিল এবং ঐ কবিতার নিম্নে ১১৫৩ সাল লেখা ছিল।... ১২৭০ সালের মহাঝড়ে প্রস্তরফলক বহুধা ভগ্ন হওয়ায় কবিতাটির মর্ম গ্রহণ করিতে পারা যায় নাই।'[১৩] আলোচ্য লেখায় 'যোড়বাঙ্গালা' মন্দিরটির উল্লেখ থাকলেও অবস্থিতি-নির্দেশ বা অন্যান্য কোনো বিবরণ নেই। তবু ১৭৪৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় যে একটি জোড়বাংলা মন্দির নির্মিত হয়েছিল, এটি তার মুদ্রিত প্রমাণ।

চারচালা মন্দির

দোচালা কুঁড়ের অনুকরণে যেমন নির্মিত হয়েছিল দোচালা মন্দির, তেমনি চারচালা কুঁড়েঘরের আদলে সৃষ্ট হয়েছিল চারচালা প্রকরণের মন্দির-দেবালয়। চারচালা শৈলীর নানা আঞ্চলিক রূপভেদ থাকলেও দোচালার মতোই এই রীতিরও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল বাঁকানো কার্নিস। এই রীতির মন্দিরও কলকাতায় অল্পই আছে। ইডেন হসপিটাল রোড ও ইডেন হসপিটাল লেনের সংযোগস্থলে অবস্থিত চারচালা মন্দিরটি স্থাপত্য-বিচারে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত। এছাড়া ৭৮, টালিগঞ্জ রোডে রয়েছে

বাওয়ালির মণ্ডল পরিবারের চারচালা দোলমঞ্চ। এই দোলমঞ্চটির আনুমানিক নির্মাণকাল উনিশ শতকের তিনের দশক।

আটচালা মন্দির

আটচালা কুঁড়েঘরের রূপকল্প অনুসরণে নির্মিত আটচালা মন্দির আসলে চারচালারই একটি পরিবর্ধিত রূপ। নিচের চারটি বাঁকানো কার্নিসযুক্ত ঢালু চালের উপর অল্প উচ্চতার চারটি খাড়া দেওয়াল তুলে তার উপরে আরও চারটি ক্ষুদ্রায়তন চালা বসিয়ে আটচালা তার রূপ পরিগ্রহ করে।

কলকাতায় আটচালারীতিই যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, তা আমরা গোড়াতেই লিখেছি। সাম্প্রতিককালের এক গবেষকের ধারণা, কলকাতায় দালান-মন্দিরই সংখ্যায় সর্বাধিক।[১৪] কিন্তু ঠাকুরদালান ও দালানমন্দির পৃথক করে আদমসুমার করলে দেখা যাবে আটচালারীতি দালানমন্দিরকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে।

বিভিন্ন সময়ে নির্মিত হওয়ায় কলকাতার আটচালা মন্দিরগুলির সনাতন স্থাপত্যও নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। আকারেও অধিকাংশ আটচালা ক্ষুদ্রকায়। অবশ্য মন্দিরের আকার-আয়তন নির্ভর করে অর্থ বিনিয়োগের ক্ষমতার উপর। তাই মন্দিরের আকার ও অলংকরণ থেকে নির্মাতার অর্থকৌলীন্য পরিমাপ করা যায়।

আঠারো শতকে কলকাতায় যেসব বৃহদায়তন আটচালা নির্মিত হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন প্রভূত বিত্তশালী। এই ধরনের বিকৃতিহীন সনাতন রীতির একটি আটচালা মন্দির দেখা যায় ৫১, নন্দরাম সেন স্ট্রিটে। নন্দরাম সেন প্রতিষ্ঠিত এই বাঁকানো চাল ও ত্রি-খিলানযুক্ত মন্দিরটি 'রামেশ্বর' শিবের। এই মন্দিরে মোট পাঁচটি লিপিফলক আছে। মন্দিরের প্রবেশপথের মধ্যভাগে মর্মর ও কালো পাথরের যে দুটি লিপি রয়েছে, তাতে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল 'সন ১০৬১ তাং ৩০ চৈত্র', অর্থাৎ ১৬৫৫ খ্রীস্টাব্দ। পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর এ প্রসঙ্গে সন্দেহ প্রকাশ করে লিখেছিলেন যে তারিখটি ভ্রমাত্মক। স্থাপত্যবিচারে মন্দিরটি আঠারো শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে অনুমান করা যায়।

ভূকৈলাসের ঘোষাল পরিবার ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে মুখোমুখি দুটি ত্রি-খিলানযুক্ত বিশালাকার আটচালা মন্দির নির্মাণ করেন। পূর্বদিকে স্থাপিত 'রক্তকমলেশ্বর' মন্দিরের শিবলিঙ্গটি বিরাট, উচ্চতায় প্রায় ১·৮ মিটার। তাই সামঞ্জস্য বিধানের জন্য মন্দিরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের তুলনায় উচ্চতার দিকে বেশি নজর দিতে হয়েছে। বিপরীতে অবস্থিত 'কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর' শিবের মন্দিরটিকেও সৌন্দর্যের স্বার্থে প্রায় সম উচ্চতাসম্পন্ন করতে হয়েছে। এই দ্বিতীয় মন্দিরটিতে কোনো প্রতিষ্ঠাফলক না থাকলেও দুটি মন্দিরই একসময়ে নির্মিত বলে আমাদের বিশ্বাস।

আটচালা মন্দিরের প্রথাগত শৈলীর এই যে উচ্চাকার ব্যতিক্রম, তার আরেকটি উদাহরণ নিমতলার (১৬, মহম্মদ রমজান লেন) 'দুর্গেশ্বর' শিবমন্দির। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই পশ্চিমমুখী ত্রি-খিলান মন্দিরটিও আয়তনের তুলনায় অত্যধিক উচ্চতাসম্পন্ন।

ভূকৈলাসের মতো এক্ষেত্রেও উচ্চতার কারণ শিবলিঙ্গের বিরাট আকার। অন্যদিকে কুমোরটুলির বনমালী সরকারের প্রতিষ্ঠিত 'বাণেশ্বর' শিবের অলিন্দবিহীন ত্রি-খিলান মন্দিরটি (২/৫, বনমালী সরকার স্ট্রিট) বৃহদাকার হলেও তার আয়তন ও উচ্চতার মানানসই অনুপাত সনাতন মন্দির-শৈলীর অনুসারী।

আঠারো শতকের উল্লেখযোগ্য বৃহদাকার আটচালা মন্দিরের আর হদিস আমরা না পেলেও ড্যানিয়েলদ্বয়ের আঁকা 'View on the Chitpur Road' (১৭৯৭) ছবিতে ধরা রয়েছে একটি অবলুপ্ত বৃহদাকার আটচালার রূপ। এ চাড়া ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে একই শিল্পীদ্বয়ের অঙ্কিত 'Govinda Ram Mittee's Pagoda, Calcutta' ছবিতেও একটি আটচালা মন্দির দেখা যাচ্ছে। ছবিটির দৃষ্টিকোণ একটু যত্নের সঙ্গে বিচার করলে স্পষ্ট বোঝা যায়, ঐ আটচালার জায়গায় বর্তমানে বিরাজ করছে 'সিদ্ধেশ্বরী' কালীর দালান-মন্দির।

উনিশ শতকের শুরুতে কলকাতায় যে-সব প্রথাসিদ্ধ বৃহদাকার আটচালা মন্দির স্থাপিত হয়েছে, তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ কালীঘাটের 'দক্ষিণাকালী'-র মন্দির। ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৪ মিটার এবং প্রস্থে ৭.৭ মিটার। মন্দিরটির আয়তন ও নির্মাণকাল সম্পর্কে সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, '...আট কাঠা ভূমির উপর বর্ত্তমান মন্দির। ইহার তলস্থ ভূমি সমুদ্রতল হইতে অন্যূন ১০ হস্ত উচ্চ। ভূমি হইতে ইহার চূড়া অন্যূন ৬০ হস্ত উচ্চ। ইহার মধ্যের পরিসর প্রায় ৫০ হাত। ইহা নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ৭/৮ বৎসর লাগে এবং ৩০ হাজার টাকারও অধিক ব্যয় হয়। ১৮০৯ সালে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়।'[১৫]

১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে বাওয়ালীর উদয়নারায়ণ মণ্ডল রাধা-মদনমোহনের একটি বৃহৎ আটচালা মন্দির (৭৮, টালিগঞ্জ রোড) স্থাপন করেন। সনাতন শৈলীর ত্রি-খিলান ও বাঁকানো চালের এই মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৭.৪ মিটার, প্রস্থে ৭ মিটার। মন্দিরের প্রবেশ-পথের দু'পাশে দুটি শিলালিপিতে ভিন্ন তারিখ ব্যক্ত হয়েছে। সম্ভবত এর একটি ভিত্তিস্থাপন ও অন্যটি দ্বারোদ্ঘাটনের তারিখ। অদূরে অবস্থিত (৮৬, টালিগঞ্জ রোড) প্রখ্যাত যাত্রাভিনেতা মথুর শা প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মী-নারায়ণ ও শ্রীধর জীউর মন্দিরটিও (দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৬.২ মিটার) একটি প্রথানুগ আটচালা।[১৬]

বৃহদায়তন ছাড়াও কলকাতায় বহু মাঝারি ও ক্ষুদ্রাকার আটচালা মন্দির রয়েছে। ক্ষুদ্রাকার আটচালাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একদুয়ারি, কোনো কোনোটি আবার উঁচু পোস্তার উপর নির্মিত। কলকাতার অজস্র মাঝারি ও ক্ষুদ্রাকার আটচালার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্দিরের বিবরণ 'সারণি-১' ও 'সারণি-২'-এর মধ্যে সংকলিত হল।

একক আটচালা মন্দির ছাড়াও কলকাতার মন্দির-নির্মাতারা জোড়া আটচালা ও আটচালাগুচ্ছও স্থাপন করেছেন। ক্ষুদ্রাকার আটচালার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত উঁচু পোস্তা জোড়া আটচালার ক্ষেত্রেও অনেকাংশে ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আবার ভিন্নরীতির প্রধান মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্ষুদ্রাকার জোড়া আটচালা। ২৫, বেথুন রো-তে অবস্থিত নিস্তারিণী কালীর নবরত্নের সঙ্গে যুক্ত জোড়া আটচালা বা ২/২এ বলরাম ঘোষ

স্ট্রিটের ভবতারিণী কালীর নবরত্নের সংলগ্ন জোড়া আটচালা এই ধরনের দৃষ্টান্ত। অন্যান্য কয়েকটি জোড়া আটচালা মন্দিরের বিবরণ সংকলিত হল 'সারণি-৩'-এর মধ্যে।

জোড়া আটচালার পর আসা যাক আটচালাগুচ্ছের প্রসঙ্গে। আহিরিটোলার ভগবান ব্যানার্জি লেনে আছে তিনটি আটচালার একটি সমষ্টি। অন্যদিকে বাগবাজার স্ট্রিট ও রবীন্দ্র সরণির সংযোগস্থলে রয়েছে অন্নপূর্ণা মন্দির সংলগ্ন চারটি পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দির। টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ার কাছে ঘোষ পরিবারের পাঁচটি আটচালা শিবমন্দিরের সমষ্টি জীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। এই সমষ্টির সামান্য উত্তর-পশ্চিমে একটি একক আটচালা শিবমন্দিরও রয়েছে। এই গুচ্ছটির অদূরে, আদিগঙ্গার তীরে সাবর্ণ চৌধুরীদের ছ'টি আটচালা মন্দির দাঁড়িয়ে আছে। এই মন্দিরগুলির বিপরীতে, আদিগঙ্গার অপর তীরে রয়েছে দ্বাদশ আটচালা শিবমন্দির (আনুমানিক উনিশ শতকের প্রথমদিক)। টালিগঞ্জ অঞ্চলের অন্য দ্বাদশ শিবালয়ের অবস্থান ৭৮, টালিগঞ্জ রোডে, প্রতিষ্ঠাতা উদয়নারায়ণ মণ্ডল। মণ্ডল-পরিবারের আর একটি 'দ্বাদশ শিবমন্দির' রয়েছে ৯৩, টালিগঞ্জ রোডে। এই দ্বাদশ মন্দির দুটির চরিত্র কিঞ্চিৎ আলাদা। দ্বিতীয় সমষ্টির দশটি মন্দির আটচালা, বাকি দুটি পঞ্চরত্ন। প্রথম সমষ্টির একটি পঞ্চরত্ন, বাদ বাকি আটচালা।

বারোচালা মন্দির

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত মেদিনীপুরে, বারোচালা কুটিরের অনুকরণে নির্মিত হয়েছে বারোচালা মন্দির। ৯৮/এ, বেলগাছিয়া রোডের ওলাইচণ্ডী মন্দিরের আকৃতি অনেকটা সেইরকম হওয়ায় ম্যাককাচ্চন মন্দিরটিকে 'বারোচালা' শ্রেণীভুক্ত করেছেন।[১৭] মন্দিরটি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আটচালাই। পাশে সেতু নির্মিত হওয়ায় মন্দিরটির উচ্চতা বাড়িয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মানসে আটচালার উপর কংক্রিটের চারচালা যোগ করা হয়েছে। এই সাম্প্রতিক রূপান্তরই ম্যাককাচ্চনকে বিভ্রান্ত করেছে। কোনো কোনো গবেষক আবার মন্দিরটিকে 'চারচালা' বলেছেন।[১৮] এ বক্তব্য যে একেবারেই ভুল, তা বলাই বাহুল্য।

রত্ন রীতির কথা

'রত্ন' শব্দটি 'চূড়া'-র সমার্থক। রানী রাসমণি তাঁর দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দলিলে নিজের ন'-চূড়া মন্দিরটিকে অভিহিত করেছেন 'নবরত্ন' বলে।[১৯] পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মন্দির-লিপিতে[২০], এমনকি কলকাতার একটি শিলালিপিতেও 'নবরত্ন' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়:[২১]

এবার আসা যাক 'রত্ন' মন্দিরের গঠনকৌশল-প্রসঙ্গে। ঢালু ছাদ ও বাঁকানো কার্নিসযুক্ত মন্দিরশীর্ষের উপর চূড়া বসিয়ে এই রীতির মন্দির নির্মিত হয়। যদি ছাদের কেন্দ্রস্থলে একটিমাত্র চূড়া থাকে, তাহলে মন্দিরটি হয় 'একরত্ন'। তার সঙ্গে চারকোণে

চারটি বাড়তি চূড়া যোগ করলে মন্দিরটি হয়ে যায় 'পঞ্চরত্ন'। মাঝের চূড়ার জায়গায় একটি প্রকোষ্ঠ তৈরি করে তার উপরে পাঁচটি চূড়া বসালে মন্দিরটি পরিণত হয় 'নবরত্নে'। এইভাবে মন্দিরতলের সংখ্যা বাড়িয়ে এবং প্রতিটি তলের কোণে কোণে চূড়া বসালে ক্রমান্বয়ে তৈরি হয় ত্রয়োদশ-, সপ্তদশ-, একবিংশ- ও পঞ্চবিংশ রত্ন।

'রত্ন' রীতির মধ্যে কেবল 'পঞ্চরত্ন' ও 'নবরত্ন' মন্দির কলকাতায় আছে, অন্য রীতিগুলির নিদর্শন এখানে নেই। আমরা তাই শুধু এই দুটি রীতির প্রসঙ্গই আলোচনায় টানব।

পঞ্চরত্ন মন্দির

'পঞ্চরত্ন' রীতির যে শ্রেষ্ঠ নিদর্শনটি একদা কলকাতাকে অলংকৃত করেছিল, সেটি বর্তমানে নিশ্চিহ্ন। সেই মন্দিরটির কথা আমরা নবরত্ন সম্পর্কিত আলোচনার সময়ে বিশদভাবে জানার চেষ্টা করব। কলকাতায় যে-সব পঞ্চরত্ন মন্দির আজও রয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলিই রয়েছে অন্যরীতির মন্দিরগুচ্ছের সঙ্গে। ১৮/১ কেনডারডাইন লেনে ত্রিলোকরাম পাকড়াশীর জোড়া পঞ্চরত্ন যুক্ত হয়েছে একটি নবরত্নের সঙ্গে। ৭৮, টালিগঞ্জ রোডের পূর্বোল্লিখিত মন্দিরসমষ্টিতে একাদশটি আটচালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি পঞ্চরত্ন। একইভাবে ৯৩, টালিগঞ্জ রোডে দশটি আটচালার সঙ্গে রয়েছে দুটি পঞ্চরত্ন। একক পঞ্চরত্নও কলকাতায় আছে। কলকাতার পঞ্চরত্ন মন্দিরগুলির বিবরণের সারাংশ গৃহীত হল 'সারণি-৪'-এ।

নবরত্ন মন্দির

'রত্ন' রীতির মধ্যে কলকাতায় সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল 'নবরত্ন' শৈলী। বিরাট স্থাপত্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাতার বৈভব-প্রদর্শনের ইচ্ছাই বোধহয় এই জনপ্রিয়তার কারণ। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও ছিল। আঠারো শতকের কলকাতায় দারুণ জাঁকালো এক প্রকাণ্ড পঞ্চরত্ন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ব্ল্যাক জমিদার' গোবিন্দরাম মিত্র। তাঁর সেই অভ্রভেদী কীর্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও তার প্রতিকৃতি আজও বেঁচে রয়েছে বিদেশী চিত্রকরদের আঁকা ছবির মধ্যে। সেই ছবিগুলি খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, গোবিন্দরামের বিখ্যাত 'প্যাগোডা' ছিল 'পঞ্চরত্ন', প্রচলিত ধারণা মতো 'নবরত্ন' নয়।

১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে হুগলী নদীর পূর্বতীরকে বর্ণনা করে একটি প্রবন্ধ লেখেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। সেই প্রবন্ধে মার্শম্যান কিন্তু গোবিন্দরামের মন্দিরটিকে 'পঞ্চরত্ন' বলেই অভিহিত করেছিলেন, '...there is still to be seen the remains of a large temple, the largest in Calcutta, which was once crowned with a lofty cupola. For many years it was the most conspicuons object in the city,... It was visible from a distance of many miles ;... About twenty five years ago the cupola suddenly came down with a crash, but without injury to life, and it has never since been rebuilt.

That temple, usually called the "five jewels", was erected by the opulent and powerful Govinderam Mitter,…'।[২২] ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে গোবিন্দরামের জীবনী-রচনাকালে তাঁর জনৈক বংশধর এই উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু মার্শম্যানের উপর খোদকারি করে তিনি পাদটীকায় লিখেছিলেন, মন্দিরটির রূপ 'five jewels' নয়, 'nine jewels' হবে।[২৩] মার্শম্যান (১৭৯৪-১৮৭৭) যখন প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন, তখন তাঁর বয়স একান্ন। পাঁচ বছর বয়স থেকে যিনি শ্রীরামপুরে আছেন, তিনি যে মন্দিরটির অটুট অবস্থাও দেখেছেন, তাঁর সাক্ষ্যের যে আলাদা গুরুত্ব আছে, তা জীবনীকার বোঝেননি। সেইখানেই ভুলের সূত্রপাত। আসলে মার্শম্যান লিখেছিলেন ভেঙে পড়া মন্দিরের কথা, আর জীবনীকার জোর দিয়েছিলেন তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অক্ষত মন্দিরের উপর। এইজন্যই ভুল বোঝাবুঝি ঘটেছিল।

কয়েক বছর পরে কালেকটোরেট-এর ইতিহাস প্রণয়নকালে আর. সি. স্টার্নডেল গোবিন্দরামের জীবনীর এ তথ্যটি গ্রহণ করেছিলেন।[২৪] তারপর তাঁর লেখা থেকে 'নবরত্ন-কাহিনী' ছড়িয়ে পড়ে ঐতিহাসিকদের রচনাসমূহে।[২৫]

সে সময়ের বিদেশী চিত্রকরদের ছবি থেকে এখন দেখা যাক গোবিন্দরামের প্যাগোডার সঠিক শৈলী কি ছিল। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে আঁকা উইলিয়াম হিকির 'A view of the Black Pagoda on the Chitpore Road' ছবিতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে একগুচ্ছ বিভিন্ন রীতির মন্দিরের মধ্যে সর্বোচ্চ মন্দিরটি আদৌ 'নবরত্ন' নয়. সেটি একটি নির্ভেজাল পঞ্চরত্ন। তবে মন্দিরটির স্থাপত্য একটু অদ্ভুত। পঞ্চরত্নটির সামনের অংশে সংযোজিত হয়েছে একটি দালান, যার তিনটি খিলানের মাঝখানে স্থাপিত হয়েছে একটি ছোট্ট পেডিমেণ্ট। পঞ্চরত্ন ও দালানটির সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে তিনটি 'ফিনিয়্যাল'-যুক্ত একটি দোচালা। ছবি দেখে মনে হয় দোচালা ও পঞ্চরত্নের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা ভরাট করার জন্যই দালানটি তৈরি হয়েছে। এই প্রকাণ্ড মন্দিরসৌধের সংলগ্ন প্রায় অর্ধেক উচ্চতার আর একটি মন্দির দেখা যাচ্ছে—সেটি সত্যিই নবরত্ন। আসলে প্রকাণ্ড পঞ্চরত্নটি বিলুপ্ত হওয়ার পর নবরত্নটি খ্যাতিলাভ করেছে, পঞ্চরত্নের প্রাপ্য স্বীকৃতিও আরোপিত হয়েছে তার উপরে। আর একটা কথা। এই মন্দিরগুচ্ছের সম্মুখবর্তী প্রশস্ত রাস্তার অন্য পারের একটি আটচালা মন্দিরও হিকির ছবিটিতে স্থান পেয়েছে। সে মন্দিরটির কথাই আমরা আটচালা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি।

অকটারলোনি মনুমেণ্টের চেয়েও উঁচু, গোবিন্দরামের সেই বিখ্যাত প্যাগোডার আর একটি রূপ দেখা যাচ্ছে ন' বছর বাদে আঁকা অন্য একটি ছবিতে। সে ছবিটি হল ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে ড্যানিয়েলদ্বয়ের আঁকা 'Govinda Ram Mittee's Pagoda, Calcutta' নামক এনগ্রেভিং। হিকির দৃষ্টিকোণ ছিল উত্তরমুখী কিন্তু ড্যানিয়েলদের দৃষ্টিকোণ পশ্চিমমুখী। ভিন্ন এই দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা যাচ্ছে মন্দিরটি পঞ্চরত্ন, যার উত্তর পশ্চিম কোণের চূড়াটি ভেঙে পড়েছে। হিকির ছবির সঙ্গে সুসমঞ্জসভাবে এ ছবিতেও দৃশ্যমান রয়েছে ত্রি-খিলান ও পেডিমেণ্টযুক্ত দালান, তার সামান্য উত্তরে স্থাপিত নবরত্ন এবং নবরত্নের অদূরে অবস্থিত আটচালা। ড্যানিয়েলদ্বয়ের এই ছবি থেকে একটি

বাড়তি স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা যাচ্ছে। হিকির ছবিতে পঞ্চরত্নটির শুধু ডানপাশেই একটি দোচালা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এই ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে পঞ্চরত্নের দুই পাশেই একটি করে দোচালা ছিল। এই নতুন তথ্যটি বাংলার তুলনামূলক মন্দির-নির্মিতির ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান সংযোজন।

জোড়বাংলা মন্দিরের দুটি চালার মধ্যবর্তী অংশে একটি চারচালা, আটচালা বা নবরত্ন স্থাপত্য যোগ করে সুউচ্চ মন্দির সৃষ্টির চেষ্টা গ্রামবাংলার এক পরিচিত রেওয়াজ। বিষ্ণুপুরের (জেলা: বাঁকুড়া) কৃষ্ণরায় ও মহাপ্রভুর মন্দিরে এভাবেই জোড়বাংলার মধ্যবর্তী অংশে নির্মিত হয়েছে যথাক্রমে চারচালা ও আটচালা। অন্যদিকে হুগলী জেলার বালী-দেওয়ানগঞ্জের রাউত পরিবারে শিবদুর্গার মন্দিরে জোড়বাংলার মধ্যস্থলে নির্মিত হয়েছে এক নবরত্ন। বাংলার মন্দিররীতিতে উচ্চতাপ্রয়োগের যে প্রথাসিদ্ধ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হতো, সুউচ্চ মন্দির নির্মাণের তাগিদে সেই শৈলীই প্রযুক্ত হয়েছিল গোবিন্দ-রামের 'প্যাগোডার' ক্ষেত্রে।

গোবিন্দরামের মন্দিরটি যে আদতে 'পঞ্চরত্ন' ছিল, সেই প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে দু'জন গবেষক উত্থাপন করেছিলেন। ডেভিড ম্যাককাচ্চন লিখেছিলেন, 'From Hickey's print it even appears that there may never have been four lower towers, so that the temple was not a nabaratna, after all, inspite of its height.'[১৬] অন্য একটি নিবন্ধে শ্রীমতী লিনি বিশ্বাসও মন্দিরটির সম্পর্কে যথার্থ মন্তব্য করেছেন, 'Both pictures show the tallest part of the temple was a modification of Jorbangla style, i.e., a central "pancharatna" or five pinnacled temple, with two small "dochala" style temples on both sides of it and a separate navaratna or nine pinnacled temple in front and to the right of the extended entrance of the central temple.'[১৭] পঞ্চরত্ন মন্দিরটিকে ভুল করে 'নবরত্ন' বললেও গোবিন্দরামের জীবনীকার কিন্তু জোড়-বাংলা-প্রসঙ্গটি নির্ভুলভাবেই উল্লেখ করেছিলেন, 'There were 4 *Mohadebs* placed in the four corners of the temple, and other tutelary deities …in a portion adjoining to it, which was built after the fashion of a double thatch or Bangalow, whence the temple came to be called the *Jorebangala* Mundir. This appendage of *Jorebanglah* added a peculiarity and beauty to the main Temple.'[১৮]

এই সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে বোঝা যাচ্ছে যে গোবিন্দরাম যে সুউচ্চ ও বিখ্যাত 'প্যাগোডা' স্থাপন করেছিলেন, সেটি ছিল জোড়বাংলার উপর স্থাপিত একটি ত্রি-খিলান দালানযুক্ত পঞ্চরত্ন। প্রতিষ্ঠার মাত্র সাত বছর পরেই ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দে সে মন্দির ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিকম্পে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এভাবে বিধ্বস্ত হলেও মন্দিরটি ধূলিসাৎ হয়নি, কারণ তাহলে ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে হিকি বা ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে ড্যানিয়েলরা সে মন্দিরের ছবি আঁকতে পারতেন না। ছবি দুটি আঁকা হয়েছে সেই বিধ্বংসী ঝড়ের

প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর পরে। আমাদের অনুমান, এই সময়ের মধ্যেই নবরত্নটি নির্মিত হয়।

জীবনীকারের মতে গোবিন্দরাম ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে মারা যান। তাহলে যখন তাঁর পঞ্চরত্ন বিধ্বস্ত হয়, তখন তিনি সুস্থ শরীরে জীবিত। তাহলে তিনি নিজের মন্দিরটিকে সারিয়ে তুললেন না কেন? কেন হিকি-ড্যানিয়েলের ছবিতে মন্দিরটির বিধ্বস্ত রূপ ফুটে উঠেছে? ছবিতে মূল পঞ্চরত্নের দুরবস্থা এবং নবরত্নের সংযোজন দেখে আমাদের একটি কথাই মনে হয়েছে। পঞ্চরত্নটির আঘাত ছিল চিকিৎসার ঊর্ধ্বে। তাই গোবিন্দরাম পাশে একটি ছোট নবরত্ন তৈরি করে বিগ্রহগুলিকে সেখানে সরিয়ে নেন, শূন্যগর্ভ পঞ্চরত্নটি অনাদৃত ও অসংস্কৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। অবশেষে মার্শম্যানের কথা-মতো ১৮২০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ সেটি পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। তার কাঠামোর কিছু ধ্বংসাবশেষ বোধহয় ১৯০৯-১০ খ্রীস্টাব্দেও টিকে ছিল—তাই স্মার্ট তাঁর জরিপ-মানচিত্রে নবরত্ন-সহ পুরো চত্বরটিকে 'ruins of Black Pagoda' বলে দেখিয়েছেন।

যে নবরত্নটি আজও দাঁড়িয়ে আছে, সেটির জন্ম যে আঠারো শতকে, তার প্রমাণ হিকি-ড্যানিয়েলের ছবি। তবে বারংবার সংস্কারের ফলে তার চেহারা অনেকটাই বদলে গেছে। একটু নজর করে দেখলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ইটের আকার ও প্রলেপের চরিত্রের অন্তহীন বৈচিত্র্য। তবে শ্রীমতী লিনি বিশ্বাসের একটি কথা কোনো মতেই মেনে নেওয়া যায় না। তিনি লিখেছেন, ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের পরে নবরত্নটি পুনর্নির্মিত হয়।[২৯] নবরত্নটির কয়েকটি চূড়ার পলস্তরা খসে গিয়েছে। সেই অনাবৃত অংশগুলির ইট ও গাঁথুনিতে প্রাচীনত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। বিশ শতকে যে মন্দির নতুন করে গড়া হয়েছে, তার শীর্ষদেশ কি করে অপরিবর্তিত রূপে প্রাচীন থাকবে? আমাদের মনে হয় শ্রীমতী বিশ্বাস-নির্দেশিত সময়ে মন্দিরটি ভালভাবে সংস্কৃত হয়েছিল।

আঠারো শতকে নির্মিত কলকাতার অপর উল্লেখযোগ্য নবরত্নটির অবস্থিতি কেনডাব-ডাইন লেনে। ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে ত্রিলোকরাম পাকড়াশী প্রতিষ্ঠিত এই একদুয়ারী মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে দুটি পঞ্চরত্নের মাঝখানে।

উনিশ শতকের প্রথমদিকের কোনো প্রথাসিদ্ধ নবরত্ন কলকাতায় দেখা যাচ্ছে না। শোভাবাজারের দেব পরিবারের মন্দিরটিতে নবরত্নের আদল থাকলেও সেটি পুরোপুরি দালান-নির্ভর।

এই সময়ের নবরত্ন-শৈলীর একটি অনবদ্য চিত্ররূপ ধরা আছে স্যর চার্লস ড'য়লি কর্তৃক ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে আঁকা 'Hindoo Mut in the Chitpore Bazaar-এর মধ্যে। এই ছবির নবরত্নের সঙ্গে ত্রিলোকরামের একদুয়ারী নবরত্নের ছিল লক্ষণীয় সাদৃশ্য। এই মন্দিরটির পাশে একটি চূড়াবিহীন মন্দির রয়েছে. আকৃতি দেখে মনে হচ্ছে সেটিও অটুট অবস্থায় নবরত্নই ছিল। মন্দিরগুচ্ছটির অদূরে একটি দোচালা স্থাপত্য (প্রবেশপথ?) ও একটি বৃহদাকার আটচালা মন্দির দেখা যাচ্ছে। আমাদের ধারণা, এই মন্দিরগুলি বর্তমানে অবলুপ্ত। ছবিটির স্থান 'চিৎপুর বাজার' বলে উল্লিখিত হওয়ায় একজন গবেষক এটিকে সর্বমঙ্গলার মন্দির[৩০] ও অন্যজন চিত্তেশ্বরীর মন্দির[৩১] বলে অভিহিত করেছেন।

কিন্তু সুদৃঢ় যুক্তির অভাববশত এই সিদ্ধান্ত দুটির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে।

ড'য়লির আঁকা 'Hindoo Temple near the Strand Road' ছবিতে (১৮৪৮) দেখা যাচ্ছে প্রথাগত শৈলীর আর একটি নবরত্ন। নবরত্ন শৈলীর একটি বিশেষ আঞ্চলিক ঘরানা যেমন কেনডারডাইন লেন ও চিৎপুর বাজারের মন্দির দুটিতে প্রকাশ পেয়েছে, স্ট্র্যাণ্ড রোডের নিকটবর্তী এই মন্দিরে তেমনি প্রকটিত হয়েছে একটি অন্য ধরনের ঘরানা। এখন প্রশ্ন, এ মন্দিরটির স্থাপয়িতা কে, অবস্থিতিই বা কোথায়? আমাদের ধারণা, এটিই শোভারাম বসাক প্রতিষ্ঠিত নবার লেনের আদি জগন্নাথ মন্দির, যেটি বিলুপ্ত হওয়ার পর বর্তমান প্রস্তরনির্মিত নাগর দেউল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে এই শনাক্তকরণ একটি নিছক অনুমান, প্রশ্নাতীত সিদ্ধান্ত নয়।

কলকাতায় বিশালায়তন নবরত্ন-নির্মাণের ধারাবাহিকতা যে উনিশ শতকের প্রথম দিকেও বজায় ছিল, তার দৃষ্টান্ত রামনাথ মণ্ডল প্রতিষ্ঠিত মণ্ডল টেম্পল্ লেনের রাধাকান্ত মন্দির। ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে মন্দিরটির নির্মাণকার্য আরব্ধ হলেও তা সম্পূর্ণ হয় ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে। দেবস্থাপনা হয় আরও দু'বছর পরে, ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে। এই মণ্ডল পরিবারেরই প্যারীলাল-মণিমোহন প্রতিষ্ঠিত গোপালজীউর নবরত্নটি (১৮৭৬) কিন্তু উচ্চতায় রামনাথের মন্দিরের তুলনায় খাটো। এই মন্দিরের অনতিপরে নির্মিত বরানগরের কৃপাময়ী কালী (১৮৫১) ও ব্রহ্মময়ী কালীর (১৮৫৩) মন্দির দুটি গঠনরীতিতে নবরত্ন হলেও তাদের স্থাপত্য ভিন্নমুখী। চিরাচরিত বাঁকানো চালের শৈলী লঙ্ঘন করে দোতলা দালানমন্দিরে পীঢ়া রীতির চূড়া যোগ করে এই নবরত্ন দুটি তৈরি করা হয়েছে।

বরানগরের দুটি মন্দিরে যখন বাংলার প্রথাগত মন্দিরশৈলী বর্জিত হচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই অদূরে দক্ষিণেশ্বরে নির্মাণ চলেছে এক প্রথাসিদ্ধ সৌন্দর্যময় নবরত্নের। বলা বাহুল্য, সে নবরত্নের স্থাপনকর্ত্রী রানী রাসমণি।[৩২] এই মন্দির-নির্মাণে সম্ভবত অনুকৃত হয়েছিল মণ্ডল টেম্পল্ লেনের নবরত্নের গঠনবৈশিষ্ট্য। তাই দুটি মন্দিরের আকৃতি, উচ্চতা ও স্থাপত্যের মধ্যে সাদৃশ্যের ছাপ সুস্পষ্ট। স্বজাতিভুক্ত (আত্মীয়?) রামনাথ মণ্ডলের মন্দিরটিই হয়তো পঞ্চাশ বছর পরে রাসমণিকে অনুরূপ আকারের মন্দির-নির্মাণের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।

১৮৫০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ও ঘাট নির্মাণের ঠিকাদারি দেওয়া হয় ম্যাকিনটশ বার্ন কোম্পানিকে। নির্মাণকার্য শেষ হওয়ার পর ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ৩১মে প্রতিষ্ঠাকর্ম জাঁকজমক সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। এই মন্দিরগুচ্ছের মধ্যে বিভিন্ন রীতির সহাবস্থান লক্ষণীয়। মূল মন্দিরটি নবরত্ন, দ্বাদশ শিবমন্দির আটচালা রীতির এবং রাধাকৃষ্ণের মন্দির একতলা দালানশৈলীর। নাটমন্দির ও ঘাটের চাঁদনীর ছাদও সমতল।

রানী রাসমণির মন্দির প্রতিষ্ঠার ঠিক কুড়ি বছর পরে (১৮৭৫) তাঁর কন্যা জগদম্বা বারাকপুরের তালপুকুরে 'অন্নপূর্ণা'-র নবরত্ন মন্দির স্থাপন করেন। যদিও এ মন্দিরটি কলকাতার পৌরাঞ্চল, এমনকি ডাক অঞ্চলেরও বাইরে, তবু কলকাতার নবরত্ন-নির্মাণের

ধারাবাহিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে আমরা মন্দিরটির কথা উল্লেখ করলাম। তাছাড়া নবরত্ন-নির্মাণের প্রতি পারিবারিক প্রবণতার একটি নিদর্শন হিসাবেও মন্দিরটি গুরুত্বপূর্ণ। রানী রাসমণির পরিবারের নির্মিত তৃতীয় ও শেষ নবরত্নটি উদ্বোধিত হয় ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১৮ জ্যৈষ্ঠ। আগরপাড়ায় অবস্থিত এ মন্দিরটি স্থাপন করেন রাসমণির দৌহিত্র গোপাল-কৃষ্ণ দাসের স্ত্রী গিরিবালা।

উনিশ শতকে নির্মিত কলকাতার দুটি নবরত্ন মন্দিরের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে জোড়া আটচালা শিবমন্দির। এর মধ্যে প্রথমটির অবস্থান বেথুন রো-তে, দ্বিতীয়টির অবস্থান বলরাম ঘোষ স্ট্রিটে।

কলকাতার নবরত্ন-নির্মিতির ধারাবাহিকতায় বিশ শতকেও ছেদ পড়েনি। বাবুরাম ঘোষ লেনে স্থাপিত হয়েছে উমাসুন্দরী কালীর প্রথানুগ নবরত্ন (১৯২২)। কেওড়াতলা শ্মশানে অবস্থিত একটি সমাধিমন্দিরেও প্রযুক্ত হয়েছে নবরত্ন মন্দিরশৈলী। অঙ্গসজ্জায় লোহা ও রঙিন কাচের ব্যবহার সত্ত্বেও বাঁকানো কার্নিস ও প্রথাগত চূড়ার সংস্থাপনের ফলে নবরত্নের অনুকরণ এক্ষেত্রে সার্থক হয়েছে। এটিই কলকাতার শেষ উল্লেখযোগ্য নবরত্ন।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত বাগবাজারের গৌড়ীয় মঠটি আকৃতিতে নবরত্ন হলেও, প্রথাগত স্থাপত্যশৈলী থেকে বেশ বিচ্যুত। প্রশস্ত দালানের উপর নিবদ্ধ নিরেট চূড়া-গুলির গঠনরীতির সঙ্গে সনাতনশৈলীর কোনো সাদৃশ্য নেই। শতাধিক ফিট উচ্চ এ মন্দিরটি বহু ব্যয়ে নির্মিত হলেও ফলত এটি বাংলার ঐতিহ্যময় মন্দিরশৈলী থেকে ভ্রষ্ট এক আধুনিক পাঁচমিশেলী সৌধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দশ বছর পরে (১৯৪০) অদূরে নির্মিত 'নববৃন্দাবন' মন্দিরটিও এই অপজাত শৈলীর। বেশ বোঝা যায়, বিশ শতকে নবরত্ন নির্মাণের ধারাবাহিকতা টিকে থাকলেও তার মধ্যে প্রথাসিদ্ধ মন্দিরশৈলীর পুনরুজ্জীবনের স্পৃহা ছিল না, ছিল শুধু বিশাল মন্দিরসৌধের মাধ্যমে বিত্তপ্রতাপ প্রদর্শনের মোহ। তাই সনাতন নবরত্ন-স্থাপত্যের ধারা শেষ পর্যন্ত কলকাতা থেকে মুছে যায়।

নাগর শিখরশৈলী

শিখরশৈলীর প্রথমেই আলোচ্য নাগররীতির প্রসঙ্গ। 'রত্ন'রীতির ক্ষেত্রে যেমন 'চূড়া'-র সমার্থক শব্দ 'রত্ন', তেমনি নাগররীতির বেলায় চূড়া বা শিখরের মূল অংশটি 'গণ্ডি' নামে অভিহিত হয়। রথপগযুক্ত এই গণ্ডি অংশের উপরে থাকে একটি চ্যাপ্টা আমলকী-সদৃশ 'আমলক'। এই মূল শিখরটির গায়ে বহু ক্ষুদ্রাকৃতি শিখর যুক্ত হয়—সেগুলি 'অঙ্গশিখর' নামে পরিচিত। রথপগ-গণ্ডি-আমলক-অঙ্গশিখর শোভিত ধ্রুপদী নাগরশৈলীর দুটি আঞ্চলিক প্রকারভেদ আছে। দীর্ঘ গণ্ডি, ক্ষুদ্র আমলক এবং অঙ্গশিখরের অবিচ্ছেদ্য উপস্থিতি দেখা যায় উত্তর ভারতের শিখরমন্দিরগুলিতে। এই শ্রেণীর নাম 'উত্তর ভারতীয় নাগরশৈলী'। অন্যদিকে উড়িষ্যা এবং সন্নিহিত অঞ্চলে দেখা যায় 'ওড়িশী নাগরশৈলীর মন্দির। এ মন্দিরগুলির গণ্ডি হ্রস্ব, আমলক বৃহদাকার, অঙ্গশিখর কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। ওড়িশী নাগররীতির আর একটি বিশেষত্ব

মন্দিরের আয়তন বৃদ্ধি করে। সেটি হল মূল মন্দিরের অগ্রভাগে জগমোহন, ভোগমণ্ডপ ও নাটমন্দির নামক তিনটি অংশের সংযোজন।

উত্তর ভারতীয় নাগরশৈলী

উত্তর ভারতীয় নাগরশৈলীর অনুকরণে কলকাতায় বহু মন্দির নির্মিত হয়েছে। এই রীতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক উত্তর ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। তাই উত্তর ভারতীয় নাগরশৈলীর মন্দিরগুলি বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছে বড়বাজার অঞ্চলে। কাশীনাথ ট্যাণ্ডনের নোঙ্গরেশ্বর শিবমন্দির, নবাব লেনে অবস্থিত নবরথপগযুক্ত চুনার পাথরের জগন্নাথ মন্দির, রাজা কাটরার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ট্যাণ্ডন পরিবারের জগন্নাথ মন্দির, 'মরকত কুঞ্জ' (৫৬/এ, বি. টি. রোড) প্রাঙ্গণের স্তম্ভ-অলিন্দ-অঙ্গশিখর যুক্ত ত্রিরথ শিবমন্দির, ১০, হাঁসপুকুরিয়া লেনের হনুমান মন্দির, ৪৯/এ শিবু ঠাকুর লেনের শিব মন্দির ও ৪৮/এ শাঁখারিটোলা লেনের মন্দির এই শৈলীর উল্লেখ্য উদাহরণ।

কলকাতার কয়েকটি জৈন মন্দিরও এই শৈলীর ফসল। বদ্রিদাস মুকিমের শীতলনাথ-মন্দির (১৮৬৭), সুখলাল জহুরির মহাবীর-মন্দির (১৮৮০) ও কাপুরচাঁদ জহুরির চন্দ্রপ্রভু-মন্দির (১৮৯৫)—গৌরীবেড়ের এ মন্দির তিনটি স্থাপত্যবিচারে সমগোত্রীয়। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় নির্মিত বেলগাছিয়ার পার্শ্বনাথ উপবনের মন্দিরটি কিন্তু কিছুটা ভিন্ন রীতির। দোতলা দালান নির্মাণ করে এখানে স্থাপিত হয়েছে অঙ্গশিখরযুক্ত সপ্তরথ শিখর। চারদিকের বারান্দায় সংস্থাপন করা হয়েছে মূল শিখরের দশটি ক্ষুদ্রাকার পঞ্চরথ প্রতিরূপ। চুনার পাথরে নির্মিত এ মন্দিরটি আকারে বিরাট।

ওড়িশী নাগর

ওড়িশী নাগরশৈলীর যে ক'টি নিদর্শন কলকাতায় আছে, তার সব ক'টিই এই শতকে নির্মিত এবং অপজাত স্থাপত্যের উদাহরণ। নিমতলা ঘাট স্ট্রিটে চৌধুরী পরিবারের 'বৃন্দাবনবিহারী'-র পঞ্চরথ শিখর, বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে রাস্তার মাঝখানে অবস্থিত শিবমন্দির এবং প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট-কলেজ স্ট্রিট সংযোগস্থলে অবস্থিত ব্রজেশ্বর শিবমন্দির তেমনি কয়েকটি দৃষ্টান্ত।

ব্রজেশ্বর শিবমন্দিরটি আগে আটচালা ছিল। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত সেই মূল মন্দিরটি জীর্ণ হয়ে পড়লে ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে এই ভিন্ন রীতির মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়।[৩৩] সুদৃশ্য করার জন্য মন্দিরটির চার কোণে চারটি বন্ধনী যোগ করে উপরে বসানো হয়েছে বৃহৎ আমলক।

পীঢ়া দেউল

পীঢ়া দেউলের বিশেষত্ব হল খাঁজকাটা চূড়া। পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরের জগমোহনটি পীঢ়া রীতির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কলকাতায় একটিমাত্র পীঢ়া দেউল আমরা খুঁজে পেয়েছি। সেটি হল ৮১, শ্যামবাজার স্ট্রিটে দাস-পরিবারের পুবমুখী বিশ্বনাথ

শিবের মন্দির। পলস্তরা ও রঙের প্রলেপে মন্দিরটির প্রাচীনত্ব অনেকাংশে ঢাকা পড়লেও স্থাপত্যবিচারে এটির নির্মাণকাল উনিশ শতকের প্রথমার্ধ।

কলকাতার পীঢ়া-ধর্মী একটি মন্দির ফিরিঙ্গি কালীর মতোই অবাস্তব প্রাচীনত্বের দাবি করে। স্থাপত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হয় মন্দিরটি বড়জোর একশো বছর আগে নির্মিত। এ মন্দিরটি হল গিরিশ পার্কের উত্তরে বিবেকানন্দ রোডে অবস্থিত পুঁটে কালীর মন্দির।[৩৪]

বঙ্গীয় শিখরশৈলী

বাংলার প্রান্তিক অঞ্চলগুলি দিয়ে প্রবেশ করেছিল উত্তর ভারতীয় ও ওড়িশী শিখর-শৈলী। বহিরাগত সে শিল্পরীতিগুলি পরিপাক করে এবং তার সঙ্গে দেশজ শৈলীর মিশেল দিয়ে বাংলার মন্দিরনির্মাতা মিস্ত্রিরা সৃষ্টি করেছিলেন নতুন কিছু প্রকরণ। তাঁদের হাতে পড়ে ওড়িশী নাগর জগমোহন-ভোগমণ্ডপ-নাটমন্দির হারিয়ে এক সরলীকৃত বঙ্গীয় রূপ ধারণ করেছিল। এছাড়া নাগরশৈলীর গণ্ডি অংশের গায়ে পীঢ়া রীতির খাঁজ যোগ করে তাঁরা আর একটি নতুন ধরনের মন্দির-রূপ তৈরি করেছিলেন। এই শৈলীটির কয়েকটি নিদর্শন হল মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচথুপীর পঞ্চায়তন মন্দির ও কাগ্রামের জোড়া দেউল, খুলনা জেলার কোদলাগ্রামের মঠ বা ফরিদপুর জেলার মথুরাপুরের দেউল। এই বঙ্গীয় শিখরশৈলীর কোনো দৃষ্টান্ত কলকাতায় খুঁজে পাওয়া যায়নি।

দালান রীতির মন্দির

আয়ত বা বর্গাকার ক্ষেত্রের উপর নির্মিত থাম ও অলিন্দযুক্ত সমতল শীর্ষের মন্দিরগুলি এই রীতির অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের মন্দিরশৈলী যে গুপ্তযুগেও (খ্রীঃ পঞ্চম শতক) প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সাচিতে। কলকাতার অধিকাংশ দালানমন্দিরই বসতবাড়ির সঙ্গে যুক্ত। অনেক ক্ষেত্রে আবার তিনদিকের দরদালানের সঙ্গে চতুর্থদিকে দালানমন্দির যোগ করে তৈরি করা হয়েছে 'চকমিলানো' বাড়ি। বাংলার গ্রামাঞ্চলে বহিরাগত ধর্মসম্প্রদায়গুলির যে-সব 'অস্থল' আছে, সেগুলির বাস্তু-কল্পনার সঙ্গে কলকাতার ঠাকুরবাড়িগুলির বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই আপাত কারণহীন সাদৃশ্যের পিছনে সম্ভবত ক্রিয়াশীল থেকেছে নিরাপত্তাবোধের অভাব। বাইরে থেকে এসে নতুন প্রবাসে অর্থ ও সম্পদ অর্জনের পর, একই চৌহদ্দির নিরাপদ বেষ্টনীর মধ্যে বসতবাড়ি-কাছারি-দেবালয়ের সব কিছু রক্ষা করার প্রবণতাই বোধহয় বহিরাগত অস্থল-নির্মাতা বা কলকাতার মন্দির-স্থাপয়িতাদের এই ধরনের বহুমুখী গৃহ নির্মাণে প্ররোচিত করেছিল।

চকমিলানো বাড়ির মধ্যে সংস্থাপিত কয়েকটি দালানমন্দির উঁচু পোস্তার উপর নির্মিত হয়েছে। অন্য তিনদিকের বাস্তুকাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্যই প্রয়োজন হয়েছে এই উচ্চতার। এইসব উঁচু দালানমন্দিরে ওঠার জন্য প্রশস্ত সোপান-

শ্রেণী যুক্ত হয়েছে অগ্রভাগের মাঝের অংশে। চকমিলানো বাড়ির অঙ্গ হিসাবে যেমন দালানমন্দির নির্মিত হয়েছে, তেমনি কলকাতায় একক দালানমন্দিরেরও অভাব নেই।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, বিশেষত হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুরে দোতলা দালানমন্দিরের প্রচলন দেখা যায়। একতলা দালানমন্দিরের মতো এই জাতীয় দোতলা দালানমন্দিরও কলকাতায় রয়েছে। ১/১ নীলমণি সরকার লেনে ভড় পরিবারের 'ব্রজকিশোর মন্দির', ৫৭ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে দাস পরিবারের 'রাধাগোবিন্দ মন্দির' এবং ৫৭ বেনিয়াটোলা স্ট্রিটে গোস্বামী পরিবারের 'সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির' দোতলা দালানরীতির দৃষ্টান্ত।

মিশ্ররীতি

বিভিন্ন মন্দিররীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে মন্দিরনির্মাতা মিস্ত্রিরা নতুন শৈলী সৃষ্টির চেষ্টা চালাতেন। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মতো কলকাতাতেও মিস্ত্রিদের সেই নিরীক্ষার ফসল ছড়িয়ে আছে। চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ে, ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস অফিসের উত্তরদিকে রয়েছে দালানের উপর নির্মিত একটি আটচালা মন্দির। দাস পরিবারের এই কালীমন্দিরটি কলকাতায় দালান ও আটচালা রীতির মিশ্রণের একমাত্র দৃষ্টান্ত।

শিখর ও দালানের মিশ্রিত রূপায়ণ কলকাতায় বহুল মাত্রায় ঘটেছে। ৫৩ বটতলা স্ট্রিটে 'রাধামাধবের' দালানমন্দিরটির উপরে সংযুক্ত হয়েছে আমলক, কলস ও চক্র যুক্ত শিখর। আঢ্য পরিবারের এই মন্দিরেব আনুমানিক নির্মাণকাল উনিশ শতকের প্রথমদিক। ৩ ক্রাউচ লেনের লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দির বা নিমতলার আনন্দময়ী কালীর মন্দির অনুরূপ দালান-নির্ভর শিখরমন্দির। কিন্তু প্রথানুগ শিল্পরীতি থেকে বিচ্যুত বলে এ মন্দির দুটির স্থাপত্যগুরুত্ব অল্প। দালাননির্ভর শিখরমন্দিরের অনুরূপ একটি নিদর্শন হল কাঁকুড়গাছিতে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রস্তরমণ্ডিত সমাধিমন্দিরটি।

নবরত্ন প্রসঙ্গে আমরা দালাননির্ভর রত্নমন্দিরের কথা আগেই আলোচনা করেছি। তাই বিষয়টির পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে চলে আসা যাক রত্ন ও শিখরের বিচিত্র মিশ্রণের প্রসঙ্গে। মানিকতলা মেন রোডের উত্তরধারে, রেলব্রিজের অদূরে অবস্থিত জগন্নাথ মন্দিরে রয়েছে রথপগহীন চূড়া। বৃহৎ এই চূড়াটি উত্তর ভারতীয় নাগররীতি ও বঙ্গীয় রত্নশৈলীর এক অদ্ভুত সংকর সংমিশ্রণ। বর্গাকার ভাবে উঠে যাওয়া মন্দিরটির একতলার চার কোণে স্থাপিত হয়েছে চারটি 'রত্ন'। সেগুলি এমনভাবে সংস্থাপিত হয়েছে যে রত্নের বদলে সেগুলিকে অঙ্গশিখর বলেই ভ্রম হয়। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠালিপি অত্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমাদের অনুমিত নির্মাণকাল বর্তমান শতকের গোড়ার দিক। শিকদারপাড়া স্ট্রিটের তারাসুন্দরী কালীর মন্দিরটিও ঠিক একই মিশ্ররীতির। সতেরোচূড় এই প্রস্তর মন্দিরে উত্তর ভারতীয় নাগররীতির সঙ্গে মিশে গিয়েছে বাংলার রত্নরীতির ধারা।

নির্মাণের উপাদান

পলিমাটির দেশ নিম্নবঙ্গে মন্দির নির্মাণের প্রধান উপকরণ হল ইট। অদূর অতীতে কিছু পাথরের মন্দির নির্মিত হলেও কলকাতার অধিকাংশ মন্দিরই ইটের তৈরি। অবশ্য ইটের গাঁথুনির উপর পাথরের গাত্রালংকার বসিয়ে অনেক ক্ষেত্রে দৃশ্যত 'পাথরের মন্দির' রচিত হয়েছে।

বর্তমানে যেভাবে ইট তৈরি হয়, সাবেকী আমলে কিন্তু সে প্রথা ছিল না। তখনকার দিনের পদ্ধতিটি ছিল অন্যরকম। উপযোগী মাটি সংগ্রহের পর তার মিশ্রণ ও মর্দন ঘটিয়ে তৈরি করা হতো শক্ত কাদা। তারপর মুগুরাকৃতি কাঠের 'পিটুনে' দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে সেই শক্ত কাদাকে একটি সমতল ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া হতো। 'পিটুনে'-র প্রয়োগে তৈরি হতো অভিপ্রেত স্থূলত্বের একটি স্তর। এবারে সুতো দিয়ে চৌকো দাগ টেনে পাতলা দা দিয়ে স্তরটিকে টুকরো করা হতো—অবিকল যেভাবে ময়দার স্তর থেকে গজা বা নিমকি তৈরি হয়। প্রথমে রোদের তাপে উলটে-পালটে এবং পরে কাঠের আগুনে পুড়িয়ে সাঙ্গ হতো ইট তৈরির প্রণালী। বলা বাহুল্য, এই পদ্ধতিতে সব ইটের আকার হুবহু সমান হওয়া সম্ভব ছিল না। এই পুরনো পদ্ধতির ইটের আরও একটি বিশেষত্ব ছিল। বর্তমান ইটের চেয়ে এগুলি হতো ঢের বেশি পাতলা। কলকাতার মন্দির-নির্মাণে এ ধরনের ইট উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে, তারপর এসেছে আধুনিক ঘরানার ইট। ইটের আকার-প্রকার দেখলেই তাই একটি মন্দিরের মোটামুটি বয়স আন্দাজ করা যায়।

বাংলায় যে-সব প্রাক্-মুসলিম যুগের মন্দির আজও টিকে আছে, সেগুলির ছাদ 'লহরা' পদ্ধতিতে নির্মিত। 'লহরা'-র গাঁথুনির জন্য মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হতো কাদামাটি। কিন্তু পাঠান আমলে যখন বঙ্গীয় স্থাপত্যে খিলান, ভল্ট বা গম্বুজের অনুপ্রবেশ ঘটল, তখন স্থায়িত্বের জন্য অনুভূত হল চুন-সুরকির, বা চুন-বালির মিশ্রণের প্রয়োজন ঘটল। সেকালে পাথুরে চুনের চেয়ে শামুক পোড়ানো চুনের ব্যবহার ছিল বেশি। চুনারি সম্প্রদায়ের সদস্যরা ভাটিতে শামুকের খোলা পুড়িয়ে তৈরি করতেন সেই চুন। সৌধ নির্মাণের মশলা তৈরির জন্য চুনের সঙ্গে যেমন সুরকি বা বালি মিশ্রিত হতো, তেমনি খিলান ও গম্বুজকে দৃঢ়তর করার জন্য মেশানো হতো চিটে গুড়। কলকাতার কিছু পলস্তরা-খসা প্রাচীন মন্দিরের গাঁথুনিতে দেখা যায় এই প্রথানুগ মাল-মশলার উপাদান। কয়েকটি ক্ষেত্রে সে মশলার মধ্যে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়েছে শামুকের খোলার কুচি।

নির্মাণ-কৌশল

মন্দিরের নির্মাণ-কৌশলকে দুটি প্রধান পর্বে বিভক্ত করা যায়: দেওয়াল গাঁথা ও চাদ তৈরি। বলা বাহুল্য, প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয় কাজটি জটিলতর ও মুনশিয়ানা-সাপেক্ষ। বাংলার সাবেক মন্দিরশৈলীর একটি সুপরিচিত অঙ্গ হল চার কোণা থেকে

উদ্গত লহরার উপর নির্ভরশীল গম্বুজ। ইংরেজি পরিভাষায় এই ধরনের গম্বুজকে বলা হয় 'পেনডেনটিভ ডোম'। গোটা ছাদ জুড়ে গম্বুজ নির্মাণের কাজটি জটিল ও পরিশ্রমসাধ্য। তাই কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মন্দির-শিল্পীরা খুঁজে নিয়েছিলেন সহজতর একটি পন্থা। গর্ভগৃহের উভয় পাশে তাঁরা যোগ করেছিলেন দুটি স্বতন্ত্র খিলান। খিলান দুটির উপরে ছোট গম্বুজ নির্মাণ করে তাঁরা পদ্ধতিটির সরলীকরণ ঘটিয়েছিলেন। এর ফলে একদিকে যেমন কারিগরি জটিলতা এড়ানো গিয়েছিল, তেমনি কমানো সম্ভব হয়েছিল মন্দির নির্মাণের খরচ। মন্দিরশীর্ষ নির্মাণে উদ্গত লহরা ছাড়াও আর এক রকম প্রযুক্তি ব্যবহৃত হতো। ইংরেজিতে তাকে বলা হয় 'কোভ ভল্ট', বাংলায় 'কুব্জপৃষ্ঠ খিলান' বলা যেতে পারে।

চূড়ার নিম্নাংশ এভাবে গড়ে তোলার পর, ইচ্ছামতো প্রযুক্তি ব্যবহার করে সৃষ্টি করা হতো চালা, রত্ন বা শিখররূপী ঊর্ধ্বাংশ। গম্বুজের মূল আকারটি ঢেকে না দিলে চালা, রত্ন বা শিখরের রূপ ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। মন্দির-শিল্পীরা সেই কাজটি সম্পন্ন করতেন ইটের খোয়া, চুন, সুরকি আর বালির প্রলেপের সাহায্যে। গর্ভগৃহের ভিতর থেকে দেখলে বোঝা যায়, নির্মাণ-কৌশলের দিক থেকে মন্দির ও মসজিদের গম্বুজ সমগোত্রীয়। কিন্তু এই কারিগরি কারিকুরির কল্যাণে দুটির বহিরঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত অলিন্দ অংশের ছাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্মিত হয়েছে 'ভল্ট' বা অর্ধগোলাকৃতি টানা খিলানের মাধ্যমে। কিছু দালানমন্দিরের ছাদেও দেখা যায় এই টানা খিলানের প্রয়োগ। ১৭/১ বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিট, ৮২/১ নিমতলা ঘাট স্ট্রিট ও ৮-৯, দীনু রক্ষিত লেনের মন্দিরগুলির শীর্ষদেশ এই পদ্ধতিতে রচিত। কলকাতার বাকি দালানমন্দিরগুলির অধিকাংশের ছাদ কড়ি-বরগা দিয়ে তৈরি। অবশ্য এ শতাব্দীর প্রারম্ভে সিমেন্টের প্রচলন শুরু হওয়ার পর থেকে অলিতে-গলিতে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে কংক্রিট-ছাদের মন্দির।

টেরাকোটাসজ্জা

মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে বাংলায় যে-সব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলির একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ হল পোড়ামাটির অলংকরণ। টেরাকোটাসজ্জার এই ধারা আঠারো শতকে স্থাপিত কিছু মন্দিরে প্রযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু উনিশ শতকের কলকাতার মন্দির-গুলিতে পোড়ামাটির অলংকরণ হয় সামান্য, নচেৎ অনুপস্থিত। দক্ষিণেশ্বরের নবরত্নে (১৮৫৫) কোনো টেরাকোটাসজ্জা না থাকায় বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ সুধাংশু রায় অনুমান করেছেন যে, প্রায় আড়াইশো বছর আগে থেকেই টেরাকোটাশিল্পের অবনতি সূচিত হয় এবং উনিশ শতকের মধ্যভাগে তার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে।[৩৫] বিদগ্ধ গবেষক বিনয় ঘোষের রচনায় খুঁজে পাওয়া যায় এই বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি, 'তাই দেখা যায় যে, ব্রিটিশ আমলে অনেক দেবালয় তৈরি হলেও, সেখানে বাঙালী শিল্পীদের সেই কলাকুশল হাতের স্পর্শ নেই। বর্ধমানের মহারাজারা যেসব মন্দির তৈরি করিয়েছেন, সাল তারিখ

অনুসারে দেখা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনো কোনো মন্দিরে কারুকার্যের নিদর্শন কিছু কিছু আছে এবং ক্রমে উনবিংশ শতাব্দীতে এসে সেগুলি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তখন কেবল মন্দিরের সংখ্যা (যেমন ১০৮ মন্দির) ও চূড়া বেড়েছে, শিল্পৈশ্বর্য একেবারে লুপ্ত। ভূস্বামীদের মধ্যে সাবর্ণ চৌধুরীদের মতো দেবালয় প্রতিষ্ঠা বোধহয় আর কেউ করেননি। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক দেবালয়ে পোড়ামাটির কাজের নিদর্শন রয়েছে দেখা যায়, যেমন হালিশহরের মন্দিরগুলিতে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এসে দেখা যায় মন্দিরের গায়ে বালির ও চুনের পলস্তারা ছাড়া আর কিছু নেই, এমনকি কালীঘাটের মন্দিরেও নেই। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রানী রাসমণি যখন দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত মন্দিরটি নির্মাণের জন্য ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন তখন তিনি নিশ্চয়ই পোড়ামাটির কারুকাজের জন্য কোনো শিল্পীর খোঁজ পাননি। যদি পেতেন তাহলে তার সামান্য নিদর্শনও কোথাও থাকত। তখন বাংলার সূত্রধর শিল্পীরা প্রায় নিখোঁজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছেন, অন্তত শিল্পনৈপুণ্যের দিক থেকে।'[৩৬] টেরাকোটার বিলোপ সম্পর্কে উপরোক্ত দুই গবেষক যে ধারণা প্রকাশ করেছেন, সে বিষয়ে মতান্তরের অবকাশ আছে। কিন্তু সে-প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে এ ব্যাপারে ম্যাককাচ্চন যা লিখেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য, 'In the sub-divisions adjacent to Calcutta, very little terracotta is found after the beginning of the 19th Century, whereas in Midnapore and Birbhum districts it lingered on into the early 20th. Furthermore, in Calcutta itself so many old temples have been renovated that there is no saying how they may have been decorated originally.'[৩৭] ম্যাককাচ্চন যেখানে যথাযথ প্রশ্ন তুলে থেমে গিয়েছিলেন, অন্য দুই গবেষক সেখান থেকে কয়েক ধাপ এগিয়ে একটি 'বিলুপ্তি-তত্ত্ব' খাড়া করেছেন। কিন্তু এই তত্ত্ব যে যথার্থ নয়, সে কথা ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে।

পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষত রাঢ় অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা উনিশ শতকের অজস্র মন্দিরে টেরাকোটাসজ্জা উপস্থিত। সরজমিন সন্ধানকালে দেখেছি, মেদিনীপুর জেলার ধামতোড় গ্রামে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে নির্মিত মন্দিরেও পোড়ামাটির ফলকসজ্জার যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে।[৩৮] কাজেই রানী রাসমণির মন্দিরে টেরাকোটা না থাকার কারণ বাংলার তাবৎ টেরাকোটাশিল্পীর অবলুপ্তি, এ যুক্তি ধোপে টেকে না।

কিন্তু টেরাকোটাশিল্পীদের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও রাসমণি কেন সে অলংকরণ ব্যবহার করেননি ? যেহেতু আমরা পূর্ববর্তী গবেষকদের মত খণ্ডন করে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছি, তাই এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায়। আমাদের যুক্তি এরকম :

১. আগেই জানানো হয়েছে, রাসমণির মন্দিরের সঙ্গে তাঁর স্বজাতিভুক্ত রামনাথ মণ্ডলের মন্দিরের দারুণ সাদৃশ্য। সম্ভবত রামনাথের মন্দিরটিকে অনুকরণ করেছিলেন রাসমণি। টেরাকোটাসজ্জিত ভিন্নধর্মী মন্দির নির্মাণ তাই তাঁর অভিপ্রেত ছিল না।

২. টেরাকোটাসজ্জিত মন্দির নির্মাণে যে অর্থ ব্যয়িত হতো, সেই পরিমাণ অর্থেই পঙ্খের অলংকরণযুক্ত অভ্রভেদী মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন রাসমণি। সুউচ্চ মন্দির স্থাপনার মোহ দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ।

৩. টেরাকোটাশিল্পের কিছু ঋতুকালীন সমস্যা আছে। টেরাকোটা ফলক তৈরির প্রশস্ত সময় হচ্ছে শীতকাল। কিন্তু মন্দির নির্মাণের কাজ দ্রুত নিষ্পাদন করতে চেয়েছিলেন রাসমণি। তাই তাঁর পক্ষে শুধুমাত্র অলংকরণের স্বার্থরক্ষার জন্য শীতের মরশুম পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। জমি সংক্রান্ত মামলা এবং পোস্তা ও ঘাট নির্মাণে বেশ কয়েক বছর ব্যয়িত হয়ে যাওয়ায় বৃদ্ধা রাসমণি অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। নিজের জীবদ্দশায় আদৌ মন্দির নির্মাণ নিষ্পন্ন হবে কিনা সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ জাগছিল। প্রতিষ্ঠাত্রীর এই উৎকণ্ঠা সম্পর্কে স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছিলেন, '...কিন্তু রানীর ভয় হইল যে, মন্দির প্রতিষ্ঠা শীঘ্র সমাপ্ত না হইলে তাঁহার জীবনকালে উহা নাও হইতে পারে।'[৩৯] সময় সংক্ষেপের এই তাগিদের জন্য দক্ষিণেশ্বরের কালীমূর্তি দীপাবলীতে প্রতিষ্ঠা না করে, তড়িঘড়ি জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতেই স্থাপন করা হয়। টেরাকোটাসজ্জা যে কেন দক্ষিণেশ্বরে অনুপস্থিত, এই পটভূমি বিশ্লেষণ করলে তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না।

এখন প্রশ্ন, কলকাতার কোন্ কোন্ প্রাচীন মন্দিরে টেরাকোটাশিল্প ব্যবহৃত হয়েছিল। গোবিন্দরামের 'প্যাগোডা'-র যে ক'টি ছবির কথা আমরা উল্লেখ করেছি, সেগুলিতে মন্দিরটির টেরাকোটাসজ্জার কোনো প্রতিফলন নেই। কিন্তু ডয়লির আঁকা 'স্ট্র্যাণ্ড রোডের নিকটবর্তী নবরত্নের' ছবিতে টেরাকোটার হদিস মিলছে। বিলুপ্ত এই মন্দিরের উপরের তলার প্রবেশপথের দু'পাশে দেখা যাচ্ছে দুটি বড় মূর্তি, এবং তার সঙ্গে কিছু প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্পের ফলক। ছবি থেকে ফলকগুলিকে পোড়ামাটির বলেই মনে হচ্ছে।

বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী পরিবার নানাস্থানে যে-সব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, সে সব মন্দিরে অল্পবিস্তর টেরাকোটা অলংকরণ রয়েছে। এই পরিবারেরই উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল কালীঘাটের বর্তমান কালীমন্দির। তাই অনুমান করা অসঙ্গত নয়, এ মন্দিরেও হয়তো পোড়ামাটির সজ্জা ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু বারংবার সংস্কারের ফলে বর্তমানে তার চিহ্নমাত্র নেই। নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে শহুরে রুচি অনুযায়ী সংস্কৃত হয়েছে কলকাতার মন্দিরগুলি। প্রাচীন মন্দিরগুলির সম্মুখসজ্জা আমূল সংস্কৃত হওয়ার ফলে কোন্ কোন্ মন্দিরে এই ধরনের অলংকরণ ছিল, তা নির্ধারণ করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। তাই বিদেশী চিত্রকরদের ছবির মধ্যে আজ খুঁজতে হচ্ছে টেরাকোটাসজ্জার সাক্ষ্য।

কলকাতার স্বল্পসংখ্যক মন্দিরে আজও কিছু টেরাকোটা অলংকরণ টিকে রয়েছে। হাটখোলার দত্ত পরিবারের দুর্গেশ্বর শিবমন্দিরে দেখা যায় থামের গায়ে নিবদ্ধ টেরাকোটার টিয়াপাখি। এই মন্দিরের ত্রি-খিলান স্তম্ভের 'মোল্ডিং'-এও রয়েছে প্রথানুগ টেরাকোটাসজ্জা। কেনডারডাইন লেনে অবস্থিত ত্রিলোকরাম পাকড়াশীর তিনটি

মন্দিরের অগ্রভাগ ভালভাবে নিরীক্ষণ করলে বোঝা যায় যে, এক সময়ে পোড়ামাটির বেশ কিছু নকাশি কাজ সেখানে উৎকীর্ণ ছিল। কিন্তু সংস্কারকালে চাঁছাছোলার ফলে তার বহুলাংশ বর্তমানে সিমেন্টের পলস্তরায় আবৃত।

কলকাতার টেরাকোটা-মন্দিরের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সম্ভবত বনমালী সরকারের প্রতিষ্ঠিত বাণেশ্বর শিবের মন্দির। ২/৫ বনমালী সরকার স্ট্রিটে[৪০] অবস্থিত দক্ষিণমুখী, একদুয়ারী এই আটচালা মন্দিরের সাবেক প্রবেশপথটি প্রাচীর তুলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রাচীর তৈরির ফলে মন্দিরগাত্রের নীচের দিকের ফলকসজ্জা বিনষ্ট হয়েছে। তবে উপরের বাঁকানো কার্নিশের সংলগ্ন তিন সারি মৃৎফলকের একাংশ আজও বিধ্বস্ত অবস্থায় টিকে রয়েছে। যেহেতু এ মন্দিরের প্রশংসনীয় টেরাকোটাসজ্জা বিলুপ্তির প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে, তাই তার পরিচয়টুকু ধরে রাখার জন্য আমরা বিষয়টি কিঞ্চিৎ বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করব।

এই মন্দিরের সাবেক প্রবেশপথের উপরে একসারি গুণিতক চিহ্ন আকৃতির সরু ও ক্ষুদ্রাকার পোড়ামাটির ফলক অনুভূমিক বাঁকানো ভাবে বিন্যস্ত। বাঁকানো কার্নিসের দু'দিকের প্রান্তে নিবদ্ধ ফলকে রয়েছে ময়ূরের চঞ্চুপুটে ধৃত সর্প। পশ্চিমবাংলার অন্যান্য স্থানের বহু মন্দিরে অনুরূপ ফলক দেখা যায়। পরবর্তী সারিতে পারলক্ষিত হয়েছে পাকানো দড়ির আকারে উদ্গত ফলকসজ্জা। এই একই রূপকল্প পোড়ামাটির বদলে পঙ্খে ব্যক্ত করা হয়েছে দক্ষিণেশ্বরের কয়েকটি শিবমন্দিরে। অন্য ফলকগুলির প্রত্যেকটি অর্ধগোলাকৃতি ছোট নকশা-চিহ্নের ফ্রেম দিয়ে বেষ্টিত। এই ফলকগুলির অধিকাংশের বিষয়বস্তু শৈব মহন্তদের জীবনযাত্রা। মহন্তদের যে-সব বিভিন্ন অবস্থা ফলকে রূপায়িত হয়েছে, সেগুলি হল :

১. ঊর্ধ্ববাহু অবস্থায় এক পায়ে দণ্ডায়মান।
২. মালাজপরত, উপবিষ্ট।
৩. মাথার উপর পা তুলে কসরৎ-রত।
৪. পা থেকে কাঁটা উৎপাটন-রত।
৫. দু-হাতে হাঁটু ধরে উপবিষ্ট।
৬. মাথায় দু-হাত রেখে, উপরদিকে দু-পা তুলে রাখা এক কৃশকায় মহন্ত, যাঁর বগলের ভিতর দিয়ে এক মহিলার মুখমণ্ডল দৃশ্যমান।[৪১]
৭. বর্শাধারী মহন্ত।
৮. লগুড়ধারী মহন্ত, ইত্যাদি।

মহন্তদের জীবনযাত্রা-বিষয়ক টেরাকোটা ছাড়াও এ মন্দিরের ফলকে রয়েছেন উপবিষ্টা মেম, তামাকু সেবনরত সাহেব, নথপরা নতমুখী বাতায়ন-পাশে উপবিষ্টা নারী, নর্তক, বাদ্যকর, দ্বারপাল, চামরবাহক, অসিধারী যোদ্ধা, বীণাধারী কিন্নর, নৃসিংহ, বলরাম, জগন্নাথ, সরস্বতী প্রভৃতি। সব মিলিয়ে এই মন্দিরটির টেরাকোটাসজ্জা বাংলার প্রথাগত মন্দিরভাস্কর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে স্থাপিত টালিগঞ্জের ঘোষ পরিবারের চারটি মন্দিরও

টেরাকোটায় সজ্জিত। মন্দিরগুলির মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড় সেটির ফলকে হনুমানসহ যুদ্ধরত রাম-রাবণ, কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, প্রস্ফুটিত পদ্ম প্রভৃতি দেখা যায়।

সাবর্ণ চৌধুরীদের প্রতিষ্ঠিত বড়িশার দ্বাদশ শিবমন্দিরের (১৮০৬) মধ্যে তিনটিতে রয়েছে পোড়ামাটির ভাস্কর্য। জরাজীর্ণ ফলকগুলি থেকে অতি কষ্টে শিব-লক্ষ্মী-সরস্বতী সহ মহিষমর্দিনী, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি বিষয়বস্তু শনাক্ত করা যায়। এই মন্দিরগুচ্ছের সামান্য উত্তর-পশ্চিমে আছে সমসাময়িক ছ'টি আটচালা মন্দির। দত্তদের এই মন্দিরগুলির তিনটিতে টেরাকোটার ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। তার মধ্যে দুটির টেরাকোটা সাবর্ণ চৌধুরীদের মন্দিরের অনুরূপ। তৃতীয় মন্দিরের মৃৎফলকগুলি তুলনায় সৌষ্ঠবহীন হলেও তার মধ্যে বিষয়-বৈচিত্র্যের অভাব নেই। ফলকগুলিতে রয়েছে হনুমান, ঢোল ও করতালবাদক, নর্তকী, দণ্ডায়মান নগ্ন সাধু, বন্দুকধারী সৈনিক প্রভৃতি। শখের বাজারের নিকটবর্তী বৈদ্যপাড়ায় অবস্থিত উনিশ শতকের তিনটি ভগ্নপ্রায় আটচালা মন্দিরে আছে ফুললতার নকাশি কাজ ও প্রস্ফুটিত পদ্মফলক। ঠিক একই ধরনের পোড়ামাটির কাজ দেখা যায় হরিনাথ দে রোডের শিববাগানে অবস্থিত বিশ্বাস পরিবারের আটচালা মন্দিরে।

কলকাতায় টেরাকোটাভাস্কর্য পুনরুজ্জীবনের দুটি সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তার মধ্যে প্রথমটি হল কৈলাস বসু স্ট্রিটের একটি আটচালা মন্দিরে। বিগত শতাব্দীতে স্থাপিত মন্দিরটিতে টেরাকোটা-ফলক সংযোজন করেছিলেন বর্তমান সেবায়েতরা (হাটুই পরিবার)। দুঃখের বিষয়, ত্রুটিপূর্ণ প্রস্তুত প্রণালীর ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই নিবদ্ধ ফলকের অধিকাংশ নোনা ধরে নষ্ট হয়ে গেছে। অন্য মন্দিরটি চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ে অবস্থিত। কপালীটোলার দাস পরিবারের এই মন্দিরে যোগ করা হয়েছে ছাঁচে তৈরি মৃৎফলক। সুরুচিপ্রসূত ফলকগুলি মন্দির-সজ্জার এক সার্থক প্রয়োগ হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

প্রাসঙ্গিক একটি তথ্য এখানে উল্লেখ্য। কলকাতার মন্দির অলংকরণে টেরাকোটা বহুলভাবে ব্যবহৃত না হলেও, তার ব্যবহার ঘটেছে সাহেবি সৌধের অঙ্গসজ্জায়। বিদেশী স্থপতিরা কিছু মৃৎফলক আমদানি করেছিলেন বিলাত থেকে, আবার 'বার্ন কোম্পানির' উদ্যোগে বার্নপুরে সম্পন্ন হয়েছে টেরাকোটা তৈরির কাজ। জি. পি. ও.-র উত্তরবর্তী কালেকটোরেট ভবনের গায়ে আজও দেখা যাবে এরকম কিছু টেরাকোটাসজ্জার নিদর্শন।

পঙ্খ অলংকরণ

কলকাতার মন্দির-স্থাপত্যে টেরাকোটার মতো পঙ্খের ব্যবহারও ব্যাপকভাবে ঘটেনি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পঙ্খের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ থেকেছে ফুল-লতা-পাতার নকাশি কাজের মধ্যে। কলকাতার যেসব মন্দিরে পঙ্খের নকাশি কাজ রয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি হল :

ক. ৫৯/এ, বাগবাজার স্ট্রিটের শিবমন্দির।

খ. ১/২, কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রিটের জোড়া শিবমন্দির।

গ. বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের ভবতারিণী কালীমন্দির।

ঘ. দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী কালীমন্দির।

ঙ. ২৫, বেথুন রো-র নিস্তারিণী কালীমন্দির।

চ. ৫/১, হরপ্রসাদ দে লেনের শ্যামসুন্দর জীউয়ের মন্দির।

ছ. ২৫, গোপীকৃষ্ণ পাল লেনের রাধাকান্ত জীউয়ের মন্দির।

জ. ৬/১, গোবিন্দ সেন লেনের রাধাগোবিন্দ ও জগন্নাথের ঠাকুরবাড়ি।

ঝ. ৫০/এ, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের শ্যামসুন্দর জীউয়ের মন্দির।

ঞ. টালিগঞ্জে বাবুরাম ঘোষ প্রতিষ্ঠিত মন্দির (১৮০৭)।

কলকাতার কিছু মন্দিরে দেখা যায় নকাশি কাজের সঙ্গে পঙ্খের ক্ষুদ্রাকার কিছু মূর্তি। এরকম অলংকরণ আছে বাগবাজারের অন্নপূর্ণা মন্দির সংলগ্ন শিবমন্দিরে ও ভূকৈলাসের মন্দিরগুচ্ছে।

এই শতাব্দীতে সিমেন্টের প্রচলন শুরু হওয়ার পর থেকে পঙ্খের বদলে সিমেন্টের মন্দিরসজ্জা আরম্ভ হয়। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ অ্যাভেনিউয়ের জোড়া শিবমন্দিরের গঙ্গা, যমুনা, পার্বতী ও চণ্ডীর মূর্তি এই শ্রেণীর সিমেন্টজাত অলংকরণের উদাহরণ।[৪২]

প্রস্তরভাস্কর্য

কলকাতার প্রস্তরমণ্ডিত মন্দিরগুলির অধিকাংশই অবাঙালি স্থাপয়িতাদের উদ্যোগে ভিন রাজ্যের শিল্পীদের দিয়ে তৈরি। এই মন্দিরগুলিতে ব্যবহৃত প্রস্তরভাস্কর্যের মধ্যে আছে ফুল-লতা-পাতার নকাশি কাজ, জাফরি ও দ্বারপাল মূর্তি। এছাড়া কার্নিসের ব্র্যাকেট হিসাবে প্রযুক্ত হয়েছে পাথরের লম্ফমান সিংহ, বাদ্যকর ও উপুড় অবস্থায় মাথার উপরে পা তুলে মল্লক্রীড়ারত নারীর মূর্তি। বড়বাজারের নোঙ্গরেশ্বর শিবমন্দির, নিমতলার আনন্দময়ী কালীমন্দির, হাঁসপুকুরিয়া লেনের হনুমান মন্দির, ২৭ শিবু ঠাকুর লেনের রামসীতা মন্দির ও ৪৯/এ শিবু ঠাকুর লেনের শিবমন্দিরে এ জাতীয় অলংকরণ পরিলক্ষিত হয়। হাঁসপুকুরিয়া লেনের মন্দিরটিতে বেশ বড় পাথরের ফলকে খোদাই করা দশাবতার মূর্তিও আছে। 'মরকত কুঞ্জ' প্রাঙ্গণের মন্দিরে রয়েছে সমগোত্রীয় ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি। পাথরের মন্দির না হলেও, ৯৩ টালিগঞ্জ রোডের দ্বাদশ শিবমন্দিরের প্রবেশপথের দেওয়ালে প্রস্তরখোদিত কিছু মূর্তি ও ব্র্যাকেটের অনুকৃতি দেখা যায়।

দ্বারের দারুভাস্কর্য

বাংলার প্রথাগত মন্দির-স্থাপত্যে গর্ভগৃহের কাঠের দরজার পাল্লায় ফুল-লতা-পাতা, পশুপাখি বা দেব-দেবীর মূর্তি খোদাই করার রীতি সুপ্রচলিত ছিল।[৪৩] কলকাতায় এই ধারার কোনো নজির আছে কি না, সে বিষয়ে সুধীজনের ঔৎসুক্য জাগা স্বাভাবিক। একটিমাত্র মন্দিরে আমরা এই জাতীয় দারুতক্ষণের দৃষ্টান্ত খুঁজে পেয়েছি। ১১৯ রাজা রামমোহন সরণিতে অবস্থিত কেদারনাথ শিবমন্দিরের (১৮৬৮) দক্ষিণ ও পূর্বের দুটি দরজাতেই রয়েছে কাঠের কারুকার্য। দক্ষিণ দরজার দু'পাশের প্যানেলের খোপে খোপে

উৎকীর্ণ হয়েছে হরিণ, সাপ ও সিংহের মুখাবয়ব। পূর্ব দিকের দরজায় অনুরূপভাবে প্রকটিত আছে দুটি প্রস্ফুটিত পদ্ম, একদিকে বৃষবাহন শিব ও অন্যদিকে ডমরুধারী বৃষবাহন শিব প্রভৃতি। কালীঘাটের কালীমন্দিরেও একদা নিবদ্ধ ছিল ভাস্কর্যময় কাঠের দরজা। কিন্তু বর্তমান দরজাটি রুপোর পাতে মণ্ডিত।

ধাতুশিল্পের ব্যবহার

কালীঘাটের কালীমন্দিরের দরজার রুপোর পাতটি কারুকার্যহীন নয়। 'রাপুসে' পদ্ধতিতে পাতটির উপর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে দশমহাবিদ্যার মূর্তি। নবাব লেনের জগন্নাথ মন্দিরের দরজায় একই রীতির মাধ্যমে পিতলের পাতে রূপায়িত হয়েছে কার্তিকেয় মূর্তি সহ দশমহাবিদ্যার অবয়ব।[৪৪]

কলকাতার মন্দির-স্থাপত্যে যে ধাতুটি সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে, সেটি হল ঢালাই লোহা (Cast Iron)। রেলিং, গেট, জাফরি, ব্র্যাকেট তো বটেই, লৌহমূর্তিও অলংকরণ হিসাবে গৃহীত হয়েছে কলকাতার মন্দির-স্থাপত্যে। বড়তলা স্ট্রিটে আঢ্য-পরিবারের ত্রি-খিলান দালানমন্দিরের থামের গায়ে লাগানো আছে গ্রীক ভাস্কর্যের অনুসারী লোহার মূর্তি।

বিদেশী প্রভাব

বাংলার মন্দির-স্থাপত্যে ইউরোপীয় প্রভাবের অনুপ্রবেশ আরম্ভ হয় আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। কলকাতার ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। বরং ইংরেজদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল বলে কলকাতার মন্দিরগুলিতে পাশ্চাত্য-প্রভাব বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। বহু মন্দিরের সম্মুখভাগের ত্রি-খিলান দালান অংশে ব্যবহৃত হয়েছে গুচ্ছবদ্ধ স্তম্ভ। কমপাউণ্ড পীয়ারের (Compound Pier) অনুকরণে পরিকল্পিত এই স্তম্ভগুচ্ছের দেশী নামকরণ করা হয়েছিল 'কলাগেছে থাম'। এই পাশ্চাত্যধর্মী সংযোজনটি কলকাতায় এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে 'হুতোম প্যাঁচার নকসা'তেও 'কলাগেছে থামের' উল্লেখ দেখা যায়।[৪৫] ৯৬/১/১ মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের জোড়া শিবমন্দিরে বা নবাব লেনের জগন্নাথ মন্দিরে আজও দেখা যাবে অসংস্কৃত 'কলাগেছে থাম'।

গুচ্ছবদ্ধ থামের মতো আয়োনিয়ান-ডোরিক-কোরিনথিয়ান স্তম্ভশৈলীরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে কলকাতার মন্দির-স্থাপত্যে। বড়তলা স্ট্রিটের আঢ্য পরিবারের মন্দিরে বা ২৫ গোপীকৃষ্ণ পাল লেনের 'রাধাকান্তজীউয়ের মন্দিরে' রয়েছে আয়োনিয়ান স্তম্ভ। ৮২/১ নিমতলা ঘাট স্ট্রিটের 'গিরিধারী গোবিন্দজীউ মন্দিরে' ও ১২ ভূপেন বসু অ্যাভেনিউয়ের 'লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরে' নিবদ্ধ হয়েছে কোরিনথিয়ান থাম। রবীন্দ্র সরণির 'সিদ্ধেশ্বরী কালী-মন্দিরে' দেখা যায় ডোরিক থামের প্রয়োগ।

থামের মতোই বিদেশী প্রভাব পড়েছে খিলানের উপরেও। প্রথাসিদ্ধ অর্ধগোলাকৃতি খিলানের পরিবর্তে অনুসৃত হয়েছে 'গথিক' খিলান-শৈলী। এই জাতীয় খিলান

হাইকোর্টের স্থাপত্যে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে দেশীয় শিল্পীরা 'গথিক' নামের বদলে এটিকে অভিহিত করেছেন 'হাইকোর্ট খিলান' নামে।

কলকাতার বেশ কিছু দালানমন্দিরে প্রবেশপথ বা গবাক্ষের উপরের খিলানে ব্যবহৃত হয়েছে ইউরোপীয় ভাবধারার 'ফ্যানলাইট'। ৫ দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রিটে অবস্থিত 'বৈষ্ণবদাস মল্লিকের ভগবনৃমন্দিরে' দেখা যায়, খিলানের উপরে চতুষ্কোণ জানলা ফুটিয়ে লাগানো হয়েছে কাঠের ঝিলমিল (Venetian Blind)। ১১ বৃন্দাবন বসু লেনের 'নিস্তারিণী কালীমন্দিরে' ও ১/এ বটকৃষ্ণ লেনের 'সিংহবাহিনী মন্দিরের' থামের ফাঁকে ফাঁকে ঝোলানো আছে বিদেশী শৈলীর এই ঝিলমিল। এ ছাড়া মন্দির অলংকরণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ফেস্টুন, পেনডাণ্ট, শিল্ড, রোজেট প্রভৃতি পঙ্খসজ্জা। সাবেকী মন্দিরসজ্জায় প্রাধান্য পেয়েছিল দেব-দেবীর মূর্তি বা দেশজ জীবনচর্যার নানা দিক। কিন্তু ইংরেজদের সংস্পর্শে আসার ফলে সাহেবদের জীবনযাত্রার ছবিও ফুটে উঠতে লাগল মন্দির-অলংকরণে। বনমালী সরকারের মন্দিরের টেরাকোটায় সাহেবের তামাক-সেবন বা মেম মূর্তি এই ধরনের অলংকরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মন্দিরের চূড়ার ক্ষেত্রেও বিজাতীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। চোরবাগানের মল্লিক পরিবারের 'জগন্নাথ মন্দিরের' (১৮২১) শীর্ষদেশ গির্জাসদৃশ, ভূকৈলাসের সত্যচরণ ঘোষালের সমাধিমন্দির পাশ্চাত্যধর্মী গম্বুজযুক্ত। ২/জি কার্তিক বসু লেনের 'সংসারেশ্বর শিবমন্দিরে'ও গম্বুজ আছে বটে, কিন্তু সে গম্বুজে রয়েছে ইসলামী স্থাপত্যের আদল।

প্রতিষ্ঠালিপির প্রয়োগ

কলকাতার মন্দির-স্থাপত্যে প্রতিষ্ঠালিপির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে কষ্টিপাথর, মার্বল, পোড়ামাটির ফলক, তামার পাত এবং পঙ্খ-পলস্তরার প্রলেপ।

কষ্টিপাথরের ফলকগুলির কয়েকটিতে দেখা যায়, খোদাই করা অংশটি সোনার জলে রঞ্জিত। বেলগাছিয়ার ওলাইচণ্ডী মন্দিরে[৪৬] বা রামমোহন সরণির কেদারনাথ শিব-মন্দিরের[৪৭] লিপিগুলি এই শ্রেণীর। শোভাবাজারের নন্দরাম সেনের মন্দিরে আবার দেখা যায় কষ্টিপাথরে স্বল্প গভীরতার রঙবিহীন খোদাই। হয়তো এই ফলকেও এক সময়ে সোনার জলের প্রলেপ ছিল, যা কালের প্রবাহে অন্তর্হিত হয়েছে। নিমতলার দুর্গেশ্বর শিবমন্দির[৪৮] এবং চেতলায় রাধাকান্ত মন্দিরের[৪৯] কষ্টিপাথরের লিপিফলক দুটি পলতোলা অর্থাৎ 'বা-রিলিফ' রীতির।

মার্বল পাথরের লিপিগুলি দু' ধরনের। প্রাচীনতরগুলিতে আছে শুধু অগভীর খোদাই। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের ফলকে খোদিত অংশ ভরাট করা হয়েছে সীসা দিয়ে।

টালিগঞ্জ স্টুডিয়োপাড়ায় অবস্থিত ঘোষ পরিবারের মন্দিরগুলিতে দেখা যাবে পোড়ামাটি ও পঙ্খের উৎসর্গলিপি। এ শতাব্দীতে স্থাপিত দেবস্থানগুলির মধ্যে ১২/বি রাজা রামমোহন সরণির ঠাকুরবাড়িতে দেখা যায় পঙ্খের প্রতিষ্ঠালিপি।

তামার পাতের লিপির নমুনা রয়েছে ভূকৈলাসের সিংহবাহিনী মন্দিরে। ৫/১

হরপ্রসাদ দে লেনের শ্যামসুন্দর জীউর মন্দিরেও পিতলের পাতে খোদিত লিপি দেখা যায়।[৫০] ২৩, তারক প্রামাণিক রোডস্থ সীতানাথ-বালকনাথের মন্দিরে পিতলের পাতে লেখা আছে : 'কাংস্যবণিক বংশোদ্ভব স্বর্গীয় মধুসূদন কুণ্ডুর বণিতা / শ্রীমতী রামাসুন্দরী দাসী / সন ১৩০৭ সাল, তারিখ ২৮শে আষাঢ়।

কলকাতার মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপিগুলির অধিকাংশের ভাষা বাংলা। এমনকি, অবাঙালিদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরেও হিন্দির পাশাপাশি বাংলা প্রতিষ্ঠালিপি উৎকীর্ণ হয়েছে।[৫১] আবার অনেক ক্ষেত্রে বঙ্গাক্ষরে রচিত হয়েছে সংস্কৃত মন্দিরলিপি। চেতলার রাধাকান্ত মন্দির, বাগবাজারের অন্নপূর্ণা মন্দির সংলগ্ন শিবমন্দির,[৫২] বড়বাজারের অধুনালুপ্ত শিবমন্দির,[৫৩] নিমতলার দুর্গেশ্বর শিবমন্দির, ঠনঠনিয়ার কালীমন্দির সংলগ্ন শিবমন্দির,[৫৪] নবীন কুণ্ডু লেনের মজুমদার পরিবারের শিবমন্দির[৫৫] ও ভূকৈলাসের মন্দিরগুচ্ছে এইরকম লিপি দেখা যায়। বাংলা ও সংস্কৃতের সহাবস্থানও বিরল নয়, অখিল মিস্ত্রি লেনের জোড়া আটচালায় দুটি ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে।[৫৬]

অনেক লিপির হরফের ছাঁদ সমকালীন পুঁথির হরফের অনুরূপ। বাগবাজার মদন-মোহনতলার পূর্ব দিকে অবস্থিত ভুবনেশ্বর শিব[৫৭] বা ১৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের মন্দিরে[৫৮] তার নমুনা পাওয়া যায়। ভূকৈলাসের সিংহবাহিনী মন্দিরের পলতোলা লিপিটি ফারসী হরফের ছাঁদে খোদিত। শিল্পী অনবদ্য নৈপুণ্যের সঙ্গে বাংলা হরফকে সাজিয়ে দিয়েছেন অবিকল ফারসীর মতো করে।

কলকাতার মন্দিরে ইংরেজি লিপির প্রয়োগও পরিলক্ষিত হয়। কেনডারডাইন লেনের[৫৯] ও ৪৯/এ শিবু ঠাকুর লেনের মন্দিরে তার উদাহরণ রয়েছে।

কলকাতার মন্দিরলিপির বিষয়বস্তু বিচিত্র। নিছক সন-তারিখ বা তার সঙ্গে শুধু প্রতিষ্ঠাতার নামটুকুই যেমন বহু ফলকে বিবৃত হয়েছে, তেমনি অনেক লিপিতে ধরা আছে নানারকম বিস্তারিত তথ্য।

পুঁথির পাতায় যেমন প্রহেলিকার ভিতরে সন-তারিখ নিহিত থাকত, অনেক মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতেও সেইভাবেই ব্যক্ত করা আছে প্রতিষ্ঠাকালের শকাঙ্ক। ভূকৈলাসের রক্তকমলেশ্বর শিবমন্দিরের লিপিতে প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'শাকেঽক্ষি-শূন্যজলধীন্দুমিতে'।[৬০] শ্লোকাংশটি ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় : অক্ষি = ২, শূন্য = ০ জলধি = ৭ এবং ইন্দু = ১, অর্থাৎ 'অঙ্কস্য বামা গতি' অনুসারে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল হচ্ছে ১৭০২ শকাব্দ। বাংলা লিপিতেও যে এরকম কূটরহস্য ব্যবহৃত হতো তার প্রমাণ রয়েছে ৯৩ টালিগঞ্জ রোডের মন্দিরগুচ্ছে। প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে এই স্থানের লিপিতে বলা আছে : 'মুরারি মুরলী ছিদ্র কুমার বদন, রত্নাকর শুধাকর শাকের গণন'।[৬১] এখানে অর্থ দাঁড়াচ্ছে : মুরারি মুরলী ছিদ্র = কৃষ্ণের বাঁশীর ছিদ্র = ৭, কুমার বদন = কার্তিকেয় = ৬, রত্নাকর = সমুদ্র = ৭ এবং সুধাকর = চন্দ্র = ১, অর্থাৎ ১৭৬৭ শকাব্দ। এই মন্দির-গুচ্ছের দ্বাদশ শিবমন্দিরের কথাও অনুরূপ প্রহেলিকার মাধ্যমে প্রকাশ করে বলা হয়েছে 'রাশী সঙ্খ্যা কাশীপতি'।

মন্দিরলিপি থেকে প্রতিষ্ঠাতার নাম, পেশা[৬২], পরিবারের প্রয়াতা সদস্যার নামে

দেবীপ্রতিষ্ঠার কথা[৬৩] বা মন্দির সংস্কারের বিবরণও[৬৪] জানা যায়। এছাড়া ভূকৈলাসের সিংহবাহিনী মন্দিরে ও বাগবাজারের গৌড়ীয় মঠের লিপিতে রয়েছে কুলজিনামা, গোপীকৃষ্ণ পাল লেনের রাধাকান্ত মন্দিরে আছে সংস্কারকালীন ব্যয়ের উল্লেখ।[৬৫] নগরায়ণের ফলে কলকাতার শ্রমজীবী-পল্লীগুলি অনেকাংশে ভেঙেচুরে গিয়েছে, কিন্তু ১৭ আড়পুলি লেনের শীতলা মন্দিরে রয়ে গেছে সাবেক 'ভিস্তিপাড়া' নামের উল্লেখ। ফলকটিতে খোদাইকারী মিস্ত্রির নামও উল্লিখিত আছে।[৬৬]

মন্দিরনির্মাণে ব্যয়িত সময় সম্বন্ধেও আলোকপাত করা আছে কিছু লিপিতে। ৭৮ টালিগঞ্জ রোডের রাধামদনমোহন জীউর মন্দিরে নিবদ্ধ দুটি লিপিতে ১৭৫০ ও ১৭৫৬ শকাব্দ লেখা আছে।[৬৭] বেশ বোঝা যায়, ১৭৫০ শকাব্দে ভিত্তিস্থাপনের পর মন্দিরনির্মাণ সম্পূর্ণ করতে ছ' বছর সময় লেগেছিল। অন্যদিকে ৯৩ টালিগঞ্জ রোডের মন্দিরলিপিতে স্পষ্টভাষায় খোদিত আছে 'আরব্ধ সন' ও 'পিতিষ্ঠা সন'।

ছিদাম মুদি লেনের ভড় পরিবারের রাধাগোবিন্দ জীউ মন্দিরের লিপিতে আছে বিগ্রহ স্থানান্তরের কথা,[৬৮] ২/২ বনমালী সরকার স্ট্রিটস্থ শ্যামসুন্দর জীউ মন্দিরের ফলকে খোদাই করা রয়েছে সেবায়েতি স্বত্বের হিসাব-নিকাশ।[৬৯] টাগোর কাসল স্ট্রিটের আটচালা মন্দিরের গায়েও স্বত্বাধিকারীর নামবাহী ফলক লাগানো ছিল।[৭০] সম্প্রতি বর্তমান পূজারী মন্দিরটি সংস্কারকালে সে ফলক উপড়ে ফেলেছেন। কলকাতার বহু মন্দিরের মালিকানা দখলের জন্য এইভাবে ফলক-বদল ঘটানো হয়েছে। ইতিহাস-বিলোপের এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে নিন্দার্হ।

বাংলা পুঁথির পুষ্পিকায় প্রার্থনামূলক কবিতার অনুরূপ বয়ান দেখা যাচ্ছে ১/কে রাধানাথ মল্লিক লেনের দয়াময়ী কালীমন্দিরের ফলকে: 'শ্রীশ্রী৺ দয়াময়ী / সন ১১৭৮ / শ্রীগুরুপ্রসাদ তরে হেরি দিগম্বরী।' ছোটখাটো ছন্দোবদ্ধ লিপি ছাড়াও কলকাতার বেশ কয়েকটি মন্দিরে রয়েছে দীর্ঘ পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত কাব্যচর্চার নিদর্শন। নিমতলা ঘাট স্ট্রিটের গিরিধারী গোবিন্দ জীউ মন্দিরের প্রস্তরলিপির হুবহু পাঠ নিম্নরূপ: 'উপেন্দ্র ভজন ধাম শ্রীমন্দির নাম। গিরিধারি গোবিন্দ গোপাল বলরাম / এ স্থানে বিরাজ করেন ভক্তজন ধন। আর্য্যধর্ম্মাশ্রিত জন কর দরশন / বিজ্ঞাপন মম এই সর্ব্বসাধারণে। সেবা লোপ নাহি হয় আমার মরণে / মম বংশ সম্বন্ধীর নাহি অধিকার। তারা কেহ নাহি করে প্রার্থনা সেবার / আমার অভাবে কৃষ্ণভক্ত অধিকার। হইবে সকলে রক্ষা করিবে সেবার / শ্রীমূর্ত্তি সেবাতে নাহি কষ্ট পাবে কেহ। দেবোত্তর বিষয়ে হবে সেবার নির্ব্বাহ / নিত্যানন্দ বংশজাত খড়দহ বাস। সেবায়িত উপেন্দ্র গোস্বামী হয় দাস / বসু রামানন্দ বংশ পরম বিকাশ। যে বংশে গিরীশচন্দ্র হইল প্রকাশ / সম্প্রতি নিমতলা স্থানে স্বোপার্জিত ধনে। প্রাসাদ করিয়া বাস উত্তম ভবনে / ঐ গিরীশ বসু উৎসাহ করিয়া। নির্ম্মাইল মন্দির নিজ বুদ্ধিবল দিয়া / মন্দির নির্ম্মাণে বহু পরিশ্রম করে। সে প্রকার পরিশ্রম কার সাধ্য পারে / গিরীশচন্দ্র বসুকে করি আশীর্ব্বাদ। অন্তকালে পায় যেন শ্রীগোপাল পাদ / বারশত চোরনই সাল ভাদ্র মাসে। শ্রীমন্দির আরম্ভিল দিন উনত্রিংশে / ঐ বৎসর ফাল্গুনের চতুর্দ্দশ দিনে। শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করি এই ত ভবনে।' প্রতিষ্ঠালিপিটি

থেকে জানা যাচ্ছে কিভাবে স্থানীয় বাসিন্দা গিরীশচন্দ্র বসুর আনুকূল্যে নিত্যানন্দ-বংশীয় উপেন্দ্র গোস্বামী ১২৯৪ বঙ্গাব্দে মন্দির স্থাপন করেছিলেন।

৯৩ টালিগঞ্জ রোডস্থ দ্বাদশ শিবমন্দিরের প্রবেশপথে আছে দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিদের প্রতি কাব্যময় নির্দেশ: 'সকলের চরণে আমার নিবেদন। দেবালয়ে যাইবে না করি আরোহণ॥ নিষেধ বিধি কহি কিছু সভার অগ্রভাগে। গাড়ি পালকি ঘোড়া গজাদি নিষেধ আগে॥ পাদুকা পাদেতে আর শিরে ছত্র ধরে। না যাইবে গঙ্গাস্নানে দেবের মন্দিরে॥ মুনিবাক্য হেলন করে যাইতে যাহার মন। শপথ আছয়ে প্রবেশ করিতে অঙ্গন॥ আরব্ধ সন ১২৫২ সাল তারিখ ২৭ ফাল্গুন, পিতিষ্ঠা সন ১২৫৩ সাল তারিখ ৩১ চৈত্র। শ্রী প্যারিলাল দাস। শ্রীমণিমোহন দাস॥' এখানেই হুঁশিয়ারির শেষ নয়। পার্শ্ববর্তী একটি স্বতন্ত্র ফলকে খোদিত আছে: 'শকাব্দ ১৭৬৭ / শ্রীশ্রী৺ বাটীতে কেহ পাদুকা / পায়ে দিয়া জাইবেন নাই, যে জাইবেন / তাহাকে তাল্লাক সন ১২৫২ সাল।' 'তাল্লাক' শব্দটির প্রয়োগ দেখে ইসলামী বিবাহ বিচ্ছেদের কথা মনে পড়তে পারে।[৭১] কিন্তু এক্ষেত্রে 'তাল্লাক' আসলে 'দিব্যি' দেওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি যে শপথ হিসাবে প্রযুক্ত হতো, তার প্রমাণ রয়েছে চৈতন্যচরিতামৃতে: 'বীর বলে তো তোকে তালাক ভেড়ের ভেড়ে শ্রী।' আজ থেকে দেড়শো বছর আগে এ ধরনের ফারসি-বাংলা সংকর শব্দ কলকাতার কথ্য ভাষায় যে প্রচলিত ছিল, এটি তার পাথুরে প্রমাণ।

বরানগরের ব্রহ্মময়ী কালীমন্দিরের শিলালিপিটিও কবিতাকারে গ্রথিত। লিপিটির অংশবিশেষ এরকম: 'বার শত উনষাট সাল গণনায়। / মন্দির প্রতিষ্ঠা কৈল্য মাঘী পূর্ণিমায়॥ / * * * / মোহন মুরতি মার যেন গো বালিকা। / ব্রহ্মময়ী নামে খ্যাত হইলা কালিকা॥ / রাসমণির মা কালী, এই কালীমাতা। / এক ব্যক্তি উভয়ের আছিলা নির্মাতা॥ / সুমিষ্ট মা মাসী নাম দিলা সে কারণে। / প্রভু রামকৃষ্ণ, ইহা শুনেছি শ্রবণে॥' এই লিপিটি অবশ্য প্রতিষ্ঠাফলক নয়, পরবর্তীকালে নিবদ্ধ।

ছন্দোবদ্ধ ভাষ্যের এই ধারা প্রতিফলিত হয়েছে ক্রাউচ লেনের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরেও (১৯১৫)। আলোচ্য লিপিটির বয়ান এইরকম: 'শ্রীশ্রী লক্ষ্মীজনার্দ্দন / কুলের দেবতা। / তাঁর পদে মতি রতি / থাকে যেন সদা॥ / স্বামী মম / দয়ালচন্দ্র দাস / স্বর্গবাসী। / তাঁর ধর্ম্মপত্নী আমি / আতরমণি দাসী॥ / পতির আদেশে প্রভুর / সেবাকার্য্যে রত। / সন ১৩২২ সালে / মন্দির স্থাপিত॥ ৬ মাঘ গুরুবার / তিথি পূর্ণিমায়। / মন্দির প্রতিষ্ঠা হ'ল / প্রভুর আজ্ঞায়॥' এই লিপির ভাবানুসারী একটি সংস্কৃত লিপিও মন্দিরটিতে লাগানো আছে।

কাব্যময় মন্দিরলিপিগুলি থেকে বোঝা যায়, কলকাতার নগরায়ণ সত্ত্বেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত চিরাচরিত লোকায়ত ভাবনা অনুসৃত হয়েছিল। গদ্যসাহিত্য সুদৃঢ় হয়ে উঠলেও রামায়ণ-মহাভারত-মঙ্গলকাব্যের পয়ার-ত্রিপদীর রেশ মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। তাছাড়া এইসব লিপির মধ্যে সেকালের কলকাতাবাসীদের মানসিকতার প্রতিফলনও খুঁজে পাওয়া যায়।

রূপান্তরের রূপরেখা

কলকাতার নগরায়ণের ফলে একদিকে যেমন বহু মন্দিরের অবলুপ্তি ঘটেছে, অন্যদিকে তেমনি অনেক মন্দিরে এসেছে বাহ্যিক রূপান্তর। অনেক ক্ষেত্রে জীর্ণ দেবালয়ের সংস্কারকালে এমনভাবে চেহারা বদল করা হয়েছে যে, সেগুলির প্রাচীনত্বের চিহ্ন ঢাকা পড়ে গেছে। তাই আপাতদৃষ্টিতে কলকাতার বহু মন্দিরকে অর্বাচীন ও গুরুত্বহীন মনে হয়। এই পরিবর্তিত বহিরঙ্গের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েই ম্যাককাচ্চন মন্তব্য করেছেন : 'Architecturally, the temples of Calcutta are disappointing.'[৭২]

নবাব লেনের জগন্নাথ মন্দির ও প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট-কলেজ স্ট্রিট সংযোগস্থলের শিবমন্দিরের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। জনশ্রুতি অনুযায়ী, আদতে প্রথমটি ছিল নবরত্ন ও দ্বিতীয়টি আটচালা মন্দির। বর্তমানে মন্দির দুটি যথাক্রমে উত্তর ভারতীয় নাগর ও অপজাত শৈলীর শিখর-মন্দিরে পর্যবসিত। বনমালী সরকার স্থাপিত শ্যামসুন্দর-মন্দিরটি মূলত কোন রীতির ছিল, তা জানার উপায় নেই। বর্তমানে সেটি একটি স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যহীন দালানমন্দির।

২ নবাব লেনের একটি আটচালা শিবমন্দিরকে চারদিক থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে ঘিরে নির্মিত হয়েছে বহুতল দোকান ও গুদামঘর। মন্দিরটির গর্ভগৃহে প্রবেশ করে ছাদের দিকে তাকালে তবেই তার সাবেক স্থাপত্যশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। গুপ্ত লেন ও রবীন্দ্র সরণির সংযোগস্থলে অবস্থিত 'রামচন্দ্রেশ্বর শম্ভু'-র ক্ষুদ্রাকার মন্দিরটি যে আগে হাটখোলার দত্ত পরিবারের গৃহদেবালয় ছিল,[৭৩] তা মন্দির-সন্দর্শনে কোনো-ভাবেই উপলব্ধি করা যায় না। চিত্রবিচিত্র চীনামাটির টালি লাগানোর ফলে মন্দিরটি কুরূপ ও রুচিহীন হয়ে উঠেছে। ফিরিঙ্গি কালীর মন্দির যে আসলে একটি সাবেক আটচালার সঙ্গে অর্বাচীন দালানের সংযোগের ফসল, ভালভাবে নিরীক্ষণ না করলে সে কথাও আজ আর বোঝা যায় না।

মন্দিরের মালিকানা দখলের জন্য রূপান্তর ঘটানো এবং লিপিবিলোপের কথা আমরা আগেই জানিয়েছি। এই শ্রেণীর পরিবর্তনের সাম্প্রতিক উদাহরণ হল ১১/১ টাগোর কাসল স্ট্রিটের শিবমন্দির।

১৯/এ বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিটস্থ রাধানাথ জীউর মন্দিরটি অত্যন্ত জীর্ণ হয়ে পড়ায়, সেবায়েতরা শিল্পসম্মতভাবে মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করেছেন। রুচির দিকটি রক্ষিত হলেও, এর ফলে মন্দিরটির আদি রূপটির সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটেছে।

উপসংহার

বর্তমান আলোচনা থেকে একটি সিদ্ধান্ত স্পষ্ট বেরিয়ে আসে—কলকাতায় পুরাকীর্তি হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য শতাধিক বছরের প্রাচীন মন্দিরের অভাব নেই। স্থাপত্য ও প্রতিষ্ঠালিপি থেকে আমরা মন্দিরগুলির বয়স নির্ধারণে নিঃসংশয় হয়েছি। কলকাতার পুরনো মন্দিরগুলির গঠনকৌশল ও অলংকরণও কম চিত্তাকর্ষক নয়।

নিম্নবঙ্গের যে কোনো মহকুমার সঙ্গে তুলনা করলে কলকাতার মন্দির-বৈচিত্র্য কোনো-ক্রমেই পশ্চাদ্‌পর বলে প্রতিভাত হবে না।

খেদের কথা, কলকাতার গৌরব বলে বিবেচিত হতে পারতো এমন বহু মন্দির লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু অঙ্কিত চিত্র বা আলোকচিত্র থেকে সেগুলির রূপকল্প সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি। ছবিগুলি নিয়ে অনুপুঙ্খ অন্বেষণ চালালে কলকাতার সাবেকী মন্দির-স্থাপত্যের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে অনেক নতুন উপাদান আবিষ্কৃত হতে পারে। কাজেই বিষয়টি গবেষণার যোগ্য। এইসব তথ্য বিচারের পর, কলকাতার মন্দির-স্থাপত্য 'আদৌ চিত্তাকর্ষক নয়', এমন কথা আর মেনে নেওয়া যায় না।

কলকাতার মন্দির সৌধাবলী কিভাবে রূপান্তরিত হয়েছে বা হচ্ছে, সেকথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তাছাড়া 'মেট্রোপলিস' কলকাতা একদিকে যেমন জনবহুল হয়ে উঠেছে, তেমনি সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে ভক্তজনের সংখ্যাও। ভগ্নপ্রায় মন্দিরের সংস্কারকালে এইসব অত্যুৎসাহী ভক্তরা সাবেক অলংকরণগুলি বিনষ্ট করে তার জায়গায় লাগিয়েছেন সেরামিক টালি বা রঙের প্রলেপযুক্ত স্থূল অলংকরণ। অনেক ক্ষেত্রে আদি মন্দিরের রূপকল্প ধূলায় মিশিয়ে তৈরি হয়েছে আধুনিক কেতার রুচিহীন মন্দির। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই রূপান্তরের পৃষ্ঠপোষণ করেছেন বহিরাগত ধনী অবাঙালি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়।

কলকাতার নদীতীরবর্তী প্রাচীন অঞ্চলগুলি মন্দিরবহুল; তুলনায় নবীনতর এলাকাগুলিতে মন্দিরের সংখ্যা খুবই কম। আধুনিকতার আবহাওয়ায় পরিপোষিত নতুন বসতকারীরা ধর্মীয় গোঁড়ামি বা দেবনির্ভরতার দিকে ততটা আগ্রহ দেখাননি বলেই এমনটি ঘটেছে। সেকালের মতো আজকের উঠতি বাঙালি ধনীরাও আর মন্দির নির্মাণ করে পুণ্যার্জন বা গরিমা প্রকাশের চেষ্টা করেন না। বর্তমান কলকাতায় দেব-স্থাপনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে ফুটপাথে আর বেওয়ারিশ গাছতলায়, তাও প্রধানত বহিরাগত অবাঙালি ধর্মভীরুদের দৌলতে। ফলে একদিকে প্রথাগত মন্দির-স্থাপত্যের বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে, অন্যদিকে দেবমাহাত্ম্যের দিকেই নজর পড়েছে বেশি। এ শতকের গোড়ার দিকে যেসব মন্দির নির্মিত হয়েছে, সেগুলির স্থাপত্যে দেখা যায় সস্তায় কিস্তিমাতের হতাশাব্যঞ্জক প্রচেষ্টা। প্রথাগত মন্দির-স্থাপত্য আজকের বাঙালির কাছে গুরুত্বহীন ও অপ্রয়োজনীয়। তাই এ সিদ্ধান্ত অমূলক নয় যে, ঐতিহ্যময় মন্দির-স্থাপত্য প্রয়োগ বা পুনরুজ্জীবনের পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। উন্নতির আশা যেখানে বৃথা, সেখানে টিকে থাকা মন্দিরগুলি যে ক্রমেই অবলুপ্তি অথবা রূপান্তরের পথে পা বাড়াবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ রাজ্যের পুরাকীর্তি সংরক্ষণের ভার রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীন প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের হাতে। এই দপ্তর বিভিন্ন জেলার অনেক জীর্ণ ও পরিত্যক্ত মন্দির সংস্কার করে সেগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই দপ্তর সংরক্ষিত পুরাকীর্তির যে তালিকা সম্প্রতি প্রণয়ন করেছেন, তার মধ্যে কলকাতার কয়েকটি গির্জা ও মসজিদের নাম থাকলেও কোনো মন্দিরের উল্লেখ

নেই। কলকাতার ধ্বংসোন্মুখ বেশ কিছু প্রাচীন মন্দির কিভাবে তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল, তা বোঝা শক্ত। কলকাতার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন মন্দিরের দিকে আমরা বিনীতভাবে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই মন্দিরগুলির আশু সংরক্ষণ জরুরি :

১. বনমালী সরকার প্রতিষ্ঠিত ২/৫, বনমালী সরকার স্ট্রিটের আটচালা মন্দির (আঠারো শতক)।
২. গোবিন্দরাম মিত্র স্থাপিত কুমোরটুলির দোচালাযুক্ত নবরত্ন (আঠারো শতক)।
৩. মহম্মদ রমজান লেনের দুর্গেশ্বর শিবের আটচালা মন্দির (১৭৯৪)।
৪. নন্দরাম সেন প্রতিষ্ঠিত নন্দরাম সেন স্ট্রিটের আটচালা মন্দির।
৫. খিদিরপুরের ভূকৈলাস রাজবাড়ির রক্তকমলেশ্বর শিবমন্দির (১৭৮০) এবং কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর শিবমন্দির।
৬. ৭৮ ও ৯৩, টালিগঞ্জ রোডের মন্দিরগুচ্ছ (যথাক্রমে ১৮৩৪ ও ১৮৪৭)।
৭. ১, মণ্ডল টেম্পল লেনের নবরত্ন মন্দির (১৮০৯)।
৮. ৯৬/১/১, মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের জোড়া আটচালা মন্দির (আ. উনিশ শতকের প্রথমদিক)।
৯. ১, হরিনাথ দে রোডের (শিববাগান) আটচালা মন্দির (আ. উনিশ শতকের মধ্যভাগ)।
১০. ৮১, শ্যামবাজার স্ট্রিটের পীঢ়া দেউল (আ. উনিশ শতকের প্রথমার্ধ)।
১১. টালিগঞ্জ স্টুডিয়োপাড়ায় ঘোষ পরিবারের মন্দিরগুচ্ছ (উনিশ শতকের প্রথমদিক)।

ম্যাককাচ্চন প্রমুখ গবেষকদের রচনার কল্যাণে দেশে-বিদেশে বাংলার মন্দির-স্থাপত্য নিয়ে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। কলকাতার প্রথাসিদ্ধ প্রাচীন মন্দিরগুলির সংস্কার ও সংরক্ষণ সাধিত হলে সেগুলি দর্শনীয় হয়ে উঠবে, ফলে এ শহরের পর্যটন তাৎপর্য বাড়তে পারে। কলকাতার মন্দির-স্থাপত্যের বিলীয়মান শেষ চিহ্নগুলি টিকিয়ে রাখার জন্য যেমন সরকারি সহৃদয়তার প্রয়োজন আছে, তেমনি দরকার রয়েছে গণচেতনার। কলকাতার জনমানসে সচেতনতা সৃষ্ট না হলে এ বিষয়ে সুফল পাওয়ার উপায় নেই।

সারণি—১

কলকাতার কয়েকটি মাঝারি আটচালা মন্দির			
বিগ্রহ	অবস্থিতি	প্রতিষ্ঠাতা	নির্মাণকাল
১. শিব	ফিরিঙ্গি কালীমন্দির সংলগ্ন	—	আ. আঠারো শতকের প্রথমদিক।
২. শিব	বেলেঘাটা : সুরেন সরকার রোড	—	আ. আঠারো শতকের শেষদিক।
৩. 'পুষ্পেশ্বর' শিব	ঠনঠনিয়ার কালী-মন্দির সংলগ্ন	রামশংকর ঘোষ	১৮০৬।
৪. শিব	৫৯/এ,বাগবাজার স্ট্রিট	মিত্র পরিবার	আ. উনিশ শতকের প্রথম-দিক।
৫. শিব	বেনিয়াটোলা লেন	—	আ. উনিশ শতকের প্রথম-দিক (লিপিফলক অপসৃত)।
৬. শিব	১, বারাণসী ঘোষ স্ট্রিট	—	আ. উনিশ শতকের প্রথম-দিক।
৭. শিব	১, হরিনাথ দে রোড (শিববাগান বস্তি)	বিশ্বাস পরিবার	আ. উনিশ শতকের মধ্য-ভাগ (লিপিফলক বিনষ্ট)।
৮. 'রামেশ্বর-নাথ' শিব	২৫, বাগমারি রোড	—	আ. উনিশ শতকের মধ্য-ভাগ (লিপিফলক বিনষ্ট)।
৯. 'শান্তি-নাথ' শিব	১১, বৃন্দাবন বসু লেন	শিবচন্দ্র গুহ	১৮৫০।

সারণি—২

কলকাতার কয়েকটি ক্ষুদ্রকায় আটচালা মন্দির			
বিগ্রহ	অবস্থিতি	প্রতিষ্ঠাতা	নির্মাণকাল
১. 'রামচন্দ্রেশ্বর শম্ভু' শিব	রবীন্দ্র সরণি ও গুপ্ত লেনের মোড়ে	রামচন্দ্র দত্ত	আ. আঠারো শতকের মধ্যভাগ।
২. শিব	২, নবাব লেন	—	আ. আঠারো শতকের মধ্যভাগ।
৩. শিব	৯/১. রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট	রামলক্ষ্মণ দত্ত	১৮০৫।
৪. 'কালীকিংকর' শিব	২০৫/১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড	বিশ্বাস পরিবার	আ. উনিশ শতকের প্রথমদিক।
৫. 'ভুবনেশ্বর' শিব	বাগবাজার, মদনমোহনতলার পূর্বদিকে।	কৃষ্ণকান্ত মিত্র	আ. উনিশ শতকের প্রথমদিক।
৬. শিব	৩২/১. শিবতলা স্ট্রিট	—	আ. উনিশ শতকের প্রথমদিক।
৭. 'অম্বিকানাথ' শিব	১১৯/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড	ঘোষ পরিবার	আ. উনিশ শতকের প্রথমদিক [প্রতিষ্ঠালিপি অস্পষ্ট]।
৮. 'শঙ্করজীউ' শিব	১১/১, টাগোর কাস্‌ল্ স্ট্রিট	বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার	আ. উনিশ শতকের মধ্যভাগ।
৯. 'রামেশ্বর' শিব	১১/১. বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিট	বসাক পরিবার	আ. উনিশ শতকের মধ্যভাগ।
১০. শিব	২২. শ্যামবাজার স্ট্রিট	ভট্টাচার্য পরিবার	আ. উনিশ শতকের মধ্যভাগ।
১১. শিব	৫৫/বি. শ্যামপুকুর স্ট্রিট	ভট্টাচার্য পরিবার	আ. উনিশ শতকের মধ্যভাগ।
১২. 'শৈলেশ্বর' শিব	১৩, হরীতকীবাগান লেন	যাজ্ঞিক পরিবার	আ. উনিশ শতকের মধ্যভাগ।
১৩. 'রামেশ্বর' শিব	৬৩, মানিকতলা মেন রোড	বসাক পরিবার	আ. উনিশ শতকের মধ্যভাগ।
১৪. 'কেদারনাথ' শিব	১১৯, রাজা রামমোহন সরণি	ভোলানাথ সাধুখাঁ	১৮৬৮।
১৫. 'দুর্গেশ্বর' শিব	১, তারক প্রামানিক রোড	দুর্গামণি দেবী	৩০ ফাল্গুন, ১২৯১ বঙ্গাব্দ (১৮৮৫ খ্রীঃ)।

সারণি—৩

কলকাতার কয়েকটি জোড়া আটচালা মন্দির			
	উঁচু পোস্তাযুক্ত আটচালা মন্দির		
বিগ্রহ	অবস্থিতি	প্রতিষ্ঠাতা	নির্মাণকাল
১. শিব	৯৬/১/১, মসজিদবাড়ি স্ট্রিট	সেন পরিবার	আ. আঠারো শতকের শেষদিক (বর্তমানে ধ্বংসোন্মুখ)।
২. শিব	৯১/৯/১, আপার চিৎপুর রোড (কচুরি গলি)	শেঠ পরিবার	আ. উনিশ শতকের প্রথমদিক।
৩. শিব ও কালী	৮৫, অখিল মিস্ত্রি লেন	রাজনারায়ণ দাস	১৮৪৮।
৪. শিব	৬১, ডাবলিউ. সি. বোনার্জি স্ট্রিট	দে পরিবার	আ. উনিশ শতকের শেষদিক।
	সাধারণ পোস্তাযুক্ত আটচালা মন্দির		
১. 'চণ্ডেশ্বর' ও 'জগদীশ্বর' শিব	৫১, সিকদারপাড়া স্ট্রিট (তারাসুন্দরী মন্দির সংলগ্ন)	মুখোপাধ্যায় পরিবার	আ. আঠারো শতকের শেষদিক।
২. শিব	১/২, কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রিট	কৃষ্ণরাম বসু	আ. আঠারো শতকের শেষদিক।
৩. শিব	১০/এ, লাটুবাবু লেন	ছাতুবাবু-লাটুবাবু	আ. উনিশ শতকের প্রথমদিক।
৪. শিব	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ অ্যাভেনিউ	গাঙ্গুলী পরিবার	আ. উনিশ শতকের মধ্যভাগ।
৫. 'জগদীশ্বর' ও 'কনকেশ্বর' শিব	১৮৮/২, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড	জগন্মোহন বসাক	১২৫৯ বঙ্গাব্দ (১৮৫২)।

সারণি—৪

কলকাতার কয়েকটি পঞ্চরত্ন মন্দির			
বিগ্রহ	অবস্থিতি	প্রতিষ্ঠাতা	নির্মাণকাল
১. শিব ২. শিব	১৮/১, কেনডারডাইন লেন	ত্রিলোকরাম পাকড়াশী	১৭৮৫।
৩. শিব	৭৮, টালিগঞ্জ রোড	উদয়নারায়ণ মণ্ডল	১৮৩৪।
৪. শিব ৫. শিব	৯৩, টালিগঞ্জ রোড (হরিহর ধাম)	প্যারিলাল ও মণিমোহন মণ্ডল	১৮৪৭।
৬. শিব ৭. শিব	১৬২, কালীঘাট রোড	অঘোর দত্ত	১৯০২।
৮. শিব	রতনবাবু রোড, কাশীপুর	নড়াইলের রায় পরিবার	আ. বিশ শতকের প্রথমদিক।
৯. অন্নপূর্ণা	২/৩, রামকৃষ্ণ লেন	সরকার পরিবার	১৯২২।

সারণি—৫

কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলের কয়েকটি নবরত্ন মন্দির			
বিগ্রহ	অবস্থিতি	প্রতিষ্ঠাতা	নির্মাণকাল
১. রাধাকান্ত	১. মণ্ডল টেম্পল লেন	রমানাথ মণ্ডল	১৭৯৬-১৮০৭ (দেব-প্রতিষ্ঠা : ১৮০৯)।
২. গোপাল	শোভাবাজার স্ট্রিট	সুর পরিবার	আ. উনিশ শতকের প্রথমদিক।
৩. গোপাল	৯৩, টালিগঞ্জ রোড	প্যারিলাল ও মণিমোহন মণ্ডল	১৮৪৬।

(বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

সারণি—৫ (পরবর্তী অংশ)

কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলের কয়েকটি নবরত্ন মন্দির

বিগ্রহ	অবস্থিতি	প্রতিষ্ঠাতা	নির্মাণকাল
৪. 'কৃপাময়ী' কালী	৩৯, হরকুমার ঠাকুর স্ট্র্যাণ্ড	জয়নারায়ণ মিত্র	১৮৫১।
৫. 'ব্রহ্মময়ী' কালী	২২৫, প্রামাণিক ঘাট রোড	দুর্গাপ্রসাদ ও রামগোপাল দে-প্রামাণিক	১৮৫৩।
৬. 'ভবতারিণী' কালী	দক্ষিণেশ্বর	রানী রাসমণি	১৮৫০-১৮৫৫।
৭. 'নিস্তারিণী' কালী	২৫, বেথুন রো	ঈশ্বরচন্দ্র নান	১২৭২ বঙ্গাব্দ (১৮৬৫ খ্রীঃ)।
৮. অন্নপূর্ণা	ব্যারাকপুর-তালপুকুর	জগদম্বা বিশ্বাস	১৮৭৫।
৯. 'ভবতারিণী' কালী	২/২এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রিট	দয়াময়ী ঘোষ	১৮৮৮।
১০. 'সীতানাথ' ও 'বালকনাথ' শিব	২৩, তারক প্রামাণিক রোড	রামাসুন্দরী কুণ্ডু	২৮ আষাঢ়, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ (১৯০০ খ্রীঃ)।
১১. 'উমাসুন্দরী' কালী	বাবুরাম ঘোষ লেন	নিত্যকালী দাসী ও অন্যান্য	১৯২২।
১২. সমাধিমন্দির	কেওড়াতলা মহাশ্মশান	ময়মনসিংহের জমিদারবংশ	বিশ শতকের প্রথমদিক।
১৩. গৌর-নিতাই	১৬/এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী স্ট্রিট	জগবন্ধু দত্ত	১৯৩০।
১৪. রাসেশ্বরী-রাসবিহারী	১০, রামকান্ত বসু স্ট্রিট	কড়ুরি পরিবার	১৯৪০।

উল্লেখপঞ্জী

১. H. E. A. Cotton, 'Calcutta Old and New', (Ed. N.R. Ray, Revised Edition, 1980), pp. 792-804.

২. বিভিন্ন পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা পূর্ণচন্দ্রের প্রবন্ধগুলিতে কলকাতার প্রাচীন মন্দির-গুলি সম্বন্ধে প্রচুর মূল্যবান তথ্য আছে। বাগবাজারের মদনমোহন-মন্দিরের বিষয়ে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ বই লিখেছিলেন : 'মদনমোহন-ঠাকুর ও গোকুলচন্দ্র মিত্র' (১৯৩৭)। বইটিতে অন্যান্য কয়েকটি মন্দিরের কথাও আলোচিত হয়েছে।

৩. পঞ্চানন রায়ের দুটি প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ হল : 'কলিকাতার মন্দির ও মণ্ডপ' ('প্রবাসী', ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৫৯) ও 'বাংলার মন্দির' ('প্রবর্তক', জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮)। তাঁর 'বাংলার মন্দির' গ্রন্থেও (১৯৭৪) আলোচিত হয়েছে কলকাতার মন্দির-প্রসঙ্গ।

৪. David McCutchion, 'The Temples of Calcutta', 'Bengal Past and Present', January-June 1968, pp. 45-58. [পরবর্তী পাদটীকায় 'McCutchion' নামে উল্লিখিত]।

৫. Amiya Kumar Banerji, 'Temples in Calcutta and its Neighbourhood', 'Bengal Past and Present', January-June 1968, pp. 99-105.

৬. বিনয় ঘোষ, 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত', ২য় খণ্ড (১৯৮৩), পৃঃ ২৫৮–২৬৬.

৭. রাধারমণ মিত্র, 'কলিকাতা-দর্পণ' (১৯৮০), পৃঃ ৫৯-৭৮।

৮. 'পুরশ্রী' ('কলকাতা-পুরশ্রী') পত্রিকায় প্রকাশিত বর্তমান লেখকের প্রবন্ধমালা :

ক. রামেশ্বর শিবের মন্দিরলিপি : মন্দির প্রাঙ্গণে কবিতায় নোটিশ (২৬.৮.৭৮)

খ. হাটখোলার দুর্গেশ্বর শিবমন্দির (২৩.৯.৭৮)

গ. চেতলার নবরত্ন মন্দির (২৮.১০.৭৮)

ঘ. নবরত্ন মন্দিরের ধারাবাহিকতা (১১.১১.৭৮)

ঙ. জগন্নাথ মন্দির (২৫.৫.৮৫)

এ ছাড়াও দ্র. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, 'নাগরিকতা ও বাঙ্গালী', 'নাগরিক সমাচার', বিশেষ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৮, পৃঃ ৩-৪ [পরবর্তী পাদটীকায় 'নাগরিকতা ও বাঙ্গালী' নামে উল্লিখিত]।

৯. 'The origin of the bunglow must be ascribed to another Bengal feature, the double roofed house···the bunglow only represented a convenient solution to a practicable problem. It was cheap and quick to build and was suitable for the climate'—Stew Nilsson, 'European Architecture in India', 1750-1850, p. 188.

১০. 'Bunglow—n. One storeyed house, orig. lightly built or temporary ···f. Hind. 'bangla' belonging to Bengal.'—'The Concise Oxford Dictionary of Current English' (1972), p. 158.

১১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. Asok Kumar Das, 'Building Jaipur City :

Sawai Jai Singh's Capital', 'The India Magazine', June 1989, pp. 20-31.

১২. অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' (২য় সং, ১৯৭৫), পৃঃ ১১।

১৩. কালীময় ঘটক, 'দ্বিতীয় চরিতাষ্টক' (২য় সং, ১২৮৯), পৃঃ ১-২।

১৪. 'নাগরিকতা ও বাঙ্গালী', পৃঃ ৪।

১৫. সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'কালীক্ষেত্র দীপিকা' (১৮৯১), পৃঃ ৯৮।

১৬. ম্যাককাচ্চন তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে (পৃঃ ৫১) লিখেছিলেন যে, মন্দিরটি বন্দ্যোপাধ্যায়দের প্রতিষ্ঠিত। সেকথার প্রতিবাদে শ্রীরাধারমণ মিত্র লেখেন : 'ব্যানার্জিবাবুরা তৈরি করেননি, করেছিলেন মণ্ডলবাবুরা। কিন্তু তাঁরা ঐ মন্দিরের মধ্যে কোনো ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেননি। ঐ খালি মন্দির ব্যানার্জিবাবুরা মণ্ডলবাবুদের কাছ থেকে কিনে নেন এবং ১৯৪৯ সালে লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ তার ভেতর প্রতিষ্ঠা করেন।' ('কলিকাতা-দর্পণ', পৃঃ ৭৮)

ক্ষেত্রানুসন্ধানে জানা গেছে, ম্যাককাচ্চনের মতো শ্রীমিত্রও সঠিক তথ্য উদ্ধার করতে পারেননি। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা মথুর শা অমিতব্যয়িতার জন্য ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি নিজেই, বা তাঁর কোনো উত্তরাধিকারী, মন্দিরটি সহ সংলগ্ন ভদ্রাসন উত্তরপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়দের কাছে বন্ধক রাখেন। ঋণ অনাদায়ী থাকার ফলে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ বন্দ্যোপাধ্যায়রা সমগ্র সম্পত্তিটি কিনে নেন। তাঁরা মন্দিরটির কিছু পরিবর্তন সাধন করেছেন—মন্দিরের চারপাশের বারান্দা টিনের চাল ও ঢালাই লোহার রেলিং দিয়ে ঘিরে নেওয়া হয়েছে।

১৭. McCutchion, p. 52.

১৮. গৌতম মুখোপাধ্যায়, 'কলকাতার উপাসনালয়', 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট', কলকাতা সংখ্যা, ১৯৭৭, পৃঃ ৫৫।

১৯. শিবেন্দু মান্না, 'পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বর ও একটি ঐতিহাসিক নথি', 'কৌশিকী', শারদীয় সংখ্যা, ১৯৮৮, পৃঃ ৪৬।

২০. দ্র. Tarapada Santra, 'Architects and Builders : Brick Temples of Bengal', 'From the Archives of David McCutchion', (Princeton University Press, 1983), pp. 53-62.

২১. 'হরিহরধাম' মন্দিরগুচ্ছের (৯৩, টালিগঞ্জ রোড) শিলালিপিতে বলা হয়েছে : 'রাশী সঙ্খ্যা কাশীপতি সানন্দে বেষ্টিত : / মধ্যে নবরত্নে শ্রীগোপাল বিরাজিত।'

২২. 'Calcutta Review', Vol. III, no. 6, January 1845। নিবন্ধটির পুনর্মুদ্রিত রূপ ও প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিটির জন্য দ্র. Alok Roy (ed.), 'Calcutta Keepsake' (1978), p. 190.

২৩. A Member of the family, 'An Account of the late Govindaram Mitter &c.' (1869), p. 78.

২৪. R. C. Sterndale, 'An Historical Account of the Calcutta Collectorate' (2nd Ed., 1958), p. 14.

২৫. সাম্প্রতিক কালের কয়েকজন শ্রদ্ধাস্পদ ও স্বনামধন্য গবেষকও সেই ভুলের প্রবাহ অব্যাহত রেখেছেন। যেমন :

ক. 'নবরত্ন মন্দিরের মধ্যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে নির্মিত চিৎপুরের গোবিন্দরাম মিত্রের মন্দির অন্যতম। অধুনালুপ্ত এই নবরত্ন মন্দির চিত্রকর ড্যানিয়েল অঙ্কিত প্রাচীন কলকাতার চিত্রে দেখা যায়।'—বিনয় ঘোষ, 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত', ২য় খণ্ড (১৯৮৩), পৃঃ ২৬১-২৬২।

খ. '…গোবিন্দরাম মিত্রের নবরত্ন মন্দির। গোবিন্দরাম মিত্র ১৭৩০ সালে চিৎপুর রোডে ঐ মন্দির তৈরি করেন। ১৭৩৭ সালে ১০ সেপ্টেম্বরের (মতান্তরে ১১ সেপ্টেম্বরের) মহাঝড়ে ও ভূমিকম্পে ঐ মন্দির ভেঙ্গে পড়ে।'—রাধারমণ মিত্র, 'কলিকাতা-দর্পণ' (১ম পর্ব), (১৯৮০), পৃঃ ৬৯।

গ. 'চিৎপুর রাস্তার পাশে আরও একটি মন্দির ছিল—নবরত্ন মন্দির। এর প্রতিষ্ঠা-কাল ১৭৩০ খ্রীঃ। প্রতিষ্ঠাতা 'ব্ল্যাক জমিদার' গোবিন্দরাম মিত্র।'—নিশীথরঞ্জন রায়, 'চিৎপুর রোড-এর নাম উৎপত্তি', 'প্রতিক্ষণ', ৪ বর্ষ ১৮ সংখ্যা, পৃঃ ২২।

২৬. McCutchion, p. 53.

২৭. Liny Biswas, 'The Lost Image of Chitreswari : Some speculations about Govindaram Mitra's Temple', 'Bengal Past and Present', Jan.-Dec. 1982, No. 192-193, p. 9. [পরবর্তী পাদটীকায় 'Liny Biswas' নামে উল্লিখিত]।

২৮. A Member of the family, 'An Account of the late Govindaram Mitter &c.' (1869), p. 2.

২৯. Liny Biswas, p. 9.

৩০. Ibid. [চিত্র-পরিচিতি দ্র.]

৩১. McCutchion, p. 53.

৩২. বর্তমানে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'ভবতারিণী' নামে পরিচিত হলেও, রাসমণির দলিলে তাঁকে অভিহিত করা হয়েছে 'রাজরাজেশ্বরী' নামে। 'রাজরাজেশ্বরী' কিভাবে এবং কবে 'ভবতারিণী'-তে পরিণত হলেন, সে-বিষয়ে অদ্যাবধি কোনো গবেষক আলোকপাত করেননি।

৩৩. মন্দিরটিতে নিবদ্ধ বর্তমান প্রস্তরলিপির পাঠ : 'স্থাপিত ৩০শে চৈত্র, ১২৭১ সাল। শ্রীশ্রী ৺ ব্রজেশ্বর মহাদেব জীউ। সেবায়েৎ ৺ রাজকৃষ্ণ দাস। সংস্কার ১লা বৈশাখ, সন ১৩৬৩ সাল।'

৩৪. পুঁটে কালীর মন্দিরের মর্মরলিপির বয়ান : 'পুঁটে কালীতলা স্থাপিত ৯৬৪ / পিতা মহন্ত ৺ গোলাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মাতা ৺ লক্ষিমণি দেবী / পুত্র শ্রীতারকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় / ২০ নং / কলিকাতা-৭ /'।

ফিরিঙ্গি কালীবাড়ির ফলকে মন্দিরটি ৯০৫ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত বলে দাবি করা হয়েছে। পুঁটে কালীমন্দিরের মতো এ দাবিটিও নিতান্ত অবাস্তব। ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে কখনই এ ধরনের মন্দির নির্মিত হতে পারে না।

৩৫. Sudhansu Kumar Ray, 'The Artisan Castes of West Bengal and their Craft', In 'The Tribes and Castes of West Bengal' (Ed. A. Mitra, 1953), pp. 321-322.

৩৬. বিনয় ঘোষ, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', ১ম খণ্ড (১৯৭৬), পৃঃ ৩৪৫-৩৪৬।

৩৭. McCutchion, pp. 54-55.

৩৮. তারাপদ সাঁতরা, 'পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদ : উত্তর মেদিনীপুর' (১৯৮৭), পৃঃ ৯০।

৩৯. স্বামী গম্ভীরানন্দ, 'শ্রীরামপুর-ভক্তমালিকা', ২য় ভাগ (১৩৫৯), পৃঃ ৩৯০।

৪০. ভ্রমবশত ম্যাককাচ্চন মন্দিরটির ঠিকানা ২/৫ কেবলকৃষ্ণ সুর স্ট্রিট লিখেছেন (McCutchion, p. 55)। এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করেছেন বিনয় ঘোষ ('কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত', ২য় খণ্ড, ১৯৭৫, পৃঃ ২৬৫)।

৪১. এই ফলকটি ম্যাককাচ্চন দেখেছিলেন, কিন্তু পরে সেটি অপহৃত হয় (McCutchion p. 56)।

৪২. ম্যাককাচ্চন এ মূর্তিগুলিকে 'শঙ্খনির্মিত' বলেছেন (McCutchion, p. 57)।

৪৩. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. তারাপদ সাঁতরা, 'বাংলার দারুভাস্কর্য' (১৯৮০)।

৪৪. তারাপদ সাঁতরা, 'জগন্নাথ মন্দির', 'কলকাতা পুরশ্রী', ২৫ মে ১৯৮৫, পৃঃ ৪৬-৪৮।

৪৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাঃ), 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা ও অন্যান্য সমাজচিত্র' (সাহিত্য পরিষৎ, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৩৯১), পৃঃ ৭।

৪৬. ওলাইচণ্ডী মন্দিরের লিপির বয়ান : 'শ্রীশ্রী৺ওলাইচণ্ডী মাতা ঠাকুরানী ॥/ শ্রীনীলমণি চক্রবর্ত্তী / পুত্র / শ্রীগোপীনাথ চক্রবর্ত্তী / সেবাইত ও অধিকারী / জেলা ২৪ পরগণা বেলগাছিয়া / সন ১২৯৮ সাল : ১লা বৈশাখ।'

৪৭. কেদারনাথ শিবমন্দিরের শিলালিপির বক্তব্য : 'শ্রীশ্রী৺ কেদারনাথ শিব ঠাকুর / ও শ্রীশ্রী৺ শ্রীধর ঠাকুর :— / সন ১২৭৫ সন তাঃ—২ মাঘ'।

৪৮. দুর্গেশ্বর শিবমন্দিরের লিপিতে রয়েছে : 'অঙ্গৌষধীশ ধরণীধর / শীতরশ্মি। প্রখ্যাত শক / সময়ে পিতৃরাজ্ঞয়ৈতত্‌ / সংস্থাপিতং মদনমোহন / দত্ত পুত্রৈ দুর্গেশ্বরাখ্যা শিব / লিঙ্গ মভূত্‌ সুসৌধে ॥ ১৭১৬'।

৪৯. রাধাকান্ত মন্দিরের লিপিটি এরকম : 'শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ শকাব্দাঃ ১৭১৮। / শাকেষ্টাদশ বাজি চন্দ্র গণিতে কুম্ভস্থিতে / ভাস্করে রাধাকান্তমুদে শুভাশয়যুতে / গঙ্গোপকণ্ঠস্থলে। আরব্ধং নবরত্ন / মেতদমলং তদ্রামনাথেন দাসেনা / স্মি ১৭২৯ ন্নবযুগ্মমৈত্রী বিমিতে / পূন্তত্ব মাগান্মধ্যৌ ॥ ইতি ॥ পুনশ্চ ১৭৩১ ত্রিসংক্রান্ত্যাং সর্ব্বপূর্ণত্ব / মগাত।'

৫০. পাতটিতে খোদিত আছে : 'গগণচাঁদ মল্লিক / সন্তোষকুমারী দাসী'।

৫১. প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ এরকম : '৺ স্বর্গীয় পরমপূজ্য শেঠ পরশরাম মহাপ্রাণের /

সুপুত্র ৺ রামপ্রসাদ মহাশয় তস্য পুত্র মহামতি চিরঞ্জিব হুবলাল ও তাহার / কনিষ্ঠ ভ্রাতা গয়াসিরাম মাথুর বৈশ্য ব্রজবাসি / গ্রাম রেপুরা জেলা গোয়ালিয়র / শ্রীশ্রী ১০৮ শিবশঙ্কর মহাদেবতার মন্দির / সন ১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষ ৪ঠা বৃহস্পতিবার / ত্রয়োদশী তিথিতে স্থাপিত হইল। নং ১২৩/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।'

৫২. অন্নপূর্ণা মন্দির সংলগ্ন চারটি পশ্চিমমুখী শিবমন্দিরের মধ্যে যেটি উত্তরদিক থেকে দ্বিতীয় এবং দক্ষিণদিক থেকে তৃতীয়, সেটির প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ : 'শাকে বিলেশয়-বিলর্ত্তু বিধৌবিধায় / চিত্তেঽভিলাষফলদং গুরুপাদপদ্মম্। / ঈশস্য সংস্থিতিকৃতো দ্বিজবিষ্ণুরামোহ—/ কার্ষীদ্ধি মন্দিরমিদং পরমিষ্টকীর্ত্তিঃ।' [দ্র. পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর, মদনমোহন-ঠাকুর ও গোকুলচন্দ্র মিত্র (১৯৩৭), পৃঃ ২২]।

৫৩. বিলুপ্ত মন্দিরের লিপিটি এরকম : 'শাকে বাণ যুগাব্ধিচন্দ্রগণিতে মেষোনবিংশে দিনে। বারেভূমি সুতস্য বিপ্রকুলজঃ সৌধং দশম্যাং তিথৌ ॥ শ্রীশ্যামাভিধকো দদৌ সুরধুনী ক্ষেত্রোপকণ্ঠে শিবম। প্রীত্যৈ পুণ্যবতো মদাশ্বরিতয়োঃ পিত্রোঃ স্বয়ং যত্নতঃ ॥' (১৭২৫ শক)

৫৪. ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে দুটি লিপি আছে :

(ক) পুবদিকে—'শ্রীশ্রীদুর্গা / শঙ্করের হৃদয়ে মাজে / কালী বিরাজে।'

(খ) পশ্চিমদিকে—'সিদ্ধেশ্বরী কালী মাতার মন্দির / স্বর্গীয় মহাত্মা / শঙ্কর ঘোষ কর্ত্তৃক / প্রতিষ্ঠিত। / সন ১২১০ সাল।'

কালীমন্দিরের সংলগ্ন পুষ্পেশ্বর শিবের আটচালা মন্দিরে উৎকীর্ণ লিপির বয়ান : 'শ্রীমন্দিরে সমস্থাপি শ্রীমৎ পুষ্পেশ্বর শিবঃ / মনোহর স্ত্রিয়াদৌস্যা। শকাব্দেঽদ্বিদ্বিপর্ককে ১৭২৮ সন ১২১৩। তারিখ ১ বৈশাখ।—'

ম্যাককাচ্চন এই কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছিলেন (McCutchion, p. 50)। প্রতিবাদে শ্রীরাধারমণ মিত্র মহাশয় ('কলিকাতা-দর্পণ', পৃঃ ৭৭) লেখেন যে, প্রতিষ্ঠালিপিতে ১১১০ সাল খোদিত আছে, যা ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দের সমার্থক। কিন্তু আমরা লিপিটি পড়ে দেখেছি যে ম্যাককাচ্চন ঠিকই লিখেছিলেন, রাধারমণবাবুর সিদ্ধান্তই ভুল।

৫৫. মজুমদারদের মন্দিরলিপির বয়ান : 'শ্রীশ্রী শিবো জয়তি ॥ / দ্বারকানাথ জননী হরিনারায়ণাত্মজা। / হরিমোহনপত্নী শ্রীমুক্তকেশী শিবোচ্ছায়া ॥ / নভোঽগ্নি বসু ভূ মানে শাকে বিপ্রকুলোজ্বলা। / মন্দিরং মুক্তিনাথস্য প্রতিষ্ঠিতবতী মুদা॥' (১৮৩০ শক)

৫৬. ৮৫ অখিল মিস্ত্রি লেনের জোড়া মন্দিরে দুটি লিপি রয়েছে :

(ক) 'শ্রীশ্রীশিবানী শিবৌজয়তঃ / সন ১২৫৫ শাল শকাব্দাঃ ১৭৭০। ১১ ফাল্গুন / শ্রীরাজনারায়ণ দাসের হৃদেয়ে শ্রীশ্রী শিবানী শিবেঃ বিরাজ / ভবাব্ধি ভীতি বিধ্বংসি ভবানী ভব মন্দির / রাজনারায়ণো দাসো নির্ম্মমে ভক্তিতঃশ্রিয় ॥'

(খ) 'শ্রীশ্রীশিবানীশিবৌজয়তঃ ॥ / ১১ ফাল্গুন সন ১২৫৫ শাল শকাব্দাঃ ১৭৭০ /

শ্রীরাজনারায়ণ দাসের হৃদয়ে শ্রীশ্রীশিবানী শিব বিরাজ করিতেছেন / ভবাব্ধি-ভীতি বিধ্বংসি ভবানী ভবমন্দিরম ॥ / রাজনারায়ণো দাসো নির্ম্মমে ভক্তিতঃশ্রিয়ঃ ॥'

৫৭. গর্ভগৃহের প্রবেশপথের সামনে ধাপ হিসাবে ব্যবহৃত কষ্টিপাথরে লেখা আছে : 'শ্রীকৃষ্ণকান্ত মিত্র / শ্রীক্ষেত্রমণি দাসি।' সাম্প্রতিককালে মন্দিরটির গায়ে একটি মর্মরলিপি লাগানো হয়েছে : 'ভুবনেশ্বর মন্দির / স্বর্গীয় নিতাইলাল মিত্র / জন্ম ১৩২৭। ২৫ ভাদ্র / মৃত্যু ১৩৫৯। ১৫ জ্যৈষ্ঠ / স্থাপিত ১১৪১ সন।'

স্থাপত্যবিচারে মন্দিরটি ১১৪১ বঙ্গাব্দে (=১৭৩৪ খ্রীঃ) স্থাপিত বলে মনে হয় না। এই বছরটি হল মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা মিত্রবংশের আদিপুরুষ গোকুলচন্দ্র মিত্রের জন্মসন। মন্দিরে যাঁর নাম খোদিত আছে, সেই কৃষ্ণকান্ত মিত্রই বোধহয় মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি গোকুলচন্দ্র মিত্রের (১৭৩৪-১৮০৮) পৌত্র।

৫৮. মন্দিরটির প্রতিষ্ঠালিপির বয়ান : 'শ্রীশ্রী ৺দয়াময়ী শ্রীচরণাকাঙ্খী / শ্রীনিলকমল মিত্র দাস ১২৫৭ সাল।'

৫৯. কেনডারডাইন লেনের ইংরেজি লিপিটির ভাষ্য হল : 'In 1785 / This Navaratna Temple / of Moheswaram / Has been founded by / Dewan Trilok Ram Pakrashi / the ancestor of present sevait / Satish Mukhopadhaya, B. L./of 61, Wellington Street, Calcutta/ who has repaired the temples in 1940.'

৬০. রক্তকমলেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ : 'চৈত্রেঙ্ক পক্ষগণিতে ঘন পূর্ণমায়াঃ / শাকেঽক্ষিশূন্যজলধীন্দুমিতে গৃ / হেস্মিন্ন। শ্রীযুক্ত রক্তকমলেশ্বর / নাথ লিঙ্গ বারে ববেঃ পণ্ড / পতেঃ কৃপয়া বিরাসীত / শকাব্দাঃ ১৭০২।'

৬১. প্রবেশপথের ডানদিকে কষ্টিপাথরের লিপিটির পূর্ণাঙ্গ বয়ান হল : 'শাকে শৈলাঙ্গ মৈত্র প্রমিতইহ ঘটে তেন সপ্তাক্ষি মানে। গৌরীজানে নিশান্তং স্মরধুনি তটগং দ্বাদশং সংগ্রয়া চ॥ গোপালস্যৈক হর্ম্যং প্রণতিনত শিরাস্তস্য মধ্যে করোতি। দাসস্তৎ প্যারিলালোভুবি হরিহর ধামেতি নাম্না প্রকাশ্যং ॥ ০ ॥ মুরারি মুরলি ছিদ্র কুমার বদন ঃ রত্নকর শুধাকর শাকেব গণন ঃ॥ কুম্ভে সপ্তবিংশতি দিবসে শুভক্ষণে ঃ। শুভারম্ভ স্বর শৈবালনী সন্নিধানে ঃ ॥ রাশী সঙ্খ্যা কাশীপতি সানন্দে বেষ্টিত ঃ। মধ্যে নবরত্নে শ্রীগোপাল বিরাজিত ঃ॥ বাল্য বেশে ননী আসে ভঙ্গি মনোহর ঃ তুলনা কি দিব রূপ জিনি জলধর ঃ। অত্রালয় নাম হৈল হরিহর ধাম ঃ প্যারিলাল দাসের আশা লইতে হরিনাম ঃ॥'

৬২. ২/৩ রামকৃষ্ণ লেনে অন্নপূর্ণার দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্নের মেঝেতে খোদিত আছে : 'সর্ব্ববিজয় কবচ আবিষ্কারক / শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সরকার / এবং তস্য পত্নী শ্রীমতী তুলসীমণি দাসী / কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত / সন ১৩২৯ সাল ৫ই চৈত্র।'

৬৩. বাবুরাম ঘোষ লেনে উমাসুন্দরী কালীর নবরত্ন মন্দিরে উৎকীর্ণ লিপির পাঠ : 'শ্রীশ্রী ৺ উমাসুন্দরী কালীবাড়ী। / ৺ উমাসুন্দরীর পুত্র ৺ যজ্ঞেশ্বর লাহার /

অনুমত্যানুসারে শ্রীমতী নৃত্যকালী দাসী. / শ্রীঅনাথকৃষ্ণ সাহা ও শ্রীরাধাকান্ত পাল / কর্ত্তৃক ১৩২৯ সাল ১০ই মাঘ বুধবার / প্রতিষ্ঠিত।'

৬৪. প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট ও কলেজ স্ট্রিটের সংযোগস্থলের শিবমন্দিরে খোদিত আছে : 'স্থাপিত ৩০শে চৈত্র, ১২৭১ সাল। শ্রীশ্রী ৺ ব্রজেশ্বর মহাদেব জীউ। সেবায়েৎ ৺রাজকৃষ্ণ দাস। সংস্কার ১লা বৈশাখ, সন ১৩৬৩ সাল।'

৬৫. আলোচ্য মর্মরলিপিটিতে লেখা আছে : 'শ্রীশ্রী ৺ রাধাকান্ত জীউ দেবালয় / (২৫ নং গোপীকৃষ্ণ পালের লেন) / ৺ মদনমোহন সেন মহোদয় / তাঁহার পূর্বপুরুষ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। / উক্ত পুরাতন দেবালয় সংস্কার / পূর্ব্বক তৎসংলগ্ন চক্‌দালান / নূতন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। / তদীয় পুত্র / ৺ প্রাণকৃষ্ণ সেন মহোদয়ের / স্মরণার্থে / তৎপুত্র ধার্ম্মিক প্রবর / শ্রীযুক্ত নারায়ণকৃষ্ণ সেন আই, এস, ও / মহাশয়ের পত্নী ধর্ম্মপরায়ণা / শ্রীমতী ভগবতী দাসী / সম্প্রতি ২৮০০০৲ (আটাইশ) হাজার টাকা / ব্যয়ে ইহা সুচারুরূপে সংস্কার করিলেন / তারিখ ১লা আষাঢ় সন ১৩৪২ সাল / ইংরাজি ১৬ই জুন ১৯৩৫ সাল।'

৬৬. মর্মরলিপিটিতে সীসাহীন অগভীর খোদাইয়ের মাধ্যমে লেখা ছিল : 'শ্রীশ্রী৺ শীতলামাতা ঠাকুরাণী / ৺ মণি ঠাকুরুণ দেব্যো সেবাদাসী / সন ১২৮২ শাল। / শ্রীমত্যা বিরাজমহিনি দেব্যা সেবাদাসী / সন ১৩০০ শাল ২০ মাঘ। ভিস্তীপাড়া / শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস দ্বারায় খোদিত॥'

সম্প্রতি সাবেক মন্দিরটিকে ধূলিসাৎ করে নতুন মন্দির নির্মিত হয়েছে এক অবাঙালি ব্যবসায়ীর আনুকূল্যে। পুরনো লিপিটি বিনষ্ট হওয়ায় একটি নতুন মর্মরফলকে প্রায় একই বয়ান লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তবে বানান প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিষয়ের বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে।

৬৭. রাধামদনমোহন মন্দিরের প্রবেশপথের দু'দিকে লিপিদুটি নিবদ্ধ :

(ক) ডানদিকে—'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ / শুভমস্তু শকাব্দাঃ / ১৭৫০ শন ১২৩৫। / কীর্ত্তি শ্রীউদয়নারায়ণ / দাষ মণ্ডল শাকিম বাওয়ালি।'

(খ) বাঁদিকে—'শ্রীহরি / সকাব্দা ১৭৫৬।— / সন ১২৪১ সাল— / শ্রীউদয়নারায়ণ মণ্ডল / সাং বাওয়ালি পঃ বালিয়া।'

৬৮. লিপিটি এরকম : 'ওঁ / শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ জীউ / মন্দির'। এরপর বাঁদিকে : 'প্রতিষ্ঠাদিবস :—/ হরিপাল, জেলা হুগলী / গ্রাম—রাধানগর, / শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা ১২৬৮'। ডানদিকে : 'স্থানান্তর :—/ কলিকাতা. / শুভ রাস পূর্ণিমা, ১২৭৮'। এরপর রয়েছে : 'প্রতিষ্ঠাতাগণ :—/ ৺ ছিদামচন্দ্র ভড়, ৺ শ্যামাচরণ ভড় / ৺ গোবিন্দচন্দ্র ভড / শতবর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে এই স্মৃতিফলফ স্থাপিত হইল'। তারপর বাঁদিকে : 'শুভ ঝুলন পূর্ণিমা, / ১৩৬৮'। ডানদিকে : 'বৈষ্ণব দাসানুদাস / নরেন্দ্র, বীরেন্দ্র, সুরেন্দ্র।'

৬৯. পুবমুখী দালানমন্দিরটির প্রবেশপথের দু'পাশের থামে দুটি শ্বেতপাথরের লিপিফলক আছে :

(ক) দক্ষিণদিকে : 'শ্রীশ্রী৺ শ্যামসুন্দর জীউ / সেবায়েৎ / শ্রীনারায়ণচন্দ্র সুর / রকম ।০ চারি আনা / শ্রী অমূল্যচরণ সুর / রকম ।০ চারি আনা ।'

(খ) উত্তরদিকে : 'শ্রীশ্রী৺ শ্যামসুন্দর জীউ / সেবায়েৎ রকম ॥০ আট আনা / ৺নেপালচন্দ্র নিয়োগী / পত্নী ৺ব্রজেশ্বরী দাসী / কন্যা / ৺শরৎকুমারী দাসী / স্বামী ৺ উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস / পুত্রদ্বয় / শ্রীসত্যচরণ বিশ্বাস / ও / শ্রীসন্ন্যাসীচরণ বিশ্বাস ।'

৭০. ১১/১ টাগোর কাসল স্ট্রিটের মন্দিরে দুটি ফলক ছিল :

(ক) প্রবেশপথের পূর্বদিকে—'শ্রীশ্রী শঙ্কর জীউ / স্বত্বাধিকারী / শ্রীযুক্ত ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় / জমিদার / ৬৫নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সন ১২৮৬ সাল ।'

(খ) প্রবেশপথের পশ্চিমদিকে—'শ্রীশ্রী৺শঙ্কর জীউ / স্বত্বাধিকারিণী / ৺ ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় / জমিদার মহাশয়ের / পত্নী / শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী / সন ১৩৩৭ সাল ।'

এ ছাড়া মন্দিরের সিঁড়ির ধাপে খোদিত ছিল : 'মন্দির সংস্কার / ২৩শে কার্ত্তিক সন ১৩৩৪ সাল ।' এ ফলকগুলির সব ক'টিই সম্প্রতি উধাও হয়ে গেছে। মন্দিরের বহিরঙ্গ মণ্ডিত হয়েছে শ্বেতপাথরে, ফলকে এখন শুধু পূজারীর নাম ।

৭১. A. K. Bhattacharyya, 'A Corpus of Dedicatory Inscriptions from Temples of West Bengal' (1982), p. 245 (fn. 7).

৭২. McCutchion, p. 48.

৭৩. প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত' (১৯৮১), পৃঃ ৯২ ।

স্বীকৃতি : কলকাতার বিভিন্ন স্থানে সরেজমিন অনুসন্ধানে সঙ্গী হয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন ডাঃ দেবাশিস বসু । এ ছাড়া বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্যচয়নে পোষকতা করেছেন শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, ডঃ পূর্ণেন্দুনাথ নাথ, শ্রীপ্রবাল রায়, শ্রীশিবেন্দু মান্না, শ্রীঅমিত রায়, শ্রীগৌতম বসুমল্লিক প্রমুখ সুধীবর্গ ।

গণেশ লালওয়ানী

কলকাতার জৈন মন্দির

একটি বহিরাগত সম্প্রদায়ের দান

আজ মহানগরী হিসাবে বিশ্ববিশ্রুত হলেও শহর কলকাতার ইতিহাস কিন্তু বিশেষ প্রাচীন নয়। ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে চার্নকের কুঠিস্থাপনের পর থেকেই শুরু হয় কলকাতার ক্রমিক নাগরিক বিকাশ। তারপর ধীরগতিতে এই নবজাত শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে তা বেড়ে দাঁড়ায় এক লক্ষ সত্তর হাজারে। এই বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে কলকাতার আদিম অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। নতুন শহরের এই নব্য অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিলেন বহিরাগত। অন্য অধিবাসীদের মতো কলকাতার জৈনরাও ছিলেন বহিরাঞ্চল থেকে আগত।

জৈনধর্মের অস্তিত্ব কিন্তু এর বহু পূর্বেই বাংলাদেশে ছিল। সুদূর অতীতেও যে বাংলা দেশে বহু সংখ্যক জৈনধর্মাবলম্বী বসবাস করতেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন তাম্রশাসন ও হিউ-এন-সাং প্রমুখ পর্যটকদের ভ্রমণ-বিবরণ থেকে। সেইসব আদিম জৈন-দের বংশধররা আজও বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করছেন। 'সরাক' (জৈন 'শ্রাবক') নামে পরিচিত এই বাঙালি জৈনদের নির্মিত মন্দির, মূর্তি ও অন্যান্য শিল্পকৃতি ঐ অঞ্চলগুলিতে বহুল পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়।

কলকাতা, মুর্শিদাবাদ বা বাংলাদেশের অন্যত্র যেসব সুসংবদ্ধ জৈন বসতি আজ গড়ে উঠেছে, তার সদস্যরা কিন্তু বাংলার এই প্রাচীন জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত নন। এঁরা সকলেই পশ্চিমাগত। ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এই পশ্চিমা জৈনরা প্রথমে ঢাকা এবং পরে মুর্শিদাবাদে বসতিস্থাপন করেন। পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী পর্বে এঁরা মুর্শিদাবাদ, বারাণসী, রাজস্থান প্রভৃতি স্থান থেকে চলে আসেন কলকাতায়। প্রমাণাভাবে কলকাতার এই জৈন পরিবারগুলির আগমনকাল সুনিশ্চিতভাবে নির্দেশ করা যায় না। তবে যতদূর জানা যায়, জহুরী সম্প্রদায়ের (জৌহুরী সাথ) জৈনরাই প্রথমে কলকাতায় আসেন। এঁদের মধ্যে আবার প্রধান ছিলেন ওসওয়াল জহুরীরা। ওসওয়ালরা পশ্চিম ভারত থেকে প্রথমে ডেরা বাঁধেন চুঁচুড়ায়। পরে সেখান থেকে তাঁরা চলে আসেন কলকাতায়। চুঁচুড়ায় বসবাসের সময় তাঁরা সেখানে জিনালয়, দাদাবাড়ি ও অধিষ্ঠায়ক ভৈঁরোজীর মন্দির স্থাপন করেছিলেন।

কলকাতায় এসে এই জৈনধর্মী সম্প্রদায় বাসস্থান হিসাবে বেছে নেন বাঁশতলা,

বড়তলা, তুলাপটি, হাঁসপুকুরিয়া ও সংলগ্ন অঞ্চল। নতুন উপনিবেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকাটা তাঁরা সেদিন নিরাপদ মনে করেননি। তাই অনতিপরে আগত অন্য পরিবার-গুলিও বাসস্থাপন করেছিলেন একই এলাকায়। এই রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ রায় বাহাদুর বদ্রীদাস মুকিমজী যখন হ্যারিসন রোডে (বর্তমান ১৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড) বাড়ি করেন, তখন কলকাতার জৈন অধিবাসীদের মধ্যে উঠেছিল বিস্ময়ের ঢেউ।

জৈন শ্বেতাম্বর পঞ্চায়তী মন্দিরের পুরনো খাতাপত্র থেকে জানা যায় যে, জহুরী সম্প্রদায়ের পরই জৈন মাড়ওয়ারীরা অধিক সংখ্যায় কলকাতাবাসী হন। দ্বিতীয় পর্বে আগত শ্রীমাল ও ওসওয়াল জৈনরা এসেছিলেন লখনউ, ফৈজাবাদ, বারাণসী, দিল্লী, জয়পুর ও ঝুঁঝনু থেকে। রায় বদ্রীদাস মুকিম বাহাদুর এসেছিলেন লখনউ থেকে। কয়েকটি শ্রীমাল ও ওসওয়াল পরিবার এসেছিলেন মুর্শিদাবাদ থেকে। যেহেতু মুর্শিদাবাদ তখন একটি সমৃদ্ধ শহর, তাই সেখান থেকে আগত এই পরিবারগুলিকে অভিহিত করা হতো 'শহরওয়ালী সাথ' নামে। জৌহুরী সাথ, জৈন মাড়ওয়ারী সাথ এবং শহরওয়ালী সাথ—এই তিনটি সাথ বা সম্প্রদায় নিয়েই গড়ে উঠেছে কলকাতার শ্বেতাম্বর মূর্তিপূজক জৈন সমাজ। মূর্তিপূজক নন, এমন সম্প্রদায়ের জৈনরাও (যেমন স্থানকবাসী সমাজ, তেরাপন্থী সমাজ) কলকাতায় এসে বাসস্থাপন করেছেন, কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই তাঁরা মন্দিরাদি নির্মাণ করেননি। পরবর্তীকালে দিগম্বর গোষ্ঠীর জৈনরাও কলকাতায় এসেছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা মূর্তিপূজক তাঁরা মন্দিরও স্থাপন করেছেন। গুজরাটী জৈনরা এসেছেন আরও পরে।

জৈন শ্বেতাম্বর পঞ্চায়তী মন্দির

১৩৯ নম্বর কটন স্ট্রিটে, যেখানে জৈন শ্বেতাম্বর পঞ্চায়তী মন্দির রয়েছে, সেখানে জহুরী ধীরজ সিং বাস করতেন। মুর্শিদাবাদ থেকে আনা ভগবান আদিনাথের একটি মূর্তি বাড়ির দ্বিতলের একটি কক্ষে স্থাপন করে তিনি একটি গৃহমন্দিরের সূচনা করেন। মূর্তিটির গায়ে যে শিলালেখ অঙ্কিত আছে তা থেকে জানা যায় যে, আখেরাম (অক্ষয়রাম) গোলেছা মূর্তিটি নির্মাণ করান এবং ১৮৫৬ সম্বতের বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায় (১৮০০ খ্রীঃ) খরতর গচ্ছনায়ক শ্রীজিনচন্দ্র সূরি মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেন। ভাগলপুরের চম্পাপুরীতে মূর্তিটি প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবত আখেরাম নিজেই মূর্তিটিকে চম্পাপুরী থেকে আজিমগঞ্জে নিয়ে আসেন। তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করে ধীরজ সিং মূর্তিটি কলকাতায় নিয়ে আসেন ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৭ সম্বতের (১৮০০-১৮১১ খ্রীঃ) মধ্যে। গৃহমন্দিরে রূপান্তরিত করার পর ধীরজ সিং তাঁর বাসভবনটি তুলে দেন সমাজের হাতে। জৈন সমাজ গৃহমন্দিরটির পরিবর্ধন সাধন করে সেটিকে একটি শিখর মন্দিরে পরিণত করেন। বর্তমানে এ-মন্দিরের মুখ্য বিগ্রহটি ভগবান শান্তিনাথের। শ্রীজিনহর্ষ সূরি ১৮৭১ সম্বতে (১৮১৫ খ্রীঃ) এই মূর্তিটি স্থাপন করেন। মন্দিরের প্রসারকালে ভগবান মহাবীর, পার্শ্বনাথ, মুনিসুব্রত, শান্তিনাথ, পদ্মপ্রভ প্রভৃতি তীর্থংকর ও দাদাগুরুদের বেদি

প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও বহু শিলা ও ধাতুমূর্তি এই মন্দিরটিতে রয়েছে। তার মধ্যে ভগবান ধর্মনাথের বিগ্রহটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতি বছর কার্তিকী পূর্ণিমায় পরেশনাথ মিছিলে এই মূর্তিটিই বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিটের দাদাবাড়িতে নিয়ে গিয়ে তৃতীয় দিবসে ফিরিয়ে আনা হয়। এই পঞ্চায়তী মন্দিরের একটি অতিরিক্ত আকর্ষণ হল জয়পুরের শিল্পী গণেশ মুসব্বরের আঁকা জৈন পুরাণ সম্পর্কিত চিত্রাবলী।

দাদাবাড়ি

পঞ্চায়তী মন্দিরটির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জৈন সমাজ মানিকতলার কাছে বিস্তৃত জমি কিনে উপবন ও দাদাবাড়ি নির্মাণ করান। 'দাদা' অভিধায় খরতর গচ্ছের চারজন প্রমুখ আচার্যকে অভিহিত করা হয়। এই চারজন হলেন—শ্রীজিনদত্ত স্থরি, মণিধারী শ্রীজিনচন্দ্র স্থরি, শ্রীজিনকুশল স্থরি ও আকবর প্রতিবোধক শ্রীজিনচন্দ্র স্থরি। জিনশাসনের প্রসার ও জৈনসমাজকে দৃঢ়মূল করার ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদানের জন্যই এই চার স্থরিকে ভূষিত করা হয়েছে 'দাদা' বা 'পিতামহ' উপাধিতে। খরতর গচ্ছীয় জৈনরা নিজেদের বাসভূমিতে তীর্থংকর-মন্দির নির্মাণকালে দাদাবাড়িও স্থাপন করেন। কলকাতার দাদা-বাড়িটি ১৮৬৭ সম্বতের আষাঢ়ী শুক্লা নবমীতে (১৮১১ খ্রীঃ) পার্শ্বচন্দ্র গচ্ছীয় জৈনাচার্য শ্রীলব্ধি স্থরি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দাদাবাড়িতে শ্রীজিনদত্ত স্থরি, মণিধারী শ্রীজিনচন্দ্র স্থরি, শ্রীজিনকুশল স্থরি ছাড়াও শ্রীজিনভদ্র স্থরি ও স্থূলভদ্র স্বামীর চরণ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শীতলনাথ মন্দির

রায় বদ্রীদাসের নামের উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে করেছি। লক্ষ্ণৌয়ের সীধড় শ্রীমাল বংশীয় এক সাধারণ পরিবারে ১৮৮৮ সম্বতের অগ্রহায়ণী শুক্লা একাদশীতে (২৬ নভেম্বর ১৮৩২ খ্রীঃ) তাঁর জন্ম হয়। বদ্রীদাসজীর পিতার নাম ছিল কালকাদাস, মায়ের নাম খুসলকুমারী। খুসলকুমারী ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা। বদ্রীদাসজীর বয়স যখন কুড়ি-বাইশ বছর, তখন তিনি কলকাতায় আসেন ভাগ্যান্বেষণে। কথিত আছে, শ্রীপূজ্যজীর আশীর্বাদে তিনি এক বহুমূল্য রত্ন লাভ করেন। সে রত্নটি বিক্রি করে পাওয়া যায় প্রভূত অর্থ। এই মূলধনে প্রতিষ্ঠিত জহুরীর ব্যবসা থেকে উত্তর জীবনে বদ্রীদাস লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেন। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার তাঁকে নিযুক্ত করেন সরকারী জহুরীর পদে। দু'বছর পরে তিনি বড়লাটের 'মুকিম' পদে অভিষিক্ত হন। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে সপ্তম এডওয়ার্ড যখন 'প্রিন্স অফ ওয়েলস'-রূপে ভারত-পরিভ্রমণে আসেন তখন বদ্রীদাস তাঁকে বহু দুর্লভ ও মূল্যবান রত্নালংকার দেখান। পরের বছর ভারত সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে বদ্রীদাস ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ। তিনিই কলকাতার পিঁজরাপোল ও জহুরী-বাজারের ধর্মকাঁটার প্রতিষ্ঠাতা। কটন স্ট্রিটের পঞ্চায়তী মন্দিরের তিনি ট্রাস্টী ছিলেন। হ্যারিসন রোডের বাসভবনে তিনি স্থাপন করেছিলেন গৃহমন্দির। ভদ্দিলপুর

তীর্থ স্থাপনের জন্য তিনি পাহাড় ক্রয় করেন। সমেতশিখর মহাতীর্থে (পরেশনাথ পাহাড়) পার্শ্বনাথের মন্দির নির্মাণ ও তীর্থটিকে পালগঞ্জের রাজাদের কাছ থেকে কিনে নেওয়ার উদ্যোগে তিনিই ছিলেন অগ্রণী।

পূর্বোক্ত দাদাবাড়ির সম্মুখবর্তী একটি জমি বিক্রির কথা উঠলে বদ্রীদাস জমিটি কিনে নেন। তারপর বদ্রীদাস সে-কথা মাকে বলতে গেলে তিনি কোনো প্রত্যুত্তর দিলেন না। ক্ষুণ্ণ বদ্রীদাস তাঁর নীরবতার কারণ জিজ্ঞাসা করায় ভক্তিমতী খুসলকুমারী বলেছিলেন, 'তুমি ঐ জায়গায় বাগান পুকুর করবে, তা আর এমন কি প্রশংসার কাজ? তুমি যদি ওখানে তীর্থংকরের মন্দির তৈরি করে দিতে তাহলে তা লোককল্যাণের কারণ হয়ে তোমার কীর্তিকে অক্ষয় করে রাখত।' মায়ের কথা শিরোধার্য করে বদ্রীদাস তখন অকৃপণ অর্থব্যয়ে এক অপরূপ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করলেন, যা আপন বৈশিষ্ট্যে আজও সকলের চিত্তহারী। দেশী-বিদেশী পর্যটকদের কাছে কলকাতার এই অপূর্ব মন্দিরটি এক আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্যস্থান। মন্দিরটির ছাদে ও দেওয়ালে যে কাচ ও মিনার কাজ রয়েছে, তার তুলনা অন্যত্র দুর্লভ। শ্বেতাম্বর পঞ্চায়তী মন্দিরের মতো এ মন্দিরেও রয়েছে গণেশ মুসব্বরের আঁকা বহু চিত্র। ছবিগুলির মধ্যে সমসাময়িক ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি-বিশিষ্ট যে পরেশনাথ মিছিলের ছবিটি রয়েছে, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মন্দিরের নির্মাণকার্য শেষ হওয়ার পর বদ্রীদাসের গুরু শ্রীজিনকল্যাণ সূরি মন্দিরটিতে শীতলনাথের মূর্তি প্রতিষ্ঠার আদেশ দেন। স্থাপনার সময়ও তিনি নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মনোমত শীতলনাথ-মূর্তি বহু অনুসন্ধান সত্ত্বেও পাওয়া গেল না। কার্যব্যপদেশে সেই সময় বদ্রীদাসকে যেতে হয়েছিল আগ্রায়। সেখানে জনৈক বৃদ্ধ একদিন তাঁকে নিয়ে গেলেন রৌশন মহল্লার জৈন মন্দিরে। মন্দিরে পৌঁছে তিনি বদ্রীদাসকে বললেন, 'এই মন্দিরের ভূমিগৃহে তুমি তোমার মনের মতো মূর্তি পাবে।' পাথর সরিয়ে বদ্রীদাস তখন সেই ভূমিগৃহে অবতরণ করলেন। সেখানেই তিনি পেলেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত শীতলনাথ বিগ্রহ। লোকজনের সাহায্যে মূর্তিটি তুলে কলকাতায় নিয়ে আসা হল বটে, কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও সেই উপকারী বৃদ্ধের আর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। ১৯২৩ সম্বতের ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়ায় (১৮৬৭ খ্রীঃ) মূর্তিটি স্থাপিত হল বদ্রীদাসের মন্দিরে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই প্রতিমাটি সপ্তদশ শতকে আগ্রার সংঘপতি চন্দ্রপাল কর্তৃক প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগ্রহ-স্থাপনার শুভ অনুষ্ঠান কিন্তু বদ্রীদাস-জননী খুসলকুমারী দেখে যেতে পারেননি। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জীবনাবসান হয়।

মহাবীর স্বামী মন্দির

দাদাবাড়ির উত্তরে, একই চৌহদ্দির মধ্যে অবস্থিত এই মন্দিরের অধিষ্ঠাতা বিগ্রহটি একবিংশ তীর্থংকর ভগবান মহাবীরের। ১৯৩৬ সম্বতে (১৮৮০ খ্রীঃ) মন্দিরটি নির্মাণ করান জহুরী সুখলাল টাঁক। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীশান্তিসাগর সূরি।

চন্দ্রপ্রভ মন্দির

শীতলনাথ মন্দিরের দক্ষিণে রয়েছে জহুরী কপূরচাঁদ খাড়র প্রতিষ্ঠিত অষ্টম তীর্থংকর চন্দ্রপ্রভর মন্দির। ১৯৭২ সম্বতে (১৮৯৬ খ্রীঃ) এই মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন লক্ষ্ণৌর খরতর গচ্ছাচার্য শ্রীজিনরত্ন সূরি।

মহাবীর জিনালয়

৯৬ নম্বর ক্যানিং স্ট্রিটে (বর্তমানে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড) অবস্থিত এই মন্দিরের স্থানে ১৯৮৬-৮৭ সম্বতে (১৯৩০-৩১ খ্রীঃ) চাতুর্মাস্য করেন মুনি শ্রীদর্শনবিজয়। তাঁরই প্রেরণায় এখানে স্থাপিত হয় এক গৃহমন্দির। আবু থেকে সপরিকর মহাবীর মূর্তি এনে প্রতিষ্ঠা করা হয় এই গৃহমন্দিরে। কয়েক বছর পরে এখানে বিরাট মন্দির নির্মিত হলে ২০১০ সম্বতে (১৯৫৪ খ্রীঃ) জৈনাচার্য শ্রীবিজয় রামচন্দ্র সূরি নবনির্মিত মন্দিরে সেই প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরটি গুজরাটী জৈনদের।

পার্শ্বনাথ জিনালয়

১১ নম্বর হেসাম রোডে ২০১৮ সম্বতে (১৯৬২ খ্রীঃ) গুজরাটী জৈনরা এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। বৃহৎ ভূখণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত এই মনোরম মন্দিরটি ভগবান মনোমোহন পার্শ্বনাথের।

আদিনাথ জিনালয়

সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ পূরণচাঁদ নাহার তাঁর অনুজ কুমারসিং নাহারের স্মৃতিরক্ষার্থে ৪৬ নম্বর ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রিটে নির্মাণ করেন 'কুমারসিং হল'। এই গৃহের তৃতীয় তলে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে 'আদিনাথ জিনালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্দিরের বিশেষ গৌরব হল তিনটি স্ফটিকনির্মিত বিশাল প্রতিমা। নাহার পরিবারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও চিত্রাদির একটি সুন্দর সংগ্রহও এখানে রয়েছে।

এই মন্দিরগুলি ছাড়াও জৈন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের আরও কয়েকটি দেবস্থান আছে, যাদের গৃহমন্দির বলে অভিহিত করা যেতে পারে। যেমন—

১. ১১৩, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ের চারতলায় শ্রীসবাইলাল কেশবলাল শাহের গৃহস্থিত ভগবান কুন্থুনাথের মন্দির। ২০১১ সম্বতে (১৯৫৫ খ্রীঃ) এই মূর্তিটি স্থাপন করেন শ্রীবিজয় রামচন্দ্র সূরি।

২. ১-এ, চৈতন শেঠ লেনের দ্বিতলে শ্রীছোটুমল সুরানার বাড়িতে ভগবান পার্শ্বনাথের চৈত্যালয়।

৩. ৪১, শিবতলা স্ট্রিটে শ্রীরাজমল কোচরের বাড়িতে ভগবান পার্শ্বনাথ জিনালয়।

৪. ৪, ক্রীক রো-তে ভূপতসিং দুগড়ের বাড়িতে আদিনাথ চৈত্যালয়।

৫. ৩৪/১, বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে শ্রীসুরপৎসিং দুগড়ের বাড়িতে বাসুপূজ্য জিনালয়। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে এই জিনালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাসুপূজ্যের রজতমূর্তি, পার্শ্বনাথের স্ফটিকবিগ্রহ ও অভিনন্দনের রক্তবর্ণ প্রস্তরপ্রতিমা এখানে দর্শনীয়।

৬. পাথুরিয়াঘাটার শ্রীবিজয়সিং বোথরার গৃহের জিনালয়।

যে সমস্ত গৃহমন্দির আগে ছিল কিন্তু এখন নেই, সেগুলির পরিচয়ও এখানে দিয়ে রাখি :

১. ১৫২, হ্যারিসন রোডে রায় বদ্রীদাসের গৃহস্থিত জিনালয়।

২. বড়তলা স্ট্রিটে মাধোদাসজীর গৃহমন্দির, প্রতিমা সম্ভবনাথের।

৩. ক্যানিং স্ট্রিটে মাধোলালজী দুগড়ের গৃহমন্দির, প্রতিমা সম্ভবনাথের।

৪. হ্যারিসন রোডে জীবনদাস প্রতাপচাঁদের বাড়িতে শান্তিনাথের গৃহমন্দির।

৫. মানিকতলায় যতি পান্নালালের গৃহমন্দির।

৬. ১৯, সিকদারপাড়া স্ট্রিটে রায় বুধসিং হীরালাল মুকিমের গৃহমন্দির।

এই সমস্ত অবলুপ্ত গৃহমন্দিরের বিগ্রহ বর্তমানে হয় জৈন শ্বেতাম্বর মন্দিরে নয়তো শীতলনাথ মন্দিরে রক্ষিত আছে।

কলকাতায় আসার পর শ্বেতাম্বরদের মতো দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত জৈনরাও এখানে মন্দির নির্মাণ শুরু করেন। দিগম্বরদের মন্দিরগুলির বিবরণ এইরকম :

১. দিগম্বর জৈন বড় মন্দির—১, বসাক লেনে ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে হুলাসীলাল অগ্রবাল এই মন্দিরটি নির্মাণ করে সমাজকে দান করেন। প্রতি বছর কার্তিকী পূর্ণিমায় এই মন্দির থেকে দিগম্বর জৈন সমাজের রথযাত্রার মিছিল বেরিয়ে বেলগাছিয়ার দিগম্বর মন্দিরে যায়। সপ্তম দিনে বেলগাছিয়া থেকে একটি মিছিল আবার ফিরে আসে এই মন্দিরে। কলকাতার দিগম্বর মন্দিরগুলির মধ্যে এটি প্রাচীনতম মন্দির। সম্প্রতি কাচের কাজ ও অন্যান্য সৌন্দর্যবর্ধক সংযোজনের মাধ্যমে মন্দিরটিকে সাজানো হয়েছে নবরূপে।

২. পুরানী বাড়ি—৩৫, ব্রজদুলাল স্ট্রিটে এই মন্দিরটি অবস্থিত। দিগম্বর জৈন বড় মন্দিরের নির্মাতা হুলাসীলাল অগ্রবাল এইখানে বাস করতেন। স্বীয় বাসস্থানে তিনি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য একটি মন্দির স্থাপন করেছিলেন। নিঃসন্তান হুলাসীলালের মৃত্যুর পর সেই গৃহমন্দির রূপান্তরিত হয় সর্বজনীন মন্দিরে। দিগম্বর জৈন সমাজের বৃদ্ধি-চাঁদ সরাওগী-কৃত সংস্কারের কল্যাণে এই দেবালয়টি পরিণত হয় প্রস্তর মন্দিরে। ঢাকার প্রাচীন জৈন মন্দির থেকে প্রতিমা এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৩. বেলগাছিয়া পার্শ্বনাথ উপবন—হরসহায় বাবুর বংশধর জহুরী চুন্নুলাল ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে বেলগাছিয়া ব্রিজের পার্শ্বস্থিত এই জায়গাটি কিনে পার্শ্বনাথ মন্দির নির্মাণ করান। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে উপবনসহ মন্দিরটি তিনি তুলে দেন সমাজের হাতে। তৎকালীন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ধনী দয়ানন্দ সরাওগী বর্তমান মন্দির নির্মাণ করান। দিগম্বর জৈন সমাজ বহু অর্থব্যয় করে এই স্থানটি রমণীয় করে তুলেছেন। বর্তমানে মন্দিরের সামনে বৃহৎ মানস্তম্ভ নির্মিত হচ্ছে।

৪. নয়া মন্দির—৮৩, রবীন্দ্র সরণিতে অবস্থিত এই মন্দিরটির নির্মাণকাল ১৯০৪-০৫ খ্রীস্টাব্দ। মন্দিরটির নির্মাণকার্যে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন হরকিষণদাস সরাওগী। ভগবান চন্দ্রপ্রভের এই মন্দিরটিকে বাইরে থেকে সাধারণ মনে হলেও ভিতরে রয়েছে আকর্ষণীয় পাথরের কাজ।

দিগম্বর সমাজের যেসব গৃহমন্দির কলকাতায় রয়েছে তার বিবরণ এরকম :

১. ২১, হাঁসপুকুর ফার্স্ট লেনের ত্রিতলে শ্রীভগবানদাস জৈনের বাড়িতে ভগবান নেমিনাথের গৃহমন্দির।

২. ৪, শেক্সপীয়র সরণিতে শ্রীগজরাজ সরাওগীর বাড়ির মন্দির। এখানে রয়েছে উদ্যান পরিবৃত মর্মর মন্দির।

৩. ৯, আলিপুর পার্কে সাহু শান্তিপ্রসাদ জৈন নির্মিত 'সাহু নিলয়ে'র মন্দির। উদ্যানযুক্ত এই মন্দিরটির ছাদ কাচের।

৪. হাইড রোডে অবস্থিত শ্রীবৈজনাথ সরাওগীর 'জৈন কুঞ্জে'র মন্দির। মন্দিরটি নির্মাতা ও তাঁর কারখানার কর্মচারীদের জন্য স্থাপিত।

৫. ৫১, বড়তলা স্ট্রিটে বিসাউ নিবাসী অর্জুনদাস ঘনশ্যাম সরাওগী স্থাপিত মন্দির। স্থাপয়িতা মন্দিরসহ বাড়িটি সরাওগী বালিকা বিদ্যালয়কে দান করে দেন।

কলকাতার সন্নিকটে অবস্থিত দিগম্বর জৈন মন্দিরগুলির মধ্যে ১, জটিয়া রোডস্থিত বালীর মন্দির, ৪২, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডস্থিত উত্তরপাড়ার মন্দির ও যোগীপাড়াস্থিত চুঁচুড়ার মন্দির উল্লেখযোগ্য।

অলোক রায়

কলকাতার নেটিভ গির্জা

লং-কৃষ্ণমোহন-লালবিহারীর কর্মকেন্দ্র

কোম্পানির শাসন একদিকে যেমন কলকাতার নাগরিক বিকাশের সহায়ক হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি এই অঞ্চলে রোপণ করেছিল খ্রীস্টধর্মের বীজ। ধর্মোপাসনার প্রয়োজনে কলকাতার বুকে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অসংখ্য গির্জা। কলকাতার আদি গির্জা কোন্‌টি, তা নিয়ে অবশ্য বিতর্কের অবকাশ আছে। উপাসনাস্থল বা স্থায়ী ও সাময়িক কয়েকটি চ্যাপেলের সন্ধান মিললেও কলকাতার সেই আদিপর্বের একমাত্র 'চার্চ' সম্ভবত 'সেণ্ট অ্যান' (১৭০৯)। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে সিরাজের আক্রমণে সেণ্ট অ্যান বিধ্বস্ত হওয়ার পর বেশ কিছুদিন উপাসনার কাজ চলে কোনো গির্জা ছাড়াই। বাস্টিডের ভাষায়, 'Those who are not very amenable to other considerations may, perhaps, have their sensibilities aroused about the matter on being reminded, that for thirty years (viz., from the fall of old St. John's in the siege in 1756, and the retaking of Calcutta by Clive in January 1757, to the opening of the Present St. John's on Easter Saturday, 1787) the Government officials, and all the members of the church of England residing in Calcutta, worshipped in a small room in the Old Fort where divine service was regularly conducted by the Protestant Chaplain,'[১] আঠারো শতকে নির্মিত যে বেসরকারি গির্জাটিকে আজও বলা হয় ওল্ড চার্চ বা মিশন চার্চ (১৭৭০), তার সঙ্গে এ শহরের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ওল্ড চার্চের পর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হয় সেণ্ট জন্‌স চার্চ (১৭৮৭), অনেকদিন পর্যন্ত যেটি পরিচিত ছিল 'নিউ চার্চ' নামে। সেণ্ট জন্‌স সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রেই আমরা জব চার্নকের সমাধি নামক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থাপত্য-নিদর্শনটি দেখতে পাই। নিউ চার্চ যখন পুরনো হতে শুরু করেছে, তখন, অর্থাৎ উনিশ শতকে কলকাতায় গড়ে উঠল আরও অনেকগুলি নতুন গির্জা; যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল : সেণ্ট অ্যানড্রুজ চার্চ (১৮১৫), সেণ্ট থমাস চার্চ (১৮৩৩), সেণ্ট ষ্টিফেন্‌স চার্চ (১৮৪৬), ওয়েলেসলি চার্চ (১৮৪৬), সেণ্ট জেমস চার্চ (১৮৬৪), সেণ্ট বারনাবাস চার্চ (১৮৬৭), সেণ্ট মেরিজ চার্চ (১৮৮৮)। কিন্তু 'সাহেবপাড়ায়'

অবস্থিত এ গির্জাগুলিতে ইউরোপীয়দের সমাগমই হতো বেশি। এই গির্জাগুলিতে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার নিয়েও কয়েকটি সমস্যা দেখা দেয়, যার মধ্যে প্রধান ছিল ধর্মোপাসনার ভাষাগত সমস্যা। পোর্তুগীজ, গ্রীক, আরমানিদের নিজস্ব চার্চ থাকলেও নেটিভ খ্রীস্টানদের তখনও কোনো নিজস্ব গির্জা ছিল না। মিশন চার্চের স্থাপয়িতা কিয়ারন্যানডার কলকাতায় যে মিশন স্কুলটি স্থাপন করেছিলেন (১৭৫৯) সেখানে আরমানি. পোর্তুগীজ, ইংরেজ ছেলেদের সঙ্গে বাঙালি ছাত্ররাও পড়ত। লং জানিয়েছেন, 'Kiernander entertained sanguine hopes of the conversion of brahmans in the school ; but his prospects were doomed, as many subsequently have experienced in similar cases, to vanish into air. The minister of the Mission Church paid more attention to the spiritual and intellectual condition of that much neglected class, the Portuguese, than any other persons in Calcutta, and some of the best members of the Church were Portuguese.'[১] পরবর্তীকালে বাঙালিরা খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করায় স্বতন্ত্র বঙ্গভাষী-চার্চের প্রয়োজন প্রকট হয়ে উঠল।

নেটিভ চার্চের সঙ্গে সঙ্গে নেটিভ 'মিনিস্টার' তথা ভারতীয় পাদ্রিদের নিয়েও সমস্যা দেখা দিয়েছে। কলকাতা শহরের বাইরে মফস্বল অঞ্চলে ইউরোপীর মিশনারিরা ধর্মপ্রচারের কাজে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করলেও মিশন হাউসগুলিতে সব সময় বিদেশী যাজক পাঠানো সম্ভব হতো না। তাছাড়া সেখানে নেটিভ খ্রীস্টানরাই সংখ্যাগুরু থাকায় ভারতীয় পাদ্রি নিয়োগই সুবিধাজনক ছিল। উনিশ শতক থেকেই অবশ্য বিদেশী মিশনগুলির সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় যাজকদের মধ্যে কিছুটা বিক্ষোভ দেখা দেয়, যার বিশদ বিবরণ মিলবে পাদ্রি লালবিহারী দে-র অভিজ্ঞতায়—'We three of us, Mr. [Jagadishwar] Bhattacharjya, Mr. [Prasanna] Chatterjea, and myself drew up a memorial addressed to the Foreign Mission Committee at Edinburgh, in which we stated that, on the principle of ecclesiastical parity, which is a fundamental principle of Presbyterianism, we should be made members, not only of the Presbytery, but also of the Mission Council.' কিন্তু কর্তৃপক্ষ সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন—'Duff's contention was, that Presbyterian parity regarded parity in ecclesiastical matters only ; that we were certainly entitled, as Presbyterian ministers, to become members of Presbytery, but that the Mission Council was quite a different affair : we were not entitled *ex officio* to become members of that Council ; *that* depended on the pleasure of the Home Committee.'[৩] লালবিহারী অবশ্য জোর দিয়ে বলেছেন, এই বিরোধের সময় টাকাকড়ির চিন্তা তাঁদের মনে ছিল না। কিন্তু লালবিহারীর জীবনী থেকে জানি পরবর্তীকালে অর্থের কথাও তাঁদের ভাবতে হয়েছিল। আসলে 'নেটিভ মিনিস্ট্রি'

নিয়ে 'ইউরোপীয়ান মিনিস্টার'দের চিন্তা-ভাবনার অন্ত ছিল না।[8] ফলে নেটিভ কনভার্ট আর নেটিভ মিনিস্টারদের নিয়ে গড়ে উঠল নেটিভ চার্চ। যেহেতু নেটিভদের বসবাস সেকালে কেন্দ্রীভূত ছিল উত্তর কলকাতায়, তাই তাঁদের জন্য সেই অঞ্চলেই গির্জা নির্মিত হল। এর একমাত্র ব্যতিক্রম ভবানীপুর অঞ্চল, সেখানে বাঙালিদের জন্য ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে ভবানীপুর চার্চ স্থাপিত হয়।

অনেকদিন পর্যন্ত যদিও সাহেব পাদ্রি একেবারে বর্জন করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু ক্রমশ তাঁদের স্থান গ্রহণ করেছেন বাঙালি পাদ্রিরা। বিপরীত ঘটনা ঘটেছে একমাত্র ক্রাইস্ট চার্চে। বিনয় ঘোষ কলকাতার গির্জার বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'গির্জার আঞ্চলিক অবস্থান সম্বন্ধে একথা বললেও ভুল হয় না যে উত্তরে বৌবাজার এবং পুবে ও দক্ষিণে সার্কুলার রোড, এই সীমানার মধ্যেই কলকাতার শতকরা ৯৫টি গির্জা প্রতিষ্ঠিত। তার কারণ, এই সীমানার মধ্যেই ইংরেজ ও অন্যান্য খ্রীস্টানদের বসবাস, কাজকর্ম ইত্যাদি প্রধানত আবদ্ধ ছিল।'[৫] এই 'শতকরা ৯৫টি গির্জার' বাইরে যে গির্জাগুলি রয়েছে, তার মধ্যে তিনটি নেটিভ চার্চের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এই প্রবন্ধে। শুধু উত্তর কলকাতায় অবস্থানের জন্যই নয়, দু'জন বিখ্যাত বাঙালি (কৃষ্ণমোহন ও লালবিহারী) এবং একজন ভারতবন্ধু বিদেশী (লং) পাদ্রির কর্মস্থল হিসাবে গির্জা তিনটির বিবরণ আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

লং সাহেবের গির্জা

মুর্শিদাবাদের ঘসেটি বেগমের কাছ থেকে পাওয়া আমহার্স্ট স্ট্রিটের একটি জমিতে চার্চ মিশনারি সোসাইটি (সি. এম. এস.) স্থাপন করেছিল খ্রীস্টান ছেলেদের জন্য একটি আবাসিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়টি নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে পরে সেণ্ট পল্‌স স্কুল ও সেণ্ট পল্‌স কলেজে পরিণত হয়। এই সময়ে কলকাতার আর্কডিকন ছিলেন ড্যানিয়েল কোরি (১৭৭৭-১৮৩৭)। তাঁরই উদ্যোগে মিশনের কাজকর্ম পরিচালনা এবং গির্জা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ৩৩, আমহার্স্ট স্ট্রিটে ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে ২০,৪০০ টাকা দিয়ে একখণ্ড জমি কেনা হয়।[৬] ক্যালকাটা মিশনারি সোসাইটি সক্রিয় ভাবে অর্থসংগ্রহ শুরু করে এবং অল্পদিনের মধ্যে তিরিশ হাজার টাকার মতো দান সংগৃহীত হয়। কোরির বন্ধু মেজর ফিপ্‌স শুধু জমি কেনার জন্যই টাকা সংগ্রহ করেননি, সেই জমিতে একটি গির্জা নির্মাণের জন্যও সচেষ্ট হন।[৭] কলকাতার বিশপ রেজিনাল্ড হেবার (১৭৮৩-১৮২৬), চার্চ মিশনারি অ্যাসোসিয়েশন এবং চার্চ মিশনারি সোসাইটি গির্জা তৈরির তহবিলে চার হাজার টাকা দান করলে নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের ১২ নভেম্বর আর্কডিকন কোরি গির্জাটির ভিত্তি স্থাপন করেন। নির্মাণ সম্পূর্ণ হতে কয়েক বছর সময় লাগে। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দের ১২ নভেম্বর আচার্য ডিয়ার (Rev. J. W. Deerr) চার্চ মিশন চ্যাপেলের দ্বার উদ্‌ঘাটন করে পবিত্র উপাসনা পরিচালনা করেন। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১০ অক্টোবর পর্যন্ত এই উপাসনাকেন্দ্রটি 'চার্চ মিশন চ্যাপেল' নামেই পরিচিত ছিল। আসলে তখন সেখানে ছিল কেবলমাত্র তিনশো জনের একত্র উপাসনার

উপযোগী একটি বড় ঘর। ইউরোপীয় মিশনারিরা দীর্ঘদিন গির্জাটি পরিচালনা করেছেন :

১৮২৮-২৯	রেভারেণ্ড জে. ল্যাথাম	১৮৪৫-৫৫	রে. টিমোথি স্যাণ্ডিস
১৮২৯-৩০	রে. ডবলিউ মর্টন আর্কডিকন কোরি	১৮৫৫-৬৪	রে. টিমোথি স্যাণ্ডিস রে. জেমস ভন
১৮৩০-৪২	রে. টিমোথি স্যাণ্ডিস	১৮৬৪-৭৪	রে. জেমস ভন
১৮৪২-৪৫	রে. জে. পি. অসবোর্ন		

উপাসনালয়টির পোশাকী নাম 'চার্চ মিশন চ্যাপেল' হলেও প্রাচীন নথিপত্রে লেখা আছে : 'প্রতিমাপূজকদের জন্য ভজনালয় : ভারতীয় (নেটিভ) খ্রীস্টানদের প্রার্থনার ঘর ও পোর্তুগীজদের জন্য পুরোহিতের (Parish) অধীন গির্জা।'

১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১০ অক্টোবর কলকাতার চতুর্থ বিশপ ড্যানিয়েল উইলসন (১৭৭৮-১৮৫৮) কর্তৃক প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠান পরিচালনকালে গির্জাটির নতুন নামকরণ হয় 'হোলি ট্রিনিটি চার্চ'। তবে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে লঙের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত লোকমুখে চার্চটি পরিচিত ছিল 'কোরি সাহেবের গির্জা' নামে। এই গির্জার যথার্থ স্থাপয়িতা কোরি মাদ্রাজে বিশপ হয়ে যাওয়ার পরও চার্চটিকে ভোলেননি। এই চার্চের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল আমৃত্যু। গির্জাটির দক্ষিণের রাস্তাটির আগে নাম ছিল 'কোরিজ চার্চ লেন' (এখনকার নাম ডাঃ কার্তিক বসু লেন)।

চার্চ মিশনারি সোসাইটির প্রচারক রেভারেণ্ড জেমস লং (১৮১৪-১৮৮৭) ভারতবর্ষে আসেন ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে। তিনি পটলডাঙা স্কুলে পড়াবার সময়ে এবং পরে ঠাকুর-পুকুরে নতুন কর্মজীবন গ্রহণকালে দীর্ঘদিন আমহার্স্ট স্ট্রিটের সি. এম. এস. কম্পাউণ্ডের একটি গৃহে বাস করেন। স্যাণ্ডিস এবং অসবোর্নের সঙ্গে তিনিও হোলি ট্রিনিটি চার্চের দেখাশোনা করতেন। ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ঠাকুরপুকুর গির্জার সঙ্গে যুক্ত হলেও সে গির্জাটির সম্পূর্ণ দায়িত্বভার লং গ্রহণ করেন ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে।[৮] সম্ভবত ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত লং পটলডাঙা সি. এম. এস. স্কুলে পড়িয়েছেন এবং স্কুল সংলগ্ন গির্জায় ধর্মোপদেশ দিয়েছেন। কোরিকে ভুলে গেলেও ভারতবন্ধু লং-কে বাঙালি ভুলতে পারেনি। তাই লঙের মৃত্যুর পর থেকে হোলি ট্রিনিটি চার্চ 'লং সাহেবের গির্জা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে—'The Church in Amherst Street, near St. Paul's College, still stands as a living monument to the memory of the Rev James Long, who has otherwise been thrown into oblivion by Bengalees whose memory should not have been so short-lived.'[৯]

হোলি ট্রিনিটি চার্চ পরিচালনার সঙ্গে ইউরোপীয় মিশনারিদের যোগ থাকলেও প্রায় প্রথম থেকেই এই গির্জার ভারতীয় চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছিল। দীর্ঘদিন আগে এই গির্জার উপাসনায় বাংলা 'লিটারজি'-র (উপাসনাপদ্ধতি) ব্যবহার প্রচলিত হয়। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে শুরু হয় ভারতীয় আচার্য বা 'প্যাস্টর'দের নিযুক্তি। প্রথম ভারতীয় প্যাস্টর হন রেভারেণ্ড প্যারীমোহন রুদ্র। অবশ্য ১৯১১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত গির্জাটির সুপারিনটেনডেণ্ট হতেন একজন ইউরোপীয় মিশনারি। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের পরে কর্তৃপক্ষ

গির্জা পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভারতীয় পাদ্রিদের হাতে তুলে দেন। হোলি ট্রিনিটি চার্চের আচার্যদের নামের তালিকা :

১৮৭৪-৮২	রেভারেণ্ড প্যারীমোহন রুদ্র
১৮৮২-৮৭	রে. রাজকৃষ্ণ বসু
১৮৮৭-৮৯	রে. জেকব কান্তিনাথ বিশ্বাস
১৮৮৯-৯৯	ন্যাথানিয়েল পি. এন. সরকার (Catechist)
১৮৯৯-১৯০৪	রে. জোশুয়া শান্তিভূষণ বিশ্বাস
১৯০৪-০৭	রে. কৈলাসচন্দ্র দে
১৯০৭-২২	রে. জোসেফ প্রাণনাথ বিশ্বাস
১৯২৩-৩২	রে. রাহুলচন্দ্র বিশ্বাস
১৯৩২-৩৪	রে. ললিতমোহন দে
১৯৩৩-৩৮, ১৯৩৯	রে. জোসেফ প্রাণনাথ বিশ্বাস
১৯৩৮-৩৯	রে. মনোরঞ্জন দে
১৯৪০-৪৭	রে. রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়
১৯৪৭-৫০	রে. ক্যানন কে. বি. ঘোষ
১৯৫০ (ফেব্রুয়ারি-মে)	রে. নিশিকান্ত বিশ্বাস
১৯৫০-৫১	রে. মনোরঞ্জন দে
১৯৫১-৬০	রে. সনৎকুমার মণ্ডল
১৯৬০-৬৪	রে. সার্থক লাহিড়ী
১৯৬৪-৬৬	রে. বিভূধন মণ্ডল
১৯৬৭-৭৮	রে. অনিলকুমার দাস
১৯৭৮-	রে. প্রণতিপ্রকাশ মণ্ডল।[১০]

গত দেড়শো বছরে হোলি ট্রিনিটি চার্চের ভিতর-বাইরে বহু পরিবর্তন ঘটেছে। একটি সামান্য হলঘর রূপান্তরিত হয়েছে সমুচ্চ-শিখরবিশিষ্ট গির্জায়। গির্জার চূড়ায় স্থান পেয়েছে ঘড়ি। আগে ঘরের পূবদিকে তিন সদস্যের গায়কদলের বসার মতো জায়গা ছিল, পাশে ছিল একটি বেদি। পরে অন্যদিকেও বসার জায়গা হয়েছে। বেদির পূবদিকের বড় জানালা দুটিতে বসানো হয়েছে অস্ট্রিয়ায় তৈরি বহুবর্ণের রঙিন কাচ। সকালবেলায় সূর্যের আলো তার মধ্য দিয়ে এসে বেদিটিকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করে। বড় বেদির মাঝখানে রয়েছে একটি কারুকার্যখচিত কাঠের বেদি। মার্বল পাথরের গোলাকার 'পুলপিট'-টি গির্জার উত্তর-পূর্ব কোণে স্থাপিত। রেভারেণ্ড জি. এস. ই. চার্লটন তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের স্মৃতিরক্ষার্থে এটি দান করেন। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রয়েছে পিতলের তৈরি 'লেকট্রন'—পাঠকালে ধর্মশাস্ত্র যার উপরে রাখা হয়—এটি মা-বাবার স্মৃতিরক্ষার্থে রায়বাহাদুর গুণনিধি বিশ্বাসের দান। জলসংস্কার কালে (Baptism) শিশুদের স্নান করানোর জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মার্বল পাথরের একটি বড় গোলাকার জলাধার আছে। উত্তর-পশ্চিম কোণে আছে প্রাপ্তবয়স্কদের জলসংস্কারের উপযোগী

মার্বল পাথরের একটি সুবৃহৎ জলাধার। চতুষ্কোণ এই জলাধারটি গির্জার প্রথম পালক রেভারেণ্ড প্যারীমোহন রুদ্রের স্মরণে মণ্ডলীর সদস্যেরা স্থাপন করেন।

হোলি ট্রিনিটি চার্চ উনিশ শতকে শুধু বাঙালি খ্রীস্টান নয়, বাঙালি হিন্দুদেরও আকর্ষণ করেছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনী থেকে জানি, মথুরবাবু একবার রামকৃষ্ণকে আমহার্স্ট স্ট্রিটে লং সাহেবের গির্জায় নিয়ে গিয়েছিলেন। নববিধান ব্রহ্মমন্দির গির্জাটির খুব কাছে হওয়ার ফলেই সম্ভবত এখানে তাঁর পদার্পণ ঘটেছিল।[১১]

হোলি ট্রিনিটি চার্চ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে সেন্ট পল্স স্কুল ও কলেজ থাকায় এক সময় সেখানকার ইউরোপীয় শিক্ষকরা গির্জার দৈনন্দিন উপাসনায় অংশ নিতেন। এখন বিদেশীর সংখ্যা নগণ্য হওয়ায় উত্তর কলকাতার অধিকাংশ গির্জা যথার্থ স্বদেশী রূপ লাভ করেছে। বর্তমানে হোলি ট্রিনিটি চার্চের মণ্ডলীভুক্ত ১৭৫টি পরিবারের সব কটিই ভারতীয় খ্রীস্টান। প্রতি মাসে প্রথম ও তৃতীয় রবিবারে সকালে প্রভু যীশুর স্মরণে বিশেষ উপাসনা (ম্যাস) হয়। প্রতি রবিবার সকাল সাতটায় ও বিকাল পাঁচটায় মণ্ডলীভুক্ত পরিবারের সকলে যোগ দেন বাংলা ভাষায় অনুষ্ঠিত উপাসনায়। হোলি ট্রিনিটি চার্চের কয়্যার শুধু অতীত ঐতিহ্যকেই স্মরণ করায় না, নতুন সদস্যদের উদ্দীপনায় সেটি প্রাণচঞ্চল। সানডে স্কুলের কাজকর্মও চলে নিয়মিত। সেইসঙ্গে আছে মণ্ডলীর মহিলা সমিতি, যাদের উদ্যোগে নানা অনুষ্ঠান এবং শিশুদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। গির্জার দক্ষিণদিকে অবস্থিত চ্যাপেল গার্লস স্কুলটিও সি. এম. এস. প্রাঙ্গণে দীর্ঘদিন শিশুশিক্ষার কাজে নিয়োজিত।

কৃষ্ণ বন্দ্যো'র গির্জা

হেদুয়ার পশ্চিমে, বেথুন কলেজের দক্ষিণপাশে অবস্থিত যে গির্জাটি 'ক্রাইস্ট চার্চ' নামে চিহ্নিত, দীর্ঘদিন বাঙালি-সমাজে সেই গির্জাটি পরিচিত ছিল 'কৃষ্ণ বন্দ্যো'র গির্জা' নামে। ঈশ্বর গুপ্ত এই গির্জার সম্পর্কেই লিখেছিলেন,

> হেদোর এঁদো জলে কেউ যেও না তায়,
> কৃষ্ণ বন্দ্যো জটে বুড়ী শিকলি দেবে পায়।

হেদুয়ার পুবদিকে 'বেঁদো বাঘ' ডাফের আস্তানা, আর পশ্চিমদিকে 'জটে বুড়ী' কৃষ্ণমোহনের ডেরা। ধর্মান্তরের আতঙ্কে শঙ্কিত বাঙালি মহলে হেদুয়ার পার্শ্ববর্তী 'ডাফ চার্চ' আর 'ক্রাইস্ট চার্চ' সেকালে বহু আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল।

ওল্ড বা মিশন চার্চের কর্তৃপক্ষ ও 'ইভ্যানজেলিকাল ফাণ্ডের' সদস্যরা ক্রাইস্ট চার্চ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে। অখ্রীস্টানদের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁরা নেটিভপাড়ায় একটি ছোট চার্চ স্থাপনের কথা ভাবেন, যেখানে নেটিভ পাদ্রি ধর্মোপদেশ দেবেন। এই উদ্দেশ্যেই কলেজ স্কোয়ারে অবস্থিত হিন্দু কলেজ সংলগ্ন একখণ্ড জমি ক্রয় করে তাঁরা চার্চ মিশন-স্কুলের শিক্ষক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে (১৮১৩-১৮৮৫) পাদ্রি নিযুক্ত করেন। কিন্তু ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ৭ জুলাই প্রস্তাবিত গির্জার ভিত্তিস্থাপনের দিনে হিন্দু সমাজের বিচলিত নেতারা প্রতিবাদ জানালেন বাংলার

ডেপুটি গভর্নর আলেকজাণ্ডার রসের কাছে। বিশপ ড্যানিয়েল উইলসনকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করে রস প্রতিবাদীদের হাতে একটি চিঠি দেন। প্রতিবাদীরা চিঠিটি নিয়ে সেদিনই বিশপের সঙ্গে দেখা করেন।

ডাফ কলকাতায় আসার পর থেকেই হিন্দু কলেজের বেশ কয়েকজন ছাত্র তাঁর প্রচেষ্টার ফলে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন (মহেশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীনাথ নন্দী, আনন্দচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি)। হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ তাই কলেজ স্কোয়ারে এই গির্জা নির্মাণের ব্যাপারটি ভাল চোখে দেখেননি। তাঁরা মনে করেছিলেন ডাফ এইভাবে হিন্দু কলেজের একেবারে ভিতরে প্রবেশ করে সকলকেই ধর্মান্তরিত করে ফেলবেন। বাস্তবে কিন্তু ক্রাইস্ট চার্চের সঙ্গে ডাফের কোনো সম্পর্কই ছিল না। কৃষ্ণ-মোহনকে ডাফ ধর্মান্তরিত করলেও অনতিপরে তিনি ডাফের 'চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ড' পরিত্যাগ করে 'চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডে' যোগ দেন।

হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষের আবেদনে বিশপ ৭ জুলাই ভিত্তিস্থাপনের অনুষ্ঠান স্থগিত রাখলেন। ৯ জুলাই বিশপের বাড়িতে প্রতিবাদীরা সমবেত হলেন—সেখানে মেডিক্যাল কলেজের সম্পাদক ডেভিড হেয়ার এবং হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রসন্নকুমার ঠাকুর পেশ করলেন দুটি প্রতিবাদ পত্র। তাঁদের বক্তব্য ছিল মেডিক্যাল কলেজ ও হিন্দু কলেজের ধারেকাছে গির্জা স্থাপন করলে ছাত্রদের ক্ষতির আশঙ্কা আছে, অর্থাৎ অভিভাবকদের আশঙ্কা ছাত্ররা সব খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করবে। কলেজ দুটি ভারতবর্ষে শিক্ষাবিস্তারে ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে যে ভূমিকা পালন করছে তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত গির্জাটিকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করার অনুরোধ তাঁরা বিশপের কাছে রাখেন। উত্তরে বিশপ বলেন, যে-কোনো স্থানে গির্জা বা মন্দির স্থাপনের অধিকার সকলেরই আছে। তবে এক্ষেত্রে মিশন কর্তৃপক্ষের কোনো জেদের ব্যাপার নেই। প্রতিবাদীরা হিন্দু কলেজের উত্তরে আধ মাইলের মধ্যে এবং ঐ রাস্তার উপরেই সমপরিমাণ জমি সংগ্রহ করে দিলে তিনি গির্জাটি সেখানে স্থানান্তরিত করতে স্বীকৃত হন। হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ তখন হেদুয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমের একখণ্ড জমির বিনিময়ে কলেজ স্কোয়ারের জমিটি গ্রহণ করেন এবং জমির সঙ্গে আরও আঠারোশো টাকা ক্ষতিপূরণ দেন।

১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে গির্জাটির ভিত্তিস্থাপন করলেন বিশপ উইলসন। নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হল ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে। উত্তরদিকে পঞ্চাশ ফিটের মতো উচ্চ চতুর্ধার স্তম্ভবিশিষ্ট সাধারণ গথিক রীতির এই গির্জাটির দৈর্ঘ্য ছিল পূর্ব-পশ্চিমে ৬৪ ফিট এবং প্রস্থ ছিল উত্তর-দক্ষিণে ৫৮ ফিট। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর ক্রাইস্ট চার্চের দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠানে প্রার্থনা পরিচালনা করলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন, Exodus XX. 24 অবলম্বনে ভাষণ দিলেন আর্কডিকন থমাস ডিয়ালট্রি। ২৯ সেপ্টেম্বর কৃষ্ণমোহন Ephesians II. 1 অবলম্বনে বাংলায় তাঁর প্রথম ভাষণ দিলেন। এরপর থেকে গির্জাটিতে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় ধর্মোপদেশ দান ও মাসে একবার হোলি কমিউনিয়ান অনুষ্ঠিত হতো। বাংলাদেশে এই প্রথম চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডের একটি গির্জা

ভারতীয় খ্রীস্টানের পরিচালনাধীন হল। ভারতবর্ষে চার্চের ইতিহাসে এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে ক্রাইস্ট চার্চের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে।

বাঙালি খ্রীস্টানদের জন্য গির্জাটি স্থাপিত হওয়ায় কৃষ্ণমোহন সাধারণত বাংলাতেই ধর্মোপদেশ দিতেন। 'সত্যধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রস্তাবে প্রচারিত উপদেশ কথা' (১৮৪০) ও 'ধর্ম্মপোষক বক্তৃতা' (১৮৪৭) গ্রন্থদ্বয়ে তাঁর অনেক ভাষণ মুদ্রিত হয়েছে। তাৎক্ষণিক মূল্য ছাড়াও ভাষণগুলির স্থায়ী সাহিত্যিক গুরুত্ব আছে। বিশেষ উপলক্ষে তিনি ইংরেজিতেও বক্তৃতা দিতেন। উমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতিচারণে তার সপ্রশংস উল্লেখ রয়েছে : 'অধ্যাপক রচফোর্ট' (Rochfort) একদিন আমাকে বলিলেন—'বিলাতে আমি কে, এম, ব্যানার্জ্জির নাম শুনিয়াছিলাম। এখানে আসিয়া আমার বড় ইচ্ছা হইল যে, কলিকাতায় তাঁহার চর্চ্চে গিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আসি। রবিবারে তাঁহার চর্চ্চে গিয়া বসিলাম; চক্ষু মুদ্রিত করিলাম, পাছে বক্তার কালো রংটায় আমার মনে ভাবান্তর উপস্থিত করে। যাহা শুনিলাম, তাহা ইংরাজের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর Sermon অপেক্ষা কম উপাদেয় বলিয়া বোধ হইল না'।'[১২]

ক্রাইস্ট চার্চের সংলগ্ন যে 'পারসোনেজ'-টি (পারসন বা পাদ্রির বাসস্থান) নির্মিত হয়, সেখানে প্রথমদিকে কৃষ্ণমোহন ভারতীয় খ্রীস্টান বালকদের জন্য একটি স্কুল পরিচালনা করতেন। ক্রাইস্ট চার্চের সঙ্গে ক্যাথিড্রাল মিশনের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, সেন্ট পল্স্ ক্যাথিড্রাল এনডাওমেন্ট ফাণ্ডের টাকাতেই চার্চের ব্যয় নির্বাহ হতো। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে বিশপ উইলসন ক্রাইস্ট চার্চ পরিচালনার ভার চার্চ মিশনারি সোসাইটির হাতে তুলে দেন। তবে চার্চের সম্পত্তি মিশন-চার্চের ট্রাস্টিদের হাতেই থাকে।

ক্রাইস্ট চার্চে অবস্থানকালে কৃষ্ণমোহনের জীবনের দুটি দিকের কথা উল্লেখযোগ্য। শিক্ষকতা-কর্মে তাঁর স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রতিভা ছিল। ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে মতিলাল শীলের প্রতিষ্ঠিত 'শীল্স্ ফ্রি স্কুল' পরিচালনার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন : 'We learn from the Papers that there has been a split between the Jesuits and Baboo Moteelall Seal. They have ceased to have any further connection with the College, usually called Seal's College, which has been placed under the Superintendance of the Rev. Krishna Mohan Banerjee.'[১৩] সেইসঙ্গে ছিল সাংবাদিকতা ও সাহিত্যরচনার প্রবণতা। এই সময়েই তিনি 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' গ্রন্থটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন (১৮৪৬-৫১) এবং প্রায় বছরখানেক 'সংবাদ সুধাংশু' (১৮৫০-৫১) নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদনা করেন।

১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি বিশপ্স্ কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ায় কৃষ্ণমোহন ক্রাইস্ট চার্চের প্যাস্টর-পদ ত্যাগ করেন। ক্যাথিড্রাল মিশন তখন রেভারেণ্ড চার্লস ডেভিসকে যাজকত্বের দায়িত্বভার প্রদান করেন। ডেভিসের পর, ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে রেভারেণ্ড জর্জ ই. ইয়েট যাজক হন। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ক্রাইস্ট চার্চ যখন চার্চ মিশনারি সোসাইটির কর্তৃত্বাধীন হয়, তখন নতুন প্যাস্টর নিযুক্ত হন রেভারেণ্ড আর. পি. গ্রীভ্স্। তাঁর সহকারী হন রেভারেণ্ড এইচ. সি. মিলওয়ার্ড।

১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি ক্রাইস্ট চার্চের পারসোনেজে একটি মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়। এই স্কুলটিই পরবর্তীকালে পরিচিত হয় 'ক্রাইস্ট চার্চ গার্লস স্কুল' নামে। মিস এইচ. জে. নীল এই স্কুলের অধ্যক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একদিকে ছাত্রীসংখ্যার বৃদ্ধি ও অন্যদিকে পুরনো গির্জা ও পারসোনেজের ভগ্নদশার কারণে পুরো চত্বরটি ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাই ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে গির্জাগৃহ ও পারসোনেজ ভেঙে নতুন চার্চ ও স্কুলবাড়ি তৈরি হয়। এই সময়ে স্কুলকে সাময়িকভাবে অন্য ভাড়াবাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৩ অগাস্ট নতুন বাড়িতে আবার ফিরে এল ক্রাইস্ট চার্চ গার্লস স্কুল। মিস নীলের অবসর গ্রহণের পর এই স্কুলের অধ্যক্ষা হন মিস অ্যালিস স্যাম্পসন। ক্রাইস্ট চার্চের নামবাহী স্কুলটি দীর্ঘদিন ক্রাইস্ট চার্চের প্রাঙ্গণে অবস্থিত ছিল। কিন্তু ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে, মিস জে. আর. টেলরের অধ্যক্ষতার আমলে, বেথুন স্কুল ও কলেজের সম্প্রসারণের জন্য সরকার স্কুলটির বাড়ি ও জমি অধিগ্রহণ করতে চান। আড়াই লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে ক্রাইস্ট চার্চ গার্লস স্কুল স্থানান্তরিত হয় দমদমে. ৩০, যশোর রোডের নবনির্মিত বাড়িতে। নতুন স্কুলবাড়িটির আনুষ্ঠানিক দ্বারোদঘাটন হয় ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ১৬ মার্চ। এই স্কুলের প্রাঙ্গণে ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে একটি সুন্দর চ্যাপেল নির্মিত হয়।

ক্রাইস্ট চার্চের নবনির্মিত গির্জাভবনের দ্বারোদঘাটন তথা পবিত্রকরণ অনুষ্ঠিত হয় ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৪ অগাস্ট। সাবেক গির্জাটির প্রায় অর্ধেক জমির উপর অবস্থিত নতুন গির্জাটি আদত অবস্থান থেকে সরে গেছে অল্প কয়েক ফিট দক্ষিণে।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে চার্চ মিশনারি সোসাইটির হাতে গির্জার পরিচালনভার দেওয়া হলেও ক্রাইস্ট চার্চের বিষয়সম্পত্তি মিশন চার্চ ও ইভ্যানজেলিকাল ফাণ্ডের হাতেই থাকে। নতুন গৃহনির্মাণের পর ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে চার্চ মিশনারি সোসাইটি গির্জার কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং আদি গৃহের দাম হিসাবে মিশন চার্চকে ছয় হাজার টাকা দেন। এই হস্তান্তরের বিষয়টি পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট অনেকের মনেই আপত্তি বোধ জাগিয়েছে। আসলে এই বিতর্কের সূত্রপাত মিশন চার্চের সঙ্গে চার্চ মিশনারি সোসাইটির সম্পর্ক নিয়ে। মিশন চার্চের ইতিহাসে তাই বলা হয়েছে, 'So it is erroneously stated that the Church was 'made over' to the C. M. S. There was no transfer.'[১৪] ক্রাইস্ট চার্চের ইতিহাসকারও জানিয়েছেন, 'This transaction could not be considered as regular. Bishop Wilson who handed over the Charge of Christ Church to the C. M. S. in 1857, did not mean that they would be owners of the property as well.'[১৫]

১৮৫৭ থেকে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দ—এই সময়ে ক্রাইস্ট চার্চের প্যাস্টর ছিলেন গ্রীভ্‌স্ ও মিলওয়ার্ড। ১৮৬০-৬১ খ্রীস্টাব্দে পদটিতে ছিলেন রেভারেণ্ড মধুসূদন শীল। মধুসূদনের পর যিনি প্যাস্টর হলেন, সেই রেভারেণ্ড ক্রিশ্চান বমওয়েট্‌স্ বাংলার মিশনারি মহলের এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে জার্মানির উরটেমবার্গে বমওয়েট্সের জন্ম। জার্মান লুথেরান মিশনারি হিসাবে তিনি ভারতে আসেন ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে। প্রথম কয়েক

বছর তিনি বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে, বিশেষত কৃষ্ণনগরে ধর্মপ্রচারকের কাজ করেন। নীলবিদ্রোহের সময়ে যে স্বল্পসংখ্যক পাদ্রি নিপীড়িত প্রজাদের পাশে দাঁড়ান, বমওয়েট্স্ তাঁদের অন্যতম। দীর্ঘদিন পল্লী অঞ্চলে থাকার পর তিনি কলকাতায় আসেন। ক্রাইস্ট চার্চে তিনি দুটি পর্যায়ে যাজকতা করেন : প্রথমে ১৮৬২-৬৭ ও পরে ১৮৭০-৭৬ খ্রীস্টাব্দ। কলকাতায় অবস্থানকালেই ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি বিবাহ করেন এক বাঙালি স্কুল-শিক্ষিকাকে। বমওয়েট্স্ সম্পূর্ণ একাকী সমগ্র নিউ টেস্টামেণ্ট বাংলায় অনুবাদ করেন, যা সেকালে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল।[১৬] এছাড়া তিনি একটি *Bengali Primer*-ও রচনা করেছিলেন।[১৭] ধর্মীয় বাদবিসংবাদের পর ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি মিশনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন।

শুধু কৃষ্ণমোহন বা বমওয়েট্সের মতো কৃতবিদ্য পাদ্রিদের কর্মস্থল হিসাবে নয়, বহু খ্যাতিমান বাঙালির ধর্মান্তর গ্রহণের দীক্ষাস্থল হিসাবেও ক্রাইস্ট চার্চ কলকাতার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে কলেজ স্কোয়ারে গির্জা-স্থাপনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে যাঁরা বিশপ উইলসনের কাছে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামবাগানের রসময় দত্ত। হিন্দু কলেজ ও ক্রাইস্ট চার্চের নৈকট্য সেদিন তাঁর কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছিল। কিন্তু তাঁরই চেষ্টায় সেই চার্চ যখন এগিয়ে এল তাঁর বসত-বাড়ির কাছেই, তখন তিনি জানতেন না যে কয়েক বছর পরে তাঁরই পুত্ররা ক্রাইস্ট চার্চে ধর্মান্তর গ্রহণ করবেন। রসময়ের পাঁচ পুত্রের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র ও হরচন্দ্র অল্প দিনের ব্যবধানে ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। গোবিন্দচন্দ্রের দুই কন্যা অরু-তরু বালিকা বয়সে এখানেই দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীকালে গোবিন্দচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র উমেশচন্দ্র দত্ত খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন এই গির্জায়। প্রকৃতপক্ষে ক্রাইস্ট চার্চ হয়ে উঠেছে রামবাগানের দত্তদের পারিবারিক চার্চ। বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তার ও সামাজিক মঙ্গলকর্মের জন্য যিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন সেই রায়বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, সি. আই. ই.ও ক্রাইস্ট চার্চেই ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিলেন।

ডাফ চার্চ

কলকাতায় আলেকজাণ্ডার ডাফের স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে একটি রাজপথ (ডাফ স্ট্রিট), একটি বালিকা বিদ্যালয় (ডাফ স্কুল) এবং হেদুয়ার পূর্বদিকের একটি গির্জা (ডাফ চার্চ)। উত্তর কলকাতার পূর্বোক্ত দুটি গির্জার মতো ডাফ চার্চও বাঙালিদের জন্য স্থাপিত 'নেটিভ চার্চ'। যদিও সূচনাপর্বে ইংরেজ পাদ্রিরা গির্জা পরিচালনা করতেন, গির্জাটির জন্ম কিন্তু বাংলাভাষায় ধর্মোপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন থেকেই।[১৮]

ডাফ চার্চের স্থাপনার সঙ্গে কলকাতার চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ প্রেরিত প্রথম মিশনারি আলেকজাণ্ডার ডাফ স্কটল্যাণ্ড থেকে কলকাতায় আসেন ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে। সে সময়ে কলকাতায় স্কটিশ প্রেসবিটেরিয়ানদের গির্জা ছিল মাত্র একটি—সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ চার্চ বা স্কচ কার্ক (১৮১৫)। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ড দ্বিধাবিভক্ত হলে প্রতিবাদী বা

ডিসেনটারস দল স্থাপন করেন ফ্রি চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ড। ফ্রি চার্চে যোগ দেওয়ায় ডাফ এবং তাঁর সহকর্মীরা সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ গির্জা থেকে বহিষ্কৃত হন। নিজেদের একটি গির্জার প্রয়োজন অনুভব করে ফ্রি চার্চ-পন্থীরা তখন ৭৬, ওয়েলেসলি স্কোয়ারে একটি চার্চ স্থাপন করেন। দীর্ঘদিন পরে, ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে এই ওয়েলেসলি চার্চ সম্মিলিত হয় সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ চার্চের সঙ্গে। আরও পরে গির্জাগৃহটি বিক্রি করে দেওয়া হয় ক্যাথলিকদের কাছে। বর্তমানে এটি ক্যাথলিকদের 'প্রভু যীশু গির্জা'।

ওয়েলেসলি চার্চ ছিল প্রধানত ইংরেজিভাষীদের জন্য চিহ্নিত। কিন্তু ডাফ তখন থাকতেন ২, কর্নওয়ালিস স্কোয়ারে, তাঁর প্রচারক্ষেত্র ছিল উত্তর কলকাতা। সে অঞ্চলের বাঙালি খ্রীস্টানদের কথা স্মরণে রেখেই ডাফ হেদুয়ার কাছে একটি ছোট গির্জা স্থাপনের কথা ভাবেন। জর্জ স্মিথ এই নতুন গির্জাটিকে 'বেঙ্গলি চার্চ' নামে অভিহিত করলেও[১৯] সাধারণভাবে এটিকে তখন কর্নওয়ালিস স্কোয়ারে অবস্থিত ফ্রি চার্চ বলা হতো।

ফ্রি চার্চ বা বেঙ্গলি চার্চ নামক এই গির্জা স্থাপিত হয় ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু ঠিক কোন দিন চার্চের শুভারম্ভ সূচিত হয়, তা নিয়ে মতভেদ আছে। প্রবোধকুমার অধিকারীর মতে সূচনাটি ঘটে নভেম্বর মাসে (কোনো তারিখ তিনি দেননি), কিন্তু জর্জ স্মিথের মতে তারিখটা হল ১ অক্টোবর—'The immediate result was the formal organiging, on the Ist. October 1848, of the Bengalee Church, the members of which from their familiarity with English has hitherto worshipped along with the ordinary Congregation of the Free Church in Wellesley Square.'[২০]

বাঙালিদের জন্য স্থাপিত এই গির্জার প্রধান রূপকার আলেকজাণ্ডার ডাফ তখন ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশনের পরিচালনা এবং অন্যান্য বহু কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত। অনতিপরে ফার্লোতে স্কটল্যাণ্ড যাবেন এমন পরিকল্পনাও তাঁর ছিল। তারই মধ্যে প্রতি রবিবার সকালে ইংরেজিতে এবং কদাচিৎ কখনও সন্ধ্যায় বাংলায় ভাষণ দিলেও, চার্চের পরিচালনভার তিনি নিতে পারেননি। গির্জাটির প্রথম 'প্যাস্টর' বা পালক নিযুক্ত হন ডাফের সহকর্মী ডঃ ডেভিড এওয়ার্ট (১৮০৫-১৮৬০)। এওয়ার্ট ভাল বাংলা জানতেন এবং বাংলায় ভাষণ দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। লালবিহারী দে লিখেছেন, 'Ewart was the first pastor of the Bengali Church in connection with the Free Church of Scotland ; and he was well fitted for the post. He preached in Bengali well, and his Sermons always instructed and edified his flock.'[২১] চার্চের শৈশব কাটে এওয়ার্টের সুযোগ্য ব্যবস্থাপনায়। এই সময়ে ডাফ ও তাঁর সহকর্মীদের কাছে ধর্মান্তরিত বাঙালিরাও গির্জাটির সঙ্গে যুক্ত হন—শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, রামচন্দ্র বসু, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, ব্রজনাথ মিত্র, ঈশানচন্দ্র ঘোষ, বরদাপ্রসাদ চক্রবর্তী, রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র, বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র সিংহ, কালীপদ চট্টোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ দে, যোগেন্দ্রনাথ বসু,

নবীনচন্দ্র ঘোষ ও ঈশানচন্দ্র সরকার। এই গির্জাতেই লালবিহারী দে যাজকত্বে অভিষিক্ত হয়েছিলেন ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে।

কলকাতাতেই এওয়ার্টের মৃত্যু হয় ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে পরবর্তী প্যাস্টর নিযুক্ত হলেন ডাফের বিশেষ স্নেহভাজন ছাত্র রেভারেণ্ড লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯৪)। লালবিহারীর জীবনে এই অধ্যায়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়েই তিনি 'Searchings of Heart' (১৮৫৭)-এর মতো ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন।

লালবিহারীর পালকত্বের সময়ে হেমনাথ বসুর ধর্মান্তর নিয়ে একটি বিখ্যাত মামলা হয়। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে কিশোর হেমনাথ লালবিহারীর কাছে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করতে চায়। ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশনের ছাত্র না হওয়ায়, হেমনাথ খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে ঠিক কতটা অবহিত, তা নিয়ে লালবিহারীর মনে দ্বিধা ছিল। কয়েকমাস ধর্মোপদেশ দানের পর ডাফের সঙ্গে পরামর্শ করে লালবিহারী হেমনাথকে ধর্মান্তরিত করতে মনস্থ করেন। কিন্তু হেমনাথের পিতা ডাফ ও লালবিহারীর বিরুদ্ধে অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে জোর করে ধরে রাখার জন্য আদালতে হেবিয়াস কর্পাস জারি করার আবেদন জানান। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হেমনাথের সাবালকত্ব অর্জনে কয়েক মাস বাকি আছে স্থির করে তাকে পিতার হাতে তুলে দেন। বিচারকের এই রায় নিয়ে সে সময়ে হিন্দুসমাজ বিজয়োৎসব করে। কিন্তু দু'বছর পরে হেমনাথ লালবিহারীর কাছে এসে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন।

অর্থনৈতিক ও অন্যবিধ কারণে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে লালবিহারী সরকারি শিক্ষাবিভাগে কর্মগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে চার্চের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ বিচ্ছিন্ন হয়। তখন লালবিহারীর স্থলাভিষিক্ত হন রেভারেণ্ড গুরুদাস মৈত্র। ইতিপূর্বে গুরুদাস লাহোরে আমেরিকান প্রেসবিটেরিয়ান মিশনে দীর্ঘদিন কাজ করেছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত গুরুদাস যোগ্যতার সঙ্গে প্যাস্টরের কাজ নির্বাহ করেন।

১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের পর বেশ কয়েক বছর এই চার্চে কোনো বিশেষ পদাভিষিক্ত প্যাস্টর ছিলেন না। সেই সময়ে একজন করে ইউরোপীয় মিশনারি কার্ক সেসনের মডারেটর হিসাবে কাজ করতেন। বেশ কিছুদিন এই গির্জার দেখাশোনা করেন আলেকজাণ্ডার টমরি—'It has been the custom for many years to hold an English service every Sunday morning in the Bengali Church connected with the Mission. He gave us of his best, and there are many sermons which will be remembered for their originality of thought and their spiritual intensity. His eloquence was the admiration of his Bengali friends, and to their friends they would often speak almost with pride of the kind of preaching they listened to from him in their Church.'[২২] স্কটিশ চার্চেস কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ জেম্স্ ওয়াট ফ্রি চার্চের অধ্যক্ষরূপেও অনেকদিন কাজ করেছেন। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে এই গির্জার সদস্যসংখ্যা ছিল দেড়শো। সংখ্যাটি ছোট হলেও বিখ্যাত ব্যক্তিদের সংযোগে ও কাজকর্মের সজীবতার জন্য এই ক্ষুদ্র চার্চটি কলকাতায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।[২৩]

১৯১০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ডাফের স্মৃতিবিজড়িত এই গির্জাটির নতুন নামকরণ হল 'ডাফ চার্চ'। ব্যক্তিনামাঙ্কিত চার্চের সংখ্যা খুবই কম, সঙ্গত কারণেই আলেকজাণ্ডার ডাফ সেই দুর্লভ স্বীকৃতি লাভ করেছেন। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ড পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হলে ডাফ চার্চ কলকাতার প্রধান প্রেসবিটেরিয়ান চার্চে পরিণত হয়।

১৯২২ খ্রীস্টাব্দের গোড়ায় ডাফ চার্চের স্থায়ী প্যাস্টর নিযুক্ত হন রেভারেণ্ড লক্ষ্মীপ্রসাদ চৌধুরী—'The Rev. L. P. Chowdhury has recently been appointed Pastor of the Duff Church. Mr. Chowdhury has worked for several years in Beldanga. He is the author of several translations of English work into Bengali.'[২৪] লক্ষ্মীপ্রসাদের রচিত জীবনীগ্রন্থ 'স্টেফানস নির্ম্মলেন্দু ঘোষ' (১৯২০) জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। লক্ষ্মীপ্রসাদ ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্যাস্টর ছিলেন। তারপর ঐ পদে আসীন হন যথাক্রমে রেভারেণ্ড সুরেন্দ্রকুমার ঘোষ (১৯২৭-১৯৩৫) ও রেভারেণ্ড প্রবোধকুমার অধিকারী (১৯৩৫-১৯৭১)।

ডাফ চার্চের সম্পত্তির মালিক চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ড মিশন ট্রাস্ট। চার্চ, ম্যান্স্ (পুরোহিতের বাসস্থান), চ্যাপেল ও সেবকদের ঘর নিয়ে মোট জমির পরিমাণ এক বিঘা পনেরো ছটাক। পুরোহিতের বাড়িটি সম্ভবত ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে চার্চের সমকালেই নির্মিত হয়। কথিত আছে, তৈরি হয় স্কটল্যাণ্ডের রানীর দানে। চার্চ ও ম্যান্স্ সংস্কারের জন্য বিশেষ কার্কগণ কয়েকবার দান করেছিলেন। প্রথমে ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশনের ও পরে স্কটিশ চার্চ কলেজের মিশনারি ও ভারতীয় খ্রীস্টান অধ্যাপকরাই গির্জাটির সদস্য তথা পরিচালক ছিলেন। বহুদিন পর্যন্ত স্কটিশ চার্চ কলেজ ম্যাগাজিনে পরবর্তী কয়েকমাসের ধর্মীয় ভাষণের বক্তাদের নাম ছাপা হতো। জন স্ক্রিমজারের মতো সাহিত্যের অধ্যাপকও এই গির্জায় নিয়মিত ধর্মোপদেশ দিয়েছেন।

প্রথমদিকে ইউরোপীয় মিশনারিরা চার্চ সংলগ্ন ম্যান্সে বাস করতেন, সেইজন্য এই ম্যান্সটি অতি বৃহৎ আকারে নির্মিত হয়। চ্যাপেলে সানডে স্কুল হতো, হতো প্রচার সভা। সংযুক্ত ফ্রি চার্চের আমলে চ্যাপেল থেকে সকালবেলা দরিদ্র শিশুদের দুধ বিতরণ করা হতো। পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে আসার পর আদি কনভার্টরা তখন থাকতেন ১৮, ডাফ স্ট্রিটে। কলেজ, চার্চ, ১৮ ডাফ স্ট্রিট ও সেণ্ট মার্গারেট স্কুল তখন এক কম্পাউণ্ডে ছিল, প্রায় কুড়ি বিঘা জমিতে। জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য ১৮, ডাফ স্ট্রিট ও স্কটিশ চার্চ কলেজের মধ্যবর্তী কিছু জমি মিশন ছেড়ে দেয়। সেই জমিতে পুরসভা রাস্তা তৈরি করেছেন। মিশনারিদের একাংশ ২, কর্নওয়ালিস স্কোয়ারে থাকতেন। ফ্রি চার্চের সেসনের সভা প্রায়ই সে বাড়িতে অনুষ্ঠিত হতো।

উল্লেখপঞ্জী

১. H. E. Busteed, 'Echoes from Old Calcutta', 1882, p. 43.
২. Rev. J. Long, 'Calcutta in the olden time: its localities', 'Calcutta Review', Vol. 18, December 1852, p. 294.
৩. Lal Behari Dey, 'Recollections of Alexander Duff, D. D., LL. D.', (London, 1879), pp. 212-13.
৪. 'The Bengal Magazine', December 1873, June 1874, October 1875.
৫. বিনয় ঘোষ, 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত', দ্বিতীয় খণ্ড, (বাক্-সাহিত্য, ১৯৮৩), পৃঃ ২৭৪।
৬. 'I cannot help but mention the name of Ven'ble Daniel Corrie, the then Archdeacon of Calcutta whose missionary interests were so great for the indigenous Christians that in 1821 he purchased the property at 33, Amherst Street, known as C. M. S. compound out of a sum of Rs. 33,000/- donated by his friend, Major Phipps.'– '150th Anniversary (November 12-14, 1976) : Holy Trinity Church' [Souvenior], 1976.
৭. গির্জাটির জন্মলগ্ন বর্ণনা করে লং লিখেছেন, 'The Calcutta Committee, in consequence, purchased for 20,400 rupis (sic) an estate at Mirzapur, which had been previously a 'tannery'; it was purchased out of a sum of 30,000 rupis (sic), given to Mr. Corrie by Major Phipps for mission purposes. The neighbourhood was so insecure a few years previous to that period, that no native would venture out at night with a good shawl on, as he would be liable to be robbed or murdered : while a dense jangal (sic) and filthy tank occupied the site where now a Christian temple raises its head.'–Rev. James Long, 'Handbook of Bengal Missions, in connexion with The Church of England', (London, 1848), p. 105.
৮. দ্র. 'Christmas—1978 and Historical Background of the Church', Church of the Epiphany, Thakurpukur, Calcutta, 1978.
৯. Nirmal C. Sinha, 'The Reverend James Long', 'St. Paul's Cathedral Mission College Golden Jubilee Commemoration Volume', 1950, p. 67.

১০. হোলি ট্রিনিটি চার্চ সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহে অধ্যাপক রেভারেণ্ড প্রণতিপ্রকাশ মণ্ডল বিশেষ সাহায্য করেছেন। তাঁর লেখা 'অতীতের পৃষ্ঠা থেকে হোলি ট্রিনিটি চার্চ' প্রবন্ধটি চার্চের স্মারকপুস্তিকায় (১৯৮৬) মুদ্রিত হয়েছে।

১১. নির্মলকুমার রায়, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থপরিক্রমা' (প্রথম খণ্ড), নবভারতী প্রকাশনী, ১৯৮৫, পৃঃ ২২৭-২২৯।

১২. বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসঙ্গ', (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সম্পাদিত অখণ্ড সং, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৯), পৃঃ ১৬৪।

১৩. 'Friend of India', Tuesday, September 24, 1844, p. 614.

১৪. Phyllis Chester, 'Two hundred years at the Old or Mission Church', Calcutta, 1970, p. 28.

১৫. J. G. Biswas, 'Christ Church : a statement', 1939, p. 6.

১৬. দ্র. 'Review of Mr. Bomwetsch's Bengali translation of the Gospel of Mathew', 'The Bengal Magazine', October, November and December, 1877.

১৭. 'The Bengal Magazine', August, 1877.

১৮. কয়েক বছর আগে ডাফ চার্চের ইতিহাসের একটি অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপি আমার হাতে আসে। পুস্তকাকারে লেখা পাণ্ডুলিপিটির প্রথম পাতায় ছিল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের বিবরণ—

ভারত বিখ্যাত
কলিকাতা ডাফমণ্ডলীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
লেখক—রেভারেণ্ড প্রবোধকুমার অধিকারী, বি. এ.
ডাফমণ্ডলীর প্রাক্তন পালক (১৯৩৫ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত)
ডাফ চার্চ কার্ক সেসন কর্তৃক অনুমোদিত।

বারোটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ—১. চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ডের মিশন কার্যের আরম্ভ ও প্রথম কনভার্ট। ২. ১৯০৫ সালে সভ্য ও সভ্যাদিগের তালিকা। ৩. প্রথম প্রাচীনেরা—তাহাদের কার্য, সেসনের সভা। ৪. ডাফ চার্চ গির্জাঘর ও পুরোহিতের বাড়ি। ৫. রেভারেণ্ড লক্ষ্মীপ্রসাদ চৌধুরীর পালকত্বের সময়। ৬. রেভারেণ্ড সুরেন্দ্রকুমার ঘোষের পালকত্বের সময়। ৭. রেভারেণ্ড প্রবোধকুমার অধিকারীর পালকত্বের সময়। ৮. মণ্ডলীসমূহের সম্মেলন। ৯. প্রাচীন ও প্রাচীনাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী। ১০. মণ্ডলীর কার্যে সাহায্যকারী সভ্য ও সভ্যাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ১১. কর্মরত ডাফমণ্ডলীর তরুণদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ১২. মেয়েদের কথা—মহিলা কর্মীদের কথা।

অপ্রকাশিত এই রচনাটি পড়বার সময়ে আমার মনে হয় যে, চার্চ কর্তৃপক্ষ এটি মুদ্রণের দায়িত্ব নিলে ভারতবর্ষের খ্রীস্টান সমাজের ইতিহাস রচনার বিশেষ সুবিধা হয়। ইতিমধ্যে যতদূর জানি, লেখক পরলোকগমন করেছেন। বৃদ্ধ বয়সের এই

রচনাটি সম্ভবত লেখক সংশোধনের সুযোগ পাননি। চার্চের সঙ্গে দীর্ঘ যোগাযোগ সত্ত্বেও তাঁর সংকলিত বিবরণ সব ক্ষেত্রে তথ্যনির্ভর নয়। তাছাড়া ডাফ চার্চের প্রথম পর্বটি পাণ্ডুলিপিতে প্রায় সম্পূর্ণ অনালোচিত রয়ে গিয়েছে। এইসব ভাবনা নিয়ে আমি প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করি।

১৯. George Smith, 'The Life of Alexander Duff, D. D., LL. D.' Vol. II, (London, 1879), p. 82.

২০. Ibid.

২১. Rev. Lal Behari Dey, 'Recollections of Alexander Duff, D. D., LL. D., and of the mission college which he founded in Calcutta', (London, 1879), p. 223.

২২. Alexander Tomory, 'Alexander Tomory : Indian Missionary', (Edinburgh, 1910), p. 27.

২৩. Alexander Tomory and Mrs. K. S. Macdonald, 'Missions of the United Free Church of Scotland : Story of our Bengal Missions', (Edinburgh, 1907), p. 37.

২৪. 'Scottish Churches College Magazine', March, 1912.

বিমলকুমার পাল

কলকাতার দুর্গাদালান

একটি সরেজমিন সমীক্ষা

পলাশির যুদ্ধের পর যখন কোম্পানির রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হল, তখন বাণিজ্য ও শাসনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হল এক সুসংহত আমলাতন্ত্রের। এই প্রয়োজন থেকেই কলকাতায় সৃষ্টি হল বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ। কলকাতায় চাকরি পাওয়ার আশায় প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে ছুটে এলেন ভাগ্যান্বেষী মানুষের দল। প্রাক্-পলাশি যুগে যাঁরা কলকাতায় ডেরা বেঁধেছিলেন, তাঁরা ইতিমধ্যে থিতিয়ে বসেছেন, কোম্পানির সমৃদ্ধি তাঁদের জীবনযাত্রায় যোগ করেছে স্বস্তিভির মাত্রা।

জনবাহুল্যের ফলে ক্রমে প্রয়োজন হল চিকিৎসক, উকিল প্রভৃতি পেশাদার শ্রেণীর। সব মিলিয়ে পলাশির যুদ্ধের একশো বছরের মধ্যেই কলকাতায় একটি সুগঠিত বাঙালি-সমাজ কায়েম হয়ে উঠল। ব্যবসা, বেনিয়ানি বা ডাক্তারি-ওকালতির আয়ে সে সমাজের এক বৃহৎ অংশ ছিল পরিপুষ্ট। তাঁদের সেই আর্থিক সাচ্ছল্যের ছাপ পড়ল কারুকার্য-মণ্ডিত লৌহফটকে, পেডিমেণ্টশোভিত বার-বাড়িতে, দুর্গাদালানের খিলানে। ফটক বা পেডিমেণ্ট যখন শুধুই ধনীদের কুক্ষিগত, দুর্গাদালান তখন শ্রেণীর বেড়া ভেদ করে প্রবেশ করেছে মধ্যবিত্তদের উঠানেও। বিত্তবানদের দুর্গাদালানের পাঁচটি খিলান বা উচ্চাঙ্গের নকাশি শিল্পকর্মের তুলনায় মধ্যবিত্তদের ত্রি-খিলান হয়ত বা অনেকটাই নিরাডম্বর, তবু সাধ্যানুযায়ী সাধ মেটানোর প্রতিফলন সেখানেও মেলে।

উনিশ শতকের চৌকাঠ পেরিয়ে কলকাতা প্রবেশ কবল বিশ শতকের আঙিনায়। পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশবিভাগের দুঃস্বপ্ন পেরিয়ে শেষে এল স্বাধীনতা। কিন্তু ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের জনজোয়ার আর ক্ষীয়মাণ আভিজাত্যের মুমূর্ষতায় সুয়োরানী কলকাতা ক্রমে পরিণত হল ছিন্নবাসা দুয়োরানীতে। অনেক বাড়িতেই উঠে গেল দুর্গাপুজোর পাট, প্রয়োজন ফুরোতে কোথাও দুর্গাদালান রূপান্তরিত হয়ে গেল ঘরে, কোথাও বা দালান ধূলিসাৎ করে তৈরি হল বাড়ি। অবহেলা-অনাদর অগ্রাহ্য করে আজও তবু টিকে আছে বেশ কিছু দুর্গাদালান। কলকাতার গলি-ঘুঁজি দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে মাঝে-মাঝে হঠাৎ চোখে পড়ে যায় সেই অবহেলিত পুরাকীর্তিগুলি। অনেক সমৃদ্ধি-উৎসব-সমাবেশের এই সাক্ষীদের বুকে জমে আছে বিলীয়মান ইতিহাসের উপাদান। সরেজমিন ক্ষেত্রানুসন্ধানে সংগৃহীত পাঁচটি দুর্গাদালানের কাহিনী আলোচিত হল এই নমুনা-সমীক্ষায়।

গঙ্গাপ্রসাদ সেনের দুর্গাদালান

উনিশ শতকের খ্যাতনামা কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন তাঁর পিতা নীলাম্বরের সঙ্গে কলকাতায় আসেন ১২৪৭ বঙ্গাব্দ নাগাদ। পিতৃভূমি বিক্রমপুরের উত্তরপাড়-কোমরপুর গ্রাম থেকে পিতাপুত্রে প্রথমে আসেন ঢাকায়। তারপর ঢাকা থেকে নদীপথে পৌঁছন কলকাতায়। নীলাম্বর তখন নব্বই বছরের বৃদ্ধ, গঙ্গাপ্রসাদ উনিশ বছরের যুবক। শেষ বয়সে গঙ্গাতীরে বসবাস ও প্রতিদিন গঙ্গাস্নানের সুযোগের আশাতেই নীলাম্বর কলকাতায় আসেন।

চিকিৎসায় দক্ষ ছিলেন নীলাম্বর। ঢাকা অঞ্চলের একটি প্রবাদবাক্য ছিল: 'নীলাম্বরের বড়ি, গণি মিঞার ঘড়ি।'[১] ঢাকার নবাব গণি মিঞার বিরাট ঘড়ি যেমন সঠিক সময় দিত, নীলাম্বরের তৈরি বড়িও তেমনি চিকিৎসাকালে ঈপ্সিত ফলপ্রদ ছিল। সেই স্বীকৃতি পাওয়া যায় প্রবাদটির মধ্যে।

নীলাম্বর-গঙ্গাপ্রসাদের পূর্বপুরুষরা কিন্তু আদতে পূর্ববাংলার লোক ছিলেন না। তাঁরা থাকতেন হুগলী জেলায়, ত্রিবেণীর কাছে বিশপাড়া গ্রামে। বর্গীর হাঙ্গামার চাপে নীলাম্বরের ঊর্ধ্বতন চতুর্থ পুরুষ রাজারাম সেন পৈতৃক বাসভূমি ছেড়ে উত্তরপাড়-কোমরপুরে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন।

নীলাম্বর যখন কুমোরটুলিতে বাসস্থাপন করেন তখন স্ট্র্যাণ্ড রোড বা পোর্ট ট্রাস্টের রেললাইন ছিল না। নীলাম্বর সপরিবারে উঠলেন শোভাবাজারের রাজ-পরিবারের গঙ্গাতীরস্থ আটচালা-ঘরে। কলকাতায় আসার মাত্র দু'বছর পরে, ১২৪৯ বঙ্গাব্দের ভৈমী একাদশীর দিন নীলাম্বরের মৃত্যু হয়। মৃত্যুপথযাত্রী নীলাম্বর নাকি ক্রন্দনরত গঙ্গাপ্রসাদকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'কালে তুমি ভারতের চিকিৎসক-সম্রাট হবে।' গঙ্গাপ্রসাদ সত্যিই পরে বিখ্যাত আয়ুর্বেদজ্ঞ পণ্ডিত হয়েছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিরা নীলাম্বরের কাছে চিকিৎসার জন্য আসতেন। গঙ্গাপ্রসাদের আমলেও এ ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল। রানী রাসমণি ও মথুরবাবুর গৃহচিকিৎসক ছিলেন বলে গঙ্গাপ্রসাদের কাছে স্বয়ং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও এসেছেন চিকিৎসার জন্য। রামকৃষ্ণদেবের জীবনীগুলিতে পরমহংস-গঙ্গাপ্রসাদ প্রসঙ্গ সবিস্তারে বিধৃত আছে।

গঙ্গাপ্রসাদ নানাভাবে কলকাতার আয়ুর্বেদজ্ঞ সমাজ ও আয়ুর্বেদচর্চাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। কলকাতায় সে সময়ে রোগীর চিকিৎসাকালে ডাক্তাররা যথাযোগ্য 'ফি' পেতেন। কিন্তু কবিরাজরা তাঁদের পারিশ্রমিক বা ওষুধের দাম পেতেন রোগীর আরোগ্যলাভের পরে। বলা বাহুল্য, এ নিয়ে বিস্তর গণ্ডগোল হতো। গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজ-সমাজকে একত্রিত করে এই প্রথাটির নিরাকরণ ঘটান। ডাক্তারদের মতো কবিরাজদের ক্ষেত্রে 'ফি'-র রীতি প্রচলিত হয়।

পসারের কল্যাণে গঙ্গাপ্রসাদ কুমোরটুলির গঙ্গাতীরে বসতবাড়ি ও ঔষধালয় স্থাপন করেন। কিন্তু পোর্ট কমিশনারসের রেললাইন পাতার সময়ে সে বাড়ি তার আওতায় পড়ে। ৯/১ কুমোরটুলি স্ট্রিটে বদলি জায়গা নিয়ে গঙ্গাপ্রসাদ নির্মাণ করেন তাঁর

ঔষধালয়। এছাড়া ১৬ ও ১৭ কুমোরটুলি স্ট্রিটের জমি বন্দর-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কিনে গঙ্গাপ্রসাদ বিরাট বসতবাড়ি ও দুর্গাদালান নির্মাণ করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি বছর সেই দালানে দুর্গাপূজা হয়ে চলেছে।

গঙ্গাপ্রসাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন শাক্ত। তাঁর পিতা নীলাম্বর শুধু খ্যাতিমান কবিরাজ ছিলেন না, মন্ত্রসিদ্ধ তান্ত্রিকও ছিলেন। নীলাম্বর দেশের বাড়িতে দীপান্বিতা কালীপূজার রাতে ও শারদীয় মহাষ্টমীর রাতে কালীপূজা করতেন। গঙ্গাপ্রসাদ সে বাড়িতে দুর্গাপূজা প্রবর্তন করেন। কিন্তু দেশের সেই ভদ্রাসন পদ্মাগর্ভে বিলুপ্ত হতে থাকায় গঙ্গাপ্রসাদ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান কলকাতায় উদ্‌যাপন করার সিদ্ধান্ত নেন। গৃহদেবতা গোবিন্দজীউ, লক্ষ্মীদেবী ও শ্রীধর শালগ্রাম শিলাকে নিয়ে আসা হয় কুমোরটুলিতে। মৃৎশিল্পী যদুনাথ পালকে দিয়ে দালানের নকশা ও কারুকার্যের ব্যবস্থা করিয়ে তৈরি হয় দুর্গাপূজার উপযোগী দুর্গাদালান। শারদোৎসবের পাশাপাশি সে দালানে আচরিত হতে থাকে কালীপূজা, রথযাত্রা, দোল প্রভৃতি পূজা-পার্বণ।

দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে নানা উৎসব সমারোহ চালু করেন গঙ্গাপ্রসাদ। মহালয়ার পরদিন দ্বিতীয়া তিথিতে তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দান বা 'বিদায়ের' রীতি চালু করেন। এই বিদায়ের সুব্যবস্থা অদ্যাবধি চলছে। বর্তমানে এই দিনটিতে প্রায় পঞ্চাশজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সাম্মানিক অর্থ দান করা হয়। রসরাজ অমৃতলাল বসু সম্ভবত এই বিদায়ের ইঙ্গিত দিয়েই লিখেছেন, 'স্বনামধন্য স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেনের পূতচরিত্র পৌত্র গিরিজাপ্রসন্ন এখনও পূজার সময় বহু ক্ষুন্নজনকে প্রসন্ন করেন।'[২]

অমৃতলাল যেমন গিরিজাপ্রসন্নের আমলের কথা লিখেছেন, নবীনচন্দ্র সেন তেমনি নিজের স্মৃতিকথায় বর্ণনা করেছেন গিরিজাপ্রসন্নের পিতা ভগবতীপ্রসন্নের সময়ের কথা: 'কলিকাতায় একদিন সুহৃদ্‌শ্রেষ্ঠ বিজয়রত্ন বলিলেন যে, আমার 'কুরুক্ষেত্র'কে যাত্রা করিয়া ভূষণদাসের দল গাইতেছে। তিনি উহার অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন, এবং বলিলেন যে আমাকে উহা একদিন শুনিতে হইবে। প্রথিতনামা চিকিৎসক ৺গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীর গানে বিজয়রত্ন স্বয়ং আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। দেখিলাম একটি বালক অভিমন্যুর অদ্ভুত অভিনয় করিতেছে। সে ঠিক যেন আমার কল্পনার অভিমন্যু। তাহার যেরূপ মধুর কণ্ঠ, সেরূপ সুন্দর দীর্ঘমূর্ত্তি, তেমনই বিষাদ গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত মুখশ্রী, এবং তেমনই গৌরবব্যঞ্জক দেহভঙ্গি। এরূপ অভিনেতা কোনও রঙ্গালয়েও দেখি নাই। সে এ যাত্রাদলের প্রাণ। যাত্রা আগাগোড়া কীর্ত্তনের সুরে বাঁধা। শুনিলাম একজন গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিত 'কুরুক্ষেত্র' হইতে এ যাত্রা রচনা করিয়াছেন। তিনি যদিও স্থানে স্থানে 'কুরুক্ষেত্রের' উপর হাত চালাইয়া যাত্রার অধিকারীর মত দুই একটা দৃশ্য দিয়া রসভঙ্গ করিয়াছেন, এবং সুভদ্রা শোকের মাহাত্ম্য না বুঝিয়া সে সর্গ একেবারে মাটি করিয়াছেন, তথাপি 'কুরুক্ষেত্রের' ভাষা ও ভাব লইয়া এমন মধুর কীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন যে তাহাতে পাষাণ দ্রব হয়। ৺গঙ্গাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠপুত্র ভগবতীবাবুর আদরের ও আহারের আবদারে যদিও আমি যাত্রাটি ভাল করিয়া শুনিতে পারিলাম না, তথাপি যাহা শুনিয়াছিলাম, বিশেষতঃ অভিমন্যুর

অভিনয়ে, মুগ্ধ হইয়াছিলাম।'[৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উদ্ধৃতিটিতে উল্লিখিত 'বিজয়রত্ন' হলেন গঙ্গাপ্রসাদের ভাগিনেয় ও প্রধান ছাত্র মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন।

ঢাকা-বিক্রমপুরের পণ্ডিত-সমাজের ব্যবস্থা অনুসারে এই পরিবারের দুর্গাপ্রতিমা পশ্চিমবঙ্গের প্রচলিত প্রতিমা-কল্পনার তুলনায় একটু ভিন্ন ধরনের হয়। সচরাচর দুর্গার ডানপাশে লক্ষ্মী-গণেশ এবং বাঁপাশে সরস্বতী-কার্তিক থাকেন। কিন্তু সেনবাড়ির চালচিত্রে দুর্গার ডানপাশে লক্ষ্মী-কার্তিক ও বাঁপাশে সরস্বতী-গণেশের অবস্থান। গণেশ ও কার্তিকের স্থানবিনিময় প্রতিমাটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

দুর্গাদালানে অলংকরণের কাজ যিনি করেছিলেন, কৃষ্ণনগরের সেই যদুনাথ পাল গঙ্গাপ্রসাদের সময়ে এ বাড়ির প্রতিমা গড়তেন। তারপর যদুনাথের জ্ঞাতিবংশীয় কাঙালীচরণ পাল এবং কাঙালীচরণের পরে কৃষ্ণনগরের তারাপদ পাল প্রতিমানির্মাণে নিযুক্ত হন। বর্তমানে তারাপদর পুত্র শ্রীহারু পাল প্রতিমার কাজ নির্বাহ করছেন। কুমোরটুলি ঘাটের আড়তদারদের কাছ থেকে মাটি কিনে হারুবাবু প্রতিমা তৈরি করেন। দুর্গাদালানেই দুর্গাপ্রতিমা নির্মাণের কাজ হয়। প্রতিমার কাঠামো প্রতি বছর পরিবর্তন করা হয়। রথযাত্রার দিন নতুন কাঠামো-পূজার মধ্য দিয়ে সূচিত হয় প্রতিমা তৈরির কাজ। এ ব্যাপারে উপকরণ ও সহায়ক ব্যক্তি সংগ্রহের দায়িত্ব শিল্পীর। তাঁর হাতে সেন-পরিবার অর্থ তুলে দিয়েই নিশ্চিন্ত—দায়িত্ব নির্বাহের সব ভারই তাঁর উপর।

সেন-পরিবারের সাবেক পুরোহিত ছিলেন কালীনাথ ভট্টাচার্য এবং তাঁর পুত্র কালীরঞ্জন (খুদু ঠাকুর)। বর্তমানে পৌরোহিত্যের ভার কালীরঞ্জনের জ্ঞাতিবংশের হাতে।

দুর্গাপূজার পনের দিন আগে নবম্যাদি কল্পারম্ভের দিন 'বোধন' অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন থেকে শুরু হয় নিত্য চণ্ডীপাঠ, আরতি ইত্যাদি। ষষ্ঠীর দিনে পালিত হয় অধিবাস, বেল-বরণ, হোম-যজ্ঞ প্রভৃতি। সেন-পরিবারের দুর্গাপূজার পুঁথি সংকলিত হয়েছিল কালিকাপুরাণ ও বৃহৎ নন্দিকেশ্বর পুরাণের নির্দেশ মিলিয়ে। সেই পুঁথি অনুসারেই এ বাড়ির দুর্গাপূজা হচ্ছে।

নীলাম্বরের আমলের রেওয়াজ মনে রেখে মহাষ্টমীর রাতে দুর্গাপ্রতিমার দু'পাশে দুটি কালীপ্রতিমার পূজা হয়। সেদিন শীতলাদেবীর পূজা ও বলিদানও অনুষ্ঠিত হয় ঘটস্থাপনার মাধ্যমে। আগে এই সময়ে একটি মহিষবলি হতো। তাছাড়া ছিল বিভিন্ন দিনে মোট ন'টি ছাগবলির ব্যবস্থা। বর্তমানে জীববলির পরিবর্তে ন'টি চালকুমড়া, নবমীর দিন একটি অতিরিক্ত চালকুমড়া, একজোড়া আখ ও শত্রুকে মন্ত্রপূত করে হাড়িকাঠে বলি দেওয়া হয়।

দশমীতেই প্রতিমা বিসর্জনের নিয়ম। কিন্তু দশমী বৃহস্পতিবারে বা অশ্লেষার মতো অহিতকর নক্ষত্রে পড়লে বিসর্জন বিলম্বিত হয়। পাশেই গঙ্গা। নৌকায় চাপিয়ে মাঝ-গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে এ বাড়ির দুর্গাদালানে বসত চণ্ডীমঙ্গলের পালাগান, পুতুলনাচ, পাঁচালীগান প্রভৃতির আসর। যাত্রা-থিয়েটারও ছিল। গঙ্গাপ্রসাদের পৌত্র রামেশ্বর-

প্রসন্ন, যিনি একাধারে ডাক্তার ও কবিরাজ হয়েছিলেন, 'হর্ষবর্ধন' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। দুর্গাপূজা উপলক্ষে সে নাটকটিও সমারোহের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল।

দুর্গাপূজার সময়ে সেন-বাড়িতে কথকতাও হতো। সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পিতা কথকচূড়ামণি মহানন্দের সঙ্গে সে সময়ে এ বাড়িতে এসেছেন। পিতার সঙ্গে তিনি দোহার ধরতেন। একবার তাঁর দোহারে মুগ্ধ হয়ে গঙ্গাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগবতীপ্রসন্ন নাকি তাঁর দু'হাতে দুটি বালা পরিয়ে দিয়েছিলেন।[৪] নিজের একটি দিনলিপিমূলক রচনায় এ বাড়ির কথা উল্লেখ করেছেন বিভূতিভূষণ, 'এই সেদিন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের সেই ডিস্‌পেন্‌সারি ঘরটাতে গিয়ে গিরিজাপ্রসন্নবাবুর সঙ্গে কথা বলে এলুম—যেখানে আমার ন'বছর বয়সের শৈশবে শেষ বার গিয়েছিলুম।'[৫]

আজও নিষ্ঠার সঙ্গে সেন-পরিবারের সদস্যরা দুর্গাপূজা চালিয়ে যাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু সেদিনের সে সমারোহ আর নেই। সেকালের আড়ম্বরের একটি বর্ণনা দিয়ে তাই সেন-পরিবারের দুর্গাদালান প্রসঙ্গ শেষ করা যাক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ অধ্যাপক' কুমুদবন্ধু সেনের লেখা থেকে আমরা বর্ণনাটি উদ্ধৃত করছি: 'বাল্যকালে গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়কে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। কারণ আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব প্রসন্নকুমার সেন মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল ও এটর্নী ছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র কবিরাজ ভগবতীপ্রসন্ন ও কনিষ্ঠ পুত্র কবিরাজ গুরুপ্রসন্ন আমাদের গ্রে স্ট্রীটের বাড়ীতে সর্বদা যাতায়াত করিতেন। কোন বিশেষ পর্বোপলক্ষে বিশেষতঃ দুর্গোৎসবে আমরা আমন্ত্রিত হইয়া যাইতাম এবং কখনও আমার পিতার সঙ্গে কখনও বা একাকী গিয়াছি। কুমারটুলীতে গঙ্গাতীরস্থ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদের বাটীর দুর্গোৎসবে শহরবাসীরা প্রতিমাদর্শন যাত্রাগান পুতুলনাচ তৎকালে প্রচলিত পূজার পনর দিন পূর্বে চণ্ডীর গান শুনিতে যাইত। এবং পূজার কয়দিন কলিকাতার গণ্যমান্য বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণের জন্য বাঈ খেমটার নাচ ও গান হইত। তৎকালের প্রসিদ্ধ গায়ক-গায়িকাদের মজলিশ হইত। বিজয়া দশমীর দিন সকালে পল্লীর পুরমহিলাগণের শুনিবার জন্য মহিলা গায়িকা দ্বারা বাউল কীর্তনের ব্যবস্থা হইত।

'পূজার কয়দিন একদিকে যেমন দীয়তাং ভূজ্যতাম চলিত আবার তৎসঙ্গে আমোদ-উৎসবের নানা আয়োজনে কুমারটুলী পল্লীটী মুখরিত হইয়া উঠিত। গঙ্গাপ্রসাদ স্বয়ং দাঁড়াইয়া বিশিষ্ট অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থনা করিতেন এবং উৎসবে কোন বিষয়ে কোন অঙ্গহানি না হয় তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। বৃদ্ধ বয়সেও এই বিষয়ে তাঁহার কোন শৈথিল্য ছিল না। তাঁহার পুত্রেরাও এইসব বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন—আদর আপ্যায়নে সকলকে মুগ্ধ করিতেন।'[৬]

শ্যামলধন দত্তের দুর্গাদালান

হাটখোলার বিখ্যাত দত্ত-পরিবারের সন্তান শ্যামলধন দত্ত ছিলেন সেকালের এক খ্যাতনামা অ্যাটর্নি। পেশায় সাফল্যের কল্যাণে তিনি পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে উঠে আসেন ১৫৯, বলরাম দে স্ট্রিটের আলোচ্য বাড়িটিতে। সেকালের বিখ্যাত জুয়েলার পতিত

সেনের কাছ থেকে বাড়িটি কেনার পর শ্যামলধন অচিরে সচেষ্ট হন দুর্গাপূজা প্রবর্তনে। সেটা ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের কথা। সেই থেকে এ বাড়িতে দুর্গাপূজা চলে আসছে।

অপুত্রক শ্যামলধনের কনিষ্ঠা কন্যা রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে ঘোষ লেনের বিখ্যাত ঘোষ-বংশীয় শরৎচন্দ্র ঘোষের বিবাহ হয়। রাজলক্ষ্মী-শরৎচন্দ্রের ছয় পুত্র—প্রকাশচন্দ্র, পরেশচন্দ্র, প্রবোধচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র ও অরুণচন্দ্র ঘোষ। মাতামহের এ বাড়িটি উত্তরাধিকারসূত্রে এই ছয় ভাই পেয়েছিলেন। ঘোষেদের আবাসে পরিণত হলেও বাড়িটি এখনও 'দত্তবাড়ি' নামেই সাধারণ্যে পরিচিত।

শ্যামলধন যে দুর্গাপূজার প্রচলন করেছিলেন এ বাড়িতে, তাঁর দৌহিত্রবংশীয় উত্তরাধিকারীরা তা আজও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছেন। এখনও আগেকার নিয়মেই প্রতি বছর উল্টোরথের দিন কাঠামো-পূজা হয়। প্রতি বছর নূতন কাঠামোয় প্রতিমা গড়ার কাজ চলে। মৃৎশিল্পী প্রতিমা গড়েন দুর্গাদালানেই। প্রতিমায় সিংহের ভিন্নতর রূপকল্পও বজায় আছে সাবেক নিয়ম অনুযায়ী।

পুরুষানুক্রমে এ বাড়ির পূজা করেছেন রাজমোহন ভট্টাচার্য, তাঁর পুত্র মদনমোহন এবং পৌত্র মনোরঞ্জন। মনোরঞ্জনের পুত্ররা পৌরোহিত্যের পেশা ত্যাগ করায় ভট্টাচার্যদের স্থান পূরণ করেন ভবানীপুরের শ্রীসরোজ মুখোপাধ্যায়।

দুর্গাপ্রতিমা নির্মাণের ভার আগে ছিল কুমোরটুলির হরিপদ পালের উপর। সে দায়িত্ব বর্তমানে বহন করছেন তাঁর ভাগিনেয় তারাপদ পাল। এ বাড়ির প্রতিমার অঙ্গে কাপড় জড়ানো হয় না। মাটির প্রলেপের উপর কাপড় সেঁটে তার উপর রং-তুলির সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয় কাপড়ের মতো নকশা। এ কাজ করতে পটুয়ারা আসতেন নবদ্বীপ থেকে।

পূজায় জীববলি হয় না। শুধুমাত্র মহাষ্টমীর দিন চালকুমড়ো বলি হয়। কিন্তু সেই বলিদানও বাড়ির সদস্যদের দেখতে নেই বলে দু'জন ব্রাহ্মণ নতুন সাদা কাপড়ের দু'প্রান্ত ধরে পর্দার মতো আড়াল করে দেন।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে ব্রাহ্মণ, কুমোর, মালী প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার লোকদের 'দান' দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। আর প্রচলিত আছে নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ানোর প্রথা। সপ্তমী থেকে নবমীর মধ্যে একদিন নীলকণ্ঠ পাখি নিয়ে হাজির হয় পাখিওয়ালা। পাখি কিনে খাঁচায় ভরে রাখা হয়। বিসর্জনের সময় দুর্গাপ্রতিমার আগে আগে পাখির খাঁচা নিয়ে চলে পথ-পরিক্রমা। গঙ্গার ঘাটে পৌঁছনোর পর ছেড়ে দেওয়া হয় নীলকণ্ঠ পাখিটিকে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, নীলকণ্ঠ পাখি কৈলাসে উড়ে গিয়ে পৌঁছে দেবে দুর্গার প্রত্যাবর্তনের আগাম খবর।

দুটি নৌকার মাঝখানে দুর্গাপ্রতিমা বসিয়ে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন সাধিত হয়। বিসর্জনের মুহূর্তে নৌকা দু'টি সরে যায় দু'পাশে। বিসর্জন অন্তে বাড়ি ফেরার পর দুর্গাদালানে চলে শান্তিজল সিঞ্চনের পালা।

অনেকগুলি শাখায় ঘোষ-পরিবার বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে দুর্গাপূজায় পালা-প্রথা শুরু হয়। শরৎচন্দ্র-রাজলক্ষ্মীর ছয় পুত্র—ছ'টি এবং সর্বজ্যেষ্ঠ পৌত্র

বনবিহারী (পরেশচন্দ্রের পুত্র) একটি—মোট সাতটি পালায় পূজার অধিকার আবর্তিত হয় ক্রমানুযায়ী।[৭]

গোপাল ভট্টাচার্যের দুর্গাদালান

কাশী মিত্র ঘাট স্ট্রিটের এই দুর্গাদালানের স্থাপয়িতা পণ্ডিত জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জ্ঞাতি ভাগিনেয় জয়গোপাল কিছুদিন মেট্রোপলিটান স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন। কিন্তু পৌরোহিত্য করার কল্যাণে তাঁর পদবী হয়ে দাঁড়ায় 'ভট্টাচার্য', লোকমুখে নামটি সংক্ষিপ্ত হয়ে তিনি পরিচিত হন 'গোপাল ভট্টাচার্য' নামে। এই পরিবারটির আদি বাসস্থান খানাকুলের নিকটবর্তী মায়াপুর গ্রামে।

জয়গোপালের পুত্র ভোলানাথ এবং পৌত্র সন্তোষকুমারও পৌরোহিত্য করতেন। সে ধারা বজায় রেখেছেন সন্তোষকুমারের পুত্র শ্রীসুশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়. জয়গোপালের মতো তাঁর নামটিও সংক্ষিপ্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে 'শান্তি ভট্টাচার্য'। সুশান্তবাবুর ভাইয়েরা জীবিকা খুঁজেছেন অন্যান্য পেশায়।

ভট্টাচার্য-পরিবারের দুর্গাদালানের দ্বিতলে পূজিত হচ্ছেন শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র (রাধাকৃষ্ণ) বিগ্রহ ও শ্রীধর শালগ্রাম শিলা। বাগবাজার-কুমোরটুলি অঞ্চলের বহু কায়স্থ ও কুম্ভকার পরিবার ভট্টাচার্যদের যজমান। তাই পরিবারটির আঞ্চলিক প্রতিপত্তি কম নয়।

ভট্টাচার্যদের দুর্গাপ্রতিমা খুব বড় নয়। প্রতি বছর জন্মাষ্টমী বা রাধাষ্টমীর দিন কাঠামো পূজা হয়। প্রতি বছর অবশ্য কাঠামো বদলানো হয় না, সেটা হয় কয়েক বছর অন্তর। নিজেরা যাজক হলেও স্বগৃহের পূজা এঁরা করেন না, তন্ত্রধারকের ভূমিকা পালন এবং বহিরাগত পুরোহিতকে সাহায্য করার মধ্যেই পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ।

কালিকাপুরাণ ও দেবীপুরাণের মিশ্রিত পদ্ধতিতে পূজা পরিচালিত হয়। ষষ্ঠ্যাদিকল্পারম্ভের দিন পূজা আরম্ভ হয়। সেদিন সন্ধ্যায় পালিত হয় বোধন ও অধিবাস। জাঁকজমকহীন এই পূজায় আগে ছাগ ও মহিষবলি হতো। বর্তমানে চালকুমড়া, আখ, শশা ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়।

প্রথাসিদ্ধ এককাঠামোর প্রতিমাটি আগে গড়তেন হারু পাল। হারু পালের পর তাঁর শ্যালক হাবুল পাল সে কাজ করতেন। বর্তমানে হারু পালের শিল্পশিষ্য অসিত-কুমার মুখোপাধ্যায় প্রতিমা তৈরির কাজ নির্বাহ করছেন।[৮]

সুর পরিবারের দুর্গাদালান

ডাফ স্ট্রিটের এই দুর্গাদালানটির কথায় আসার আগে সুর পরিবারের ইতিহাসটি একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। হুগলী জেলার মানকুণ্ডুর নিকটবর্তী আলতাড়া গ্রামে এই সদ্‌গোপ পরিবারটির আদি নিবাস ছিল। পুরনো কলকাতার এক ধনী প্রবাদপুরুষ হরি পালের ইচ্ছা ছিল সুর, নিয়োগী ও বিশ্বাস—এই তিন কুলীনবংশে নিজের তিন কন্যার বিবাহ দেবেন। সেই অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যা উমাশশীর সঙ্গে আলতাড়ার রামধন সুরের বিবাহ দিয়ে রামধনকে নিয়ে আসেন কলকাতায়।

পরিশ্রমী যুবক রামধন অবস্থাপন্ন শ্বশুরের পৃষ্ঠপোষকতায় স্টেশনারি দোকান খুলে অফিসে-অফিসে স্টেশনারি জিনিস সরবরাহ শুরু করেন। পাশাপাশি শুরু হয় কাগজের ব্যবসা। কিছুদিনের মধ্যেই সাফল্যলাভ করলেন রামধন। তিন-চারটি দোকানের মালিকানা ও সাতটি বিদেশী কাগজ কোম্পানির সোল এজেন্সি তাঁর করায়ত্ত হল।

রামধনের দুই পুত্র প্যারীমোহন ও চন্দ্রমোহন একটি নতুন ব্যবসা শুরু করেন কলকাতায় স্থান-সমস্যা তখন শুরু হয়ে গেছে। কলকাতা ও শহরতলির জমি কিনে প্লট করে বিক্রি শুরু করেন দুই ভাই। প্রচুর মুনাফার মাধ্যমে নতুন সমৃদ্ধির সন্ধান পায় সুর পরিবার।

চন্দ্রমোহনের স্ত্রী কেদারমণির আগমনের পর থেকেই সুর-পরিবারের উত্থান প্রবল হয়ে ওঠে। হুগলী জেলার সীনামোড় গ্রাম থেকে সাত বছর বয়সে সুর-পরিবারের বধূ হয়ে আসেন কেদারমণি। দু'বছরের মধ্যেই সমৃদ্ধির জোয়ার আসে, ১২ এবং ১৫ নম্বর হরি পাল লেনের বাড়ি ছেড়ে পরিবারটি উঠে আসে ডাফ স্ট্রিটের এই বাড়িতে। পুরনো বাড়ির দুর্গাপূজার রেওয়াজ বজায় রাখতে নতুন বাড়িতে তৈরি হয় দুর্গাদালান। তারপর সুদীর্ঘ ১০৮ বছর সে পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ডাফ স্ট্রিটের যৌথ বাড়িটি ছিল সাড়ে চোদ্দ কাঠা জমির উপর। বাড়ির সামনে লম্বা গাড়িবারান্দা। দরজা পেরিয়ে উঠান, উঠানের ধারে কমবেশি ৪০ ফিট লম্বা ও ২৫ ফিট চওড়া দুর্গাদালান। এই দু' মহলা বাড়ি প্রথমে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়। তারপর একে-একে ভাড়াটে বসানো হয়েছে, বিক্রিও হয়ে গেছে একাংশ। দুর্গাপূজাও বন্ধ হয়ে গেছে। বজায় আছে শুধু রামধন-পূজিত শ্রীধর শালগ্রাম শিলার পালাক্রমে সেবা।

একদিন কুমোরটুলির মৃৎশিল্পী যেখানে প্রতিমা গড়তেন, ডাকের সাজ, চালচিত্র, উৎসব-অনুষ্ঠান, কথকতা-ভাগবত পাঠ, ফক সাহেবের ম্যাজিক বা ব্যায়াম-প্রদর্শনী হতো, সে দুর্গাদালান আজ রিক্ত। অতীতের স্মৃতির মধ্যেই বেঁচে আছে এই দালানের ঐতিহ্যময় দুর্গাপূজা।[৯]

পাল পরিবারের দুর্গাদালান

ইতিপূর্বে আলোচিত চারটি দুর্গাদালানেরই বয়স শতাধিক বছর। সাম্প্রতিককালেও যে দুর্গাদালান নির্মিত হয়েছে, তার উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপিত হচ্ছে এই পঞ্চম ও শেষ দুর্গাদালানটির সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ।

৫, হরি ঘোষ স্ট্রিটের আলোচ্য দুর্গাদালানটি নির্মিত হয় ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ, পূজা শুরু হয় তারও বহু পরে, ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ। পূজা প্রবর্তন করেন সুরেন্দ্রনাথ পালের স্ত্রী আদ্যাশক্তি দাসী।

এই পাল পরিবারটির আদি বাড়ি ছিল কৃষ্ণদাস পাল লেনে। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের মা কোনো কারণে সে বাড়ি বিক্রি করে দেন। দীর্ঘদিন বিভিন্ন ভাড়াবাড়িতে কাটানোর পর পরিবারটি স্থায়ী ঠিকানা পায় এই বাড়িতে।

প্রথমদিকে প্রতিমা গড়তেন কুমোরটুলির হাবুল পাল। বর্তমানে সে কাজ করছেন তাঁর পুত্র। প্রতি বছর রথযাত্রার দিন কুমোরটুলি থেকে শিল্পী এসে প্রতিমার বায়না নিয়ে যান। প্রতিমা তৈরি হয় কুমোরটুলিতেই। কাঁচা অবস্থাতেই সেখান থেকে নিয়ে এসে দুর্গাদালানে বসানো হয়, দালানেই প্রতিমার অঙ্গরাগ হয়।

বৈষ্ণবমতে অনুষ্ঠিত পূজায় কোনো বলি হয় না। তিথিনির্বিশেষে পূজার সব ক'টি দিন নিরামিষ আহার চলে। বাগুইআটি থেকে ব্রাহ্মণ এসে পৌরোহিত্য করেন। দশমীতে নিরঞ্জন হয়ে থাকে নিমতলা বা আহিরিটোলা ঘাটে।

পাল পরিবারে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতীপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা ও বারো মাস সত্যনারায়ণ পূজা পালিত হয়। সে-সময়ে অন্য দেবদেবীরাও আসন পান দুর্গাপূজার দুর্গাদালানে।[১০]

শেষের কথা

কলকাতার দুর্গাদালানের এই নমুনা-সমীক্ষায় আমরা শুধু কয়েকটি পরিবারের ইতিহাস ও পূজার প্রসঙ্গেই আলোচনা করলাম। দালানগুলির নির্মাণ-কৌশল ও অলংকরণ-বৈচিত্র্য একটি ভিন্ন সমীক্ষার বিষয় হতে পারে। কলকাতায় ছড়িয়ে থাকা অজস্র দুর্গাদালানের সব ক'টি দিক নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা একটি সুবৃহৎ গ্রন্থের পরিসর দাবি করে। কোনো যোগ্য গবেষকের দ্বারা সে কাজ সাধিত হলে কলকাতার ইতিহাসের বহু মূল্যবান উপকরণ আবিষ্কৃত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

উল্লেখপঞ্জী

১. হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, 'বঙ্গভাষার লেখক', (বঙ্গবাসী, ১৩১১), পৃঃ ৭৬৪।
২. অমৃতলাল বসু, 'পুরাতন পঞ্জিকা', 'মাসিক বসুমতী', চৈত্র ১৩৩০, পৃঃ ৮৪৩।
৩. নবীনচন্দ্র সেন, 'আমার জীবন', পঞ্চম ভাগ (সান্যাল এণ্ড কোম্পানি, ১৩২০), পৃঃ ৩৪৬।
৪. এই কিংবদন্তীটি-সহ অন্যান্য তথ্য-সংগ্রহে সহায়তা করেছেন গঙ্গাপ্রসাদের প্রপৌত্র শ্রীজ্যোতিপ্রসন্ন সেন।
৫. 'উর্মিমুখর', 'বিভূতি-রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড (মিত্র ও ঘোষ, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৩৯২), পৃঃ ৪৪৮–৪৯।
৬. কুমুদবন্ধু সেন, 'আয়ুর্বেদের এক গৌরবময় যুগ', 'লোকসেবক', ১৫ চৈত্র ১৩৬৪ / ২৯ মার্চ ১৯৫৮।
৭. তথ্যগুলি সরবরাহ করেছেন ঘোষ পরিবারের শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ।
৮. তথ্যগুলি দিয়েছেন শ্রীসুশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৯. তথ্যগুলি পাওয়া গেছে চন্দ্রমোহন সুরের প্রপৌত্র শ্রীবিমলকুমার সুরের কাছে।
১০. পাল পরিবারের প্রবীণতম সদস্য শ্রীসতীন্দ্রনাথ পালের সৌজন্যে তথ্যগুলি পেয়েছি।

পূর্ণেন্দুনাথ নাথ

কলকাতায় করারোপ

কোম্পানির আমলে

উপনিবেশ স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক শোষণ। সেই শোষণ চালানোর বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে একটি হল নানা ধরনের কর আরোপ। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকরা তাঁদের ভারতীয় উপনিবেশে এ রীতির ব্যতিক্রম ঘটাননি। স্বয়ং ইংরেজরাই যেসব করকে অন্যায্য বা জবরদস্তিমূলক বলে বর্ণনা করেছেন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নির্দ্বিধায় সেসব কর আরোপ ও আদায় করেছিল। কোম্পানির আমলে কলকাতায় যে করব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ একটি পৃথুলাকার গ্রন্থের বিষয় হতে পারে। সীমিত পরিসরের এ নিবন্ধে আমরা কোম্পানি-শাসনের আদিপর্বে করব্যবস্থার যে উন্মেষ ঘটেছিল, তার রূপরেখা চিহ্নিত করার চেষ্টা করব।

ইংরেজ আগমনের সময়ে এদেশে প্রচলিত ছিল মুঘল করপদ্ধতি। সেই পদ্ধতিতে করগুলি বিন্যস্ত ছিল দুটি শ্রেণীতে: ভূমিরাজস্ব (খাজনা) ও 'সায়ের'। আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, অভ্যন্তরীণ মাল চলাচলের শুল্ক, অনুমতি-কর (লাইসেন্স ট্যাক্সের সঙ্গে তুলনীয়), বাজার-কর প্রভৃতি বিভিন্ন কর ছিল 'সায়ের' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কয়েকটি অঞ্চলে আবার ভূমিরাজস্বের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্বই ছিল না, সেটিকেও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল 'সায়ের'-এর মধ্যে।[১] ভূমিরাজস্ব নির্ধারিত হতো বাদশাহ বা সুবাহদার নির্দেশিত 'নিরিখ' অনুযায়ী। কিন্তু 'সায়ের' শ্রেণীর বিচিত্র করগুলির ক্ষেত্রে সেরকম কোনো নির্ধারিত নীতি ছিল না। তাই সেসব করের পরিমাণ নির্ভর করত আদায়কারী আঞ্চলিক শাসকের খেয়াল-খুশির উপর।[২] ফলে অঞ্চলভেদে করগুলির অঙ্ক ও আদায়ের রীতিনীতি ভিন্নতা ধারণ করত। বাদশাহ বা নবাবের রাজ্যাভিষেকের সময়ে (জুলুস) বা জন্মদিনে ভূমিরাজস্বের 'নিরিখ' ঘোষিত হতো। বাদশাহী আমল শেষ হওয়ার পর বৈশাখ মাসের একটি দিনে জমির খাজনা স্থির করার নিয়ম প্রচলিত হয়। সেই বিশেষ দিনটিকে অভিহিত করা হতো 'পুণ্যাহ' নামে।[৩]

১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানি মুঘল সম্রাটের কাছে কলকাতা-সুতানুটি-গোবিন্দপুরের জমিদারি ক্রয় করার অনুমতি চায়। সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে বাংলার সুবাহদার সে অনুমতি মঞ্জুর করেন। এই জমিদারি লাভ করার জন্য একদিকে যেমন পূর্ববর্তী জমিদারদের (সাবর্ণ চৌধুরী পরিবার) ক্রয়মূল্য দিতে হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি

নবাবকে পূর্ব প্রচলিত হারে খাজনা দেওয়ার স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল কোম্পানিকে।[৪] ইতিপূর্বে জমিদারির অধিকার শুধু ব্যক্তিবিশেষকেই দেওয়া হতো। এই প্রথম সেই অধিকার অর্জন করল একটি প্রতিষ্ঠান।

জমিদার হওয়ার ফলে কোম্পানির কয়েকটি অধিকার জন্মাল। তার মধ্যে তিনটি প্রধান: ১. রায়তদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার, ২. পতিত জমি বিলি-বন্দোবস্ত করার অধিকার, ৩. জরিমানা ও স্বল্পাঙ্কের নতুন শুল্ক আদায়ের অধিকার।[৫] এই অধিকারের বলেই কোম্পানি কলকাতায় কর আদায় করতে শুরু করে।

জমিদারি কেনার সময়ে শর্ত ছিল যে, কোম্পানি কলকাতার প্রতি বিঘা জমির জন্য সর্বোচ্চ তিন টাকা খাজনা আদায় করতে পারবে। নবাবকে দেয় অর্থ মিটিয়ে ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানির মাসিক প্রায় ৪৮০ টাকা উদ্বৃত্ত হয়। কর থেকে মুনাফার অঙ্ক বাড়াবার জন্য কোম্পানি বারেবারে ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু বাদশাহী 'নিরিখ' ব্যতীত রাজস্ববৃদ্ধির প্রয়াস ছিল বেআইনী।[৬] তাই ইংরেজ কোম্পানির এই অপচেষ্টার কথা জানতে পেরে সুবাহদার অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। ১৭৩২ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, বাদশাহী নিরিখ লঙ্ঘন করলে কোম্পানির জমিদারি কেড়ে নেওয়া হবে।[৭]

কোম্পানির পরিচালন-পর্ষদ ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই ব্যতিব্যস্ত ছিল বলে ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে কাউন্সিলের মধ্যে 'কালেক্টর' বা 'জমিদার' নামে একটি নতুন পদ সৃষ্ট হল। এই পদটি সর্বপ্রথম লাভ করেন র‍্যাল্‌ফ শেলডন।[৮] ব্যবসায়িক ও বাস্তু জমির জন্য কোম্পানির মোহরাঙ্কিত ইজারাপত্র (পাট্টা) দেওয়া, আবাদী জমি বিলি এবং কর-জরিমানা আদায় ছিল শেলডনের প্রধান কাজ। তাঁর আদায়ীকৃত কর ও জরিমানার অর্থই ছিল জমিদারি থেকে কোম্পানির আয়ের প্রধান উৎস। যেসব প্রজা যথাসময়ে খাজনা দিতে অপারগ হতেন, কালেক্টর তাঁদের কয়েদ করে রাখতেন নিজের কাছারিতে, চাবুকও মারা হতো সেই হতভাগ্যদের। কলকাতায় ইতিমধ্যে বিচারালয় স্থাপিত হয়ে গেলেও কালেক্টররা তার ধার ধারতেন না। প্রজা শায়েস্তা করার ভার তাঁরা নিজেদের হাতেই রেখেছিলেন।

কোম্পানির কালেক্টরের মাইনে ছিল বার্ষিক দু' হাজার টাকা। কিন্তু বিভিন্ন আইন-বহির্ভূত পদ্ধতিতে ও ব্যক্তিগত ব্যবসার কল্যাণে তাঁরা প্রভূত সম্পদের অধিকারী হয়ে উঠতেন।[৯] জমিদারি পরিচালনার কাজ কালেক্টরকে সাহায্য করতেন একজন দেশীয় কর্মচারী। কলকাতার ইতিহাসে এই বাঙালি সহায়করা 'ব্ল্যাক জমিদার' নামে অভিহিত হয়েছেন।[১০] স্বনামধন্য নন্দরাম সেন ও গোবিন্দরাম মিত্র এই পদটি 'অলঙ্কৃত' করেছিলেন।

কলকাতার ভূমিরাজস্ব-নীতি দীর্ঘকাল অপরিবর্তিত ছিল। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের ত্রয়োবিংশ আইনের মাধ্যমে এ-বিষয়ে কিছু পরিবর্তন আনা হয়। কলকাতা শহরে কোম্পানির প্রত্যক্ষ মালিকানা-বহির্ভূত সমস্ত জমির খাজনা নির্ধারিত হয় কাঠা প্রতি

তিন আনা। দেউলিয়া বা দেনদার ব্যক্তির ক্ষেত্রে অন্যান্য ঋণ পরিশোধের আগে খাজনার টাকা আদায় করা হবে, এমন ব্যবস্থাও আইনটিতে রাখা হয়েছিল।[১১]

বাজার কর

বাজার থেকে কর আদায়ের প্রথা মুঘল আমলেও প্রচলিত ছিল। বাজারের মালিক একদিকে জমিদারের প্রাপ্য কর মিটিয়ে বাজারটি নিজের দখলে রাখতেন এবং অন্যদিকে বিক্রেতাদের কাছ থেকে আদায় করতেন নিজের প্রাপ্য টাকা। বিক্রেতাদের দেয় অর্থের অঙ্ক নির্ভর করত পণ্যের পরিমাণ ও মূল্যের উপর। কোম্পানি-নির্দিষ্ট হারে টাকা আদায় করে বাজারের মালিককে সন্তুষ্ট থাকতে হতো।

পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের কিছুদিনের মধ্যেই কোম্পানি 'সায়ের' শুল্ক তুলে দেয়। কিন্তু কর সংগ্রহে বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ায় ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের ১১ জুন 'সায়ের' পুনঃপ্রবর্তিত হয়। মাত্র কয়েকদিন পরেই শুধু বাজার-হাটের শুল্ক বজায় রেখে 'সায়ের' আবার তুলে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হওয়ায় কলকাতায় নতুন করারোপ অসুবিধাজনক ছিল। তাই 'সায়ের'-এর অন্তর্ভুক্ত বাজার-কর এইভাবে বজায় রেখে পরে আইনের মাধ্যমে ফোর্ট উইলিয়ামকে তার আদায়-ক্ষমতা দেওয়া হয়।

তখন কড়িই আদানপ্রদানের প্রধান মূল্যমান বলে বিবেচিত হতো। কড়ির হিসাব ছিল : চারটি কড়িতে এক গণ্ডা, কুড়ি গণ্ডায় এক পণ এবং ষোল পণে এক কাহন। তৎকালীন প্রধান মুদ্রা ছিল আর্কট টাকা।[১২] কড়ির উৎকর্ষ অনুযায়ী একটি আর্কট টাকার বিনিময়মূল্য ছিল দু' কাহন দশ পণ থেকে দু' কাহন তেরো পণ কড়ি। বিক্রেতাদের উপর তখন কর ধার্য করা হতো কড়ির হিসাবেই।

যেসব পণ্যের উপর কর বসানো হয়েছিল সেগুলির মধ্যে কয়েকটি হল : ধান, চাল, তরিতরকারি, তেল, নুন, চুন, হলুদ, পান, সুপারি, কলা, আখ, দুধ, মিষ্টান্ন, তালমিছরি, হরিণ প্রভৃতি পশুর মাংস, তাড়ি, তামাক, কামার-কুমোর-তাঁতি-কাঁসারি-সোনার বেনের দোকান, সুতা, কাপড়, মাদুর, গাছপালা, কবিরাজি গাছগাছড়া, বাঁশ, জ্বালানি কাঠ, খড়, মাছধরা জাল ও যন্ত্রাংশ, লোহালক্কড়। করারোপের পদ্ধতি ও পরিমাণের কথা সারণি-২-এর মধ্যে দেওয়া হল।

কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলের বাজারগুলি তখন বসত সপ্তাহের একটি বা দুটি নির্দিষ্ট দিনে। সুতানুটি বাজার বসত বৃহস্পতি ও রবিবারে। কালীঘাট ও গোবিন্দপুর বাজার বসত সপ্তাহে মাত্র একদিন, শনিবারে। বাজারে পণ্য আসত মূলত তিনভাবে —১. মুটের মাধ্যমে, ২. বলদের পিঠে বস্তা বা ছালায় এবং ৩. গরুর গাড়িতে। বিক্রেতাদের তখন বাজারের মালিক বা ইজারাদারকে দু' ধরনের কর দিতে হতো— তোলা ও ত'বাজারিয়া। ত'বাজারিয়া দিতে হতো নগদে, আর তোলা ছিল পণ্যের অংশবিশেষ।

১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত তৎকালীন জমিদার পিটার আমিয়াট

ত'বাজারিয়ার পরিমাণ ধার্য করেন বিক্রেতা পিছু বারো গণ্ডা দু' কড়ি। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে কলকাতার কালেক্টর জন স্কট একটি প্রতিবেদন পাঠান কালেক্টর অফ রেভেনিউয়ের কাছে। সেই প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, ত'বাজারিয়ার অঙ্কের মধ্যে ব্রাহ্মণদের দেয় বৃত্তি বাবদ দু' গণ্ডা দু' কড়ি ধরা ছিল। ব্রাহ্মণদের বৃত্তি যে ত'বাজারিয়ার অর্থ থেকে দেওয়া হতো, সেকথা ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের একটি হিসাব থেকেও জানা যায়।[১৩]

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, অধিকাংশ দোকানদার পণ্যের পরিবর্তে নগদ অর্থে 'তোলা' দিচ্ছেন। ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বিষয়টি কলকাতার রেভেনিউ কমিটির গোচরে আনা হয়। এই রীতিটি স্থায়ী প্রচলন লাভ করার ফলে অনতিবিলম্বে বিলুপ্ত হল ত'বাজারিয়া ও তোলার বাস্তব পার্থক্য।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার বাজারগুলির চরিত্রে এল রূপান্তর। আগে যেসব পণ্য ছিল শুধুমাত্র হাটের দিনেই লভ্য, সেগুলি এবার স্থায়ী দোকানে স্থান পেতে লাগল। একই বিক্রেতার কাছে বিচিত্র পণ্যের সমাহারও আরম্ভ হল। এই সময়ে যেমন বিভিন্ন পণ্যের উপর কর আরোপিত হতো, তেমনি দোকানের উপর প্রযুক্ত হতো একটি স্বতন্ত্র কর। ফলে, দোকানদাররা পড়তেন দুটি করের আওতায়। এই অসুবিধা নিরাকরণের জন্য ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দের ২৫ মে ও ২১ সেপ্টেম্বর সপারিষদ গভর্নর জেনারেল দুটি নয়া নির্দেশ জারি করলেন। স্থির হল, আচ্ছাদনহীন হাট, রাস্তা বা জমির উপর বসে কোনো পণ্য বিক্রি করলে তার জন্য কর দিতে হবে। কিন্তু স্থায়ী দোকান থেকে জিনিসগুলি বিক্রি করলে এই 'পণ্য কর' লাগবে না, শুধু দোকানঘরের জন্য ধার্য করটুকু দিলেই চলবে।

গৃহ কর

ইংরেজরা প্রথম ডেরা বেঁধেছিলেন সুতানুটিতে। ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে তাঁরা সন্নিহিত অন্য অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেন। সেই সময়ে বহু বিস্তৃত পতিত জমি কোম্পানি অধিকার করে। ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বরের এক নির্দেশনামার মাধ্যমে বিঘা পিছু আট আনা খাজনায় এইসব জমির পাট্টা দেওয়া শুরু হয়।

কোম্পানির জমিদারির আদিপর্বে কলকাতার প্রায় সব বাড়িই ছিল হোগলা, গোলপাতা বা খড়ের ছাউনিতে ঢাকা মাটির কুটির। কোম্পানির জমিদারি লাভের একশো বছর পরে, অর্থাৎ ১৭৯৩-৯৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় পাকা বাড়ির সংখ্যা দাঁড়ায় ১,১১৪টি।[১৪] কলকাতায় পাকা বাড়ি নির্মাণের ব্যাপক প্রচলনের পিছনে ছিল পাটনার একটি দুর্ঘটনা। ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দের এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পাটনার প্রায় সমস্ত বাড়ি ভস্মীভূত হয়, কারণ সেগুলি প্রায় সবই ছিল খড়ের তৈরি। এই অগ্নিকাণ্ডই কলকাতায় খড়ের ঘরের বদলে পাকা বাড়ি তৈরির প্রেরণা যোগায়।[১৫]

ইতিমধ্যে ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি থেকে কোম্পানি সাহেবপাড়ার বাড়ি বেচাকেনার উপর পাঁচ শতাংশ কর জারি করেছিল। কিন্তু ইউরোপীয় অধিবাসীদের

প্রবল প্রতিরোধের ফলে ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে করটি ব্রিটিশদের উপর থেকে প্রত্যাহৃত হয়। অথচ পোর্তুগীজ, আরমানি প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের উপর করটি অপরিবর্তিত ভাবে বহাল থাকে।

চৌকিদারি কর

পুরনো কলকাতার মেটে রাস্তাঘাট একদিকে ছিল অপরিসর, অপরিচ্ছন্ন, ভাঙাচোরা, আবার অন্যদিকে ছিল চোর-ডাকাতের বিপদসঙ্কুল। এইসব রাস্তাঘাট পাহারা দেওয়ার জন্য কোম্পানি একটি নতুন কর বসায়—'পুলিস ট্যাক্স' বা 'চৌকিদারি কর'। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে চিৎপুর থেকে চৌরঙ্গি পর্যন্ত নজরদারির জন্য করটি প্রথম আরোপিত হয়। তখন তার হার নির্দিষ্ট হয়েছিল বিঘা পিছু চার থেকে পাঁচ টাকা।[১৬] খাজনার সঙ্গেই এই টাকাটা দিতে হতো। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে এই ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়। একটি মাত্র করের মধ্যেই রাস্তার মেরামতি, নজরদারি এবং পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক শুল্ক কেন্দ্রীভূত করা হয়। বসতবাড়ির জন্য এই বহুমুখী পথ-করের পরিমাণ ধার্য করা হয় খাজনার পাঁচ শতাংশ। কিন্তু দোকানদারদের ক্ষেত্রে করটির হার ছিল বেশি। তাঁদের দিতে হতো খাজনার দশ শতাংশ।[১৭]

তৌলদারি কর

জাল-জুয়াচুরি প্রতিরোধ করার জন্য কোম্পানির আমলে বছরে দু'বার ব্যবসাদারদের দাঁড়িপাল্লা-বাটখারা পরীক্ষা করা হতো। এই পরীক্ষার জন্য যে কর আরোপিত হয়েছিল, তার নাম 'তৌলদারি কর'। কোম্পানি-শাসনের গোড়ায় বাটখারাসহ প্রতিটি দাঁড়ি-পাল্লার জন্য দিতে হতো এগারো পণ পাঁচ গণ্ডা কাড়ি। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার জাস্টিস অফ পিস জানান যে, তৌলদারি কর থেকে যে অর্থ আদায় হয়, তাতে কর্মচারীদের বেতন-সঙ্কুলানও হয় না। তাই ১৮০২ খ্রীস্টাব্দের ২৫ মে একটি সরকারি নির্দেশের বলে বছরে দু'বারের বদলে চারবার পরীক্ষার রীতি প্রচলিত হল, তার সঙ্গে করের অঙ্কটিও বেড়ে দাঁড়াল চার আনা।[১৮]

নগরশুল্ক

বসতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার জনবহুল এলাকা বাড়তে লাগল, বিস্তৃত হল নগরাঞ্চলের আয়তন। প্রশাসনিক কারণে কলকাতা শহরের সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ধারণের প্রয়োজন অনুভূত হতে লাগল। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের তৃতীয় রেগুলেশনের সপ্তদশ ধারায় কলকাতা শহরের সীমানার কথা উল্লিখিত হয়েছিল।[১৯] ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর কোম্পানির তরফে ই. হে শহরতলিসহ নগর কলকাতার চতুঃসীমা ঘোষণা করেন।[২০]

কলকাতা শহর থেকে বেশি করে কর আদায়ের জন্য কোম্পানি 'ক্যালকাটা টাউন ডিউটিজ' নামে নগরশুল্কের প্রচলন ঘটায় ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে। বাজার, গঞ্জ বা হাটের উপর

আরোপিত কর ছাড়াও তখন আমদানিকৃত বস্তুর জন্য স্বতন্ত্র কর আরোপ করা হয়।[২১] আমদানিকৃত পণ্যের উপর শুল্ক এর আগেও ছিল, কিন্তু তখন তা ধরা ছিল বাজার-করের মধ্যেই।[২২] নগরশুল্কের নামে কোম্পানি প্রায় ষাটটি বস্তুর উপর কর বসাল। কিন্তু এইসব বস্তুর অনেকগুলিই ছিল বহিঃশুল্কের (Customs Duty) আওতাভুক্ত। যাতে একই পণ্যের উপর নগরশুল্ক ও বহিঃশুল্ক দুটিই আরোপিত না হয় সেজন্য ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে পুরনো ব্যবস্থা বাতিল করে চালু করা হল নতুন নগরশুল্ক পদ্ধতি।[২৩] এই সংশোধিত করহার অনুযায়ী নিম্নলিখিত পণ্যগুলির উপর শুল্ক ধার্য করা হল :

দানাশস্য : চাল (ঝাড়া বা আঝাড়া), গম, যব···	··· ২½%
তেল ও তেলবীজ···	··· ৫%
ডাল, মটর, ছোলা ইত্যাদি	··· ৫%
চিনি, গুড়···	··· ৫%
ঘি···	···১০%
তামাক···	··১০%
সুপারি···	···১০%
হলুদ···	··· ৫%
কাঠকয়লা···	··· ৫%
জ্বালানি কাঠ···	··· ৫%

কোম্পানির কলকাতাস্থ নিমকগুদামের নুন ছাড়া বাইরে থেকে আমদানি করা নুনের উপরেও কর আরোপিত হয় :

লাহোর নুন···	···মন প্রতি ১ টাকা
সম্বর, দুধওয়ারি, বলুম্বা, সলুম্বা ও ফুরা নুন···	···মন প্রতি ৮ আনা
বড়ারি ও অন্যান্য নুন···	··মন প্রতি ১ আনা

কলকাতায় ব্যবহার, বিক্রি বা গুদামজাত করে রাখলে তবেই নুনের উপর কর বসত। কিন্তু অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য বা রপ্তানির উদ্দেশ্যে আনীত নুনের জন্য শুল্ক লাগত না।[২৪]

জলপথে আনীত দ্রব্যের জন্য দুটি চৌকি স্থাপন করা হয়েছিল। তার একটি ছিল বালীখালে, অন্যটি খিদিরপুর ঘাটে। মালবাহী নৌকা কলকাতার নগরাঞ্চলের মধ্যে প্রবেশ করলেই স্থলপথে আনা পণ্যের সমান হারে কর দিতে হতো। কর ফাঁকি দিলে উপযুক্ত শাস্তিরও ব্যবস্থা ছিল।[২৫]

আবকারি কর

১৮০২ খ্রীস্টাব্দে বিভিন্ন প্রকারের মদের উপর যে কর আরোপিত হয়, তার গ্যালন পিছু হার ছিল এরকম :

বাংলাদেশে বিলাতি পদ্ধতিতে তৈরি ‘রাম’···	···৪ আনা

ঐ 'রাম' প্রস্তুতকারী ব্যক্তি··· ··· ···৬ আনা
'আরক' বা অন্যান্য কড়া দেশী মদ··· ··· ···৮ আনা
লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানে বিলাতি মদ বিক্রির জন্য··· ···৩ আনা

মদ বিক্রির লাইসেন্সের জন্য দোকানদারকে প্রতিদিন পাঁচ টাকা দিতে হতো। অবশ্য এসব দোকানে কোনো অতিরিক্ত শুল্ক ছাড়াই বিলাতি পদ্ধতিতে প্রস্তুত দেশী মদ বিক্রি করা যেত। তাড়ি ও গাঁজা বিক্রেতাদের দৈনিক কর ছিল যথাক্রমে এক টাকা ও দু' টাকা।[২৬]

বহিঃশুল্ক

নুন, সুপারি ও তামাক ছাড়া অন্য সমস্ত পণ্যের উপর কোম্পানি ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের ২৩ মার্চ বহিঃশুল্ক বা কাস্টমস্ ডিউটি বসায়।[২৭] ফলে কলকাতায় আনীত দ্রব্যগুলি একই সঙ্গে দুটি করের শিকার হয়—নগরশুল্ক ও বহিঃশুল্ক। জলপথে আনীত পণ্য ও স্থলপথে আনীত অধিক পরিমাণ দ্রব্যের ক্ষেত্রে কর ধার্য হয় শতকরা চার ভাগ। স্থলপথে আনা স্বল্প পরিমাণ পণ্য ও তুলা আমদানির উপর আরোপ করা হয় শতকরা দু'ভাগ।

১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের ২০ জুন কোম্পানি অন্যত্র বহিঃশুল্কের বিলোপ ঘটালেও কলকাতায় তা অপরিবর্তিত থাকল। করব্যবস্থার ভিন্নতা সৃষ্ট হওয়ায় নানা সমস্যা দেখা দেয়। তাই ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে বিল পিছু পাঁচ শতাংশ কর এবং মাল ছাড়ানোর জন্য পাঁচ সিক্কা টাকা, এই দুটি 'বন্দর কর' জারি করে বহিঃশুল্ক বাতিল করা হয়।[২৮] আবার ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দের প্রথম রেগুলেশনের মাধ্যমে কলকাতা বন্দরে যাতায়াতকারী জাহাজগুলিতে সশস্ত্র পাহারার জন্য অতিরিক্ত ১% বহিঃশুল্ক বসানো হয়। তবে সোনা-রূপা বা মুদ্রার ক্ষেত্রে এই কর প্রযোজ্য হতো না। পরবর্তীকালে এ করের বদলে সর্ব-সাকুল্যে সাড়ে তিন শতাংশ বহিঃশুল্ক ধার্য হয়।[২৯]

নৌকা, ফেরিঘাট, রাস্তা ও সেতুর কর

১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের ১৬ নভেম্বর হুগলী নদীতে দেশী লোকদের দ্বারা চালিত সমস্ত ধানী নৌকার উপর একটি কর আরোপিত হয়। একশো মন মালের জন্য করের অঙ্ক দাঁড়ায় এক সিক্কা টাকা। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দের ১৫ অগাস্ট এ করটির চরিত্র পরিবর্তিত হয়। পুরনো পদ্ধতির বদলে নৌকা ছাড়ার সময়ে কোম্পানির বয়া (Buoy) ব্যবহারের জন্য করটি আদায় করা শুরু হয়। করের পরিমাণ অবশ্য একই থাকে। তবে করটির সর্বোচ্চ পরিমাণ ষাট টাকায় বেঁধে দেওয়া হয়।[৩০]

১৮০৬ খ্রীস্টাব্দের অষ্টাদশ রেগুলেশনের মাধ্যমে টালির নালার নাব্যতা সৃষ্টি ও ফেরির ব্যবস্থার জন্য এই শুল্কগুলি বসানো হয়:

যাতায়াতকারী বজরা, পিনেস্,
ভাউলে ও পানসির ক্ষেত্রে ··· ··· দাঁড় পিছু ১ আনা

ইট, সুরকি, বালি, মাটি, মাটির
তৈজসপত্র ইত্যাদি মালবাহী নৌকা ... ১০০ মন মাল পিছু ৪ আনা
খুচরা জিনিসপত্রবাহী ছোট নৌকা ... ... নৌকা পিছু ৪ আনা
ধান, চাল, খেসারি, মুগ, কলাই,
মটর, ছোলা, মুসুরি, অড়হর, গম,
যব, চিঁড়া, বরবটি, কাকনিদানা, ঢাকাই
কুমড়া, খড়, জ্বালানি কাঠ, গরান
কাঠ, আদা, হলুদ, পেঁয়াজ, রসুন
ভর্তি নৌকা ... ... ১০০ মন মাল পিছু ১ টাকা
অন্যান্য মালবাহী নৌকা ... ... ১০০ মন মাল পিছু ২ টাকা

জনসাধারণের পারাপারের জন্য কালীঘাট, বাঁশদ্রোণী, গড়িয়া, তেঁতুলবেড়িয়া এবং বর্ষাকালে অতিরিক্ত ভাবে খড়িবেড়িয়ায় ফেরি নৌকার ব্যবস্থার জন্য কর ধার্য হয় এ রকম :

সাধারণ যাত্রী ... ... মাথা পিছু ৫ গণ্ডা কড়ি
মালপত্রসহ যাত্রী ... ... মাথা পিছু ১ পণ কড়ি
মালসহ বলদ ... . ২ পণ কড়ি
বাহকসহ পালকি ... ... ৪ আনা
ছ্যাকরা বা যাত্রীগাড়ি (যাত্রীসহ বা খালি) ৮ আনা
গবাদি পশু ... ... পশু পিছু ১ পণ কড়ি

সরকারি নৌকা ব্যবহার না করে অন্য নৌকায় পার হলে অবশ্য কোনো ফেরি-কর লাগত না।

১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের অষ্টম আইনে কোম্পানি রাস্তা ও সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াত-কারী কিছু যানবাহনের উপর টোল বসায়। সৈন্য ও পুলিশ বা তাদের মালপত্রকে এই কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় (সারণি-৬ দ্র.)।

স্ট্যাম্প শুল্ক

সরকারি দপ্তরে রেজেস্ট্রি বাবদ এই শুল্ক প্রথম প্রচলিত হয় ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে।[৩১] শুধু এই শহরের করই নয়, সারা প্রদেশের স্ট্যাম্প শুল্কই কলকাতায় আদায় হতো।

কলকাতার সৌন্দর্যসাধনের কর

১৮৪০ খ্রীস্টাব্দের চতুর্বিংশ আইনে এবং ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের ষোড়শ আইনে কলকাতার উন্নয়নের জন্য গরুর গাড়ি, ঘোড়া প্রভৃতি যানবাহনের উপর কর বসানোর অধিকার দেওয়া হয় কমিশনারদের। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের দশম আইনে কলকাতা শহরকে দ্বিধাবিভক্ত করা হয় উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগে।[৩২] তিন মাস অন্তর ঘর-বাড়ি-জমির মূল্যায়নের ব্যবস্থা হয়, এবং সম্পত্তিটির যা ভাড়া হওয়া উচিত তার সওয়া ছয় শতাংশ (বা টাকায়

এক আনা। কর ধার্যের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই 'সৌন্দর্যসাধন কর' না দিলে সমন জারির ব্যবস্থা ছিল। সমন জারির ফি হিসাবে অভিযুক্তকে এক টাকা দিতে হতো। অভিযোগ প্রমাণিত হলে এক টাকা চার আনা থেকে পনেরো টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হতো। ঐ বছরের দ্বাদশ আইনের পঞ্চাশ ধারায় বলা হয়, যেসব বাড়ির ভাড়া সত্তর টাকা বা তার বেশি হওয়ার যোগ্য, সেইসব বাড়ির মালিককে সারারাত বাড়ির বাইরে কমিশনারদের নির্দেশিত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

খুচরা কর

হলওয়েলের প্রতিবেদন থেকে কোম্পানির আমলের বেশ কিছু ছোটখাটো করের কথা জানা যায় (সারণি-৫ দ্র.)। আদালতের ফি ও জরিমানা বাবদ ১৮১৪-১৫ খ্রীস্টাব্দে আদায় হয় ৯৫২৩ টাকা। ঐ বছরেই ১,১৮,০৪৯ টাকা আদালতের খুচরা মামলার আয় হিসাবে জমা পড়ে। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে কোর্ট অফ রিকোয়েস্টের মামলার এক্তিয়ার বাড়িয়ে ২৫০-সিক্কা টাকা পর্যন্ত ঋণের মামলা করার অধিকার দেওয়ায় এই অতিরিক্ত অর্থ আদায় হয়।[৩৩] প্রচলিত 'বিবাহ শুল্ক' ছিল সাধারণ মানুষের পক্ষে কষ্টকর। এই কর ও 'এতলাকের' বিষয়ে কোম্পানির কর্মকর্তাদের মধ্যেই মতভেদ ছিল।[৩৪]

কর আদায় বৃদ্ধির স্বার্থে কোম্পানি কিছু ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার বিভিন্ন ব্যক্তিকে কয়েক বছরের জন্য দিয়ে দেয়। বিনিময়ে কোম্পানি লাভ করত এককালীন মোটা অঙ্কের অর্থ। এইসব একচেটিয়া ব্যবসায়ীর অনুমতি না নিয়ে অন্য কোনো ব্যক্তি ঐ ব্যবসাগুলি করলে তাঁদের জেল-জরিমানা হতো। একচেটিয়া ব্যবসাগুলির জন্য সারণি-৪ দ্রষ্টব্য।

করারোপের প্রতিবাদ

সাহেবপাড়ায় বাড়ি বেচাকেনার উপর করারোপের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় অধিবাসীদের প্রতিরোধের কথা আমরা আগেই জেনেছি। এর দীর্ঘকাল পরে করের বিনিময়ে প্রতিশ্রুত সুযোগ-সুবিধা না দেওয়ার দায়ে পিছু হঠতে হয় কোম্পানিকে। গণ্ডগোলটা বাধে রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা নিয়ে। কোম্পানির আইনে স্পষ্ট লেখা ছিল: 'নগরীয় প্রজাপুঞ্জের বাটীর টেক্স গৃহীত হইয়া তদ্দ্বারা নগর পরিষ্কার, পথঘাট প্রস্তুত ও মেরামত করণ এবং আলো প্রদানের কর্ম্ম নির্বাহ হইবেক।' তা সত্ত্বেও ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানি বড় বড় বাড়ির বাইরে সারারাত আলো জ্বালিয়ে পথগুলি আলোকিত করার আইন চালু করার চেষ্টা করে। কিন্তু বেঁকে বসলেন বিডেল নামে সুপ্রিম কোর্টের এক উকিল। আলো না লাগানোর অপরাধে তাঁকে হাজির করা হল প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে। আইন থেকে বিডেল তখন দেখিয়ে দিলেন যে, রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করার দায়িত্ব কোম্পানির, বাড়ির মালিকদের নয়। লজ্জিত ম্যাজিস্ট্রেট মামলা ডিসমিস করে দিতে বাধ্য হলেন।[৩৫]

করারোপের বিরুদ্ধে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদের নায়ক ছিলেন কলকাতার গাড়োয়ান সম্প্রদায়। তাঁরা দু'দিন গরুর গাড়ি বন্ধ করায় কোম্পানি আইন শোধরাতে বাধ্য হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে তখন লেখা হয়: 'এইক্ষণে আমরা গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদিগ্যে সাধুবাদ প্রদান করি, তাহারা দুই দিন মাত্র গাড়ী বন্দ করিয়া রাজপুরুষদিগের অন্তঃকরণ এমত চঞ্চল করিল যে বিধিদর্শি বিধিদাতারা বিধির বিধি খণ্ডনের ন্যায় অবিধি করিয়া বসিলেন, আমরা চিরকাল ন্যায্য বিষয়ে লেখনী ধরিয়া এ পর্য্যন্ত তাঁহারদের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিলাম না, আগে এরূপ জানিতে পারিলে এডিটরী কাম পরিত্যাগ করত গাড়োয়ানি কাম লইতাম, তাহাতে রাজার অনুগ্রহের পাত্র হওয়া যাইত।' একই সঙ্গে গৃহকর বৃদ্ধি প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়: 'লোক কথায় কহে "ন্যাংটার নাই বাটপাড়ের ভয়" সাহেবেরা বাঙ্গালিদিগের ভাড়াটিয়া ভবনে বাস করিয়া নবাবি করেন,...বাড়ীর টেক্স বৃদ্ধি হইলে পরের মাতায় কাঁটাল রাখিয়া অনায়াসেই সেই কোষ খাইবেন, ইহার বাড়া তাঁহারদের সুখের বিষয় কি আছে? যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বে হবাচন্দ্র রাজা গবাচন্দ্র পাত্রের কথা শ্রুত ছিলাম, এইক্ষণে কার্য্যে তাহা দৃশ্য হইতেছে।'[৩৬]

১২৫৮ বঙ্গাব্দের ১ শ্রাবণ 'সংবাদ প্রভাকর' রাস্তার উপর আরোপিত করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়: 'আমারদিগের গবর্নমেন্টের রাস্তার ট্যাক্স বিষয়ক যে এক আইনের পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপাঠে চমৎকৃত হইয়াছি; সেই আইনের মর্ম্মানুসারে মুটে মজুর প্রভৃতিকেও রাজকরে কর প্রদান করিতে হইবেক, ধনতৃষ্ণা, তোমার চরণে নমস্কার করি, আমরা স্বাবকাশমতে এবিষয়ে অতি শীঘ্রই লেখনী ধাবণ করত বিস্তারিতরূপে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব।'[৩৭]

'সংবাদ প্রভাকর'-এর মতো অন্যান্য পত্রিকাও করারোপের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিল। ১২৬২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' কোম্পানির করব্যবস্থার বিষয়ে লেখে: 'বিচার দ্বারা প্রজাদিগের স্বত্ব ও শান্তিরক্ষা করা রাজধর্ম্ম, রাজপুরুষেরা তজ্জন্য পৃথকরূপে ষ্টাম্প মাসুল আবগারী ডুটী লইতেছেন, নদীতে নৌকা গমনাগমন করে এজন্য নদীর উপর মাসুল বসাইয়াছেন, কিন্তু গ্রীষ্মকালে নদী সকল শুষ্ক হইয়া গেলে সুন্দররূপে তাহার কি তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন? দস্যু তস্করেরা অকুতোভয়ে সর্ব্বদা জলে স্থলে প্রজাদিগের ধন প্রাণ নাশ করিতেছে তাহা নিবারণের কি সদুপায় হইতেছে? ভাগীরথীতে ১২/১৪ ক্রোশান্তর এক ২ খানি চৌকির পান্সি আছে, তদ্দারা কিরূপে নদীর শান্তিরক্ষা হইতে পারে। গবর্নমেণ্ট আত্মলাভের চেষ্টাতেই সদা ব্যস্ত ও বিব্রত।'[৩৮]

রাস্তার গ্যাসের আলোর জন্য কর ধার্য হতে সম্ভবত সর্বাধিক সংখ্যক প্রতিবাদ সরব হয়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ১৩ মার্চ ১৮৫৬-র 'হিন্দু পেট্রিয়টে' গিরিশচন্দ্র ঘোষ এইভাবে শুরু করেছিলেন: 'CALCUTTA is flatly getting too rich for poor people to abide in it. The evils of taxation are fast escaping from the Pandora box of the legislative council. Today the city requires good roads; tax the householders! Tomorrow

the roads require to be watered—tax again !—the next day the streets are found awfully dark for the purposes of good government—haul up the citizen for an additional pressure of the screw !—the day after the stink of the drains is discovered to be too nanseating for refined noses—give another strain to the throat of the liege ! The liege in the meantime gets black in the face—his eyes stant out of their sockets—his tongue lolls out ruefully….'[৩৯] করটির বিরুদ্ধে 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' যে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, তার থেকে বিষয়টি বিশদভাবে জানা যায় : 'কয়েক বর্ষাবধি কলিকাতা নগরে গাস আলোক হইবার প্রস্তাব হইতেছে, বর্ত্তমান বর্ষে তাহা সম্পন্ন হইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে ; এবং গাস বিষয়ক নূতন আইনের যে পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে ব্যক্ত হয় যে সকল রাস্তায় গাস আলোক দেওয়া যাইবেক, সেই সকল রাস্তার ধারে মাসিক ৫ টাকা ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়ার উপযুক্ত যে সকল বাটী আছে তাহার ভাড়ার টাকার উপর শতকরা ৪ চারি টাকা অতিরিক্ত টাক্স দিতে হইবেক এবং যে ২ রাস্তায় গাসের আলো দেওয়া না যাইবেক সেই ২ রাস্তায় তৈলের আলোর ভাগ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া যাইবেক তজ্জন্য তত্তৎ রাস্তাবাসি প্রজাদিগকেও ঐরূপ বাটীর ভাড়ার উপর অতিরিক্ত ২ টাকা টাক্স দিতে হইবেক।' শেষ করতে গিয়ে তাঁরা মন্তব্য করেন : 'প্রজা পালক রাজা যদি রক্ষক হইয়া ভক্ষক হয়েন তবে প্রজাদিগের অরণ্যে রোদন ব্যতীত আর কি গতি আছে।'[৪০]

উপসংহার

কোম্পানি-আমলের করব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বেনিয়া কোম্পানি গোড়া থেকেই ছিল করলোলুপ। কিন্তু বাদশাহী 'নিরিখ' লঙ্ঘন করতে গিয়ে তিরস্কৃত হওয়ার পর কোম্পানি নিজেদের আর্থিক লালসাকে সযত্নে ঢেকে রাখে। কারণ কোম্পানি জানত বাদশাহ বিরূপ হলেও যেমন বিপদ, তেমনি প্রজামণ্ডলী প্রতিবাদী হয়ে উঠলে অন্য ইউরোপীয় বাণিজ্যিক গোষ্ঠীগুলি ইংরেজদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করবে। পরবর্তীকালে মুঘল দরবার ও প্রতিযোগী ইউরোপীয় গোষ্ঠীগুলির শক্তিক্ষয় কোম্পানিকে অনেকটা নিশ্চিন্ত করে তোলে। কোম্পানি তখন প্রচলিত করগুলির পরিমাণবৃদ্ধি ও নতুন শুল্ক আরোপের সাহস পায়। প্রকৃতপক্ষে ১৭৯৪ থেকে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোম্পানি আরোপিত করের পরিমাণ অবিশ্বাস্য রকম বৃদ্ধি পায়। শুল্কের পরিমাণই শুধু বর্ধিত হয়নি, তার সঙ্গে জটিল হয়ে উঠেছিল আদায়পদ্ধতি। ফলে কোনো মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে ব্যবসা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে, বিস্তৃত হয় উৎকোচ ও অসাধুতার ব্যাপ্তি।[৪১] বহির্বাণিজ্য করার মতো মূলধন থাকা সত্ত্বেও বাঙালি সওদাগর শ্রেণী তাই সে পথ পরিহার করতে বাধ্য হলেন।[৪২]

ব্যবসাবাণিজ্যের উপর আরোপিত কর যেমন বাঙালি ব্যবসায়ীদের পক্ষচ্ছেদ করে কোম্পানির স্বার্থকে সুরক্ষিত করেছিল, নগরজীবনের উপর আরোপিত শুল্কগুলিও তেমনি

অন্য বাসিন্দাদের উত্ত্যক্ত করে তুললেও ইংরেজদের গায়ে আঁচড় লাগতে দেয়নি। বাড়ি বেচাকেনার ক্ষেত্রে কিভাবে ইংরেজদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, আমরা তা দেখেছি। কলকাতার প্রায় সব করই অনুরূপভাবে সাহেবদের স্বার্থরক্ষা করত। এ বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য দিয়ে এ নিবন্ধের ইতি টানা যাক: 'নাগরীয় বিষয়ে রাজপুরুষেরা যে সকল নূতন আইন প্রকাশ করিলেন, তাহাতে প্রজাদিগের নগরে বাস করা ভার হইল, ঐ নিষ্ঠুর নিয়মে কি অধন কি সধন সকল ধনেরি নিধনতুল্য বিপদ দেখিতেছি, কেবল ধনপূর্ণ বাছাধন সাহেবরাই স্বচ্ছন্দে থাকিবেন, শ্বেতাঙ্গের গুণে তাঁহারদিগের পক্ষে তাদৃশ ক্লেশের বিষয় হইবেক না।'[৪৩]

সারণি—১

ইজারাদারদের দেয় বাজারের বার্ষিক খাজনা (১৮১৭ খ্রীঃ)[৪৪]

	বাজার	খাজনা
১.	টিরেট্টাব বাজার	৫০০-০-০
২.	শেরবোর্নের বাজার	৫০০-০-০
৩.	শর্টের বাজার	৮৩২-০-০
৪.	বড়বাজার	২,০৩১-০-০
৫.	রাজাবাজার	৭০১-০-০
৬.	মেছুয়াবাজার	৩,০০৯-৪-০
৭.	ধর্মতলা বাজার	২,০০০-০-০
৮.	ইন্টালি বাজার	৬০০-০-০
৯.	হাট সুতানুটি	২৫০-০-০
১০.	সুখ বাজার	২৫০-০-০
১১.	সিমলা বাজার	২০০-৪-১০
১২.	বাহিরসিমলা বাজার	১৫০-০-০
১৩.	শোভাবাজার	২৬-৮-০

উপরোক্ত বাজারগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি 'লীজ' দেওয়া হয়েছিল নিরানব্বই বছরের জন্য। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ছ'টি বাজার বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে পাঁচ বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হয়েছিল ৭,৬৮৫ টাকায়:

	বাজার	টাকা
১.	বৈঠকখানা বাজার	৩,৫২০
২.	বৌবাজার	৩,৭০৫
৩.	কসাইটোলা ও ধর্মতলা বাজার	২০০
৪.	কলিঙ্গা ও জানবাজার	২৬০
		৭,৬৮৫

সারণি—২

কলকাতার বাজারে বিক্রীত দ্রব্যের উপর ধার্য করের পরিমাণ (১৭৮৮ খ্রীঃ)[৪৫]

(ক) বিক্রেতা পিছু কড়ির হিসাবে

১. তেল—১০ গণ্ডা থেকে ২ পণ।
২. মুড়ি, ছোলামটর ভাজা ইত্যাদি—৭ গণ্ডা ২ কড়ি থেকে ১½ পণ।
৩. মোটা কাপড়—১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ ৫ গণ্ডা।
৪. সবজি—১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ ১৫ গণ্ডা।
৫. পটল, করলা (আলাদাভাবে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে)—১ পণ থেকে ১ পণ ১৫ গণ্ডা।
৬. কলা—১ পণ ২ গণ্ডা থেকে ১ পণ ১৫ গণ্ডা।
৭. পান, সুপারি—১০ গণ্ডা থেকে ৪ পণ।
৮. জুতা, চটি—১০ গণ্ডা থেকে ১½ পণ।
৯. তামাক—১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ ১৭ গণ্ডা।
১০. রুদ্রাক্ষ, পুঁতি, ছোট হাতা-খুন্তি—১০ গণ্ডা।
১১. মিষ্টান্ন—১০ গণ্ডা থেকে ২ পণ।
১২. দই—১০ গণ্ডা থেকে ২ পণ।
১৩. ফল—১১ গণ্ডা ২ কড়ি থেকে ২ পণ।
১৪. মাটির হাঁড়ি, কলসি—১০ গণ্ডা থেকে ২ পণ।
১৫. কলাপাতা, পদ্মপাতা—১০ গণ্ডা থেকে ২ পণ।
১৬. শামুক চূর্ণ—১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ।
১৭. ভুট্টা—১ পণ।
১৮. কম্বল—১০ গণ্ডা।
১৯. তালপাখা—১ পণ।
২০. শীতলপাটি (শ্রীহট্টের বেতের)—১০ থেকে ১৫ গণ্ডা।
২১. সাধারণ পাটি (শপ, বরিয়া বা চাটাই)—১ থেকে ২ পণ।
২২. খেলো হুঁকো—৫ গণ্ডা থেকে ২ পণ।
২৩. শনের দড়ি ও তিসি—১০ গণ্ডা থেকে ২ পণ।
২৪. ফুল—১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ ১০ গণ্ডা।
২৫. মেয়েদের খোঁপার জাল, রেশমি ফিতা, চুলের দড়ি—১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ।
২৬. তুলা—১ গণ্ডা ২ কড়ি থেকে ১০ গণ্ডা।
২৭. সুতা—১০ গণ্ডা।
২৮. মশলাপাতি—১০ গণ্ডা থেকে ২ পণ।
২৯. হলুদ, লঙ্কা, পেঁয়াজ—১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ ১০ গণ্ডা।
৩০. দাঁতের মিশি—১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ ১০ গণ্ডা।

৩১. ছোট তৈজসপত্র—১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ।
৩২. মেয়েদের চুড়ি—১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ।
৩৩. ছোট হাতবাক্স—১০ গণ্ডা।
৩৪. কবিরাজি গাছগাছড়া—১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ ১০ গণ্ডা।
৩৫. নুন—১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ।
৩৬. দেশলাই—১০ গণ্ডা।
৩৭. হুঁকোর টিকা ও গুল—১০ গণ্ডা।
৩৮. বেতের ঝুড়ি, কুলো ইত্যাদি—১০ গণ্ডা থেকে ২ পণ।
৩৯. ডিম—১ পণ।
৪০. গড়গড়ার নল—১০ গণ্ডা।
৪১. সাধারণ ছাতা—১০ গণ্ডা।
৪২. পাথরের বাসন—১০ গণ্ডা।
৪৩. আলু—১০ গণ্ডা (অথবা প্রতি ২ বস্তার জন্য ১ পণ ১০ গণ্ডা)।
৪৪. লোহার শিকল, কড়া ইত্যাদি—১০ গণ্ডা থেকে ২ পণ।
৪৫. সাজিমাটি ও কাপড় কুঁচানোর গিলে—১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ।
৪৬. নাপিতের দোকান—দোকানী পিছু প্রতিদিন ১০ গণ্ডা।

(খ) পরিমাণ অনুযায়ী কড়ির হিসাবে

১. মাছ—মন পিছু ২ পণ ১০ গণ্ডা থেকে ৮ পণ।
২. কড়ি—বস্তা বা মুটে পিছু ১০ গণ্ডা থেকে ১২ গণ্ডা ২ কড়ি।
৩. পাখির খাঁচা—খাঁচা পিছু ৮ পণ।
৪. ছোট মুরগি, হাঁস, হাঁসের বাচ্চা ও পায়রা—পাখি পিছু ১ থেকে ৫ গণ্ডা।
৫. ছাগল, ভেড়া—পশু পিছু ১০ গণ্ডা।
৬. বলদজাতীয় ভারবাহী পশু—পশু পিছু ২ পণ।

(গ) পরিমাণ অনুযায়ী, বিক্রেতা পিছু কড়ির হিসাবে

১. খৈল—প্রতি বিক্রেতার ১ টুঙি বা ২ বস্তা পিছু ১ পণ থেকে ১ পণ ১০ গণ্ডা।
২. ঘুঁটে—একটি মুটের বহনযোগ্য মালের জন্য বিক্রেতা পিছু ১০ গণ্ডা।
৩. খড়, বিচালি—দু' বস্তা মালের জন্য বিক্রেতা পিছু ১২ গণ্ডা ২ কড়ি থেকে ১ পণ ১০ গণ্ডা।
৪. ঝোলাগুড়—একটি মুটের বহনযোগ্য মালের জন্য বিক্রেতা পিছু ১০ গণ্ডা থেকে ২ পণ।
৫. আখ—একটি বলদের বহনযোগ্য মালের জন্য বিক্রেতা পিছু ১২ গণ্ডা ২ কড়ি থেকে ৩ পণ ১০ গণ্ডা।

৬. **বাঁশ**—একটি বলদ বোঝাই মালের জন্য বিক্রেতা পিছু ১২ গণ্ডা ২ কড়ি থেকে ১ পণ ১০ গণ্ডা।

(ঘ) অন্যান্য

১. চাল—গুণগত শ্রেণী অনুযায়ী প্রতি বলদবাহিত বোঝা পিছু ১০ ছটাক থেকে ৩ সের। খুচরা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ১২ গণ্ডা থেকে ১ পণ ১২ গণ্ডা কড়ি।

২. জ্বালানি কাঠ—গাড়ি প্রতি ৩ পণ ১০ গণ্ডা থেকে ৭ পণ, বলদবাহিত বোঝা পিছু ১০ থেকে ১৭ গণ্ডা, মুটে প্রতি ১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ এবং বিক্রেতা পিছু ১০ গণ্ডা থেকে ২ পণ কড়ি।

সারণি—৩

কলকাতায় আহৃত কর (এপ্রিল, ১৭৫২)[৪৬]

ভূমিরাজস্ব··· ···	···১,৯১৭-২-০
কড়ি বিক্রির কর··· ···	··· ৭৫-১-৩
পাটা বাবদ কর··· ···	··· ৭০-০-০
বিবাহ কর··· ···	··· ১৩১-৩-৬
ক্রীতদাস বিক্রির কর ···	··· ১০-১ ৩
তাঁতীদের জমির কর ···	··· ১১০-৮-০
বাড়ি বিক্রির কর··· ···	···২৫৬-১৩-৯
পিওন বাবদ··· ···	··· ১৩৬-২-৯
ইটের জন্য সেলামি··· ···	··· ৩৭৯-২-৬
আমদানিকৃত মদের শুল্ক···	··· ৩৭-৪-০
গাছপালা (Verdure), মাছের চুবড়ি, জ্বালানি কাঠ···	···২১৬-১০-৬
বাজারের জায়গার কর···	···৪২৯-০-০
ফেরি নৌকা··· ···	··· ১৪-০-০
ব্রাহ্মণী বৃত্তি বাবদ··· ···	··· ২-৫-০
রপ্তানির চালের শুল্ক··· ···	···১,১০৬-২-০
কর্মীদের বাজেয়াপ্ত বেতন···	··· ২২৩-০-০
তামাক··· ···	··· ১২-৮-০
নুনের শুল্ক··· ···	··· ৩৪৮-৫-৮
ভাঙের দোকান··· ···	··· ১৪৩-০-০
ভারবাহী বলদ বাবদ ···	··· ৪১-১২-০
পটকা··· ··· ···	··· ৩-০-০
শুয়োরের মাংসের কসাইখানা···	··· ১-১-৬

সারণি—৪

অষ্টাদশ শতকে কলকাতার 'জমিদার' প্রদত্ত একচেটিয়া ব্যবসার ইজারার বিবরণ[৪৭]

ব্যবসার নাম	ইজারার জন্য দেয় বার্ষিক অর্থ (টাকায়)
১. কাচ তৈরির ব্যবসা (একক ব্যক্তি)	৪৪০
২. সিঁদুর তৈরির ব্যবসা (একক ব্যক্তি)	৮২৩
৩. দড়ি ইত্যাদি দিয়ে নৌকাদির ছিদ্র বন্ধ করার ব্যবসা (ইজারাদার অন্যের সঙ্গে ইজারার অধিকার ভাগ করে নিতে পারতেন এবং সেই বাবদ দিন পিছু ১ পণ কড়ি ও প্রাপ্য টাকা পিছু ১০ গণ্ডা কড়ি আদায় করতে পারতেন)	৮২৩
৪. তামাকের দোকান (একক ব্যক্তি)	১২৫
৫. ভাঙের দোকান (একক ব্যক্তি)	১২৫
৬. সিন্দুক তৈরির ব্যবসা (একক ব্যক্তি)	৩২৭
৭. ছবি আঁকার রং (Red lead & Lapistute) [ইজারাদার মাসিক দু'টাকা লাইসেন্স-করের বিনিময়ে প্রস্তুতকারীদের এই রং প্রস্তুতের অধিকার দিতে পারতেন]	১৮৪
৮. বাঁধ, সাঁকো নির্মাণ ও জাহাজের ছিদ্রাদি সারাইয়ের জন্য দড়ির ফেঁসো সরবরাহের ব্যবসা	৫২৩
৯. ডিহি কলকাতা ও গোবিন্দপুরে ভারবাহী বলদের ব্যবসা (যাঁরা ভারবাহী বলদ রাখতেন, তাঁরা প্রতিটি পশুর জন্য ইজারাদারকে বার্ষিক ছ'আনা দিতে বাধ্য ছিলেন)	২১১
১০. ডিহি কলকাতা ও বাজার কলকাতার ফেরি নৌকার ব্যবসা (ইজারাদার যাত্রী পিছু ৪ গণ্ডা, ঘাস-বিচালির বোঝা পিছু ১০ গণ্ডা এবং বাছুর-	

ব্যবসার নাম	ইজারার জন্য দেয় বার্ষিক অর্থ (টাকায়)
ঘোড়া প্রভৃতির জন্য পশু পিছু ১ পণ কড়ি আদায় করতে পারতেন)	১৫২
১১. আতশবাজির ব্যবসা (সবরকম বাজি তৈরি ও বিক্রির অধিকার ইজারাদার একাই ভোগ করতেন)	৬৬
১২. পুরনো লোহা-লক্কড়, পেরেক ইত্যাদি বেচাকেনা এবং গল্‌ফ্‌ খেলার সরঞ্জাম বিক্রির ব্যবসা	৬০ (১৭৬১ খ্রীঃ) ৬৫ (পরবর্তীকালে)

এই ধরনের একচেটিয়া ব্যবসার রীতি ১৭৩৮ থেকে ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল।

সারণি—৫

কলকাতায় আদায়ীকৃত বিভিন্ন ছোটখাটো কর (১৭৫২ খ্রীঃ) [৮]

১. ছোটখাটো জিনিসের উপর কর—কোম্পানির দস্তকে আনা নয়, এরকম সব ছোটখাটো জিনিসের উপর ২ শতাংশ।

২. জরিমানা—কিছু অপরাধের জন্য চাবুক মারা ছাড়াও জরিমানা আদায় হতো।

৩. এতলাক—কাছারিতে কোনো অভিযোগ দায়ের করলে পিওন প্রতিদিন ৩ পণ কড়ি পেত। তার থেকে ১ পণ ১৪ গণ্ডা কোম্পানির 'এতলাক' খাতে জমা পড়ত। ১ পণ পেত পিওন, ছ' গণ্ডা মুহুরিদের প্রাপ্য হিসাবে জমা পড়ত।

৪. বিক্রয় কর—বাড়ি, নৌকা ইত্যাদি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোম্পানির প্রাপ্য ছিল ৫ শতাংশ।

৫. দাস বিক্রির কর—ক্রেতা কোম্পানিকে দিত ৪ টাকা ৪ আনা।

৬. পাট্টা বাবদ—পাট্টা পিছু ৪ টাকা ৪ আনা।

৭. সালিশি নামা—বিরোধের মধ্যস্থতা করলে কোম্পানি উভয় পক্ষের কাছে ২০ পণ করে কড়ি পেত।

৮. ঋণ শোধ কর—খাতক ঋণ শোধ করলে পাওনাদারকে কর দিতে হতো।

৯. ছাড়পত্র শুল্ক—ছাড়পত্রের জন্য কোম্পানি ৮ আনা শুল্ক বসাতে পারত।

১০. বন্ধকী কর—বন্ধকী দ্রব্যের ক্ষেত্রে কোম্পানির শুল্ক ছিল দ্রব্যটির মূল্যের ৫ শতাংশ।

১১. বিবাহ কর—বিবাহের অনুমোদন পত্রের জন্য উভয় পক্ষের কাছ থেকে ৩ সিক্কা টাকা।

১২. রশি সেলামি—জমির বিরোধের মীমাংসার জন্য, জমি মাপার জন্য ১ টাকা।

১৩. ডিঙি সেলামি—দেশীয় ব্যক্তিরা ডিঙি নৌকা তৈরি করলে কোম্পানি ভারবহন ক্ষমতা অনুযায়ী ৫০ থেকে ১০০ টাকা কর নিত।

১৪. মুরিয়ানুস—এতলাকের যে অংশ মুহুরিদের জন্য জমা পড়ত, তা থেকে আদায়ীকৃত কর।

১৫. মদ আমদানির কর—রপ্তানি ব্যতীত অন্য কারণে বাটাভিয়া বা আর্মেনিয়া থেকে মদ আমদানি করলে কোম্পানি লিগার পিছু (per Leagure) ২ টাকা ৪ আনা শুল্ক নিত।

১৬. ট্রাস্ট সম্পত্তির অনুমোদন বাবদও কব আদায় করা হতো।

১৭. ঢোল-শহরৎ শুল্ক—দাসদাসী, পশু ইত্যাদি হারিয়ে গেলে মালিকের অনুরোধে ঢোল বাজিয়ে ঘোষণার ব্যবস্থা করা হলে কোম্পানি কর পেত ১ কাহন ১ পণ কড়ি।

১৮. চাল রপ্তানি শুল্ক—মন প্রতি ১ সের ৮ ছটাক।

সারণি—৬

কলকাতার 'রাস্তাঘটিত' কর (১৮৫১ খ্রীঃ)[৪৯]

স্প্রিংওয়ালা ৪ চাকার যাবতীয় গাড়ি···	··· ২ টাকা
স্প্রিংওয়ালা ২ চাকার যাবতীয় গাড়ি···	··· ১ টাকা
স্প্রিংওয়ালা দেশীয় নানা প্রকার শকট···	··· ২ আনা
স্প্রিং ছাড়া নানা প্রকার ৪ চাকার গাড়ি···	··· ৬ আনা
স্প্রিং ছাড়া নানা প্রকার ২ চাকার গাড়ি···	··· ৪ আনা
স্প্রিং ছাড়া ৩ ফিট ৩ ফিট ও ৬ ইঞ্চি বেড় ও ৩ ইঞ্চি পরিমিত লোহার পাত-যুক্ত নানা প্রকার শকট ···	··· ৮ আনা
ঐ ধরনের কিন্তু যদি চাকার লোহার পাতে বেষ্টিত ও পরিসর ৩ ফিট ৬ ইঞ্চি ও ৩ ইঞ্চি থেকে কম হয়··· ···	··· ২ আনা
মহিষ বা গরু পিছু··· ··· ···	··· ২ পয়সা
হাতি পিছু··· ··· ···	··· ১ টাকা
উট পিছু··· ··· ···	··· ৪ আনা
ঘোড়া পিছু··· ··· ···	··· ১ আনা
টাট্টু পিছু··· ··· ···	··· ২ পয়সা
কুড়িটি ছাগল বা ভেড়া পিছু··· ···	··· ২ আনা

একশো শুয়োর পিছু···	···	··· ৪ আনা
খচ্চর পিছু···	··· ···	··· ১ পয়সা
গাধা পিছু···	··· ···	··· ২ পয়সা
বেহারাওয়ালা পাল্কি ৩ জন···	···	··· ১ টাকা
পাল্না নামক ছোট পাল্কি···	···	··· ৪ আনা
বেহারাওয়ালা ডুলি··· ···	···	··· ২ আনা
মুটে··· ··· ···	···	··· ২ পয়সা

অন্য কোনো পশুর দ্বারা বাহিত যানবাহনের ক্ষেত্রেও সমহারে করারোপের ব্যবস্থা ছিল।

উল্লেখপঞ্জী

১. H. H. Wilson, 'Glossary of Judicial and Revenue Terms' (Ed. A. K. Ganguly, Calcutta, 1940), p. 725.

২. Charles E. Trevelyan, 'Report upon the Internal Customs and Town Duties of the Bengal Presidency' (1834). p. 1. প্রাসঙ্গিক অংশটি এরকম : 'As in all other departments of the Government. so in this, there was nothing regular and fixed : the duties varied at different times and different places, and a wide avenue was always open for the extortion of the Collectors.'

৩. B. B. Misra, 'The Central Administration of the East India Company, 1773-1834' (Oxford, 1959), p. 171.

৪. এই খাজনার পরিমাণ ছিল—ডিহি কলিকাতা : ৪৬৮ টাকা ৯ আনা ৯ পাই, সুতানুটি : ৫০১ টাকা ১৫ আনা ৬ পাই, গোবিন্দপুরের (পাইকান পরগনার অন্তর্ভুক্ত অংশ) একাংশ : ১২৩ টাকা ১৫ আনা ৩ পাই এবং গোবিন্দপুরের অন্য অংশ কলকাতার অন্তর্ভুক্ত অংশ) : ১০০ টাকা ৫ আনা ১১ পাই।—Radha Kumud Mookerji, 'Indian Land System' (Calcutta, 1958), p. 35.

৫. Ibid., p. 36.

৬. কোম্পানির ইংরেজরা এমন একটা ভাব দেখাতেন যেন তাঁরা ইংল্যাণ্ডের রাজার প্রত্যক্ষ প্রজা। বস্তুত ইংল্যাণ্ডরাজ প্রদত্ত ১৬৬১ খ্রীস্টাব্দের সনদই তাঁদের মনে এই বোধের উন্মেষ ঘটায়—'Though their factories were part of the dominion of Mughals, their own Law was administered in them and their own national character imparted to them as completely as if they were part of English territory.'—E. B. Cowell, 'Tagore Law Lectures' (Calcutta, 1872), pp. 11-12.

৭. Radha Kumud Mookerji, 'cit. Supra', p. 36. এই কারণে শুল্ক প্রয়োগের ব্যাপারে কোম্পানি কিছুটা অস্বস্তিবোধ করত--'The Council seems to have hesitated in exercising the Zemindar's authority in levying taxes to defray public expenditures. In the year 1727, the Council were at a difficulty to provide the funds for the purchase of a building for the Mayor's Court and a new jail. In June, 1733 they say the assessment of the Black inhabitants had made them uneasy.'—W. K. Firminger, 'Historical Introduction to the Bengal Portion of the Fifth Report', Chapter LXXIII.

৮. 'Whether the English had become zamindars or talukdars is a technical question of some interest, but of no great historical importance, for the company at once regarded itself as zamindar and exercised the functions of that office. In order to contend with that increased responsibilities, the company appointed an additional member of council. and gave to him the title of 'zamindar' or collector. From Ralph Sheldon, appointed Collector in the year 1700 through Holwell, who was collector in the year of the Black Hole Tragedy, to the present day the succession of Collectors of calcutta is unbroken'.—W. K. Firminger, 'cit. Supra'.

৯. Reginald Cranfuird Sterndale, 'An Historical Account of the Calcutta Collectorate Etc.' (2nd. Edition, Calcutta, 1959), pp. 12-13.

১০. Ibid., p. 14.

১১. C. D. Field, 'Introduction to the Regulations of the Bengal Code 1888' (Calcutta, 1942), pp. 179-180.

১২. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ব্যবসা শুরু করে দক্ষিণ ভারতে। পরবর্তীকালে ব্যবসা যখন অন্যত্র প্রসারিত হল, তখনও দক্ষিণ ভারতের টাকাকেই কোম্পানি প্রধান মুদ্রা হিসাবে গ্রাহ্য করত। আর্কটি টাকা দক্ষিণ-ভারতীয় মুদ্রা। 'আর্কট' স্থান-নামটি থেকে 'আর্কটি' বিশেষণের উৎপত্তি।

১৩. Herbert Harington, 'An Elementary Analysis of the Laws and Regulations enacted by the Governor General in Council, at Fort William in Bengal', Vol. III (Calcutta, 1817), p. 49.

১৪. A. K. Ray, 'A Short History of Calcutta : Town and Suburbs' (Rddhi Edition, 1982), p. 126.

১৫. Rev. J. Long, 'Selections from unpublished Records of Government' (Firma KLM Edition, 1973), p. 630.

১৬. Public Department Proceedings, dated 26. 11. 1772 and Revenue Department Proceedings, dated 29. 6. 1773.

১৭. Vide Statute ৩ Geo. III, Cap. 35, S. 158. ১৮১৪-১৫ খ্রীস্টাব্দে এই বাবদ আদায় দাঁড়ায় ১,৭৮,৭৫৭ সিক্কা টাকা।

১৮. Harington, 'cit. Supra', p. 41.

১৯. ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের তৃতীয় রেগুলেশনের সপ্তদশ ধারায় কলকাতার সীমা এইভাবে বর্ণিত হয়েছে : 'A line drawn by the nullah of the Baugbazar, or Cowcross, the Mahrattah entrenchment, and the road, adjoining to it continued westward of the Collighant road, the Govindpore nullah, and the river'.

২০. A. K. Roy, 'cit. Supra', pp. 116-120.

২১. A Regulation for the re-establishment, with certain exceptions, of the Calcutta Town Duties, established by Section II, Regulation XXXIV 1795 ; passed by the Governor General in Council on the 14th May, 1801 (Regulation V of 1801).

A Regulation for subjecting certain additional articles to the payment of the Calcutta Town Duties : Passed by the Governor-General in Council on the 6th of August, 1801 (Regulation X of 1801).

২২. এই করের হার ছিল নিম্নরূপ :

(ক) ছোলা, ঘোড়ার দানা, সরিষা, গম ইত্যাদি—হুগলী বা নদীর অন্য তীরবর্তী অন্যান্য স্থান থেকে আনয়নের ক্ষেত্রে টাকা প্রতি ছ' গণ্ডা কড়ি।

(খ) তেল, ঘি, ছোলা, গম ইত্যাদি—আড়ং থেকে আনয়নের ক্ষেত্রে বোঝা প্রতি তিন আর্কট টাকা। দেশের অভ্যন্তরীণ এলাকা থেকে আনয়নের ক্ষেত্রে সিক্কা টাকা পিছু ছ' পয়সা।

(গ) চিনি—বস্তা পিছু দু' আনা।

(ঘ) ঘি—মটকি পিছু ছ' আনা।

(ঙ) মধু—মটকি পিছু দু' আনা।

(চ) মোটা কাপড়—প্রতি খণ্ড চার থেকে পনেরো গণ্ডা কড়ি।

২৩. Vide Regulation X of 1810, Sections 2 and 3.

২৪. শুল্কের লোভে কোম্পানি নুনের ব্যাপক আমদানির প্রশ্রয় দিতে শুরু করে। এর ফলে বাংলার নুন প্রস্তুতকারী মলঙ্গীরা প্রচণ্ড আর্থিক সংকটে পড়ে। এ প্রসঙ্গে দ্র., N. K. Sinha, 'Midnapore Papers : Hijli and Tamluk (1781-1807)' (Calcutta, 1954), p. 8.

২৫. ১ মে ১৮১৪ থেকে ৩০ এপ্রিল ১৮১৫-র মধ্যে কলকাতায় আদায়ীকৃত নগরশুল্কের পরিমাণ ছিল মোট ১,১৯,৩৭১ টাকা। কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে নীট লাভ দাঁড়ায় ১,০৯,০৮০ টাকা।—Harington, 'cit. Supra', p. 58.

২৬. Regulation II of 1802 (A Regulation for levying a duty on spirits manufactured at distilleries constructed and worked according to the European manner ; passed by the Governor General in Council, on the 22nd April, 1802)। ইতিপূর্বে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের ষষ্ঠ রেগুলেশনে তাড়ি ইত্যাদির উপর কর ধার্য হয়েছিল।

২৭. '...that any article of foreign, or inland trade, excepting salt, betel-nut and tobacco (the duties of which were continued as before) shall pay a duty to Government of 2½% distinct from the Company's duty paid in Calcutta.'—'Rule for the collection of Govt. Customs', dt. 23-3-1773, Article 2.

এই কর আদায়ের উদ্দেশ্যে ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে বোর্ড অফ কাস্টম্‌স ও কলকাতার কাস্টম্‌স্ হাউস স্থাপিত হয়।

২৮. W. H. Carey, 'The Good Old Days of Hon'ble John Company', Vol. 1 (Rddhi Edition, 1980), p. 206.

২৯. A Regulation for the Collection of a new duty of one percent to be levied on all imports into and exports from the port of Calcutta excepting money and bullions ; passed by the Governor General in Council, on the 2nd January 1797. ১৮১৫-১৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার বহিঃশুল্ক সূত্রে আমদানি বাবদ ১২,৮৫,২৭২ টাকা ১৪ আনা ১ পাই এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে ৩,৫১,৫৯৭ টাকা ৮ আনা ৯ পাই আদায় হয়েছিল। দ্র. H. R. Ghosal, 'Economic Transition in the Bengal Presidency (1793-1833)', (Calcutta, 1966), p. 178.

৩০. Regulation VII of 1801 (A Regulation for modifying the duty on coasting vessels called Dhonies and for providing for the better collection of the same : and for the establishment of a duty of one anna per Ton on vessels importing into on exporting from the River Hooghly, for defraying the Expenses attendant on a Magazine to be erected for the reception of the Gunpowder of

ships entering the said River ; passed by the Governor General in Council, on the 16th July, 1801).

৩১. ce. XII and XIII of Regulation VI of 1797. Also see, Sterndale, 'cit. Supra', p. 61.

৩২. হুগলী নদী থেকে পুরনো কেল্লার ঘাট, ফেয়ারলি প্লেস, ক্লাইভ স্ট্রিট হয়ে ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের (বর্তমান বি-বা-দী বাগ) উত্তরদিকের রাস্তা, লালবাজার, বৈঠকখানা পর্যন্ত কাল্পনিক রেখা টেনে শহরকে দু'ভাগ করা হয়েছিল। এই আইন তৃতীয় জর্জের রাজত্বের তেত্রিশ বর্ষের বাহান্ন সংখ্যক আইনের একশো আটান্ন ধারার বলে ধার্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের করারোপ সংক্রান্ত আইনকে বাতিল করে কলকাতার বাড়ি-জমির উপর করারোপের অধিকার জাস্টিস অফ পিসের পরিবর্তে কমিশনারদের উপর ন্যস্ত করে।

৩৩. Vide Assessment Regulation in the Calcutta Annual Register and Directory (as quoted in Harington, 'cit. Supra'.)

৩৪. ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি কোম্পানির কোর্ট অফ ডিরেক্টরস মন্তব্য করেন : 'You are likewise to point out to us what duty or fines appear to be particularly grievous upon the poorer sort of people, such as the duty on marriages, which we think, ought to be either totally abolished or levied with great regard to circumstances, and the duty called Etlack, if it is necessary to be continued, ought to be used with moderation and greatly redressed.'—Long, 'cit. Supra', p. 81.

৩৫. বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', প্রথম খণ্ড (প্যাপিরাস, ১৯৭৮) পৃঃ ৭১। [মূল সংবাদ : 'সংবাদ প্রভাকর', ১৯.৩.১২৫৯]

৩৬. তদেব, পৃঃ ৬৮। [মূল সংবাদ : 'সংবাদ প্রভাকর', ৬.১১.১২৫৭]

৩৭. বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', দ্বিতীয় খণ্ড (প্যাপিরাস, ১৯৭৮) পৃঃ ১৩৫-১৩৬।

৩৮. বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', তৃতীয় খণ্ড (প্যাপিরাস, ১৯৮০) পৃঃ ৯১।

৩৯. Alok Ray (Ed.), 'Nineteenth Century Studies' (Calcutta, 1974), No. 5, p. 64.

৪০. বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', তৃতীয় খণ্ড (প্যাপিরাস, ১৯৮০), পৃঃ ৯৪-৯৫। [মূল সংবাদ : 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা', ভাদ্র ১২৬২ বঙ্গাব্দ। ৪ সংখ্যা]

৪১. N. K. Sinha, 'The Economic History of Bengal (1793-1848)', Vol. III (Calcutta, 1970), p. 43.

৪২. Charles E. Trevelyan, 'cit. Supra', p. 65.

৪৩. বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', প্রথম খণ্ড (প্যাপিরাস, ১৯৭৮), পৃঃ ১৫৫। [মূল সংবাদ : 'সংবাদ প্রভাকর', ৪.১২.১২৫৮]

৪৪. Harington, 'cit. Supra.', Vol. III, p. 25.

৪৫. Ibid., p. 28-31.

৪৬. Rev. J. Long, 'cit. Supra.', p. 42.

৪৭. Harington, 'cit. Supra.', Vol. I, p. 33.

৪৮. Harington, 'cit. Supra.', Vol. III, pp. 38-40.

৪৯. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭০। [মূল সংবাদ : 'সংবাদ প্রভাকর', ২.৪.১২৫৮]।

স্বপন বসু

কলকাতার পুলিশ প্রশাসন

উনিশ শতকে

পলাশির যুদ্ধের কয়েক বছরের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতের নতুন রাজধানী তথা নতুন যুগের নতুন শহর হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল কলকাতা। জীবিকার প্রয়োজনে নানা ভাষাভাষী মানুষজন এসে ভিড় জমানোয় লোকসংখ্যা বাড়তে লাগল দ্রুত। জনসংখ্যাবৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে বাড়িভাড়া ও জমির দাম গেল বেড়ে, মাথাচাড়া দিল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা। আঠারো শতকের সূচনা থেকেই কলকাতায় স্বতন্ত্র পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। গোড়ায় 'জমিদার অফ ক্যালকাটা'র উপর ছিল নগরের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব। কলকাতা রাজধানী হওয়ার পর, ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে, ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে পুলিশ সুপারের একটি পদ সৃষ্টি করা হয়। ৭০০ দেশী পাইকের এক বাহিনী নিয়ে তিনি রক্ষা করতেন নগরের শান্তি-শৃঙ্খলা।

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার পুলিশি ব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করেন। ঐ বছরের ২২ সংখ্যক রেগুলেশান অনুযায়ী জমিদারি পুলিশের অস্তিত্ব বিলোপ করে পুলিশকে ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তৃত্বাধীনে আনা হয়। প্রতিটি জেলাকে কয়েকটি থানায় ভাগ করে একজন দারোগাসহ কয়েকজন কর্মীর উপর থানার শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কলকাতা পুলিশেও এই পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতাকে কয়েকটি ওয়ার্ডে ভাগ করে প্রতিটি ওয়ার্ডের শান্তিরক্ষার ভার এক-একজন থানাদারের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। কলকাতা পুলিশের দায়িত্ব দেওয়া হয় স্যর রিচার্ডসন, আই. বি. স্মিথ, কর্নেল জোসেফ, সি. এফ. মার্টিন, বল ও হার্ডিং-এর হাতে। এ সময় কলকাতায় থানার সংখ্যা ছিল ২৫।

কলকাতার সীমানা ক্রমশ বাড়তে থাকে। শর্টস বাজার ও চৌরঙ্গি আগে ছিল ২৪ পরগনার এলাকাধীন। কিন্তু আঠারো শতকের একেবারে শেষদিকে জায়গা দুটি কলকাতার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় শহরের আয়তন অনেকটা বেড়ে যায়। ক্রমবর্ধমান শহরের উপযুক্ত পুলিশি ব্যবস্থার জন্য ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ওয়েলেসলি একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির কাছে মতামত জানাতে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটরা কলকাতাকে ৪০টি থানায় বিভক্ত করার ও ২৬০ জন অতিরিক্ত পাইক নিয়োগের প্রস্তাব করেন। সেইসঙ্গে তাঁরা থানার কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধির সুপারিশও করেন। সরকার কিন্তু এ প্রস্তাব গ্রহণ করেননি।

ঐ বছরের মে মাসে শ্যামুয়েল ডেভিসকে কলকাতার সুপারিনটেনডেণ্ট জেনারেল অফ পুলিশ পদে (এই পদটির পরবর্তীকালে নাম হয় চিফ ম্যাজিস্ট্রেট) নিযুক্ত করা হয়। কলকাতা শহর ও পার্শ্ববর্তী ২০ মাইল এলাকা তাঁর আওতায় আসে। একই সময়ে সি. এফ. মার্টিনা ব্লাকিয়ার, ম্যাকলিউ, থর্নটন ও ক্যাপ্টেন ওয়াটকে পুলিশ কমিশনার (পরবর্তীকালের নাম পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট ও জাস্টিস অব পিস) হিসাবে নিয়োগ করা হয়।[১] ঐ সময়ে কলকাতার পুলিশবাহিনীর জন্য সরকারের মাসিক ব্যয় ছিল ৫,১৫১ টাকা। পরবর্তী কুড়ি বছরে শহরের লোকসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় কর আদায় বাড়ে বার্ষিক ৬৮,২৭৯ টাকা ; অথচ পুলিশ খাতে সরকার এক পয়সাও খরচ বাড়াননি। ফলে পুলিশের উপর চাপ প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পায়।

এই ক্রমবর্ধমান চাপের কথা চিন্তা করে ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার চিফ ম্যাজিস্ট্রেট শেক্সপীয়র কলকাতায় কয়েকটি নতুন থানা স্থাপন এবং প্রতি থানায় ১ জন থানাদার, ১ জন মোহরার, ১ জন জমাদার ও ১৫ জন বরকন্দাজ নিয়োগের প্রস্তাব করেন। চৌকিদারদের সংখ্যাবৃদ্ধি, থানা-কর্মীদের বেতনবৃদ্ধি এবং কর্মদক্ষতার জন্য তাদের পুরস্কারদানের প্রস্তাবও তিনি করেন। সরকার এসব প্রস্তাব অনুমোদন করে তাঁকে থানাদারদের জন্য নিয়মবিধি প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন। এই নতুন ব্যবস্থার ফলে ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় থানার সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০। সেই থানাগুলি হল :

থানার নাম	চৌকিদারের সংখ্যা	চৌকিদার পিছু বাড়ির সংখ্যা
১. শ্যামবাজার	২১	৫৮
২. বাগবাজার	১৫	৬২
৩. শ্যামপুকুর	৩৩	৮৭
৪. চড়কডাঙা	২৮	৫১
৫. জোড়াসাঁকো	২১	৭৩
৬. সিমলা	৩১	৯৬
৭. সুকিয়া স্ট্রিট	১৫	৮০
৮. পটলডাঙা	২৫	২৩
৯. ঠনঠনিয়া	১৬	৩৬
১০. মেছুয়াবাজার	২৫	৭৪
১১. কলুটোলা	১২	১৪২
১২. চুনাগলি	১১	৬৮
১৩. মির্জাপুর	৩৬	১২২
১৪. মুচিপাড়া	৪	১১৯
১৫. লালবাজার	২০	৫৫
১৬. শিবতলা	১৪	১৮
১৭. গুড়িয়াতলাও	২৪	৪৮

থানার নাম	চৌকিদারের সংখ্যা	চৌকিদার পিছু বাড়ির সংখ্যা
১৮. পদ্মপুকুর	১২	৪০
১৯. চাঁদনি চক	৩১	৪৫
২০. তালতলা	৩০	১৩৫
২১. জানবাজার	১৪	৯১
২২. শাঁখারিটোলা	৮	২৯
২৩. কলিঙ্গা	৩১	১৫৫
২৪. চৌরঙ্গী	১৪	৫০
২৫. শর্টসবাজার	৩৩	১৩
২৬. বামুনবস্তি	৯	৪৯
২৭. কুমোরটুলি	২৫	৮১
২৮. হাটখোলা	২৬	১০১
২৯. জোড়াবাগান	৩২	৮২
৩০. কবরডাঙা	১৮	৮০
৩১. ষষ্ঠীতলা	১২	৩৬
৩২. বড়বাজার	২৮	১১৬
৩৩. আর্মেনিয়ানটোলা (আরমানি টোলা)	১৪	১০
৩৪. আমড়াতলা	১৬	২৪
৩৫. ক্লাইভ স্ট্রিট	১৮	২৫
৩৬. লালদিঘি	২৪	২৬
৩৭. ডোমটোলা	৫	৪৭
৩৮. লারকিন্‌স্ লেন	২২	৯
৩৯. চাঁদপাল ঘাট	১৩	৩২
৪০. কুলিবাজার	১৪	৪২[২]

উল্লিখিত থানাগুলির মধ্যে ১৫টির (১৫—১৯, ২৪—২৬, ৩৩—৩৯ সংখ্যক) অবস্থিতি ছিল সাহেবপাড়ায়, বাকি দেশী মহল্লায়। সব থানার আয়তন সমান ছিল না, কিন্তু জনসংখ্যা অনুযায়ী সেগুলিতে লোকনিয়োগ করা হয়নি। ফলে কোনো থানায় কাজের চাপ ছিল প্রচণ্ড, আবার কোনোটিতে ছিল নামমাত্র। যেমন, লারকিন্‌স্ লেন থানা এলাকায় বাড়ি ছিল ২০০টি, অথচ চৌকিদারের সংখ্যা হল ২২; ফলে একজন চৌকিদার গড়ে ৯টি বাড়ি পাহারা দিত। পক্ষান্তরে কলুটোলা থানার আওতায় বাড়ি ছিল ১৭০৪টি, কিন্তু চৌকিদারের সংখ্যা মাত্র ১২; ফলে প্রতি চৌকিদারকে গড়ে ১৪২টি বাড়ির উপর নজর রাখতে হতো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, লারকিন্‌স্ লেন এলাকায় অনুষ্ঠিত অপরাধের সংখ্যা ছিল কলুটোলার চেয়ে তিনগুণ বেশি।

এই ৪০টি থানা ছাড়াও কলকাতায় ছিল আরও ২২টি প্রান্তিক (বাউণ্ডারি) থানা।

সেগুলির নাম হল : চিৎপুর ব্রিজ, কাঁটাপুকুর, শ্যামবাজার, উল্টাডিঙি, হোগলকুঁড়িয়া, মানিকতলা, কামারপাড়া, রামলোচন বাজার, বৈঠকখানা, এণ্টালির প্রবেশপথ, নবাব গার্ডেন, কবরখানা, তারাতলা, বিরজিতলাও, হসপিটাল, বেলভেডিয়ার ব্রিজ, খিদিরপুর ব্রিজ, কুলিবাজার, মিরবহর ঘাট, নিমতলা ঘাট, হাটখোলা ঘাট ও ওল্ড ফোর্ট ঘাট থানা। এই প্রান্তিক থানাগুলি কলকাতার প্রবেশ ও নির্গমপথের উপর দিবারাত্রি নজরদারি করত। সন্দেহজনক বা অস্ত্রধারী কোনো ব্যক্তি অথবা ডাকাতদল যাতে শহরে ঢুকে পড়তে না পারে সেদিকে ছিল এদের সতর্ক দৃষ্টি। সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই এরা খানাতল্লাশ করত। এই থানাগুলির প্রত্যেকটিতে থাকত ১ জন সিদওয়াল (জমাদার), ১ জন নায়েব এবং কয়েকজন বরকন্দাজ।

থানা-পুলিশ ও বাউণ্ডারি-পুলিশ ছাড়াও ছিল নগররক্ষী (টাউন গার্ড) বাহিনী। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের পুলিশ কমিটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় নগররক্ষী বাহিনীতে ছিলেন ১ জন সার্জেণ্ট মেজর, ৪ জন সার্জেণ্ট, ৩২ জন সিপাই ও ৭৫ জন বরকন্দাজ। কোনো ঘটনার মোকাবিলায় থানা ব্যর্থ হলে নগররক্ষী বাহিনী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত। রাস্তার গণ্ডগোল বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিবারণের ক্ষেত্রে এই বাহিনী বিশেষ ভূমিকা নিত। নগররক্ষী বাহিনী ছাড়াও নগরের শৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন কয়েকজন ইউরোপীয় কনস্টেবল। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে এঁদের সংখ্যা ছিল ১২। জল-পুলিশের ব্যবস্থাও ছিল। জল-পুলিশের দল ১টি ভাউলে ও ৯টি নৌকা নিয়ে নদীতে নজর রাখত। প্রতিটি নৌকায় ১ জন মাঝি, ২ জন পিওন ও ৮ জন করে দাঁড়ি থাকত।[৩] গঙ্গার ধারে-ধারে জল-পুলিশের ৯টি ঘাঁটি গড়ে ওঠে। সেই ঘাঁটিগুলি হল : বাগবাজার ঘাট, বনমালী সরকারের ঘাট, হাটখোলা ঘাট, পাথুরিয়া ঘাট, মিরবহর ঘাট, ওল্ড ফোর্ট ঘাট, চাঁদপাল ঘাট, বালুঘাট ও কুলিবাজার ঘাট।

সব মিলিয়ে কলকাতা-পুলিশ নাগরিকদের নিরাপত্তার বিবিধ ব্যবস্থা করেছিল। বরকন্দাজরা ছিল বাউণ্ডারি গার্ড—তারা নজর রাখত যাতে আশপাশের কোনো ডাকাত দল শহরে ঢুকে না পড়ে, চৌকিদাররা শহরের ভেতরে রাত-পাহারা দিত, কোথাও কোনো দাঙ্গা বাধলেই ছুটে যেত নগররক্ষী বাহিনী বা 'টাউন গার্ড', আর জল-পুলিশের নৌকাগুলি দিনরাত টহল দিত নদীপথে। এসব সত্ত্বেও পাটনা, মুর্শিদাবাদ বা ঢাকার তুলনায় কলকাতার পুলিশি ব্যবস্থা অপ্রতুল বলে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে পুলিশ কমিটি মন্তব্য করেন।

১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে পুলিশ সুপার স্টীল কলকাতা পুলিশ সম্পর্কে সরকারের কাছে পেশ করেন দুটি রিপোর্ট। পুলিশের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তিনি পদোন্নতি প্রথার প্রস্তাব দাখিল করে থানাদারদের বিভিন্ন বেতনের চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করার সুপারিশ করেন। বর্ধিত ব্যয়ভার মেটানোর জন্য তিনি থানার সংখ্যা কমানোর কথা বলেন। তাঁর প্রস্তাবমতো আমড়াতলা থানাটিকে আর্মেনিয়ান স্ট্রিটের সঙ্গে ও শাঁখারিটোলা থানাকে পদ্মপুকুরের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং ডোমটোলা থানাটিকে তুলে দেওয়া হয়। ফলে ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দের ১ নভেম্বর থেকে কলকাতায় থানার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৭।

কলকাতা পুলিশের কাজকর্ম খুঁটিয়ে দেখার জন্য ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে একটি কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গোটা শহরকে তিনটি বিভাগে এবং সেগুলিকে আবার কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করা হয়। নতুন ব্যবস্থায় থানার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩। এছাড়া লালদিঘি, লারকিন্‌স্ লেন, চাঁদপাল ঘাট, ক্লাইভ স্ট্রিট ও ২২নং বাউণ্ডারি থানাকে নিয়ে গঠিত হয় 'এ' ডিভিশন। 'এ' ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত পূর্বতন থানাগুলির নতুন নামকরণ হয় স্টেশন হাউস। ১ জন দারোগা, ৪ জন জমাদার, ৪ জন নায়েব ও ১৫০ জন চৌকিদার নিয়ে গঠিত হয় 'এ' ডিভিশনের পুলিশবাহিনী। এই বছর কলকাতার শান্তিরক্ষার জন্য অশ্বারোহী পুলিশবাহিনী গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বছর দশেক এইভাবে চলার পর আবার আসে পরিবর্তনের পালা। এবার কলকাতা পুলিশকে লণ্ডন মেট্রোপলিটান পুলিশের আদলে বিন্যস্ত করার চেষ্টা হয়। চিফ ম্যাজিস্ট্রেটের বদলে পুলিশ কমিশনার হলেন পুলিশের সর্বময় কর্তা। প্রথম কমিশনার হওয়ার সম্মান লাভ করলেন ককবার্ন। শহরের পূর্বতন তিনটি বিভাগ বহাল রেখে থানার সংখ্যা কমিয়ে আনা হল আঠারোয়; ফলে থানাগুলির আয়তন ও সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেকটি থানায় ইউরোপীয় ও দেশীয় পুলিশ রাখার ব্যবস্থা করা হয়। নতুন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পরে ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা পুলিশের থানাওয়ারি চেহারাটি দাঁড়াল এইরকম :

থানার নাম	ইউরোপীয় পুলিশ	দেশী পুলিশ	মোট
উত্তর বিভাগ : ছ'টি থানা			
A. শ্যামপুকুর	১	৭৯	৮০
B. কুমোরটুলি	১	৭৫	৭৬
C. বড়তলা	১	১০৩	১০৪
D. সুকিয়া স্ট্রিট	১	৭২	৭৩
E. জোড়াবাগান	২	৯৬	৯৮
F. জোড়াসাঁকো	২	৮৯	৯১
মধ্য বিভাগ : ছ'টি থানা			
G. বড়বাজার	২	৯৩	৯৫
H. কলুটোলা	২	৭৪	৭৬
I. মুচিপাড়া	১	৭২	৭৩
J. বউবাজার	৩	৮৯	৯২
K. সেণ্ট জেমস স্ট্রিট	১	৬৬	৬৭
L. ম্যাঙ্গো লেন	২	৭৪	৭৬
দক্ষিণ বিভাগ ছ'টি থানা			
M. ফেনউইক বাজার	২	৭৫	৭৭
N. তালতলা	২	৭৪	৭৬
O. কলিঙ্গা	১	৬৬	৬৭

থানার নাম	ইউরোপীয় পুলিশ	দেশী পুলিশ	মোট
P. মিডলটন রো	২	৭৫	৭৭
Q. বামুনবস্তি	১	৬৬	৬৭
R. কুলিবাজার	২	৬৬	৬৮

গোটা উনিশ শতকে কলকাতায় থানার সংখ্যা আর বাড়েনি। তবে কয়েকটি থানার এলাকার একটু-আধটু পরিবর্তন করা হয়েছিল। কোনো-কোনো থানার নামও পালটানো হয় (যেমন সেণ্ট জেমস স্ট্রিটের নাম হয় পদ্মপুকুর থানা, ম্যাঙ্গো লেনের ওয়াটার্লু স্ট্রিট থানা, মিডলটন রো-র পার্ক স্ট্রিট থানা ও কুলিবাজারের নাম বদলে হয় হেস্টিংস থানা)। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় প্রথম ট্যাফিক পুলিশ প্রবর্তিত হয়। ১৭ জন সদস্য নিয়ে এই বিভাগের সূত্রপাত।

নতুন ব্যবস্থায় প্রতিটি থানায় ইউরোপীয় পুলিশের সংখ্যা মাত্র দু-একজন হলেও, তাদের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা যে-কোনো দেশী পুলিশের চেয়ে বেশি ছিল। অর্থাৎ, আগে নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে থানাদারই ছিলেন সর্বেসর্বা। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ হয়ে উঠল শ্বেতাঙ্গ উপরওয়ালার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়ন্ত্রণ থেকেই উনিশ শতকের কলকাতায় পুলিশ-কর্মচারীদের অবস্থার একটা আঁচ পাওয়া যাবে।

কলকাতার পুলিশ-কর্মচারী

উনিশ শতকের সূচনা থেকেই কলকাতার পুলিশ-কর্মচারীদের মধ্যে ছিল পরিষ্কার দুটি ভাগ। উপরতলার পদগুলি সবই থাকত ইউরোপীয়দের দখলে, দেশীয়দের ভাগ্যে জুটত পাইক, বরকন্দাজ, নায়েব, জমাদার বা বড়জোর থানাদারের পদ। যাবতীয় নিয়োগ-বরখাস্তের সর্বময় কর্তা ছিলেন চিফ ম্যাজিস্ট্রেট এবং তাঁর অব্যবহিত নিম্নবর্তী ম্যাজিস্ট্রেট বা জাস্টিস অফ পিস-রা। এছাড়া ছিলেন একজন পুলিশ সুপার, থানাদাররা প্রতিটি বিষয় তাঁর কাছেই জানাতেন। পুলিশ সুপার ঠিকমতো কাজকর্ম করছেন কিনা তা দেখাশোনা করতেন চিফ ম্যাজিস্ট্রেট। ৩০. ১০. ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের এক আদেশবলে সরকার পুলিশের প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব আলাদা করে দেন। চিফ ম্যাজিস্ট্রেট সর্বোচ্চ পদাধিকারী হলেও তাঁর কর্মজগৎ মোটামুটিভাবে বিচার বিভাগে সীমাবদ্ধ করা হল। পুলিশ প্রশাসনের পুরো দায়িত্ব পড়ল পুলিশ সুপারের উপর। সার্জেন্ট, কনস্টেবল, থানাদার, চৌকিদাররা হলেন তাঁর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন। তাঁদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করার ক্ষমতাও সুপারের উপরেই বর্তাল।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা পুলিশে দেশীয়দের লভ্য সর্বোচ্চ পদটি ছিল থানাদারের। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতাকে কয়েকটি থানায় বিভক্ত করা হলে, প্রতিটি থানার দায়িত্বে রাখা হয় একজন দেশীয়কে। তখন এঁদেরই বলা হত থানাদার, পরবর্তীকালে এঁরা পরিচিত হন 'দারোগা' নামে। থানাদারের অনুপস্থিতির সময় পরবর্তী পদাধিকারী 'নায়েব' সব দায়িত্ব পালন করতেন। এছাড়াও থানাগুলিতে কয়েকজন করে চৌকিদার থাকত। চৌকিদাররা ঠিকমত কাজ করছে কিনা তা দেখার

ভার ছিল গিরিধারী পাইকদের ওপর। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে এইসব কর্মচারীর বেতনবিন্যাস ছিল এরকম : থানাদারের ১০ টাকা, নায়েবের ৬ টাকা, চৌকিদারের ৪ টাকা। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেটরা থানাদারের বেতন ১০ থেকে ১৬ টাকা ও নায়েবের বেতন ৬ থেকে ১০ টাকা করার প্রস্তাব দিলেও সরকার তা গ্রহণ করেননি। ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে চিফ ম্যাজিস্ট্রেট শেক্সপীয়রের আমলে থানাদারদের বেতন ১০ থেকে ১৬ টাকা করা হয়। ১৬ টাকা যে খুবই কম বেতন তা বুঝতে পেরে, ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে পুলিশ কমিটি থানাদারদের ১৬ থেকে ২০ টাকা ও চৌকিদারদের ৪ থেকে ৫ টাকা মাসিক বেতন করার সুপারিশ করেন, কিন্তু এ প্রস্তাবও সরকার অগ্রাহ্য করেন।

এত স্বল্প বেতনে এরকম পরিশ্রমসাধ্য কর্মগ্রহণে বাঙালি হিন্দুদের একেবারেই উৎসাহ ছিল না। তাছাড়া উনিশ শতকের প্রথমদিকে পুলিশের কাজের কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না, পুলিশ কর্মচারীকে লোকে একটু হীন দৃষ্টিতে দেখত। কোনো সম্ভ্রান্ত বাঙালি যুবককে থানাদারের পদগ্রহণের আমন্ত্রণ জানালে রীতিমতো অপমানবোধ করেন— পুলিশ কমিটির কাছে এ-কথা বলেছিলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই বাঙালিরা ১৫/২০ টাকা বেতনে কেরানির কাজ করত, কিন্তু পুলিশের কাজ একেবারেই নয়। সেই কারণে কলকাতা পুলিশে চৌকিদার, বরকন্দাজ, নায়েব, জমাদার বা থানাদার কোনো পদেই বাঙালি হিন্দুর দেখা বিশেষ মিলত না। থানাদারদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান (এঁদের মধ্যে কয়েকজন বাঙালি মুসলমান ছিলেন)। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার থানাদারদের নামের দিকে একবার চোখ বোলালেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে :

থানা	থানাদার
শ্যামবাজার	গোবর্ধন পণ্ডিত
বাগবাজার	কালী সহায়
শ্যামপুকুর	গোবিন্দ সিং
চড়কডাঙা	জলিল হোসেন
জোড়াসাঁকো	আমিনুদ্দিন
সিমুলিয়া	মুরলী
সুকিয়া স্ট্রিট	মুসা
পটলডাঙা	আশরফ হোসেন
ঠনঠনিয়া	গোলাম হোসেন
মেছুয়াবাজার	কালিন্দর বক্স
কলুটোলা	দোরাব
চুনাগলি	আলিমুল্লা
মির্জাপুর	আমিনুদ্দিন
মুচিপাড়া	হেফাজৎ আলি
লালবাজার	মীর হুসেন

থানা	থানাদার
শিবতলা	মির্জা আশরফুল্লা
গুড়িয়াতলাও	রামলোচন
পদ্মপুকুর	মনিরুদ্দিন
চাঁদনি চক	মির্জা হুসেন
তালতলা	মীর হুসেন
জানবাজার	মীর সয়িদ
শাঁখারিটোলা	আমীর খান
কলিঙ্গা	শেখ ইব্রাহিম
চৌরঙ্গী	গোলাম নবি
হেস্টিংস প্লেস	রাধাকান্ত
বামুন বস্তি	হিম্মৎ খান
কুমোরটুলি	সাদুল্লা
হাটখোলা	তিনকড়ি
জোড়াবাগান	বলরাম
কবরডাঙা	তালিব আলি
ষষ্ঠীতলা	জবরদস্ত খান
বড়বাজার	আশরাফ খান
আর্মেনিয়ান স্ট্রিট	জিতু
আমড়াতলা	তাজ মহম্মদ
ক্লাইভ স্ট্রিট	জুলফিকর খান
লালদিঘি	হামেল খান
ডোমটোলা	কুদরুল্লা
লারকিন্‌স্ লেন	হায়বদউল্লা
চাঁদপাল ঘাট	কায়ফৎউল্লা
কুলিবাজার	দীন আলি

দেখা যাচ্ছে, ৪০ জন থানাদারের মধ্যে ৩১ জনই ছিলেন মুসলমান। এইসব থানার ৪০ জন নায়েকের মধ্যেও মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৩০। আসলে ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে বাঙালি হিন্দুরা যখন ইংরেজি শিখে বাবু হওয়ার সাধনায় ব্যস্ত, মুসলমানরা তখন চাকরি জগতে ধীরে-ধীরে পিছু হঠছেন। এই সময় পুলিশের কাজে শিক্ষাদীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন হতো না, উপরন্তু ছিল কর্তৃত্ব করার সুযোগ। কর্তৃত্ব করার সহজাত প্রবণতা থেকে মুসলমানরা এই পুলিশের কাজের দিকে বেশি ঝুঁকলেন। ঐ কারণেই উনিশ শতকের প্রথমদিকে পুলিশ বিভাগে মুসলমানদের এত প্রাধান্য। প্রথম যুগের থানাদারদের অধিকাংশই ছিলেন অশিক্ষিত, অক্ষরজ্ঞানশূন্য। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা পুলিশের বার্ষিক রিপোর্টে চিফ ম্যাজিস্ট্রেট শেক্সপীয়র মন্তব্য করেন, অধিকাংশ

থানাদারই নিরক্ষর বলে লিখিত কোনো নির্দেশ পালনে তাঁরা অপারগ। একে মাইনে কম, তার উপর পেনসনের বা পদোন্নতির কোনো সুযোগ না থাকায় শিক্ষিত যুবকরা পুলিশের কাজে মোটেই আগ্রহ বোধ করতেন না। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে ক্যাপ্টেন স্টীল তাঁর অন্যান্য প্রস্তাবের সঙ্গে বলেছিলেন যে, দক্ষতা দেখাতে পারলে বরকন্দাজ থেকে নায়েব বা নায়েব থেকে থানাদার হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। এছাড়াও তিনি থানাদারদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করার প্রস্তাব করেন। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী :

২ জন থানাদার পাবেন ৪০ টাকা (বড়বাজার ও ক্লাইভ স্ট্রিট থানার)।

৪ জন থানাদার পাবেন ৩০ টাকা (হাটখোলা, শ্যামবাজার, কলিঙ্গা ও লারকিন্‌স্ লেন থানার)।

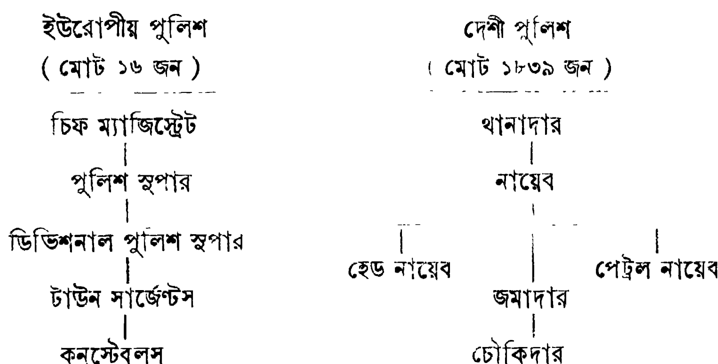
১২ জন থানাদার পাবেন ২৫ টাকা (তালতলা, বামুনবস্তি, হেস্টিংস প্লেস, চাঁদনি, গুড়িয়াতলাও, পটলডাঙা, জোড়াবাগান, কবরডাঙা, সিমলা, জোড়াসাঁকো, লালদিঘি ও আরমানিটোলা থানার)।

বাকিরা পাবেন ১৬ টাকা।[৪]

প্রান্তিক থানাগুলির ক্ষেত্রেও তিনি অনুরূপ প্রস্তাব করেন। সরকার তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করলে ঐ বছরের ১ নভেম্বর থেকে তা কার্যকর হয়। কর্মদক্ষতা দেখিয়ে পদোন্নতির যে সুযোগ সৃষ্টি হয়, অনেকেই তার সদ্ব্যবহার করতে শুরু করেন। ১৮৩৩-'৩৫, এই তিন বছরে ২৮ জন নায়েব থানাদার পদে উন্নীত হন। অবশ্য এর ফলে থানাদাররা রাতারাতি সৎ, চরিত্রবান বা কর্মদক্ষ হয়ে পড়েছিলেন এমন কথা মনে করার কারণ নেই। আসলে থানাদার নিয়োগের নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি ছিল না, সবটাই নির্ভর করত খোশামোদ বা ধরাধরির উপর। ফলে যোগ্যরা হতেন বঞ্চিত, অশিক্ষিত অপদার্থরা ভিড় করত পুলিশ বাহিনীতে। ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে পুলিশ কমিটির কাছে কলকাতা পুলিশের উন্নতিকল্পে হরিহর দত্ত যেসব প্রস্তাব করেন, তার একটিতে তিনি বলেন, অপদার্থ ও নিরক্ষর থানাদারদের জায়গায় সৎ শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়োগ করলে পুলিশের দুরবস্থার অনেকখানিই মোচন করা যাবে। থানাদাররা যা মাইনে পান, তাতে যে-কোনো দক্ষ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঐ কাজে আকৃষ্ট হবেন না সে-কথাও হরিহর দত্ত উল্লেখ করেছিলেন। থানাদারদের মতো চৌকিদারদের সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। শতাব্দীর সূচনা থেকেই তাঁদের মাইনে বাঁধা ছিল চার টাকা। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে পুলিশ কমিটি চৌকিদারদের মাইনে পাঁচ টাকা করার প্রস্তাব করলেও ব্যয়বৃদ্ধির আশঙ্কায় সরকার তা নাকচ করে দেন। কলকাতা পুলিশের নীচের দিকের পদগুলি (চৌকিদার ও বরকন্দাজ) ছিল ফরিদপুর ও যশোরের দরিদ্র অশিক্ষিত মুসলমানদের একচেটিয়া। হুগলীর বাগদি সম্প্রদায়ের কিছু মানুষও ছিল, কিন্তু সংখ্যায় তারা নিতান্তই অল্প। এইসব লোক শুধু অযোগ্য ও অপদার্থ ছিল না, শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়েও তারা ছিল শহরবাসীর জীবনসম্পদ রক্ষার দায়িত্বপালনের অনুপযোগী। যখন কলকাতা শহরে কুলির কাজ করে একজন অনায়াসে মাসে ৬ টাকা উপার্জন করত, তখন পুলিশের কাজ করে একজন পেত মাত্র ৪ টাকা। তবু এই পদে প্রার্থীর অভাব কখনও হতো না। ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে

পুলিশ কমিটির কাছে সাক্ষ্যদানকালে কলকাতার পুলিশ সুপার বলেন, চৌকিদারের মাইনে খুবই কম, তবু এই বেতনে লোক পেতে তিনি কোনো অসুবিধা বোধ করেন না। গ্রাম থেকে দলে-দলে লোক এসে বলে, গ্রামে তারা খেতে পাচ্ছে না, যে-কোনো শর্তে পুলিশে কাজ করতে তারা প্রস্তুত। আসলে পুলিশের কাজের অন্যবিধ প্রলোভন তাদের আকৃষ্ট করত স্বল্প বেতনের এই কর্মগ্রহণে।

দেশী আর বিলিতি দুই শ্রেণীর মানুষকে নিয়েই যে কলকাতার পুলিশবাহিনী গঠিত হয় সে-কথা আমরা আগেই বলেছি। ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা পুলিশের পদবিন্যাস ছিল এইরকম :



এই সময়ে কলকাতা পুলিশকে দুর্নীতিমুক্ত ও কর্মদক্ষ করে তোলার জন্য সরকার সচেষ্ট হন। কলকাতা পুলিশের ত্রুটিগুলি খুঁজে বের করে তার উন্নতির পথনির্দেশের জন্য গঠিত কমিটি ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে মত প্রকাশ করলেন, দেশী পুলিশের সংখ্যা কমিয়ে ইউরোপীয়দের সংখ্যা বাড়ালে কলকাতার পুলিশবাহিনী অনেক কর্মদক্ষ হয়ে উঠবে। কমিটির সুপারিশ কার্যকর করার পর কলকাতা-পুলিশের সদস্যসংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১৩৯৮। এদের মধ্যে—

ইউরোপীয়	৪০	জন
দেশী অফিসার	৮২	,,
বরকন্দাজ	১২৫০	,,
অশ্বারোহী	২৬	,,
মোট=	১৩৯৮	জন

বলে রাখা ভাল, ইউরোপীয়দের সম্পর্কে ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দের পুলিশ কমিটি যে মতই পোষণ করুন না কেন, তাঁদের কর্মদক্ষতা সম্পর্কে পুলিশের বড়কর্তাদের মধ্যেই মতভেদ ছিল। ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার চিফ ম্যাজিস্ট্রেট শেক্সপীয়র বলেন, দেশী থানাদাররা যথেষ্ট বুদ্ধিমান। তাছাড়া যাদের জন্য তাদের নিযুক্তি, সেই নেটিভদের আচার-আচরণ সম্পর্কে ইউরোপীয়দের চেয়ে তারা বেশি ওয়াকিবহাল—সেই কারণে চোর ও চোরাই

সম্পদ উদ্ধারে তারা বেশি সফল। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে পুলিশ কমিটি তার রিপোর্টে বলেছিল, শহর কলকাতায় যে ১২ জন ইউরোপীয় কনস্টেবল আছে তাদের আচরণ মোটেই সন্তোষজনক নয়। পুলিশবাহিনীতে ইউরোপীয়দের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দের পুলিশ কমিটি দক্ষ দেশীয় ব্যক্তিদের পুলিশের কাজে আকৃষ্ট করতে চাইলেন। এই সময় পর্যন্ত দেশীয়দের পক্ষে থানাদারের চেয়ে উঁচু কোনো পদলাভ সম্ভব ছিল না। কমিটি বললেন, যোগ্যতা থাকলে দেশীয়রা বিভাগীয় সুপারিনটেনডেণ্ট পর্যন্ত হতে পারবেন। অবশ্য এ প্রস্তাবটি দীর্ঘদিন কাগজে-কলমেই আবদ্ধ থেকে গিয়েছিল। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার পুলিশ কর্মচারীদের যে তালিকা পাই, তাতে দেখি, দারোগার উপরের কোনো পদে কোনো দেশীয় ব্যক্তি নেই। এই সময়, কলকাতা পুলিশের একজন দেশীয় কর্মচারীর সর্বোচ্চ মাইনে ছিল ৫০ টাকা—৯ জন দারোগা এই মাইনে পেতেন। পক্ষান্তরে, ইউরোপীয় পুলিশের সর্বনিম্ন পদাধিকারী পেতেন ৯৭ টাকা। তৎকালীন একজন দেশীয় পুলিশের সর্বনিম্ন মাস মাইনে ছিল ৬ টাকা। ইউরোপীয় পুলিশরা পেনসন পেতেন, দেশীয়রা ছিলেন তা থেকে বঞ্চিত। দু-একটি ক্ষেত্রে অবশ্য সরকার দয়া করে দু-চার টাকা পেনসন মঞ্জুর করতেন।

১৮৬৮ সালে সর্বপ্রথম চারজন বাঙালিকে ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগ করা হয়। এঁরা হলেন কালীকুমার ব্যানার্জি (১৬.৯.৬৮—৩০.১১.৬৮), কালীপদ মুখার্জি (২৭.৯.৬৮—১৯.১১.৬৮), ত্রৈলোক্যনাথ ব্যানার্জি (২৭.১০.৬৮—৩.১২.৬৮) ও গোপালচন্দ্র চ্যাটার্জি (১৬.১১.৬৮—২৪.১ .৬৮)। কার্যকালের মেয়াদ থেকে দেখা যাচ্ছে, চারজনই চাকরিতে যোগ দেওয়ার তিন মাসের মধ্যে পদত্যাগ করেন।[৫] পুলিশ কমিশনার ককরেলের মতে শারীরিক সক্ষমতা, পশ্চিমা চৌকিদারদের শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখার মতো ব্যক্তিত্ব, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি প্রয়োজনীয় গুণগুলি শিক্ষিত বাঙালি যুবকদের মধ্যে দুর্লভ—তাই এই কাজে তাঁরা সুবিধা করতে পারছেন না। অবশ্য এই চারজন পদত্যাগ করেছেন বলে কলকাতা পুলিশের উচ্চপদে দেশীয়দের নিয়োগের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে. এমন কথা মানতে সরকার রাজি ছিলেন না। সরকারি সদিচ্ছা থাকলেও পুলিশের অনেক বড়কর্তা উচ্চপদে বাঙালি নিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন না। পুলিশ কমিশনার হগ তো এর বিরুদ্ধে লিখিত অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে আবার পাঁচজন শিক্ষিত বাঙালি যুবককে ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগ করা হয়। এরপর থেকে দু-চারজন শিক্ষিত বাঙালি পুলিশে যোগ দিতে শুরু করেন। কনস্টেবল নিয়োগের ক্ষেত্রেও বাঙালিদের অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য সরকারি নির্দেশ জারি করা হয়েছিল ঠিকই. কিন্তু কলকাতা পুলিশে বাঙালির সংখ্যা যে উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়েনি তা কলকাতা পুলিশের কয়েক বছরের পরিসংখ্যানের দিকে নজর দিলেই বোঝা যাবে :

বছর	দেশীয় অফিসার		কনস্টেবল	
	বাঙালি	অবাঙালি	বাঙালি	অবাঙালি
১৮৭৪	৩১	৫৬	১৪২	১২১৮
১৮৮৪	৫২	৮০	৬৬	১২৫০
১৮৮৬	৫১	৭৮	৫০	১২৪৬
১৮৯১	৫৫	৭১	৩৩	১২৯০
১৮৯৬	৬০	৮৫	৩৫	১৩৯৩

বাঙালি কনস্টেবলদের অধিকাংশই ছিলেন ফরিদপুর জেলার অধিবাসী, অন্য জেলাগুলি থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের কলকাতা পুলিশের বার্ষিক রিপোর্ট সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেফটেনাণ্ট গভর্নর পুলিশবাহিনীতে বাঙালির সংখ্যাল্পতা দেখে দুঃখপ্রকাশ করেন। তিনি বলেন, কোনো বিদেশী বা অবাঙালির চেয়ে স্থানীয় কোনো শিক্ষিত যুবক তদন্তকারী অফিসার হলে ১০টির মধ্যে ৯টি ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যাবে। পরবর্তীকালে বাঙালি অফিসারের সংখ্যা পুলিশ-বাহিনীতে মোটামুটি একরকম থাকলেও, কনস্টেবলের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে পুলিশে বাঙালি কনস্টেবলের সংখ্যা ছিল ১২৫। ১০ বছর পরে তা কমে দাঁড়ায় ৫০, ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে আরও কমে তা হয় মাত্র ৩৫।

বিশেষ আগ্রহ না দেখালেও শিক্ষিত বাঙালি যুবকরা পুলিশের কাজে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের পুলিশ রিপোর্টে হগ কালীনাথ বসু নামে এক ইন্সপেক্টরের প্রশংসা করেন। হগের মতো বাঙালিবিদ্বেষীও স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, বিগত ১২ মাসে যেসব প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন বাঙালি পুলিশে যোগ দিয়েছেন, কালক্রমে তাঁরা দক্ষ ডিটেকটিভ অফিসার হয়ে উঠবেন। আশির দশকে শ্রীনাথ পাল বিভাগীয় সুপার হিসাবে দক্ষতা দেখানোয় পুলিশ কমিশনার তাঁর প্রশংসা করতে বাধ্য হন। ব্রজেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি নামে এক ইন্সপেক্টর সম্পর্কে তাঁর উপরওয়ালারা ছিলেন উচ্ছ্বসিত। বেণীমাধব সেন, মহেন্দ্রলাল সেন, অক্ষয়চন্দ্র ব্যানার্জি, জে. সি. মিত্র প্রভৃতি পুলিশ ইন্সপেক্টরদের কার্যকলাপও সে যুগে প্রশংসিত হয়েছিল।

এই ধরনের দু-চারটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে, গোটা উনিশ শতকে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে বাঙালিসমাজ পুলিশের কাজে আগ্রহবোধ করেনি। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে পুলিশ কমিশনার হ্যারিসন বলতে বাধ্য হন, 'বর্তমান পুলিশবাহিনী হিন্দুস্থানীতে ভরা—তারা অন্য জায়গার মানুষ, ভিন্ন জলবায়ুতে পরিবর্ধিত, বাঙালি সমাজজীবন ও এই শহরের জীবনধারা তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। বাহিনীতে তাদের সংখ্যাধিক্য পুলিশের উন্নতির পরিপন্থী। কিন্তু পুলিশের কাজ বাঙালির এতই অরুচিকর যে, হিন্দুস্থানীদের নিয়োগ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।'

কলকাতা পুলিশ—কাজকর্ম—কিছু সমস্যা

উনিশ শতকে কলকাতায় চুরির প্রকোপ ছিল সাঙ্ঘাতিক। নানাবিধ প্রয়াস সত্ত্বেও কলকাতায় চুরি ও সিঁধকাটার যে চমকপ্রদ বাহুল্য ছিল তা নীচের তালিকাটিতে একবার চোখ বোলালেই বোঝা যাবে :

কলকাতায় চুরি ও সিঁধের ঘটনা

১৮০২	—	৮৬০
১৮০৩	—	১১৬১
১৮০৪	—	১৩২৭
১৮০৫	—	১৮২৪
১৮০৬	—	১৪৮৩
১৮০৭	—	১৭২৮
১৮০৮	—	১৭৭২
১৮০৯	—	১৬৯১
১৮১০	—	১৯৪৯
১৮১১	—	১৯২০
১৮১২	—	১৭৭০
১৮১৩	—	১৬২৫
১৮১৪	—	১৭০৭
১৮১৫	—	১৬৩৯
১৮১৬	—	১৯৪০
১৮১৭	—	২২৫৬
১৮১৮	—	২৬০৫

এইসব ঘটনার অধিকাংশই ছিল ছিঁচকে চুরি। কলকাতায় তখন রাতের চেয়ে দিনেই চুরি হত বেশি। কারণটা স্পষ্ট। রাত জেগে পাহারা দেওয়ার পর ভোরবেলা থানায় ফিরে রাতে কি ঘটেছে তা জানিয়েই চৌকিদাররা ছুটি পেত। বাড়ি ফিরে তখন তারা ঘুমোত বা অন্য কাজকর্ম করত। ফলে দিনের বেলা শহর থাকত অরক্ষিত এবং চোরেরা সেই সুযোগের যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করত। ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেটরা কলকাতা পুলিশের এই অদ্ভুত ব্যবস্থার দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং শহরে দিবাভাগে পাহারার ব্যবস্থা করার জন্য থানা প্রতি ৮ জন দিন-চৌকিদারের সুপারিশ করেন। সরকারের এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেও, কলকাতার চিফ ম্যাজিস্ট্রেট শেক্সপীয়র কিন্তু এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না হয়ে দিন-চৌকিদারের বদলে টহলদারি পুলিশের সুপারিশ করেন। তাঁর মতে টহলদারি পুলিশবাহিনী ঘুরে-ঘুরে শহরে টহল দিলে চুরির সংখ্যা অনেক কমবে। প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে

সরকার এজন্য বার্ষিক ১৪৪০ টাকা মঞ্জুর করেন। এই নতুন ব্যবস্থা চালু হওয়া সত্ত্বেও যে দিনের বেলায় চুরির সংখ্যা কমেনি তা নীচের তালিকা থেকেই বোঝা যাবে :

বছর	চুরির সংখ্যা	দিনে চুরি	রাতে চুরি
১৮২২	২৭৪৬	২০৮৩	৬৬৩
১৮২৩	২৯৯৬	১৮৮৭	১১০৯
১৮২৪	২৮৭২	১৭৩৭	১১৩৫
১৮২৫	২৬২২	১৫৯৯	১০২৩
১৮২৬	২৪৮৩	১৪৮৭	৯৯৬
১৮২৭	২২০৭	১৩২৯	৮৭৮
১৮২৮	২২৪২	১৪৪৩	৭৯৯
১৮২৯	২২১৮	১৩৫৮	৮৬০

অধিকাংশ চুরিই করত ঝি-চাকরের দল। পুলিশের পক্ষে তা পুরোপুরি নিবারণ করা ছিল অসম্ভব। তাই পুলিশের পক্ষ থেকে কাজের লোক নিয়োগের ব্যাপারে নাগরিকদের সতর্ক হতে বলা হয়। অজ্ঞাতপরিচয় কাউকে বাড়ির কাজে নিয়োগ না করার জন্য বারবার আবেদন জানানো হয়।

কলকাতায় সিঁধ দেওয়ার ঘটনা অনেক বেড়ে যেত বর্ষাকালে। বৃষ্টিতে মাটির দেওয়ালগুলি নরম হয়ে যেত। তারপর পথঘাটে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, চোরেরা পরমানন্দে কাজ চালাত। চুরি ও সিঁধের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হিসাবে ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেটরা জানান, শহরে চোরাই মালের ক্রেতা বেড়েছে। এই ধরনের সন্দেহভাজন লোকদের ব্যবসা বা দোকান বন্ধ করার মতো ক্ষমতা ম্যাজিস্ট্রেটদের নেই। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে (এমনকি চীন থেকেও) চোর-বদমাসরা এসে জমায়েত হয়েছে শহরে, জুয়ার আড্ডা আর কুখ্যাত বাড়ির সংখ্যাও গেছে বেড়ে, চাকরদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের অবলুপ্তি ঘটেছে, জনসংখ্যার তুলনায় চৌকিদারের সংখ্যা নিতান্তই কম—তাঁদের মতে এই সবই ছিল শহরে চুরির ক্রমবৃদ্ধির কারণ।[৬] চুরির সংখ্যা বাড়ার জন্য পুলিশকে দায়ী করা উচিত কিনা তা নিয়ে সেকালে মতভেদ ছিল। কিন্তু চোরাই সম্পত্তি উদ্ধারে কলকাতা পুলিশের ব্যর্থতা বারবার সমালোচিত হয়েছে। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় অপহৃত সম্পদের আর্থিক মূল্য ছিল ১,৩৭,৭৩৭ টাকা ৮ পাই আর পুলিশ উদ্ধার করে মাত্র ১০,৩৮১ টাকা ২ পাইয়ের সম্পদ। পরের বছর অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। সে বছর ২,৪৬,২০০ টাকা ৯ পাই মূল্যের সম্পত্তি অপহৃত হয়, পুলিশ উদ্ধার করে মাত্র ৪,৮২২ টাকা ১৫ আনা ২ পাই। অবস্থার কোনো উন্নতি যে হয়নি তা বোঝা যায় ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের কলকাতা পুলিশের রিপোর্ট থেকে। রিপোর্টটিতে চিফ ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাকফারলেন চোরাই মাল উদ্ধারে পুলিশের প্রয়াস সন্তোষজনক নয় বলে মন্তব্য করেন। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে পুলিশ কমিটি মন্তব্য করেন, কলকাতায় বছরে দেড় থেকে দু'লক্ষ টাকার সম্পত্তি অপহৃত হয়, কিন্তু উদ্ধার হয় শতকরা মাত্র দশ ভাগ। শতাব্দীর শেষের দিকে অবশ্য অবস্থা আর এতটা শোচনীয় ছিল না। অপহৃত দ্রব্যের

৫০ থেকে ৬০ শতাংশ পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার হতো। আসলে চুরির আর চোরের মোকাবিলায় কলকাতা পুলিশ একেবারে হিমশিম খেয়ে গেছে। অবস্থা বছরের পর বছর থেকেছে অপরিবর্তিত। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় চুরি হয় ২৪২৪টি, ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে ২৯৭৩টি। এই সময় রেলপথ চালু হওয়ায় চোরেরা খুব সহজেই চোরাই মাল নিয়ে পুলিশের নাগাল পেরিয়ে যেত। ফলে পুলিশ হতো আরও নাজেহাল। শতাব্দীর শেষদিকেও চুরির প্রকোপ কি সাঙ্ঘাতিক ছিল, কয়েক বছরের চুরির সংখ্যার দিকে তাকালেই তা বোঝা যাবে :

বছর	চুরির সংখ্যা	বছর	চুরির সংখ্যা
১৮৮০	১৬৩৫	১৮৮৯	১৮৫৫
১৮৮১	১৫৯৩	১৮৯০	১৫৪৯
১৮৮২	১৮৩৯	১৮৯১	১৪৯৫
১৮৮৩	১৭১২	১৮৯২	১৩৮২
১৮৮৪	১৭৯০	১৮৯৩	১৫৭৮
১৮৮৫	১৬৪০	১৮৯৪	১৪৮৯
১৮৮৬	১৬০৭	১৮৯৫	১৫১৭
১৮৮৭	১৭২০	১৮৯৬	১৭২৭
১৮৮৮	১৫৭২		

বলে রাখা ভাল, এই সময় মাটির বাড়ির সংখ্যা কমে যাওয়ায় সিঁধ চুরির ঘটনা উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পায়।

চুরির সঙ্গে তাল মিলিয়ে অন্যান্য অপরাধ যদি ঘটত তাহলে কলকাতা পুলিশ যে কি করত কে জানে! চুরির তুলনায় কলকাতায় অন্যান্য অপরাধের সংখ্যা কত কম ছিল কয়েক বছরের পরিসংখ্যান দেখলেই তা বোঝা যাবে :

কলকাতায় অনুষ্ঠিত অপরাধ

	১৮২২	১৮২৩	১৮২৪	১৮২৫	১৮২৬	১৮২৭
ডাকাতি	২	—	—	—	—	১
নদীপথে চুরি	২৪	৩৮	৩৫	৩৩	৩১	৩২
সিঁধ	৬০	৪৩	৫৭	৯১	১২৭	৯৪
চুরি (৫০ টাকার উপরে)	২৭৫	৩৯৫	৩৯৯	৪১৮	৪৪০	৩৫৮
চুরি (৫০ টাকার নীচে)	২১৩	২৯১	৩৩০	৩২২	৩০৩	২৩৫
চুরি (২০ টাকার নীচে)	১৬৮৩	১৮৫১	১৬৭২	১৩৫২	১১৯৭	১০৮১
চোরাই মাল গ্রহণ	—	—	—	১	১	—
হত্যা	৩	২	৫	৪	১২	১২
অনিচ্ছাকৃত নরহত্যা	—	—	—	—	—	৪
অগ্নিসংযোগ	১৫	২৫	১৬	১৪	১২	১৪
বিবিধ	৫৭৪	৭০২	৬১১	৬৫০	৬৮০	৬৫৪

অন্যান্য অপরাধের মধ্যে কয়েকটি খুনের ঘটনা কলকাতায় প্রতি বছরই ঘটত, এগুলির মধ্যে দু-একজন বারবনিতা থাকত। উনিশ শতকের সূচনা থেকে শহর কলকাতায় বারনারীর সংখ্যা দিন-দিন বেড়েই চলে। এদের রক্ষা করা তো দূরের কথা, উলটে এদের উপরেই অত্যাচার করত পুলিশ। অবস্থা চরমে উঠলে ২ এপ্রিল, ১৮৩৪ তারিখের এক আদেশবলে বারবনিতাদের হয়রানি করতে চৌকিদারদের নিষেধ করা হয়। বলা হয়, কোনো অজুহাতেই তাদের থানায় আনা যাবে না বা তাদের ঘরেও যাওয়া চলবে না। স্বল্পসংখ্যক যেসব হত্যার ঘটনা ঘটত, প্রতিবছরই তার দু-একটির কিনারা করতে পুলিশ ব্যর্থ হত। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে আমহার্স্ট স্ট্রিটে একটি তরুণীর হত্যা রহস্যের ব্যাপারে পুলিশের ব্যর্থতার সমালোচনা করেন পুলিশ কমিশনার স্বয়ং।

কলকাতা পুলিশের সমস্যা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল মিথ্যা অভিযোগ। কাউকে বিপাকে ফেলার জন্য অনেক সময়ই তার নামে পুলিশে মিথ্যা অভিযোগ করা হতো। এর সংখ্যা খুব বেড়ে যাওয়ায় ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে চিফ ম্যাজিস্ট্রেট এলিয়ট দুঃখপ্রকাশ করে বলেন, অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও ম্যাজিস্ট্রেটরা অপরাধীকে শাস্তিদানে কুণ্ঠিত। এই ধরনের অভিযোগের সংখ্যা মাঝে অস্বাভাবিক আকার ধারণ করে। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে ২০৪০টি ও ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে ১৫৬৩টি মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশের কঠোর মনোভাবের ফলে ধীরে-ধীরে এর সংখ্যা কমতে থাকে। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে মিথ্যা অভিযোগের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৪০৬, ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে আরও কমে হয় ১৩০, ১০ বছর পরে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৬১-তে।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে কলকাতা পুলিশের ৪টি বিভাগ ছিল—রিপোর্ট, ফেলোনি, মিসডিমীনার ও কনজারভেন্সি। চৌকিদাররা সারারাত পাহারা দিয়ে ভোরবেলা থানাদারের কাছে সব ঘটনা জানাত। তিনি সকালবেলা পুলিশ সুপারের অফিসে গিয়ে রিপোর্ট করতেন, এখানে সমস্ত অভিযোগ লিখে নেওয়া হতো। কাউকে আটক করা হলে বিষয়টি থানাদার রিপোর্ট বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতেন। তিনি সব কিছু শুনে হয় লোকটিকে খালাস করে দিতেন অথবা বিচারের জন্য চালান করতেন। ছোটখাটো বিষয় হলে তা মিসডিমীনার বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানো হতো, অপরাধ গুরুতর হলে পাঠানো হতো ফেলোনি বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। শতাব্দীর মাঝামাঝি অবশ্য পৃথক ম্যাজিস্ট্রেটের অস্তিত্ব ছিল না, একই বিচারক ফেলোনি ও মিসডিমীনার বিভাগের মামলার বিচার করতেন। কনজারভেন্সি বিভাগের কাজ ছিল পৌর কর আদায় করা—উনিশ শতকের প্রথমদিকে এই কাজ পুলিশকেই করতে হতো। এজন্য পুলিশ সুপার আদায়ীকৃত করের উপর আড়াই শতাংশ কমিশন পেতেন। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে বিভাগটি পুলিশের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়। শুধু অপরাধীকে গ্রেপ্তার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করেই পুলিশের কর্তব্যের শেষ হতো না, উনিশ শতকে কলকাতা পুলিশের কর্মজগৎ ছিল বিচিত্র ও বহুমুখী। পথে কোনো বেওয়ারিশ মড়া পড়ে থাকলে পুলিশকে তার শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করতে হতো। শহরের রাস্তাঘাট, দোকান-বাজার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্বও ছিল তাদের। এমনকি এলাকার ব্যবসায়ীরা সঠিক ওজনের

বাটখারা ব্যবহার করছে কিনা সে-বিষয়ে থানাদারকে নিয়মিত রিপোর্ট দাখিল করতে হতো। সরাইখানা, হোটেল প্রভৃতির উপর তাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হতো। উনিশ শতকের প্রথমদিকে কলকাতায় প্রায়ই আগুন লাগত। শহরে কাঁচা বাড়ির সংখ্যাধিক্য সমস্যাটিকে জিইয়ে রাখে। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার বাড়ির সংখ্যা ছিল ৬৫,৫৮৪। সেগুলির চরিত্র ছিল এইরকম :

পাকাবাড়ি	১৪,৬২৩
টালির বাড়ি	২০,৩০৪
খড়ের ঘর	৩০,৬৫৭
মোট	৬৫,৫৮৪

এইসব খড়ের ঘরে প্রায়ই আগুন লাগত। আগুন লাগা কমানোর জন্য ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে পুলিশ এক বিশেষ আইন জারি করে শহরে খড়ের ঘর তোলা নিষিদ্ধ করে দেয়। তাতে অবশ্য কাজের কাজ বিশেষ হয়নি। কোথাও আগুন লেগেছে খবর পেলেই থানাদারকে ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা করতে হতো। এই কাজ করার জন্য পুলিশের নিজস্ব কয়েকটি দমকল (১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে তিনটি) ছিল। আগুন লাগার সুযোগ নিয়ে কেউ যাতে লুটপাট করতে না পারে, সেদিকেও পুলিশকে লক্ষ্য রাখতে হতো।

আগুন নেভানো তো ভাল কথা। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতার পথেঘাটে হাতি ঘুরে বেড়াত। হাতি নিরীহ জীব, কিন্তু তাকে দেখে অনেকে ভয় পেয়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বসত। সরকার তাই ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে এক আইন জারি করে সারকুলার রোড ছাড়া কলকাতার অন্যান্য পথ দিয়ে হাতির চলাচল নিষিদ্ধ করে দেন। আদেশটি ঠিকমতো পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য থানাদারদের কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

সব মিলিয়ে কাজ কিন্তু অনেক। চুরি-ডাকাতি খুন-জখমের তদন্ত করা, অপরাধীকে খুঁজে বের করা, আগুন নেভানো, ওজনদাঁড়ি-বাটখারা ঠিক আছে কিনা দেখা, রাস্তা-ঘাট পরিচ্ছন্ন রাখা—এত কাজ একসঙ্গে চালাতে গিয়ে ভুলত্রুটি তো কিছু হবেই—কিন্তু কলকাতা পুলিশের ভুলত্রুটির পরিমাণটা একটু বেশি। তাই কলকাতা পুলিশের ওপর বর্ষিত হয়েছে রাশিরাশি অভিযোগ।

নানা অভিযোগ

'কলকাতা পুলিশ কি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অপদার্থ? না, মোটেই না। কারণ কলকাতায় পুলিশের কোনো অস্তিত্বই নেই।'[৭] কলকাতার পুলিশকে লোকে কি চোখে দেখত, সেকালের একটি বিখ্যাত পত্রিকার এই ধরনের মন্তব্য থেকেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়। উনিশ শতকের শুরু থেকেই কলকাতা পুলিশ সম্পর্কে নানা অভিযোগে সরকার বিব্রত হয়ে পড়েন। কলকাতার মতো বিশাল নগরীতে পুলিশের অপদার্থতার বিরুদ্ধে সকলেই সোচ্চার—১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে ক্ষোভের সঙ্গে এ-কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক।

এসব অভিযোগের মূল লক্ষ্য কলকাতা পুলিশের দেশীয় কর্মচারীরা। এসব কর্মীর বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলা, উৎকোচ গ্রহণ, ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতি নানা ধরনের অভিযোগ ওঠে। চৌকিদার থেকে শুরু করে থানাদার পর্যন্ত সর্বস্তরের পুলিশের দুর্নীতি সম্পর্কে সবাই সরব। চৌকিদারদের তো কথাই নেই, এদের সম্পর্কে সেকালের একটি পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়, 'most stupid, roguish, villanions, sleepish, lazy useless set of scoundrels that ever disgraced the name of guardians of public peace.'[৮] শারীরিক দিক দিয়ে দুর্বল এই মানুষগুলির কারও মোকাবিলা করার মতো সাহস বা ইচ্ছা কোনোটাই ছিল না। নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে তারা মাথা ঘামাত না। তারা চাইত যে-কোনো উপায়ে পকেট ভর্তি করতে। শুধু চৌকিদাররাই নয়, সর্বস্তরের দেশীয় পুলিশ কর্মচারীই দুর্নীতিগ্রস্ত—পুলিশ সম্পর্কে মতামত প্রকাশকালে এই মন্তব্য করেন অ্যাডভোকেট জেনারেল সি. আর. প্রিন্সেপ। দেখা যেত, অনেক থানাতেই থানাদার থেকে চৌকিদার পর্যন্ত সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে সরকারের কাছে প্রদত্ত এক রিপোর্টে তদানীন্তন পুলিশ-সুপার স্টীল স্বীকার করেন. দুর্নীতির অভিযোগে অনেক ক্ষেত্রে তিনি থানার সব কর্মচারীকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হয়েছেন।

সে সময়ের কলকাতা পুলিশকে বলা যেতে পারে অপরাধীর বন্ধু আর নিরীহের যম। ফলে লোকে পারতপক্ষে পুলিশের দ্বারস্থ হতো না, ছোটখাটো ক্ষতি তারা মুখ বুঁজে সহ্য করত। অবস্থা দিন-দিন খারাপের দিকে যেতে থাকে, সংবাদপত্রের লেখালিখিতেও কোনো সুরাহা হয়নি। ডাকাতির মতো যেসব অপরাধ কলকাতায় অজানা ছিল, তাও মাথাচাড়া দিতে থাকে। ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে ধর্মতলার মতো জনবহুল কর্মব্যস্ত এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে কয়েক হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। খুন, জখম, চুরি-ডাকাতি হয়ে ওঠে জনগণের নিত্যসঙ্গী। অবস্থা সহের সীমা অতিক্রম করলে ১৯ জুলাই, ১৮৪২ তারিখে রামকমল সেন, মতিলাল শীল প্রমুখ কলকাতার ১৫৬ জন বিশিষ্ট নাগরিক এক আবেদনে কলকাতা পুলিশের অপদার্থতা ও নাগরিকদের শঙ্কার কথা প্রকাশ করে সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। তাঁরা বলেন দিনে-রাতে সবসময় পুলিশের নাকের ডগায় সাঙ্ঘাতিক সব অপরাধ হচ্ছে কিন্তু পুলিশের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সন্ধ্যার পর গুণ্ডার দল অস্ত্র হাতে শিকারের সন্ধানে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, মদের দোকানগুলি সারারাত খোলা থাকে আর টেরিটি বাজার এলাকায় দিনরাত জুয়ার আড্ডা চলে, পরিবেশ অনুকূল দেখে নামকরা পশ্চিমা বদমাশরা কলকাতায় বাসা বেঁধেছে—ব্যবসায়ীরা তাদের ভয়ে অস্থির। অপরাধ বৃদ্ধির মূল কারণ থানাদারি পুলিশের অপদার্থতা। থানাদার, নায়েব থেকে চৌকিদার পর্যন্ত সবাই কমবেশি দুর্নীতিগ্রস্ত।[৯] এইরকম পরিস্থিতিতে পুলিশের সংস্কার প্রয়োজন—এজন্য কিছু কিছু পথও তাঁরা নির্দেশ করেন। সরকারের পক্ষ থেকে ২৫ জুলাই আবেদনকারীদের জানানো হয় যে, কিছুদিন ধরেই সরকার বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করছেন, কিছু কিছু পদক্ষেপও তাঁরা গ্রহণ করেছেন এবং যথাবিহিত অনুসন্ধানের

পর কলকাতা পুলিশকে কর্মদক্ষ করার জন্য প্রয়োজনীয় যে-কোনো ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার বদ্ধপরিকর।

ব্যবস্থা নিতে নিতে কেটে গেল বছর আড়াই। ২০ জানুয়ারি, ১৮৪৫ তারিখে চিফ ম্যাজিস্ট্রেট প্যাটন ও আরও ৬ জন সদস্যকে (ওয়াকার, মিটান, রিচি, রজার্স, ফরসিথ ও রামগোপাল ঘোষ) নিয়ে সরকার এক কমিটি গঠন করেন। ঠিক হয়, কমিটি কলকাতা পুলিশের সবদিক খুঁটিয়ে দেখে, এর ত্রুটি ও তা নিবারণের উপায় সম্পর্কে সুপারিশ করবেন। কমিটির কাছে সাক্ষ্যদানকালে কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকরা পুলিশি অপদার্থতার নানা নমুনা তুলে ধরেন। 'ক্যালকাটা স্টারে'র সম্পাদক জেমস হিউম বলেন, রাস্তায় ইউরোপীয় নাবিকরা মদ খেয়ে উন্মত্ত আচরণ করছে, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও পাহারাওয়ালারা ভয়ে তাদের সামনে যায় না। প্যারীচাঁদ মিত্র জানান, ময়দানে মদমত্ত সৈনিক নিরীহ পথচারীদের আক্রমণ করছে আর পুলিশ নীরব দর্শক—এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। হরিহর দত্ত বলেন, পুলিশের চোখের সামনে নিরীহ নাগরিকরা লাঞ্ছিত হচ্ছে—এমন ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। সব সাক্ষ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ করার পর কলকাতা পুলিশের ত্রুটির কথা বলতে গিয়ে কমিটি মন্তব্য করেন, 'Under the last head of defects, we would make mention of the venality and supineness of the Native Police, and the consequent utter want of confidence in them by the Public.'[২০]

কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কলকাতা পুলিশে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। থানাদারদের বেতন বৃদ্ধি ও নিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়। প্রথম দিকে নতুন ব্যবস্থায় সুফল দেখা যায়, অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পায়, সরকারও সন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অবস্থা আবার যে-কে-সেই। ২২ জুলাই, ১৮৪৬ তারিখে সন্ধ্যাবেলায় একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত বড়বাজারে এক মহাজনের গদিতে হানা দেয়, দারোয়ানকে হত্যা ও মহাজনকে আহত করে অর্থ ও অলঙ্কারপূর্ণ সিন্দুকটি নিয়ে তারা পালায়। ঘটনাটির পর পত্রিকাগুলি পুলিশের নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠে কলকাতার ৮০০ নাগরিক (রাজা রাধাকান্ত দেব, মহারাজা কালীকৃষ্ণ দেব, মতিলাল শীল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরিমোহন সেন, রুস্তমজি কাওয়াসজি প্রমুখ) সরকারের কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করে তাঁদের আশঙ্কার কথা জানিয়ে বলেন, পুলিশের সংস্কার করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কাজের কাজ তারা করতে পারছে কই? জনগণ কিছুমাত্র স্বস্তি বোধ করছে না। সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে তাঁরা প্রস্তুত—একথাও আবেদনকারীরা জানালেন। সরকারের পক্ষ থেকে আবেদনকারীদের জানানো হল, পুলিশ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সম্প্রতি পুলিশকে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে কার্যকর হওয়ার আগেই বড়বাজারের সাঙ্ঘাতিক ঘটনাটি ঘটেছে—স্মরণীয় কালের মধ্যে এ ধরনের ঘটনা কলকাতায় ঘটেনি। পুলিশি সংস্কারের সঙ্গে ঘটনাটির বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই; পুলিশের পুরনো আমলের কার্যকলাপের সঙ্গে নতুন আমলের কার্যকলাপের তুলনা করলেই এর ভাল দিকটি চোখে পড়বে। অপরাধ নিবারণের জন্য

কলকাতার সম্ভ্রান্ত অধিবাসীরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চেয়েছেন দেখে সরকার আনন্দ প্রকাশ করেন। বিষয়টি নিয়ে নাগরিকরা দু-একটি মিটিং-এ মিলিত হন। একটি কমিটিও গঠন করেন, কিন্তু তারপরে সব চুপচাপ। তুলনায় 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'র প্রস্তাবটি অনেক বাস্তবোচিত। পত্রিকাটি বলে, 'কলকাতা পুলিশে অশ্বারোহী বাহিনীর আবির্ভাব ঘটছে, এর সঙ্গে যদি গ্যাসের আলোর ব্যবস্থা হয় তাহলে অপরাধ অনেক কমে যাবে। ইংল্যাণ্ডের তৃতীয় শ্রেণীর ও আয়ারল্যাণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর শহরগুলি গ্যাসে আলোকিত হয়েছে অথচ ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা (যেখান থেকে রাজস্ব মেলে বছরে ২০ লক্ষ স্টার্লিং) তা থেকে বঞ্চিত।'[১১] গ্যাসের আলোর ব্যবস্থা করলে অপরাধ যে কমবে এ-কথা ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে পুলিশ সুপার বার্চও স্বীকার করেন।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে দেশীয় পুলিশের বিরুদ্ধেই ছিল মূল অভিযোগ। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দেখা গেল ইউরোপীয় পুলিশরাও অপদার্থতায় পিছিয়ে নেই। ছোটখাটো অফিসারের কথা বাদ দিলেও, খোদ পুলিশ সুপার ল-এর বিরুদ্ধে ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে অপদার্থতার অভিযোগ ওঠে। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের পুলিশ রিপোর্টে চিফ ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'মিঃ ল-এর করার মতো কাজ বিশেষ কিছু নেই, যেটুকু আছে সেটুকুও তিনি করেন না।' 'সিটিজেন' তাই তাঁকে পরামর্শ দেয়, 'তোমার যখন করার কিছুই নেই, তখন সন্ধ্যাবেলা তুমি নতুন টেবিলে বিলিয়ার্ড খেল।' শুধু ল-কে দোষ দিয়ে লাভ নেই, অনেক ইউরোপীয় পুলিশের বিরুদ্ধেই ছিল রাশি রাশি অভিযোগ। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে জেমস বেল নামক দক্ষিণ বিভাগের একজন ইন্সপেক্টরকে মদ্যপান ও অপদার্থতার অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়। ইউরোপীয় পুলিশের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগটা ছিল মাতলামির। কাজের সময়ে তারা আকণ্ঠ মদ্যপান করত, নিজের কর্তব্য নিয়ে মাথা ঘামাত না। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে প্রধানত মাতলামির অভিযোগে ২২ জন ইউরোপীয় পুলিশ অফিসারকে কর্মচ্যুত করা হয়, কর্তব্যে অবহেলার জন্য এই বছরই ২৭ জন শ্বেতাঙ্গ পুলিশকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ব্যবস্থা যাই নেওয়া হোক না কেন, অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের পুলিশ রিপোর্টে হগ ইউরোপীয় কনস্টেবলদের আচরণ সন্তোষ-জনক নয় বলে মন্তব্য করেন। ইউরোপীয় অফিসারদের মধ্যে মদ্যপানের প্রবণতা দেখে ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মদ্যপানের জন্য কলকাতার অন্যতম পুলিশ সুপার ফেরিস সম্পর্কে কমিশনার হগ কঠোর মন্তব্য করেন। মদ্যপানের অভিযোগে ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে আরাটুন ও ফক্স নামে দু'জন ইন্সপেক্টরের পদাবনতি ঘটানো হয়। আরাটুন এ থেকে শিক্ষালাভ করলেও, ফক্স করেননি। ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁকে পদচ্যুত হতে হয়। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে ২৩ জন ইউরোপীয় সার্জেণ্ট ও কনস্টেবলকে বিভিন্ন অভিযোগে পদচ্যুত করা হয়। ১৮৬৭-'৬৯, শুধু এই তিন বছরে অভিযুক্ত ইউরোপীয় কনস্টেবলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮০তে। এই ট্রাডিশন যে বহাল তবিয়তে চলছিল তার প্রমাণ মিলবে ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের পুলিশ রিপোর্টে। এই বছর শুধুমাত্র মাতলামির অভিযোগে ১৬ জন ইউরোপীয় পুলিশকে পদচ্যুত করা হয়।

কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত ছিল না—তা আমরা দেখেছি। অভিযোগটা দেশী পুলিশের বিরুদ্ধে একটু বেশি—কারণ সংখ্যায় তারা অনেক, পাশাপাশি ইউরোপীয় পুলিশেরও গুণের ঘাট ছিল না। এরই মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছিল কলকাতা পুলিশের কর্মকাণ্ড।

শতাব্দীর সূচনায় তাদের অবস্থাটা ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের মতো—না ছিল নির্দিষ্ট কোনো পোশাক, না থানাগুলির স্বতন্ত্র কোনো চিহ্ন। সরকারি নীতিও বিচিত্র—তাঁরা চাইতেন পুলিশ কাজ করবে বেশি, টাকা চাইবে কম (প্রতিটি পুলিশ কমিটিকে সরকার তাই দুটি জিনিস স্মরণ রাখতে বলতেন—নাম দুটি বড় চমৎকার—efficiency and economy)। ফলে পুলিশ বাধ্য হয়ে ধরল অন্য রাস্তা। তাই যাদের হয়ে ওঠার কথা জনগণের বন্ধু, তারা হয়ে উঠল জনগণের আতঙ্ক।

দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশি ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে গোটা উনিশ শতক ধরেই এদেশের মানুষ সোচ্চার। সেই দাবি সরকার ধীরে, খুব ধীরে, স্বীকার করেছেন। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে থানাগুলির মাথায় নিশান লাগানো হল, ১৮৪৫-এ থানাগুলির বাইরে বসল বোর্ড। পোশাকের ব্যাপারটা নিয়েও অনেক জল ঘোলা হল। স্বয়ং গভর্নর জেনারেল বললেন, দিনের চৌকিদাররা পোশাক পাবে, রাত-চৌকিদাররা? না-না, সে অনেক টাকার ব্যাপার—বাদ দাও! পুলিশের মাইনে একটু ভদ্রস্থ করা নিয়েও কত কথা। শেষপর্যন্ত কিছু নিয়মকানুন হল, চালু হল পুলিশ কোড। আর এসবের সম্মিলিত ফল হিসাবেই পুলিশ সম্পর্কে জনগণের যে বিরাগ ছিল তাও খানিকটা অপসারিত হল—অন্তত কর্তাব্যক্তিরা তাই মনে করতেন। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার চিফ ম্যাজিস্ট্রেট এলিয়ট মন্তব্য করেন, 'আগের চেয়ে পুলিশ সম্পর্কে জনগণের ধারণা অনেকটা ভাল। অপরাধ নিবারণ ও অপরাধীকে গ্রেপ্তার উভয় ক্ষেত্রেই তারা যে কাজ করতে ইচ্ছুক, তার প্রমাণ অনেক ক্ষেত্রে তারা রেখেছে। এরই ফলে কয়েক বছর আগে পুলিশের প্রতি যে ভীষণ বিতৃষ্ণা ছিল তার বদলে শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রদায় অন্তত তাদের কাজের তারিফ করছে।'[১২] কেউ কেউ তারিফ করে থাকতেও পারে, উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ পুলিশকে প্রীতির চোখে দেখত—হলফ করে এমন কথা বলা মুশকিল। পত্রপত্রিকাগুলি তো বিপরীত কথাই বলে। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়ের লেখা নাটকের দারোগা চরিত্রের মতো উনিশ শতকের বাঙালি সমাজও বিশ্বাস করত, 'পুলিশে সত্যিও মিথ্যে হয়, আর মিথ্যে সত্যি হয়।'[১৩]

উল্লেখপঞ্জী

১. 'Judicial (Criminal) Proceedings', 15. 5. 1800.
২. Ibid., No. 36, 30. 11. 1830.
৩. Ibid.,
৪. Ibid., No. 40, 9. 10. 1832.

৫. 'Judicial Proceedings', No. 246, September 1869.
৬. 'Judicial (Criminal) Proceedings', No. 36, 17. 11. 1821.
৭. 'Friend of India', 24. 1. 1839.
৮. 'Citizen', 17.7.1852.
৯. 'Judicial Proceedings', No. 107, 25. 7. 1842.
১০. 'Report of Calcutta Police Committee', 27. 8. 1846.
১১. 'Friend of India', 27.8.1846.
১২. 'Police Report of Calcutta', 1853 [Elliot].
১৩. হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়, 'দারোগামশাই' (১৮৭২)।

বিনয়ভূষণ রায়

নেটিভ হাসপাতাল থেকে ফিভার হাসপাতাল

কলকাতার চিকিৎসাব্যবস্থার একটি পর্ব

পলাশির যুদ্ধের পর যখন কলকাতা ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্যিক তথা শাসন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠতে শুরু করল, সেই সময় থেকেই এই অঞ্চলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সূত্র-পাত। জনবাহুল্যের ফলে তখন যেসব সমস্যা সৃষ্ট হয়, তার মধ্যে একটি ছিল জন-স্বাস্থ্য ঘটিত। কলকাতার প্রাকৃতিক পরিবেশও ছিল বিরূপ। বছরের বর্ষণবহুল সময়ে জনস্বাস্থ্যের চরম অবনতি ঘটত। প্রতি বছর ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার ইউরোপীয় বাসিন্দারা একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাকৃতিক বিরূপতার অবসানে নবজীবনলাভের উৎসব উদ্‌যাপন করতেন।[১]

১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানি একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে সেটি তুলে দেওয়া হয় সেনাবিভাগের হাতে। সেনাবিভাগের আইনকানুন অনুযায়ী পরিচালিত এই হাসপাতালটিতে সেনাবিভাগ ও নৌবিভাগ সহ কোম্পানির বিভিন্ন কর্মচারী ও চরম অভাবগ্রস্ত ইউরোপীয় ব্যক্তিরা চিকিৎসিত হতেন।[২] ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় আর একটি হাসপাতাল স্থাপিত হয় পুলিশদেব জন্য।[৩]

এইসব হাসপাতালে কলকাতার 'নেটিভ' বাসিন্দাদের কোনো চিকিৎসার সুযোগ ছিল না। তাই কোম্পানির মেডিকাল বোর্ডের সদস্য রবার্ট উইলসনের পরামর্শ অনুযায়ী ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় একটি 'নেটিভ হাসপাতাল' স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৪] সিদ্ধান্তটি কাজে রূপায়িত করার জন্য ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দের অগাস্ট মাসে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। তাতে বলা হয়, কলকাতার দেশীয় বাসিন্দারা, বিশেষত শ্রমজীবী সম্প্রদায়, হাসপাতালের অভাব অনুভব করছে। পৃথিবীর অন্যান্য জনবহুল শহরেও শ্রমজীবীরা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন। কিন্তু এদেশের চিকিৎসকবা শল্য, ভেষজ বা ব্যবচ্ছেদ-বিজ্ঞানে অজ্ঞ হওয়ার ফলে আহত শ্রমজীবীদের উপযুক্ত চিকিৎসা হয় না। আরোগ্যের উপায় থাকা সত্ত্বেও এই হতভাগ্য ব্যক্তিরা পঙ্গুত্ব বা মৃত্যুর শিকারে পরিণত হন। শ্রমজীবীদের জন্য একটি উপযুক্ত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে হলে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত সাহায্যেরও প্রয়োজন। ব্রিটিশদের মতো দেশীয় ব্যক্তিরাও অর্থসাহায্য করলে হাসপাতালটির দ্বারা তাঁরা নিজেরাই উপকৃত হবেন। জনসাধারণের সাহায্য ও উৎসাহ পেলে হাসপাতালটির কাজকর্ম শুধু দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের জন্য সীমিত না রেখে, বিস্তৃত চিকিৎসার জন্য প্রসারিত হতে পারে।

এই আবেদনের সঙ্গে বিজ্ঞাপনটিতে হাসপাতাল স্থাপনের জন্যে একটি সভার কথাও ঘোষিত হয়।[৫]

পরবর্তী ২৭ সেপ্টেম্বর দুপুর এগারোটায় লে গ্যালসির (Le Galsi's) সরাইখানায় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।[৬] সে সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি ছিল এরকম :

১. দেশীয় ব্যক্তিদের উপযুক্ত শল্যচিকিৎসার জন্য একটি হাসপাতাল স্থাপন করা প্রয়োজন।

২. কলকাতার বাসিন্দাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সমসংখ্যক ইউরোপীয় ও দেশীয় সদস্যদের দ্বারা গঠিত পরিচালনমণ্ডলীর উপর হাসপাতালটি দেখাশুনার ভার থাকবে।

৩. প্রয়োজনীয় চাঁদা সংগ্রহ এবং পরিকল্পনা রচনার জন্য একটি উপসমিতি গঠন করা হবে।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে স্পিক, কাউপার, রেভারেণ্ড আওয়েন, ভ্যাণ্ডারহাইডেন, ডিক, মেয়ার, কোলব্রুক, ল্যামবার্ট, ফ্লেমিং, উইলসন, ডড্‌সওয়েল, মরিস, ব্যারেটো প্রভৃতি ব্যক্তিদের নিয়ে একটি উপসমিতি গঠন করা হয়। পরিকল্পনা রচনা সাঙ্গ হলে চাঁদাদাতাদের একটি সভা আহ্বানের দায়িত্ব এই উপসমিতিকে দেওয়া হয়।[৭]

হাসপাতাল স্থাপনের জন্য ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই চুয়ান্ন হাজার টাকা চাঁদা পাওয়া যায়। তার মধ্যে লর্ড কর্নওয়ালিস দেন তিন হাজার টাকা, তাঁর কাউন্সিলের সদস্যরা প্রত্যেকে দেন দেড় হাজার টাকা। এই অর্থে হাসপাতালের ব্যয়ভার সংকুলান না হওয়ায় সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন করা হয়। কোম্পানির হাসপাতাল থেকে ঔষধপত্র এবং মাসিক ছ'শো টাকা অনুদান দিতে সরকার স্বীকৃত হন।[৮]

শুধুমাত্র কলকাতা বা অন্যান্য অঞ্চলের সাহেবদের টাকায় প্রতিষ্ঠানটি তৈরি হয়নি। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের, এমনকি ভিন রাজ্যের দেশীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকেও প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল। নীচের তালিকায় টাকার অঙ্কসহ সেই দেশীয় দাতাদের নাম উদ্ধৃত হল :

কলকাতা

১ গঙ্গানারায়ণ দাস ৫০০
২ কৃষ্ণকান্ত সেন ৫০০[৯]
৩. নীলমণি গাঙ্গুলী ৫০
৪. রামনারায়ণ চৌধুরী ২০০[১০]
৫. মারুতি কিষণ (Marrooday Kesahon) ১০০
৬. মুরাদ এলারি ৫০[১১]
৭ দুর্গাচরণ চক্রবর্তী ১০০
৮. হিদারাম ব্যানার্জি ১০০
৯. বলরাম চন্দ্র ১০০
১০. রামকৃষ্ণ দত্ত ১০০[১২]
১১. রসিক রায় ২৫
১২. স্বরূপচরণ রায় ১৬
১৩. কাশীনাথ ঘোষ ১২
১৪. সীতারাম ঘোষ ১০
১৫. রামনিধি দত্ত ১০
১৬. নন্দলাল মিশ্র ৪
১৭. যশি রায় (Jessue Roy) ৫
১৮. ফকির মিত্র ৮
১৯. গঙ্গারাম মজুমদার ২
২০. কালীপ্রসাদ ৩
২১. লোচন নন্দী ৫
২২. রামপ্রসাদ দত্ত ৫[১৩]

কলকাতা

২৩. বংশীধর মিশ্র ১৫০

২৪. আহামদ আলি খাঁ ১০০[১৪]

২৫. মনোহর দাস ৫০০[১৫]

২৬. তোফাজ্জল হোসেন খাঁ বাহাদুর ৬০০[১৬]

মেদিনীপুর

১. রাজনারায়ণ রায় ১০০[১৭]

তমলুক

১. মহিষাদলের রানী ৫০০

২. মহিষাদলের জমিদারি আমলা ১৭০

৩. তমলুকের রাজা আনন্দনারায়ণ ৪০০

৪. তমলুকের জমিদারি আমলা ১০৪

৫. দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের আমলা ১৮৫[১৮]

৬. তমলুক ডিভিসনের খাস আমলা ৪০৫

কাঁথি

১. রাজা যাদবনারায়ণ ১০০

২. রানী সুগন্ধা ১০১

৩. রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ ৫০

৪. রামনিধি মুখোপাধ্যায় ৭৫

৫. রামমোহন মুখোপাধ্যায় ২৫

৬. হিজলি কাচারির আমলা ৯৫[১৯]

যশোর

১. শ্রীকান্ত রায় ১০০

২. নন্দলাল ঘোষ ৫০

৩. মহম্মদ দয়রাম ৫০

৪. গোকুলচাঁদ মজুমদার ২৫

৫. কিসমৎ পরগনা সৈয়দপুর ২৫

৬. বৈদ্যনাথ মিত্র ১৫

৭. মহম্মদশাহীর জমিদার গোবিন্দ রায় ২৫

৮. মহম্মদশাহীর জমিদার রামশঙ্কর রায় ৫০[২০]

বালেশ্বর

১. গঙ্গাধর আঢ্য ১০০

২. গোলাম মুস্তাফা ১০০

৩. জগু দাস ৫০

৪. বালি পট্টনায়ক ১৫

৫. কৃষ্ণ মণ্ডল ২৫

৬. জগন্নাথপ্রসাদ কর ২৫[২১]

দিনাজপুর

১. রাধানাথ রায় ৪০০

২. মানিকচাঁদ ১০০

৩. রামকান্ত রায় ১০০

৪. অনুপনারায়ণ ৭

৫. হরিনারায়ণ ৫

৬. মানিকচাঁদ মাখনলাল ৫০

৭. কৃষ্ণকান্ত রায় ২৫

৮. গঙ্গারাম দাস ১০

৯. নন্দলাল রায় ৫০

১০ রামজয় পালিত ১০

১১ যশোবন্ত সিংহ ৫

১২. রঘুবীর সিংহ ৫

১৩. দাতারাম ৫

১৪. ভবানীপ্রসাদ ১০

১৫. মহম্মদ আলি ৫

১৬. রাজীব লোচন ৭

১৭. দুলালচাঁদ ৫

১৮. মানিক দাস ৭

১৯. আকবর হোসেন ২৫

২০. গোলাম সুলতান ১৫

২১. রুদ্রকান্ত রায় ১০

২২. কৃষ্ণনাথ ২৫

২৩. গুরুপ্রসাদ ১০

২৪. অযোধ্যারাম ৫

২৫. রুদ্ররাম ৫

২৬. হররাম আচার্য ৫

দিনাজপুর

২৭. শ্যাম রুদ্র ৫
২৮. যুগলকিশোর ৫
২৯ মুক্তাহার ৫
৩০. আবু তালেব ৫
৩১. আসাদ জামান ৫
৩২. রূপচাঁদ ৫
৩৩. নাশারাত আলি ১০
৩৪. গদাধর ৫
৩৫. মসিনৎউল্লা ৫
৩৬. বৈজু সুন্দর ৫
৩৭ কাইয়ুম খাঁ ৫
৩৮ জানকী দাস ১০
৩৯. মহম্মদ ফয়েজ ২০
৪০. গঙ্গাগোবিন্দ ১০
৪১. গোলাম রহমান ৫
৪২. মাহমুদ আশরফ ৫
৪৩. গৌরহরি ৬
৪৪. নব খাঁ ৫
৪৫. ওয়ালি মাহমুদ ৫
৪৬. রাধাকিষেণ ২০
৪৭. মিঠুনলাল ১০
৪৮. হরগোবিন্দ রায় ২৫
৪৯. নীলমণি ২৫
৫০. রামলোচন রায় ১৫
৫১. জয়নারায়ণ দাস ১০
৫২. শিবনাথ সিংহ ৭
৫৩. গোবিন্দচাঁদ রায় ২৫
৫৪. গঙ্গানারায়ণ ৭
৫৫. রাধারাম সিংহ ১০
৫৬. হরলাল ১৫
৫৭. গৌরসুন্দর ৫
৫৮. রাজকৃষ্ণ রায় ৫
৫৯. রামকিশোর ৫
৬০. নগর বক্সি ৫
৬১. নন্দমোহন ঘোষ ৭[22]

ঢাকা

১. তুলসীরাম ঘোষ ১০০[23]
২. পরগনা জেলালপুরের জমিদার নিয়ামৎউল্লা প্রভৃতি ১০
৩. রাজনগরের জমিদার রাজকৃষ্ণ দাস প্রভৃতি ২০০
৪. নুরুল্লাপুরের রাজা রামকৃষ্ণ ৩০
৫. চন্দ্রদ্বীপের জমিদার ৪০
৬. ভাওয়ালের জমিদার রামচাঁদ ২৫
৭. রাজেশ্বর (জমিদার) ২৫
৮. আওরংপুরের জমিদার ১৩
৯. রসুলপুরের জমিদার ১২
১০ মহম্মদ হায়াৎ ৮
১১ লালা জালসিং (জমিদার) ৬
১২. বিক্রমপুরের জমিদার রামকান্ত রায় ৬
১৩. চিকনীচণ্ডীর জমিদার কৃষ্ণদেব সেন
১৪. খোজা নেহাটল (জমিদার) ৪
১৫. বাগেশ্বর ৪
১৬. কালীশঙ্কর ঘোষাল (জমিদার) ২৫
১৭. মহম্মদ হোসেন (জমিদার) ৫
১৮. রামনগরের জমিদার রামনারায়ণ ৫
১৯. কাশিমপুরের জমিদার গোবিন্দপ্রসাদ রায় ৫
২০. সেলিমাবাদের জমিদার শিবনারায়ণ ১৫
২১. ইদিলপুরের জমিদার রামনরসিং ২৫
২২. তপ্পা মাইজদ্দির জমিদার জুল কাদের ৫
২৩. দক্ষিণ শাহবাজপুরের জমিদার খোজা মাকেল ৪১
২৪. দুর্গাপুরের জমিদার রামকিশোর বসু ৭[24]

লক্ষ্ণৌ

১. নবাব ভিজিয়ার ৩০০০
২. হাসান রেজা খাঁ ২০০০
৩. রাজা টিকায়েৎ রায় ২০০০[25]

সোনামুখী আড়ং

১. তিলকচাঁদ বসাক ৫০
২. শ্যামচরণ বসাক ২০
৩. রসিকলাল বসাক ১৫
৪. রামসুন্দর চক্রবর্তী ১০
৫. কাশীনাথ শীল ১০
৬. গৌরহরি বিশ্বাস ৮
৭. ভৈরব ঘোষ ৫
৮. নন্দলাল ঘোষ ৫
৯. গোপাল বসাক ৫
১০. পার্বতী মুখোপাধ্যায় ৪
১১. ভৈরব মুখোপাধ্যায় ৪
১২. ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ৪
১৩ বাণেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ৪
১৪. সনাতন দাস ৪
১৫. লোকনাথ ভদ্র ৪
১৬. গোবিন্দ পোদ্দার ৬
১৭. রাসমোহন সরকার ৪
১৮. কার্তিক সরকার ৪[২৬]

মালদহ

১. রাধামোহন ঠাকুর ২৫
২. বাণিজ্যকুঠির কর্মচারীবৃন্দ ৩০
৩. হাজি মহম্মদ আমিন ১০
৪. গোলাম হোসেন ৫
৫. মহম্মদ বদিউল জামান ৪
৬ কীরিটচাঁদ ৫[২৭]

রংপুর

১. কাঁকিনিয়ার জমিদার রামসুন্দর চৌধুরী ৪০
২. কাঁকিনিয়ার গোমস্তা রামকিশোর মজুমদার ১০
৩ বাহিরবন্দের জমিদার লোকনাথ নন্দী ১০০
৪. রাজকিশোর রায় ২৫
৫. আনন্দমোহন চৌধুরী ২৫
৬. গোবিন্দপ্রসাদ রায় ২৫
৭. গৌরীচরণ ঘোষ ৩
৮. মহাদেব মুখোপাধ্যায় ১০
৯. জয়নারায়ণ শর্মা ৩
১০. রামকিশোর চৌধুরী ৩
১১. রামমোহন দাস ১০
১২. ভৈরবচাঁদ চৌধুরী (জমিদার) ১০[২৮]

বীরভূম

১. রাজা মামুদ জামান খাঁ ২০০
২. লালা রামনাথ ১০০[২৯]
৩. দেশীয় আমলা ৯৮

পূর্ণিয়া

১. মহম্মদ আলি খাঁ ৭৫
২. বাহাদুর সিং ৭৫
৩. কোরাগোলার ইমামবাড়ি ৭৫
৪. মির্জা জুববার পুত্রেরা ৫০
৫. মির আবুল হুসেন ৪০
৬. গোলাম আলি ২০
৭. ধনপৎ রাই ৪০
৮. রতনচাঁদ ৪০
৯. রাম আওল ২৫
১০. মুংলি খাঁ ২০
১১. আত্মারাম বসু ২৫
১২. রানী ইন্দ্রমন্তী ৬০
১৩. গোকুলচাঁদ ২৫
১৪. শ্রীনাথ চৌধুরী ২৫
১৫. তরলাল সিংহ ২৫
১৬. ধীরনাথ চৌধুরী ২৫
১৭. হরি সিংহ ২৫
১৮. চণ্ডীপ্রসাদ ২৫
১৯. কেবল মার (Cowal Mayer) ২৫
২০. মহেন্দ্রনারায়ণ ২৫
২১. হৃদয়নারায়ণ ২৫
২২. দুলাল সিংহ ২৫[৩০]

বোয়ালিয়া

১. নয়নচাঁদ দত্ত ৩০
২. গোপীনাথ সাহা ১০
৩. গৌরসিংহ সাহা (Gorsing Saw) ৭
৪. কৃপারাম ঘোষ ৫
৫. রঘুনাথ সাহা ১৫
৬. কৃষ্ণচন্দ্র সাহা ৭
৭. রামনিধি ঘোষ ৫
৮. কৃষ্ণচরণ সাহা ৫
৯. হাবুরাম ঘোষাল ৫

কুমারখালি

১. আমলা এবং পাইকারবৃন্দ ১৫০[৩১]

নাটোর

১. মহারাজা রামকৃষ্ণ ৫০০
২. মহারানী ভবানী ২০০
৩. স্থানীয় বাসিন্দাবৃন্দ ২৫৮[৩২]

কোচবিহার

১. মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ২০০
২. মহারাজার আমলা ১০০
৩. কোচবিহারের দেওয়ান ১০০
৪. সবানন্দ গোঁসাই ১০০
৫. কাশীনাথ খাসনবিশ ১০০[৩৩]

হরিয়াল (Hurriaul)

১. স্থানীয় বাসিন্দাবৃন্দ ১২৫[৩৪]

কৃষ্ণনগর

১. নদীয়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায় ৩০০
২. দেওয়ান কালীপ্রসাদ ৫০
৩. নদীয়া জমিদারির আমলা ৫০
৪. কোম্পানির দেওয়ান রামরাম ঘোষ ১০০[৩৫]

চট্টগ্রাম

১. রামনারায়ণ ঘোষাল ১০০
২. গৌরীশঙ্কর ১০০
৩. নিমাইচরণ মুখোপাধ্যায় ২৫
৪. মহম্মদ আকবর ২০
৫. স্থানীয় বাসিন্দাবৃন্দ ৩৫[৩৬]

চিত্রা (? Chittra)

১. রামসুন্দর মিত্র ২০
২. রাজা গরুড়নারায়ণ ২৫
৩. রাজা মন্নুনাথ সিংহ ২০
৪. রাজা চুনারন রায় ১০
৫. জগমোহন সিংহ ৫
৬. বসনেশ সিংহ (Bussonase Sing) ১০
৭. রাজা লোকনাথ ১০
৮. দারোগা মহম্মদ আলি ৬
৯. Ihatowar Kurreh Deah and Chorkey (?) ২০
১০. বলরাম সিংহ, মাধো সিংহ প্রভৃতি ১০[৩৭]

কলকাতার নগরায়ণের পিছনে গ্রামবাংলার যে প্রত্যক্ষ আর্থিক অবদান ছিল, এই তালিকা তার স্পষ্ট প্রমাণ। দাতাদের দানের পিছনে নতুন শক্তি হিসাবে প্রকাশমান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষার প্রচেষ্টাও পরিষ্কার বোঝা যায়।

১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দের ৩১ জুলাই চাঁদাদাতাদের এক সভায় হাসপাতালটির পরিচালন-

নীতি নির্ধারণের জন্য কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঠিক হয়, গভর্নর জেনারেল এবং তাঁর পারিষদমণ্ডলীকে প্রতিষ্ঠানটির পৃষ্ঠপোষক পদগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হবে। হাসপাতাল পরিচালনভার থাকবে বারো জন অধ্যক্ষের উপর, তাঁদের মধ্যে ন'জনকে মনোনীত করা হবে ব্রিটিশ, আরমানি ও পোর্তুগীজদের মধ্য থেকে। এই অধ্যক্ষ-মনোনয়নে অংশগ্রহণ করতে হলে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে এককালীন একশো টাকা বা মাসিক তিন টাকা দিতে হবে। একাদিক্রমে তিন বছর কলকাতায় বসবাসকারী ব্যক্তিরাই শুধু অধ্যক্ষপদে মনোনীত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। জেনারেল হাসপাতালে যাঁদের প্রবেশাধিকার নেই তাঁরা এবং দেশীয় ব্যক্তিরা দুর্ঘটনায় আহত হলে প্রতিষ্ঠানটিতে শল্যচিকিৎসার সুযোগ পাবেন। পরে যদি তহবিলের অবস্থা অনুকূল হয়, তাহলে এই হাসপাতালে ভেষজ চিকিৎসারও ব্যবস্থা হতে পারে। হাসপাতালটির তত্ত্বাবধান ও হিসাবরক্ষার জন্য অধ্যক্ষদের মধ্য থেকে তিন মাস অন্তর তিনজনের একটি কমিটি গঠিত হবে। এই তিনজনের মধ্যে দু'জন হবেন ব্রিটিশ, আরমানি বা পোর্তুগীজ। টাকা-পয়সা লেনদেনের জন্য এই তিনজনের মধ্যে দু'জনের স্বাক্ষর থাকা হবে বাধ্যতা-মূলক। চাঁদাদাতাদের বাৎসরিক সভায় হাসপাতালের বার্ষিক রিপোর্ট, হিসাবনিকাশ এবং নতুন অধ্যক্ষ নির্বাচনের বিষয়গুলি আলোচিত হবে। নির্বাচিত সদস্যদের তালিকাটি থাকবে গভর্নর জেনারেলের অনুমোদনসাপেক্ষ। তিন মাস অন্তর অধ্যক্ষরা সরকারের কাছে আর্থিক বিবৃতি পেশ করতে বাধ্য থাকবেন। মাসিক আড়াইশো টাকা ভাড়ায় ফৌজদারি বালাখানার বাড়িটিতে হাসপাতালটি স্থাপন করা সাব্যস্ত হয়। নির্বাচিত অধ্যক্ষদের মধ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপরে ন্যস্ত হয় হাসপাতাল পরিচালনার পরিকল্পনা রচনার দায়িত্ব। সভায় যাঁদের নিয়ে অধ্যক্ষমণ্ডলী গঠিত হয়, তাঁরা হলেন: রেভারেণ্ড আওয়েন, রেভারেণ্ড ব্ল্যানচার্ড, জর্জ হ্যাচ, ডি. ভ্যাণ্ডার-হাইডেন, জি. ডড্সওয়েল, জে. এইচ. হ্যারিংটন, আর. উইলসন, ডাবলিউ. ডিক, এ. ল্যাম্বার্ট, সি. বারবার, জে. পি. গার্ডেনার ও সার্কিস জোহানেস।[৩৮]

১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর কলুটোলার ফৌজদারি বালাখানায় নেটিভ হাসপাতালের কাজ শুরু হয়। গোড়ার দিকে প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার সকাল আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত বহির্বিভাগ থেকে দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের ঔষধপত্র দেওয়া হতো। এই সুযোগ পাওয়ার জন্য চাঁদাদাতাদের কাছ থেকে সুপারিশপত্র আনতে হতো রোগীদের।[৩৯] প্রথমে ডাক্তার রবার্ট উইলসনকে হাসপাতাল তদারকির এবং ডাক্তার গুলব্রেডকে শল্যচিকিৎসার দায়িত্ব দেওয়া হয়।[৪০] অধ্যক্ষমণ্ডলীর সদস্য রেভারেণ্ড আওয়েন কিছুদিনের মধ্যেই স্বদেশে ফিরে যাওয়ায় ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর বেলা দেড়টার সময় লে গ্যালসিব সরাইখানায় আয়োজিত এক সভায় নতুন আর একজন অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।[৪১]

বহির্বিভাগ চালু হওয়ার পর শল্যচিকিৎসায় আগ্রহী রোগীদের ভর্তি করা শুরু হয়। হিন্দু মুসলমান আবাসিক রোগীদের ('House Patients') জন্য নেটিভ হাসপাতালে পৃথক ঘরের বন্দোবস্ত ছিল।[৪২]

১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর বেলা বারোটার সময় নেটিভ হাসপাতালের চাঁদাদাতাদের প্রথম বার্ষিক সভায় হাসপাতালটির পরিচালন-প্রসঙ্গ বিশ্লেষিত হয়। তার সঙ্গে আলোচিত হয় ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দের ৩১ জুলাই থেকে শুরু করে এক বছরের হিসাবনিকাশ।[৪৩]

১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে তহবিলের অবস্থার উন্নতি হওয়ায় অধ্যক্ষরা নেটিভ হাসপাতালের স্থান পরিবর্তনের কথা ভেবে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন।[৪৪] তার পর ধর্মতলা স্ট্রিটের নিজস্ব বাড়িতে হাসপাতালটি স্থানান্তরিত হয়। এই নতুন বাড়িতেই ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর চাঁদাদাতাদের দ্বিতীয় বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।[৪৫] ঐ বছরের শেষ পর্যন্ত চাঁদা পাওয়া যায় ৫৪,৯৬০ টাকা।[৪৬] চাঁদাদাতাদের তৃতীয় বাৎসরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ধর্মতলা স্ট্রিটের বাড়িতেই, ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর, বেলা দু'টোয়।[৪৭]

রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কলকাতার মতো অন্য শহরগুলিতেও 'নেটিভ হাসপাতাল' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব কোম্পানির কাছে আসতে থাকে। চিঠির মাধ্যমে কোম্পানি মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, পাটনা এবং কাশীর আমলাদের কাছ থেকে প্রাসঙ্গিক মতামত চেয়ে পাঠায়। মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা থেকে দারুণ সমর্থন মেলায় ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে ঢাকায় এবং ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদাবাদে নেটিভ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকাতে বাইশ হাজার টাকা এবং মুর্শিদাবাদে আটত্রিশ হাজার টাকা চাঁদা পাওয়া গিয়েছিল। পরবর্তীকালে কাশী, পাটনা ও বেরিলিতেও নেটিভ হাসপাতাল স্থাপিত হয়।[৪৮]

১৮০২ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকে বসন্তের গো-বীজ টীকা দেওয়ার পাশ্চাত্য পদ্ধতি বাংলাদেশে প্রবর্তিত হয়। নেটিভ হাসপাতাল থেকেও এ টীকা দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গো-বীজ টীকা প্রচলনের আগে এখানে মানুষের বসন্তের বীজ দিয়ে টীকা দেওয়ার দেশজ রীতি প্রচলিত ছিল। মূলত ব্রাহ্মণরাই এই টীকা দিতেন। ডাক্তার ফ্রান্সিস বুকাননের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রায় এক হাজার লোক দেশজ টীকা দেওয়ার কাজ করে জীবিকা অর্জন করত।[৪৯] নতুন ধরনের টীকা প্রবর্তিত হওয়ায় জনমানসে অসন্তোষের সূচনা ঘটে। সেই ক্ষোভ দূর করার জন্য বাংলা ও হিন্দিতে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছিল। বাংলা বিজ্ঞাপনটির বয়ান ছিল এইরকম: '*** জে সকল বালক ও গয়রহকে অদ্যাবধি সিতলা না হইয়া থাকে উহারা প্রতি সপ্তাহের মঙ্গলবার ও স্থক্রবার অষ্টম ঘড়ি হইতে দশম ঘড়ি পর্য্যন্ত ধর্ম্মতলার ডাক্তর খানায় হাজির হএন বিনা খরচে গো সিতলার পুজ লইয়া তাহাদিগের হাথে টীকা দেওয়া জাইবেক ইহার পর তাহাদিগে দুই তিনবার ডাক্তর খানাতে জে সময় নির্ণয় হয় হাজীর হওন ব্যতিরেক এই কারণ জে পৃথক ২ সময় সিতলা হওনের আহওান এবং ঐ পুজ প্রবেশ হওনের বেওরা তহকীক হয় দোসরা কোন তাহুত করিতে হইবেক না আর জে লোকেরা আপনদিগের বালকদিগকে ডাক্তর খানায় পাঠাইয়া টীকা দেওাইবেন তাহাদিগকে জ্ঞাত করা জাইতেছে জে গোসিতলা হইতে কোন ভয় ও সঙ্কা নাই গোসিতলা হইতে জাহা ব্যামহ হয় সে অতি

অল্প কখন এমত অধিক ব্যামহ হয় না। জে তৎকালিন সেই বালকদিগের কর্তারা আপন নিয়মিত কার্য্য ও কর্ম্ম করণ হইতে বারণ থাকিয়া সেই বালকদিগের খবর গিরিতে বন্দ থাকেন।'[৫০]

সাধারণ মানুষের ভীতি নিরসনের জন্য দেশীয় টীকাদারদের দিয়ে একটি বিবৃতিও দেওয়ানো হয়। বিবৃতি দেওয়ার আগে, গুণাগুণ বোঝানোর জন্য টীকাটির ব্যবহারিক প্রয়োগ তাঁদের দেখানো হয়। ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ মার্চ নেটিভ হাসপাতালে তাঁদের সমক্ষে টীকা দেওয়া হয় জনৈক কানু ধোপার দুই ছেলে পাঁচকড়ি ও রহমতকে। ব্রজ পাল নামে এক টীকাদার প্রথমে তাদের দেশীয় টীকা দেন, তারপর গো-বীজের টীকা দেন ডাক্তার শুলব্রেড। ২২ মার্চ ছেলে দুটিকে পরীক্ষা করে দেখা যায় কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটেনি। অন্যদিকে ব্রজ পাল নিজের ছেলে ঠাকুরদাসকে ১ মার্চ নেটিভ হাসপাতালে গো-বীজের টীকা, এবং ১৬ মার্চ দেশজ টীকা দেন। ১৭ মার্চ টীকাদার রামলক্ষ্মণ চক্রবর্তী জনৈক গোপীনাথের মেয়েকে একই টীকা দেন। এ দুটি ক্ষেত্রেও কোনো অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া না ঘটায় পাঁচশজন টীকাদার একযোগে এই বিবৃতিতে সই করেন: 'অতএব আমরা বিবেচনা করিলাম জে বসন্তের স্থানে ডাক্তর জেনার প্রকাশিত সিতলার টীকা দেওয়া অত্যুচিত এবং সকলের কর্ত্তব্য ডাক্তর জেনার প্রকাশিত সিতলার গুণ আমারদিগের সুন্দররূপ হৃৎ বোধ হইয়াছে এবং কাহার এই টীকা লওনে হানি নাই এই নিশ্চয় জানিয়া সকলের জ্ঞাত কারণ এই লিখিয়া দিতেছী।'[৫১]

ইতিমধ্যে রোগীবৃদ্ধির অনুপাতে চাঁদার হার না বাড়ায় নেটিভ হাসপাতালে অর্থাভাব দেখা দেয়। ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে তহবিলের অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, অধ্যক্ষরা সুযোগ-সুবিধা কমানোর কথা ভাবতে আরম্ভ করেন। সরকারি অনুদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করার প্রস্তাব করেন ডড্‌সওয়েল। তাঁর মত ছিল, সরকারের পক্ষে আহৃত রাজস্ব ব্যয়ের শ্রেষ্ঠ উপায় হল স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়। এই সময়ে সরকারি মাসিক অনুদান বেড়ে দাঁড়ায় এক হাজার টাকা, জন ব্যারেটোর কাছে পাওয়া যায় পাঁচ হাজার টাকা দানের স্বীকৃতি।[৫২] ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে ডাক্তার জন ফ্লেমিও ৯,৮২৫ টাকা এবং ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সিস মেনডিস ২০০০ টাকা উইল করে দিয়ে যান নেটিভ হাসপাতালকে। কিন্তু এই তিনটি দানের ক্ষেত্রেই আইনগত গোলযোগ দেখা দেয়।[৫৩]

রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে গরানহাটা ও কালিঙ্গায় নেটিভ হাসপাতালের দুটি শাখা বহির্বিভাগ খোলা হয়।[৫৪] ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আদায়ীকৃত ১,৫৮,৬৭০ টাকা চাঁদার মধ্যে দেশীয় ব্যক্তিরা দিয়েছিলেন ৭০,৩০০ টাকা। পরবর্তীকালে যেসব দেশীয় ব্যক্তি নেটিভ হাসপাতালে চাঁদা দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন:

ফয়জল কাশেম খাঁ—৬০০
গঙ্গানারায়ণ বাবু—১৯০
গোপীমোহন দেব—৫০০
মাধব দত্ত—৫০
রাজা নরসিংচন্দ্র ও শিবচন্দ্র রায়—২০,০০০
দ্বারকানাথ ঠাকুর—১০০
আশুতোষ দেব—৫০
রাধাকৃষ্ণ মিত্র—৫০

রাজা বৈদ্যনাথ রায়—৩০,০০০ রমানাথ দে—৫০[৫৫]

রূপলাল মল্লিক—১০০

দেশীয় ব্যক্তিদের জন্য নেটিভ হাসপাতাল স্থাপিত হলেও ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দের আগে পর্যন্ত হাসপাতালটির অধ্যক্ষমণ্ডলীতে কোনো দেশীয় ব্যক্তি স্থান পাননি। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে রাজা বৈদ্যনাথ রায় ও রাজা নরসিংচন্দ্র রায় দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সবপ্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।[৫৬]

ফিভার হাসপাতালের পরিকল্পনা

প্রধানত আকস্মিক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের জন্য নেটিভ হাসপাতালটি স্থাপিত হলেও সেখানে অন্যান্য যেসব রোগী ভিড় করতেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন জ্বর ও প্লীহারোগে আক্রান্ত। শুধুমাত্র কলিঙ্গা অঞ্চলেই ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে এ-ধরনের রোগীর সংখ্যা ছিল ১৯,৫২৯ জন। পরের বছর সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়ায় ২০,৯৮২।[৫৭] এভাবে হাসপাতালটির উপর চাপ বাড়তে থাকায় সেখানকার শল্যচিকিৎসক জেমস রেনাল্ড মার্টিন ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ৯ এপ্রিল প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষদের কাছে একটি প্রাসঙ্গিক চিঠি লেখেন।[৫৮] চিঠিটিতে বিবৃত কলকাতা ও শহরতলির জনস্বাস্থ্য-বিষয়ক আলোচনা থেকে জানা যায় যে, তখন দেশীয় চিকিৎসকরা আর্সেনিক ও ধাতু মিশ্রিত অথবা পারদঘটিত ঔষধ দিয়ে প্লীহারোগীদের চিকিৎসা করতেন। ফলে তাঁদের মৃত্যু ত্বরান্বিত হতো।[৫৯] রোগনিরোধের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং একটি 'ফিভার হাসপাতাল' স্থাপনের প্রস্তাব মার্টিন তাঁর চিঠিতে পেশ করেছিলেন।

কলকাতার জনস্বাস্থ্যঘটিত সমস্যার উৎস-সন্ধানেরও চেষ্টা করেছিলেন মার্টিন। হ্যামিল্টনের মত অনুসরণ করে তিনি জানান যে, মদে খাওয়া লবণহ্রদ এ সমস্যার জন্য অনেকাংশে দায়ী। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, নিকাশীব্যবস্থার দুরবস্থার দিকেও তিনি অধ্যক্ষদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। পানীয় জলের সমস্যা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, নদীর জল লবণাক্ত হওয়ায় কলকাতাবাসীরা পুকুরের জলের উপর নির্ভরশীল অথচ উপযুক্ত জলাশয়ের অভাব রয়েছে। ঘন বসতিযুক্ত এলাকায় ধানচাষ, বাঁশঝাড়, কবরখানা এবং কসাইখানার উপস্থিতিকে তিনি অস্বাস্থ্যকর বলে অভিহিত করেন। তৎকালীন কলকাতা শহরের বহির্ভূত অঞ্চল, যেমন—চিৎপুর, শিয়ালদহ, কুমোরপাড়া, ইন্টালি, বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, খিদিরপুরের অবস্থাও মার্টিন বর্ণনা করেছিলেন। কলকাতা শহর সহ এইসব শহরতলি অঞ্চলে তখন প্রাণঘাতী জ্বরের প্রকোপ ছিল ব্যাপক।[৬০]

চিঠিটি পেয়ে নেটিভ হাসপাতালের অধ্যক্ষরা ২০ মে এক বিশেষ সভায় মিলিত হন। সেই সভায় কলকাতার বিশপ, প্রধান বিচারপতি স্যর এডওয়ার্ড রায়ান, স্যর জে. পি. গ্রান্ট, সি. ডাবলিউ. স্মিথ, সি. আর. বারওয়েল, বি. হার্ডিং, আর. স্যানডার্স, টি. সি. রবার্টসন, এস. নিকলসন, ডাক্তার এ. আর. জ্যাকসন, রামকমল সেন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মার্টিন স্বয়ং। সভাটি পরিচালনা করেন লর্ড বিশপ। কলকাতায় জ্বরের প্রকোপের পরিপ্রেক্ষিতে ফিভার হাসপাতাল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সভার

প্রারম্ভিক বক্তৃতায় স্মিথ স্বীকার করেন। একই সঙ্গে তিনি জানান যে, হাসপাতালটি পরিচালনার অর্থ থাকলেও জমি ক্রয় ও গৃহনির্মাণের মতো তহবিল তাঁদের হাতে নেই। ফিভার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য শহরের ধনীসমাজের সাহায্য আশা করে তিনি নেটিভ হাসপাতালের জন্য রাজা বৈদ্যনাথ-শিবচন্দ্র-নরসিংচন্দ্র ভ্রাতৃত্রয়ের এবং লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের বদান্যতার কথা উল্লেখ করেন। পরিকল্পনাটি রূপায়ণের জন্য তিনি জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়ে এই প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করেন :

১. কলকাতার দেশীয় পল্লীর মধ্যে একটি ফিভার হাসপাতাল স্থাপনা একান্ত প্রয়োজন।
২. চিকিৎসাবিজ্ঞানের যথাসাধ্য প্রয়োগই হবে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য।
৩. প্রস্তাবিত হাসপাতালটির জন্য জমি ক্রয় বা গৃহনির্মাণের আর্থিক সামর্থ্য নেটিভ হাসপাতালের নেই।
৪. তাই সমাজের সকল শ্রেণীর কাছে অর্থসাহায্যের আবেদন পেশ করা অত্যন্ত জরুরি।
৫. কলকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলের ইংরেজ ও দেশীয় ব্যক্তিদের অবহিত করার জন্য ইংরেজি ও দেশীয় পাত্রিকায় একটি আবেদনপত্র ছাপানো উচিত।

এই প্রস্তাবগুলি প্রয়োগ করে তার ফলাফল নেটিভ হাসপাতালের অধ্যক্ষমণ্ডলীকে জানানোর জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। তার সদস্য হন : স্যর এডওয়ার্ড রায়ান, কলকাতার লর্ড বিশপ, স্যর জে. পি. গ্রাণ্ট, সি. ডাবলিউ. স্মিথ, রামকমল সেন, রাজচন্দ্র দাস, রাধাকান্ত দেব, এস. নিকলসন, জে. আর. মার্টিন এবং ডাক্তার এ. আর. জ্যাকসন। এদিনের সমস্ত প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৬১]

১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ১ জুন নেটিভ হাসপাতালের অধ্যক্ষদের একটি চিঠির সঙ্গে এই বিশেষ সভার কার্যবিবরণী ও প্রস্তাবগুলি মার্টিনের দেওয়া স্মারকলিপিসহ গভর্নর জেনারেল চার্লস মেটকাফের কাছে প্রেরিত হয়। চিঠিটিতে যাঁরা সই করেছিলেন, তাঁরা হলেন : এডওয়ার্ড রায়ান, বিশপ ড্যানিয়েল, জে. পি. গ্রাণ্ট, টি. বি. মেকলে, টি. সি. রবার্টসন, সি. মর্লি, সি. ডাবলিউ. স্মিথ, আর. স্যানডার্স, সি. আর. বারওরেল, বি. হার্ডিং, এইচ. এম. পার্কার, জে. সুইনি, এস. নিকলসন এবং জে. ইয়াং।[৬২]

এই চিঠির কোনো জবাব না দিয়ে গভর্নর-জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিল কলকাতা ও শহরতলির জেলাশাসকদের কাছে প্রস্তাবসমেত মার্টিনের স্মারকলিপিটি পাঠিয়ে তাঁদের মতামত জানতে চান।[৬৩] অন্যদিকে নেটিভ হাসপাতালের অধ্যক্ষরা যে কমিটি গঠন করেছিলেন, সেই কমিটি জনসাধারণের মতামত গ্রহণের জন্য ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ১৮ জুন একটি সমাবেশের আয়োজন করে। কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন সি. ডাবলিউ. স্মিথ। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দশজন দেশীয় ব্যক্তিকে ফিভার হাসপাতাল কমিটিতে গ্রহণ করা হয়। তাঁরা হলেন : রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রসময় দত্ত, রুস্তমজি কাওয়াসজি, আগা কারবালাই মহম্মদ, মথুরানাথ মল্লিক, রাজা রাজনারায়ণ রায়, মহম্মদ মাহেদি মাস্কে, মতিলাল শীল, বিশ্বনাথ মতিলাল ও দ্বারকানাথ

ঠাকুর। সভাটিতে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথমত, চাঁদাদাতাদের মধ্য থেকে যথেষ্ট সংখ্যক হিন্দু-মুসলমান ব্যক্তিকে হাসপাতালের পরিচালকমণ্ডলীতে রাখার জন্য নেটিভ হাসপাতালের অধ্যক্ষদের অনুরোধ করা হয়। দ্বিতীয়ত, দেশীয় ব্যক্তিদের কাছে আর্থিক আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় উপস্থিত দশজন দেশীয় ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বিপুল পরিমাণ অর্থ দান করেন। কমিটির পক্ষ থেকে কলকাতা ও উত্তর প্রদেশের প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তিদের কাছে প্রেরিত হয় চাঁদা আদায়ের খাতা।[৬৪]

ফিভার হাসপাতাল নিয়ে টাউন হলে দ্বিতীয় অধিবেশন বসে ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ১২ অগাস্ট। সেই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্ভ্রান্ত দেশীয় ব্যক্তিদের কাছে একখানি ছাপানো আবেদনপত্র পাঠানো হয়। আবেদনটির উত্তরে ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত দেশীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে কোম্পানির টাকার হিসাবে ৩২,৯৪৪ টাকা ১২ আনা ৯ পাই পাওয়া যায়। দেশীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে আর টাকা সংগ্রহের সম্ভাবনা না থাকায় সমগ্র অবস্থাটি পর্যালোচনার জন্য ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের ৬ মে টাউন হলে আর একটি সভা আহূত হয়। সেই সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ইউরোপীয়দের কাছে অর্থসাহায্য চেয়ে আবার বেশ কিছু টাকা সংগৃহীত হয়। দু'বারের চাঁদার অঙ্ক মিলিয়ে অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় কোম্পানির টাকায় ৪৭,৭১৩ টাকা ১৩ আনা ৫ পাই।

১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল মার্টিন লর্ড অকল্যাণ্ডের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তাঁর সচিবের মাধ্যমে একটি চিঠি লেখেন।[৬৫] পরবর্তী ২৪মে অকল্যাণ্ড মার্টিনের চিঠির উত্তর দেন। তিনি হাসপাতাল স্থাপনের প্রস্তাবটিকে স্বাগত জানালেও, কিছু বাড়তি ব্যবস্থার প্রস্তাবও করেন: 'The Hospital will do good, but alone it will be quite inadequate to the correction of the evil which you have so forcibly pointed out. I trust that Dispensaries will be attached to it—that Medical aid will be largely given to the poor at their own houses—and that the plan will be made available as a means of extending Medical education ; ...and ultimately perhaps, of improving such habits amongst the people as are most injurious to health.[৬৬] ফিভার হাসপাতালের পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ হলে সরকারের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হবে, এই মর্মে আশ্বাস দিয়ে অকল্যাণ্ড মন্তব্য করেন, যে সমস্ত কাজ জনসাধারণের দানে রূপায়িত হতে পারে, সেসব কাজের জন্যও সরকারের মুখাপেক্ষী হওয়া দুঃখজনক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কিছু দেশীয় সজ্জন অর্থসাহায্য করতে এগিয়ে আসায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। দেশীয় ব্যক্তিদের সাহায্য বৃদ্ধি পেলে তিনি আনন্দিত হবেন এবং সরকারি সাহায্য লাভেও অসুবিধা হবে না বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

অর্থ বিনিয়োগের ব্যাপারে তিনি উদ্যোক্তাদের চাঁদার উপর নির্ভর করতে নির্দেশ দেন। এরকম একটি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারি অর্থব্যয়ে অনীহা জ্ঞাপন করে অকল্যাণ্ড স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, এ বিষয়ে তিনি চাঁদা ও করের অর্থের উপর

নির্ভর করতে ইচ্ছুক। পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়ে তিনি আশ্বাস দেন যে, সেজন্য সরকারি আমলাদের সহায়তার অভাব হবে না। পরিশেষে অকল্যাণ্ড তাঁর চিঠিখানি ফিভার হাসপাতাল কমিটির সদস্যদের দেখানোর নির্দেশ দেন।[৬৭]

১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের ৩ জুন সি. ডাবলিউ. স্মিথের সভাপতিত্বে ফিভার হাসপাতাল কমিটির সদস্যরা অকল্যাণ্ডের চিঠিটি নিয়ে আলোচনায় বসেন। আলোচনায় স্থির হয় :

১. লর্ড অকল্যাণ্ডের চিঠির শেষাংশের উত্তর দেওয়া হবে।

২. ফিভার হাসপাতাল সম্পর্কে ইউরোপীয়দের মতামত না জানা পর্যন্ত চাঁদার খাতা বিলি করা হবে না। তহবিলের অবস্থা, হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা ও সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সরকারের গোচরে আনার জন্য সে বিষয়গুলি গভর্নর জেনারেলকে জানানো হবে।

৩. ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ১৮ জুন ফিভার হাসপাতাল কমিটির সদস্যসংখ্যা প্রসারিত হয়েছিল। গভর্নর জেনারেলকে সেই কমিটিতে অভিপ্রায়মতো সদস্য নিয়োগের জন্য অনুরোধ করা হবে।

৪. প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি প্রশ্নমালা পাঠানো হবে কলকাতা ও শহরতলির আগ্রহী, প্রভাবশালী বাসিন্দাদের কাছে। প্রশ্নমালার উত্তরে সংগৃহীত তথ্য সরকারি আমলাদের কাজে লাগতে পারে।

৫. ডাক্তার জ্যাকসনকে নির্দেশ দেওয়া হবে, মাসিক একশো টাকার মধ্যে প্রতিষ্ঠানের খরচ নির্বাহের জন্য। প্রয়োজনে অতিরিক্ত পিওন, খাতাপত্র ও লেখার সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে।

৬. মুদ্রণের ব্যাপারে স্টক্যুয়েলারের প্রতিশ্রুতি স্বীকৃত ও গৃহীত হয়।

৭. পরবর্তী সভা আয়োজিত হবে গভর্নর জেনারেলের উত্তর পাওয়ার পর।

ফিভার হাসপাতাল কমিটির চেয়ারম্যান সি. ডাবলিউ. স্মিথ ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের ১০ জুন একটি চিঠির মাধ্যমে সভার সিদ্ধান্তগুলি জানিয়ে অকল্যাণ্ডের পরামর্শ প্রার্থনা করেন। ২১ জুন তারিখে অকল্যাণ্ড তাঁর জবাবি চিঠিতে কমিটিকে উৎসাহিত করেন এবং আর. এইচ. ককারেল ও এ. রজার্সের সাহায্য গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন।[৬৮] অকল্যাণ্ডের উত্তর পেয়ে ১৩ জুলাই ফিভার হাসপাতাল কমিটির এক বৈঠকে তিনটি উপ-সমিতি গঠিত হয়। প্রথম উপ-সমিতিকে গৃহ-কর ও আবকারি কর আরোপ, আদায় ও সদ্ব্যবহারের বিষয়টি পর্যালোচনা করতে বলা হয়। দ্বিতীয় উপ-সমিতির উপর শহরের আবর্জনাদি নিষ্কাশন ব্যবস্থার বিশ্লেষণ এবং তৃতীয়টির উপর ফিভার হাসপাতাল সংক্রান্ত সমস্ত কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। প্রতি বুধ ও শনিবার উপ-সমিতিগুলির এবং সোম-বার মূল কমিটির আলোচনার দিন ধার্য হয়।[৬৯]

১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চাঁদা আদায়ের পরিমাণ জানিয়ে স্মিথ ৭ অক্টোবর অকল্যাণ্ডের কাছে আর একটি চিঠি লেখেন। তখন পর্যন্ত দেশীয়দের কাছ থেকে ৩৪,২১১ টাকা

এবং ইউরোপীয় প্রভৃতি খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে ৮,৩৬১ টাকা এককালীন চাঁদা হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া বাৎসরিক চাঁদা হিসাবে দেশীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে ১৭ টাকা এবং ইউরোপীয় প্রভৃতি খ্রীস্টানদের কাছ থেকে ২৫৫০ টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। নিকলসন, মার্টিন ও জ্যাকসনের অভিমত অনুযায়ী স্মিথ লেখেন যে, হাসপাতাল পরিচালনার জন্য মাসিক এক হাজার টাকা প্রয়োজন। ফিভার হাসপাতালের চাক্ষুষ রূপায়ণ না দেখে নেটিভরা চাঁদা দিতে অনিচ্ছুক বলে স্মিথ মন্তব্য করেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি মাধব দত্তের কথা উল্লেখ করেন। মাধব দত্ত এক হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন এক বছরের মধ্যে হাসপাতাল চালু করার শর্তে। এই মানসিকতা বিশ্লেষণ করে স্মিথ সিদ্ধান্ত টানেন যে, হাসপাতাল চালু হলে অনেকেই অর্থসাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। তাই সরকারি সাহায্যের প্রয়োজনীয়তাও ক্রমশ কমে আসবে। তবে কাজ শুরু করার জন্য যে মাসিক চারশো টাকা সরকারি অনুদান একান্ত দরকার, সে-কথা স্মিথ উল্লেখ করতে ভোলেননি।

প্রস্তাবিত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য স্থান-নির্বাচনের প্রসঙ্গটিও স্মিথ আলোচনা করেছিলেন। দেশীয় ব্যক্তিদের সংস্কার অনুসারে তিনি চেয়েছিলেন নদীর অদূরবর্তী কোনো আলো-বাতাসযুক্ত জায়গা। আমদানি-রপ্তানির জন্য ব্যবহৃত গুদামঘর দুটি তিনি বিনয়ের সঙ্গে প্রার্থনা করেন। যদি সরকার জমি দান করেন, সে-কথা ভেবে অস্থায়ী বাড়িতে হাসপাতাল চালানোর সম্ভাবনার দিকও খোলা রেখেছিলেন স্মিথ। তবে জমি কিনতে ও বাড়িভাড়া করতে হলে যে সরকারি অনুদান একান্ত প্রয়োজন হবে, তা তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন স্পষ্ট ভাষায়। ভাড়া করতে হলে, ধর্মতলায় অবস্থিত ড্রামণ্ডের স্কুলবাড়িটিই আকৃতি ও গঠনপ্রণালীর দিক থেকে সবচেয়ে উপযোগী বলে স্মিথ মত প্রকাশ করেন। তিনি আরও জানান যে, হস্তান্তরে অনিচ্ছুক হলেও মালিক তিনশো টাকায় মাসিক বাড়িটি ভাড়া দিতে রাজি।[৭০]

১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের ২২ নভেম্বর গভর্নর-জেনারেলের সচিব আর. ডি. ম্যাঙ্গেলস স্মিথের চিঠির উত্তরে লেখেন, এত অল্প চাঁদায় হাসপাতাল চালানো অসম্ভব। তার বদলে চিকিৎসাকেন্দ্রের (Dispensary) সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়ে জ্বরের মোকাবিলার কথা ভাবা উচিত। আলাদাভাবে ফিভার হাসপাতাল করতে গেলে কম করে ষোল হাজার টাকা দরকার। বরং নেটিভ হাসপাতালের ছত্রছায়াতেই টাকাটি বিনিয়োগ করলে তিনটি নতুন চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা যেতে পারে। কুষ্ঠ সেবানিবাস ও সাধারণ হাসপাতালের সঙ্গে এই প্রচেষ্টাকে সংযুক্ত করলে কলকাতার অধিবাসীদের চিকিৎসা, টীকা ইত্যাদির ফলপ্রদ ব্যবস্থা সম্ভব হবে।

গরানহাটা ও কলিঙ্গার চিকিৎসাকেন্দ্র দুটিতে ইউরোপীয় চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা করানোর জন্য তখন বছরে আট হাজার টাকা লাগত। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে দেশীয় চিকিৎসক নিযুক্ত হলে যে বার্ষিক খরচ পাঁচ হাজার টাকায় কমিয়ে আনা যাবে, সে-বিষয়ে চিঠিতে আশা প্রকাশ করা হয়।

বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করা হলেও গভর্নর জেনারেলের তরফে কোনো চূড়ান্ত

সিদ্ধান্ত ঘোষিত হল না ফিভার হাসপাতালের প্রসঙ্গে। শুধু দুটি কথা জানতে চাওয়া হল—প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটির ব্যয়নির্বাহের উপযুক্ত পন্থা এবং দেশীয় ধনীদের কাছে আরও আর্থিক সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনার কথা।

নীতিগতভাবে তৎকালীন সরকার কলকাতায় চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য দিতে উৎসাহী ছিল। সেই সাহায্যের অর্থ আসার কথা আদায়ীকৃত রাজস্ব থেকে। তাই হাসপাতালের প্রসঙ্গে কর-ব্যবস্থার বিষয়টিও ভালভাবে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন গভর্নর জেনারেল। তিনি একটি নতুন স্থানীয় কর আরোপ করে তার অংশবিশেষ দিয়ে হাসপাতাল চালানোর পক্ষপাতী ছিলেন। স্থানীয় কর, সরকারি চিকিৎসক ও আমলাদের সহায়তা এবং সরকারি ঔষধাগারের ঔষধপত্র দিয়ে হাসপাতালের কাজ নির্বাহ করার পরামর্শ দেন তিনি। এ-বিষয়ে তিনি আয়ারল্যাণ্ডের পদ্ধতি অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। তখন আয়ারল্যাণ্ডে চাঁদা ও সরকারি অনুদানের সাহায্যে পাঁচশো ষাটটি চিকিৎসাকেন্দ্র পরিচালিত হতো।[৭১]

১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের ২৯ মার্চ সরকারের সচিব এইচ. টি. প্রিন্সেপ গভর্নর জেনারেলের নির্দেশে দুটি চিঠি ফিভার হাসপাতাল কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেন। চিঠি দুটির লেখক ছিলেন যথাক্রমে মেডিকাল কলেজের ও শিক্ষাপরিষদের সচিব। মেডিকাল কলেজের তখন শৈশব অবস্থা, সচিবের আসনে তখন ডেভিড হেয়ার, তিনিই কলেজটির প্রথম সচিব। যদিও এর দু'বছর আগে মেডিকাল কলেজ স্থাপিত হয়েছিল, তখন পর্যন্ত কিন্তু কলেজটির সংলগ্ন কোনো হাসপাতাল ছিল না। তাই ছাত্রদের ব্যবহারিক শিক্ষার খুব অসুবিধা হচ্ছিল। এই অসুবিধার অবসান ঘটানোর জন্য ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের ৯ মার্চ হেয়ার একটি চিঠি লিখেছিলেন শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা জে. সি. সি. সাদারল্যাণ্ডকে। শিক্ষাবিভাগ হেয়ারের দাবির যথার্থতা অনুমান করতে পেরে ১৫ মার্চ গভর্নর জেনারেলকে লেখে যে, প্রস্তাবিত ফিভার হাসপাতালটি মেডিকাল কলেজ সংলগ্ন জমিতে নির্মিত হলে রোগী এবং ছাত্র—উভয় পক্ষই উপকৃত হবেন।[৭২] মেডিকাল কলেজের জন্য হাসপাতালের দাবি সরকার গুরুত্বের সঙ্গেই বিবেচনা করেছিল। তাই ফিভার হাসপাতাল নির্মিত হওয়ার আগেই কলেজটির সঙ্গে একটি এক ওয়ার্ডের হাসপাতাল সংযোজিত হয় (এপ্রিল, ১৮৩৮)।[৭৩] তার আগেই অবশ্য আর একটি চিঠিতে হেয়ার দাবিটি দ্বিতীয়বার উত্থাপন করেছিলেন (২৫ মে, ১৮৩৭)।[৭৪]

ফিভার হাসপাতাল কমিটির অধীনে তিনটি উপ-সমিতি সৃষ্ট হওয়ার ফলে কাজের পরিধি যে অনেকটাই বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল, তা আমরা আগেই জেনেছি। জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি নিয়ে নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে কিছু দূর-সম্পর্কিত প্রসঙ্গও কমিটির আলোচনার বৃত্তভুক্ত হয়, যেমন—কলকাতার অগ্নিকাণ্ড। সরকারের সচিব ম্যাঙ্গেলস বিষয়টি নিয়ে একটি চিঠি লেখেন ফিভার হাসপাতাল কমিটির কাছে, তার সঙ্গে যুক্ত ছিল কলকাতার তৎকালীন প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাকফারলেনের একটি চিঠির অনুলিপি। সেই চিঠি থেকে জানা যায়, ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় ১৯৪৯টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল। ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের প্রথম তিন মাসেই ভস্মীভূত হয়েছিল শহরের ৫০৬টি খড়ের ঘর।[৭৫] এই

চিঠির উত্তরে কমিটি তার প্রথম উপ-সমিতির রিপোর্ট পাঠায় সরকারের কাছে। তাতে কলকাতার চৌহদ্দির মধ্যে খড় ও দরমার ঘর নির্মাণ নিষিদ্ধ করার, বিদ্যমান খড়-দরমার ছাদগুলি বদলে টালির চালের ব্যবস্থা করার, আলো-বাতাসযুক্ত বাড়ি নির্মাণের দিকে দৃষ্টিপ্রদানের এবং শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে পুকুর খননের সুপারিশ করা হয়।[৭৬]

অন্য দুটি উপ-সমিতি যখন নানাবিধ ভাবনায় ব্যস্ত, তখন তৃতীয় উপ-সমিতির একমাত্র চিন্তা প্রস্তাবিত হাসপাতালের রূপরেখা প্রণয়ন। এই উপ-সমিতি মূল কমিটির কাছে যে প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছিল, তাতে কলকাতা ও শহরতলির নিম্নবর্গের জন্য অন্যূন আড়াইশো শয্যাবিশিষ্ট এবং ইউরোপীয় চিকিৎসকের কর্তৃত্বাধীন এক বা একাধিক হাসপাতাল স্থাপনের প্রস্তাব ছিল। তার সঙ্গে ছিল হাসপাতালের প্রসূতি-বিভাগের জন্য বিশেষজ্ঞ ইউরোপীয় চিকিৎসক ও দেশীয় দাইয়ের ব্যবস্থা রাখার কথা। এরকম হাসপাতাল হলে যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রদের ব্যবহারিক শিক্ষারও সুবিধা হবে, সে-কথাও উপ-সমিতি জানিয়েছিল। কেন্দ্রীয় হাসপাতাল স্থাপনার পাশাপাশি ছিল পাড়ায়-পাড়ায় চিকিৎসা ও ঔষধ-বিতরণের জন্য বেশ কিছু চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনের সুপারিশ।

প্রতিবেদনটি পড়ে কিন্তু কমিটির সদস্যদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা দিল। জে. পি. গ্রান্ট, সি. ডাবলিউ. স্মিথ, জে. ইয়াং, এস. নিকলসন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রুস্তমজি কাওয়াসজি, জে আর. মার্টিন, আর. স্কট থমসন সহ বেশিরভাগ সদস্যই চাইলেন যে, ঘনবসতি এলাকাগুলিতে কিছু চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করা হোক, তার সঙ্গে মেডিকাল কলেজ থেকে দূরে কোথাও প্রতিষ্ঠিত হোক একটি বহু ওয়ার্ডবিশিষ্ট হাসপাতাল। কিন্তু এডওয়ার্ড রায়ান, রসময় দত্ত প্রমুখ স্বল্পসংখ্যক সদস্য শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে মোট বারোটি চিকিৎসাকেন্দ্র ও মেডিকাল কলেজের সংলগ্ন জমিতে কেন্দ্রীয় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার দাবি জানালেন। জে. পি. গ্রান্ট, সি. ডাবলিউ. স্মিথ, জে. ইয়াং, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, আর. স্কট থমসন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রুস্তমজি কাওয়াসজি ও রসময় দত্ত তখন সব দিক বিচার-বিবেচনা করে এই প্রস্তাবগুলি সরকারের কাছে পাঠালেন :

১. মেডিকাল কলেজ সংলগ্ন জমিতে ফিভার হাসপাতালটি স্থাপিত হলে একদিকে বিনামূল্যে জমি পাওয়া যাবে, অন্যদিকে রোগীরা পাবেন সুনিপুণ চিকিৎসকদের সাহায্য। ফলে বেশ কিছু অর্থসাশ্রয় হবে। কিন্তু কলেজ সংলগ্ন হাসপাতালে যেতে কিছু লোক অনিচ্ছুক। গঙ্গার কাছে হাসপাতালটি নির্মিত হলে তাঁদের কোনো আপত্তি থাকবে না।

২. শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনার জন্য চিকিৎসক, সহযোগী কর্মী ও আনুষঙ্গিক অনেক কিছুরই প্রয়োজন হবে।

৩. বারোটি চিকিৎসাকেন্দ্রের জন্য মাসে ৪৬,৪৪০ টাকার প্রয়োজন।

৪. মেডিকাল কলেজের কোনো শিক্ষকের পক্ষে একা বারোটি চিকিৎসাকেন্দ্র পরিদর্শন করা অসম্ভব। তাছাড়া কোনো অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চিকিৎসকই পেশা ছেড়ে পারদর্শকের কাজ করতে রাজি হবেন না।

৫. চিকিৎসাশিক্ষার স্বার্থে মেডিকাল কলেজ সংলগ্ন একটি হাসপাতাল প্রয়োজন। পল্লীতে-পল্লীতে ছড়িয়ে থাকা চিকিৎসাকেন্দ্রগুলি এই উদ্দেশ্যসাধনের পরিপন্থী।[৭৭]

১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি নেটিভ হাসপাতালের অধ্যক্ষরা ফিভার হাসপাতাল কমিটির সভাপতিকে একটি চিঠি দেন। তাঁদের অনুরোধ ছিল, ফিভার হাসপাতালের জন্য সংগৃহীত অর্থে নেটিভ হাসপাতাল সংলগ্ন একটি নতুন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা। পুরো বিষয়টি সরকারের গোচরে আনার জন্য সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করে কমিটি একটি চিঠি লেখে ডেপুটি গভর্নরের কাছে, ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের ৫ এপ্রিল তারিখে। পরবর্তী ১৪ মে'র জবাবি চিঠিতে চাঁদাদাতাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কমিটিকে অর্থ বিনিয়োগের নির্দেশ দেন ডেপুটি গভর্নর।

এদিকে ২৫ অক্টোবর, শিক্ষাপরিষদের সচিব ডাক্তার ফ্রেডারিক জন মোয়াট জ্বর, আমাশয় প্রভৃতি রোগের চিকিৎসার জন্য মেডিকাল কলেজ সংলগ্ন একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে সেখানেই ফিভার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য পত্রযোগে কমিটিকে অনুরোধ জানান। এই চিঠির সূত্রেই ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দের ২৬ এপ্রিল মোয়াট ফিভার হাসপাতাল কমিটির সভাপতির সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। তখন কমিটির সভাপতি হাসপাতালের রোগীদের ঔষধপথ্যের ও অন্যান্য বিষয়ের দায়িত্ব মেডিকাল কলেজ কর্তৃপক্ষ নেবেন কিনা সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলেন। পরবর্তী ৮ মে'র একটি চিঠিতে মোয়াট কমিটিকে জানিয়ে দেন যে, এসব দায়িত্ব নিতে কলেজ-কর্তৃপক্ষ রাজি, কিন্তু বিষয়টি সরকারের অনুমতিসাপেক্ষ। ১১ অগাস্ট আর একটি চিঠিতে মোয়াট সরকারের সম্মতির কথা জ্ঞাপন করেন। ইতিমধ্যে ৫ অগাস্ট মোয়াট অন্য একটি চিঠিও লিখেছিলেন। সেই চিঠি থেকে ফিভার হাসপাতালের জন্য মতিলাল শীলের মেডিকাল কলেজ সংলগ্ন জমি দান করার কথা জানা যায়। মতিলালের এই দানের শর্ত ছিল, ফিভার হাসপাতালের জন্য সংগৃহীত অর্থ মেডিকাল কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে হবে। ৬ অগাস্ট ফিভার হাসপাতাল কমিটির সদস্যরা মোয়াটের প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করে তাঁদের সম্মতিসূচক সিদ্ধান্ত তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। এর সঙ্গে চিঠিতে তারা মোয়াটকে জানান যে, হাসপাতালের নকশাটি শিক্ষাপরিষদের অনুমোদন লাভ করলে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ কমিটি তাঁদের হাতে অর্পণ করবেন।

১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করেও কমিটি শিক্ষাপরিষদের কাছ থেকে কোনো উত্তর পেল না। দীর্ঘকাল কেটে যাওয়ায় ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৬ মার্চ কমিটির সভাপতি মোয়াটকে চিঠি লিখে জানান যে, এভাবে চললে কমিটিকে সংগৃহীত অর্থ ব্যবহার করার জন্য নতুন চিন্তাভাবনা করতে হবে। এ চিঠির জবাবে ৩০ মার্চ মোয়াট লিখলেন যে, মেজর গুডউইন অঙ্কিত ফিভার হাসপাতালের নকশাটি সরকারের বিবেচনার জন্য পড়ে থাকায় তাঁর পক্ষে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি আরও জানান যে, শিক্ষাপরিষদ ফিভার হাসপাতালের জন্য প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেছে। চিঠির সঙ্গে মোয়াট অনুমোদিত নকশাটিও পাঠিয়ে দেন। ১ এপ্রিল সভাপতি মোয়াটের

চিঠি ও নকশার অনুলিপিসহ নিজের বক্তব্য কমিটির সদস্যদের জ্ঞাপন করেন। পরবর্তী ১৪ এপ্রিল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সম্পাদককে কমিটির গচ্ছিত অর্থ শিক্ষাপরিষদের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সে-কথা পত্রযোগে জানানো হয় মোয়াটকেও। ২৪ এপ্রিলের উত্তরে মোয়াট তাঁর সানন্দ স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তহবিলটির সদ্ব্যবহারের আশ্বাস দেন।

নিজেদের রিপোর্টকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলার জন্য ফিভার হাসপাতাল কমিটি মোয়াটের কাছে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করে। ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৩ মে মোয়াট সেই সূত্রে জানান যে, ফিভার হাসপাতালের জন্য সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ১,০১,৬১০ টাকা, কিন্তু গুডউইনের অনুমিত ব্যয় ১,৩০,০০০ টাকা।

এই সময়ে স্থপতি গুডউইন হঠাৎ মেডিকাল কলেজের পরিবর্তে জেনারেল হাসপাতাল (বর্তমান এস. এস. কে. এম.) সংলগ্ন জমিতে ফিভার হাসপাতাল স্থাপনার সুপারিশ করেন। মোয়াট পত্রযোগে ব্যাপারটি কমিটির সভাপতিকে জানান (১৯ ও ২২ জুন, ১৮৪৭)। কালবিলম্ব না করে সভাপতি নিজস্ব মতামতসহ মোয়াটের চিঠি দুটি সদস্যদের গোচরে আনেন। সদস্যরা একযোগে সভাপতিকে সমর্থন করে গুডউইনের মত বাতিল করেন। সে-কথা মোয়াটকে যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হয়। ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের ৭ অগাস্ট মোয়াট তার উত্তরে লেখেন, জেনারেল হাসপাতালের সংলগ্ন জমি যদি উঁচু করে নিকাশী ব্যবস্থাদির উন্নতি করা হয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিকে যদি করে তোলা যায় পঙ্কমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর, তাহলে সেখানেও ফিভার হাসপাতাল নির্মাণ করা চলে। কিন্তু শহর কলকাতা এবং বন্দর থেকে দূরবর্তী স্থানটির চেয়ে পূর্ব-নির্ধারিত অবস্থানটিই শ্রেয়। কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের সঙ্গে সম-মত প্রকাশ করে মোয়াট অটল রইলেন তাঁর পুরনো সিদ্ধান্তেই।[৭৮]

দীর্ঘদিনের জল্পনা ও জটিলতার অবসান হল। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর মেডিকাল কলেজ বিল্ডিংয়ের পূর্বদিকে, কলেজ স্ট্রিটের পশ্চিমধারে, ফিভার হাসপাতালের ভিত্তিস্থাপন করলেন লর্ড ডালহাউসি। তারপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠল প্রশস্ত সোপান, কোরিন্থিয়ান থাম ও পেডিমেণ্ট শোভিত বাড়ি। হাসপাতালের পোশাকী নামে 'ফিভার' স্থান পেল না, পেডিমেণ্টের নীচে লেখা রইল 'মেডিকাল কলেজ হসপিটাল'। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর রোগী ভর্তি শুরু হল বটে, কিন্তু কাজে পূর্ণ গতি এল পরবর্তী মার্চ মাস থেকে।[৭৯] হাসপাতালটি সম্পূর্ণ করতে প্রায় আড়াই লাখ টাকা খরচ হয়েছিল, তার মধ্যে শুধু রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ-ই দিয়েছিলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। বাকি টাকা ফিভার হাসপাতাল কমিটি, লটারি কমিটি এবং শিক্ষাপরিষদ সংগ্রহ করেছিল।[৮০]

উদ্বোধনলগ্নে মুগ্ধ বিস্ময়ে হাসপাতালটিকে সবাই স্বাগত জানিয়েছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়েছিল :

'পটল ডাঙ্গায় ফিবর হস্‌পিটাল নামক যে এক রম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে বোধকরি সকলেরই নয়ন সম্পূর্ণ সন্তোষে পরিপূর্ণ হইয়াছে, ঐ বাটীর নিমিত্ত যে মুদ্রা

সংগৃহীত হইয়াছিল তৎসমুদয় ব্যয় হইয়া গিয়াছে, এ কারণ আর আর কর্ম্মের জন্য অতিরেক অর্থের আবশ্যক হইতেছে এবং কার্য্যারম্ভকল্পেও বিলম্ব হইতেছে। উত্তরভাগে বাবু মতিলাল শীলের কালেজ ও দক্ষিণভাগে হীরাকাটার গলি অবধি ইহার পরিসর বৃদ্ধি হইবার প্রস্তাব হইতেছে, কিন্তু টাকা ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না, এই সূত্রে এ পর্য্যন্ত যে ব্যয় হইয়াছে তাহার সংখ্যা ২॥০ আড়াই লক্ষ টাকার উপর হইবেক। ইহার পর সমুদয় কল্পনা সম্পন্ন করিতে যে আরো কত ব্যয় হইবে তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন। অধুনা এতন্নগরে এতদ্রূপ মনোহর অট্টালিকা আর দৃষ্ট হয় না, যে ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে ঐ গৃহে বাস করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেক বোধ করি সে ব্যক্তির জন্ম সফল হইয়া কৈবল্যলাভ হইবেক। উক্ত বাটীর তেতালার ছাদের উপর চারিদিগে চারিটা পুষ্করিণী হইয়াছে, তাহা জল পরিপূর্ণ করণার্থ নূতন জল প্রণালী প্রস্তুত হইতেছে, গোলদীঘীর জল সেই প্রণালীতে পড়িয়া কলের দ্বারা উপরে উঠিয়া ছাদের পুষ্করিণীকে পরিপূর্ণ করিবেক। এই সময়ে আমরা অনুরোধ করি, সকলে একবার উক্ত অট্টালিকা এবং তৎসংক্রান্ত কার্য্য সমুদয় দেখিয়া আসুন।[৮১]

সারণি—১

নেটিভ হাসপাতালের রোগীবিন্যাস : প্রথম তিন বছর[৮২]

অসুস্থতার কারণ	রোগীসংখ্যা		
	১৭৯৪-১৭৯৫	১৭৯৫-১৭৯৬	১৭৯৬-১৭৯৭
দুর্ঘটনায় আহত	৬৭	১০১	১৮২
যৌন রোগ	১৮	২৬	২০
প্লীহা রোগ	২	১৮ (যকৃৎ রোগসহ)	৯ (যকৃৎ রোগসহ)
বাত	৭	১৯	৭
উদরাময়	৩	২৪	১০
শোথ	"	৪	৪

সারণি—২

নেটিভ হাসপাতালে চিকিৎসার ফলাফল : প্রথম ছয় বছর[৮৩]

	১৭৯৪-৯৫	১৭৯৫-৯৬	১৭৯৬-৯৭	১৭৯৭-৯৮	১৭৯৮-৯৯	১৭৯৯-১৮০০
মোট রোগী	১১৫	৪২০	৪৯৫	৬১৬	৬৭৩	৮২১
প্রাথমিক চিকিৎসার পর প্রত্যাবৃত	৮০	২২১	২৬৭	৪১৮	৪৭১	৬২৪
মৃত	২২	৩১	৩৯	৩৬	৫২	

সারণি—৩

নেটিভ হাসপাতালের রোগীসংখ্যা[৮১]

	১৮০৭-১৮০৮	১৮০৮-১৮০৯	১৮০৯-১৮১০	১৮১০-১৮১১	১৮১১-১৮১২	১৮১২-১৮১৩	১৮১৩-১৮১৪	১৮১৪-১৮১৫
আবাসিক	২৩৭	২৫২	২৪৩	২২৬	২৫৬	২৫৫	২৮৪	২৫১
বহির্বিভাগীয়	৩,৮৮২	৬,২০০	৮,১০৬	৬,৫৬৩	১০,৮৯৬	১২,০৯৪	১৩,৭০৫	১২,৯২৪
টিকা গ্রহণকারী	৬৭৫	৬২৬	৫৭৭	৫৮৭	৬১২	৫৩৩	৫৭৪	৫৭৮
মোট	৪,৭৯৪	৭,০৭৮	৮,৯২৬	৭,৩৭৬	১১,৭৬৪	১২,৮৮২	১৪,৫৬৩	১৩,৭৫৩

সারণি—৪

নেটিভ হাসপাতালের রোগীসংখ্যা ও চিকিৎসার ফলাফল[৮৫]

বছর	মোট রোগী		সুস্থ অবস্থায় প্রত্যাবৃত		চিকিৎসাধীন		মৃত	
	আবাসিক	বহিবিভাগীয়	আবাসিক	বহিবিভাগীয়	আবাসিক	বহিবিভাগীয়	আবাসিক	বহিবিভাগীয়
১৮৩২-১৮৩৩	৪৮২	২৭,২৯৯	৪০৫	২৭,০৩৪	৩৯	২৬৫	৩৮	—
১৮৩৩-১৮৩৪	৯০১	৮১,৩৮২	৮০৪	৮১,১৪০	৪০	২৪২	৫৭	—
১৮৩৪-১৮৩৫	১,০২৩	৭২,৩৮০	৯৩১	৭২,১৭৫	৪৩	২০৫	৪৯	—
১৮৩৫-১৮৩৬	১,০১৪	৭৫,২৮১	৯৩১	৭৫,০৬৮	৩৬	২১৩	৪৭	—
১৮৩৬-১৮৩৭	৯৫৬	৭৫,৬৮০	৮৭৯	৭৫,৪৫৭	৫২	২২৩	৪৫	—

উল্লেখপঞ্জী

১. 'Report of the committee of the Fever Hospital & Municipal Inquiry. Proceedings of the Governors of Native Hospital relative to the establishment of a Fever Hospital for the relief of natives together with Notes relating to the state of Calcutta and its suburbs' (Appendix A), p. 5.

২ Charles Lushington, 'The History, Design, and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions Etc.' (1824), pp. 291-293. [পরবর্তী টীকাগুলিতে 'Lushington' নামে উল্লিখিত]

৩. 'Report of the Committee appointed by the Right Honourable the Government of Bengal for the establishment of a Fever Hospital and for the inquiring into local management and taxation in Calcutta' (Calcutta, 1839), p. 201.

৪. Ibid., p. 195

৫. 'Calcutta Gazette', 30.8.1792.

৬. Ibid., 20.9.1792 and 27.9.1792.
৭. Ibid., 11.10.1792.
৮. Lushington, pp. 294-295.
৯. 'Calcutta Gazette', 1.11.1792.
১০. Ibid., 15.11.1792.
১১. Ibid., 6.12.1792.
১২. Ibid., 13.12.1792.
১৩. Ibid., 3.1.1793.
১৪. Ibid., 7.3.1793.
১৫. Ibid., 10.10.1793.
১৬. Ibid., 27.11.1794.
১৭. Ibid., 8.11.1792 (Additional Supplement).
১৮. Ibid., 29.11.1792.
১৯. Ibid., 22.8.1793.
২০. Ibid., 15.11.1792
২১. Ibid., 22.11.1792.
২২. Ibid., 6.12.1792.
২৩. Ibid., 20.12.1792.
২৪. Ibid., 2.5.1793.
২৫. Ibid., 17.1.1793.
২৬. Ibid., 17.1.1793.
২৭. Ibid., 24.1.1793.
২৮. Ibid., 31.1.1793.
২৯. Ibid., 21.2.1793.
৩০. Ibid., 21.2.1793.
৩১. Ibid., 13.6.1793.
৩২. Ibid., 11.7.1793.
৩৩. Ibid, 4.7.1793.
৩৪. Ibid., 25.7.1793.
৩৫. Ibid., 22.8.1793.
৩৬. Ibid., 19.9.1793 (Supplement).
৩৭. Ibid., 10.10.1793
৩৮. Ibid., 7.8.1794.
৩৯. Ibid., 14.8.1794.
৪০. Lushington, p. 295.

৪১. 'Calcutta Gazette', 25.12.1794.

৪২. Lushington, pp. 295-296.

৪৩. 'Calcutta Gazette', 10.9.1795.

৪৪. Ibid., 23.6.1796.

৪৫. Ibid., 1.9.1796.

৪৬. 'Report of the Committee of the Fever Hospital and Municipal Inquiry', Appendix B (containing the correspondence of the committee on the Fever Hospital and municipal improvements with the Government of Bengal ', p. 195.

৪৭. 'Calcutta Gazette', 15.9.1796.

৪৮. Lushington, pp. 296-297.

৪৯. Ibid., pp. 307-308.

৫০. 'Calcutta Gazette', 3.2.1803 (Supplement).

৫১. Ibid., 25.4.1805 (Supplement) ; বিবৃতিটিতে যাঁরা সই করেছিলেন তাঁরা হলেন : জয়দেব চান্দর, কৃষ্ণমোহন দেবশর্মন, রামপ্রসাদ পাল, রামকান্ত সেন, রামলোচন চক্রবর্তী, সীতারাম দেবশর্মন, রামজয় মিশ্র, রামমোহন রায়, গঙ্গাধর চক্রবর্তী, গুরুপ্রসাদ চাঙ্গর, ব্রজগোপাল, শিব পাল, রামমোহন সেন, রাধাচরণ ডাক্তার, শ্রীধর মুখোপাধ্যায়, রামমোহন চক্রবর্তী, ছিষ্টীধর (ষষ্টিধর) চক্রবর্তী, প্রীতরাম দাস, দুর্গারাম পাল, রামনারায়ণ দাস, মদনমোহন চক্রবর্তী, জগমোহন চক্রবর্তী, লোচনদাস বৈরাগী, রামকিশোর ডাক্তার ও আনন্দ দাস

৫২. Lushington, pp. 288-291.

৫৩. 'Report of the Fever Hospital Committee', pp. 197-200.

৫৪. Lushington, pp. 300-301 and 'Report of the Committee appointed by the Rt. Hon'ble the Governor General of Bengal for the establishment of a Fever Hospital in Calcutta', 1839, pp. 196 and 66.

৫৫ 'Report of the committee on the Fever Hospital and Municipal Inquiry', Appendix F, pp. 97-102.

৫৬. '(The) Bengal Directory and General Register for the Year 1828', (2nd Ed.), p. 485.

৫৭. Report of the Committee appointed by the Right Honorable the Governor of Bengal for the establishment of a Fever Hospital and for the inquiry into local management and taxation in Calcutta' (Calcutta, 1839), Appendix A, p. 12.

৫৮. Ibid., Report Volume, p. 1.

৫৯. Ibid., Appendix A, p. 1.
৬০. Ibid., pp. 4-11.
৬১. Ibid., pp. ii-vi.
৬২. Ibid., Appendix B, p. 1.
৬৩. Ibid.,Report Volume, p. 3.
৬৪. Ibid., pp. 3-4.
৬৫. Ibid.
৬৬. Ibid., Appendix B, p. 5.
৬৭. Ibid., pp. 6-7.
৬৮. Ibid., pp. 7-9.
৬৯. Ibid., Report Volume, p. 7.
৭০. Ibid., Appendix B, pp. 10-12.
৭১. Ibid., pp. 13-15.
৭২. Ibid., Report Volume, p. 10.
৭৩. 'Third Report of the Committee appointed by the Right Honourable Governor of Bengal for the Establishment of a Fever Hospital aud for inquiring into local management and taxation in Calcutta' (Calcutta, 1847), p. 2. [পরবর্তী টীকাগুলিতে 'Third Report' নামে উল্লিখিত]
৭৪. দ্র. বিনয়ভূষণ রায়, 'প্রসঙ্গ ডেভিড হেয়ার' (অঙ্কুর, ১৯৮৯), পৃঃ ১৯-২৫।
৭৫. 'Report of the Fever Hospital Committee'. Appendix B, pp. 20-21.
৭৬. Ibid., pp. 26-30.
৭৭. Ibid., Report Volume, pp. 115-120.
৭৮. Third Report, pp. 4-9.
৭৯. 'Centenary of the Medical College, Bengal : 1835-1934' (Souvenir, 1935). pp. 37-38.
৮০. Ibid., Appendix VII, p. 140.
৮১. সম্পাদকীয়, 'সংবাদ প্রভাকর', ২. ২. ১৮৫৩ (২১. ১০. ১২৫৯ ব.)। পুনর্মুদ্রিত রূপের জন্য দ্র. বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', দ্বিতীয় খণ্ড (প্যাপিরাস, ১৯৭৮), পৃঃ ১৪২।
৮২. 'Calcutta Gazette', 24.9.1795 ; 15.9.1796 ; 14.9.1797.
৮৩. Ibid., and 13.9.1798 ; 12.9.1799 ; 18.9.1800.
৮৪. 'The Government Gazette', 16.11.1815.
৮৫. Ibid.

আদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

কলকাতার নিকাশীব্যবস্থার ইতিহাস

তিনটি নথির আলোকে

প্রাক্‌কথন

কলকাতার ইতিহাস-রচনার বহু মূল্যবান উপকরণ সুরক্ষিত আছে 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল'-এর সংগ্রহে। তার মধ্যে তিনটি সূত্র কলকাতার নিকাশীব্যবস্থার ইতিহাস জানার পক্ষে অপরিহার্য। ছাপার অক্ষরে নথিবদ্ধ সেই তিনটি উদাহরণ হল :

১. First Report on the Drainage and Sewerage of Calcutta, 1858.

২. The Drainage of Calcutta, Report by Baldwin Latham, 1891.

৩. Calcutta Drainage Works by G. C. Chatterjee (a brief history), 1921.

পরিপূরক তথ্যসূত্রের সাহায্যে, এই তিনটি নথির সার-সঙ্কলন করে রচিত হল বর্তমান নিবন্ধ।

সূচনা

কলকাতার ভূপৃষ্ঠের স্বাভাবিক ঢাল লবণহ্রদের দিকে। কিন্তু এ শহরের শৈশব থেকেই নিকাশী নালাগুলির গতিপথ নির্দিষ্ট ছিল গঙ্গার দিকে। তাই বর্ষাকালে গঙ্গার জল যখন ফুলে-ফেঁপে উঠত, তখন নিকাশীব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবেই অকেজো হয়ে যেত। ফলে শহরের বহু অঞ্চলে জল জমত, বিপন্ন হয়ে উঠত অধিবাসীদের জনস্বাস্থ্য। কলকাতার নিকাশীব্যবস্থার এই গুরুতর গলদ যাঁর চোখে প্রথম ধরা পড়েছিল, তিনি হলেন ব্রিটিশ ভারতের পঞ্চম গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি। শহরের নিকাশী নর্দমাগুলির বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, '[They] neither answer the purpose of cleansing the Town nor of discharging the annual inundations occasioned by the rise of the River, or by the excessive fall of rain during the South-West Monsoon.' [১]

দোষত্রুটি দেখিয়ে ওয়েলেসলি ক্ষান্ত থাকেননি। অব্যবস্থাটি দূর করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে তার উপর তিনি আরোপ করলেন এইসব কাজের ভার (১৮০৩) :

১. কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা পরিমাপ। নিকাশী নালাগুলির গতিপথের পরিবর্তন-সাধনের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ।
২. বর্ষাকালে গঙ্গার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ এবং নর্দমাগুলির উচ্চতার সঙ্গে তার তুলনা করা।
৩. কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চল থেকে বৃষ্টির জল ও আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্য কি ধরনের নর্দমা সবচেয়ে কার্যকর হবে সে-বিষয়ে মতপ্রকাশ।
৪. কলকাতার নিকাশীব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি জাতীয় সংস্থা সংগঠিত হওয়া দরকার, তা জানানো।[২]

একই সঙ্গে ওয়েলেসলি কোনো ভারী কর আরোপ না করেই অর্থসংগ্রহের আশ্বাস দিলেন কলকাতাবাসীদের।

দুর্ভাগ্যবশত ওয়েলেসলি-নিযুক্ত কমিটির কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি। সম্ভবত ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে সেটি পেশ করা হয়েছিল লটারি কমিটির কাছে। কিন্তু লটারি কমিটির সভ্য এইচ. জে. শেক্সপীয়র পরবর্তীকালে সেটি আর খুঁজে পাননি।

ফিভার হাসপাতাল কমিটির উদ্যোগের আগে পর্যন্ত কলকাতার নিকাশীব্যবস্থা নিয়ে মাত্র দুটি উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছিল। তার মধ্যে প্রথমটি হল ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে বেলেঘাটা খাল খনন এবং অন্যটি হল লেফটেন্যাণ্ট শকের শহর-জরিপ।[৩]

ফিভার হাসপাতাল কমিটির ভূমিকা

কলকাতার পৌর ইতিহাসে ফিভার হাসপাতাল কমিটির ভূমিকা যুগান্তকারী। শহরের বিভিন্ন পৌর-সমস্যার উপর আলোকপাত করে তার সমাধানকল্পে কমিটি নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছিল। নিকাশী-প্রসঙ্গও কমিটির দৃষ্টি এড়ায়নি। পুরসভার পদস্থ কর্মী লেফটেন্যাণ্ট অ্যাবারক্রম্বি কমিটির কাছে তৎকালীন নালা-নর্দমার দুরবস্থার কথা বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, অধিকাংশ নিকাশী নালাই ছিল কাঁচা এবং সেগুলিকে পঙ্কমুক্ত করার জন্য অবিরতভাবে শ্রমিক নিযুক্ত রাখতে হতো। বহু ক্ষেত্রেই নালার তলদেশগুলি নির্গমপথের চেয়ে দু'ফিট নীচু হতো। ফলে সঞ্চিত মল-মূত্র থেকে বেরোত বিকট দুর্গন্ধ। তাই পরিষ্কার করার প্রয়োজন থাকলেও তা এড়ানোর চেষ্টা করা হতো।[৪] শুধু যে কাঁচা নর্দমাগুলির অবস্থাই শোচনীয় ছিল তা নয়। ইটের গাঁথুনিযুক্ত 'কেনেল' (Kennel) নামক নর্দমাগুলিও ছিল তথৈবচ। 'কেনেল'-এর সংখ্যাধিক্য ছিল শহরের উত্তরাঞ্চলে। এই পাকা নর্দমাগুলি পাটাতন বা অন্য আচ্ছাদন দিয়ে ঢাকা থাকত। মোটামুটি দশ ফিট অন্তর একটু ফাঁক থাকত, পরিষ্কার করার কাজ সারা হতো সেখান দিয়েই। সামান্য বৃষ্টি হলেই এই পাকা নর্দমাগুলি উপচে যেত। ফলে ফুটখানেক জল দাঁড়াত রাস্তায়, সে জল নামতে সময় লাগত আট থেকে চব্বিশ ঘণ্টা।[৫]

নিকাশী-সমস্যা নিরসনের জন্য ফিভার হাসপাতাল কমিটি বিশেষজ্ঞদের মতামত আহ্বান করেছিল। ক্যাপ্টেন প্রিন্সেপ, মেজর জেনারেল ফোর্বস প্রভৃতি প্রযুক্তিবিদরা কমিটির কাছে পেশ করেছিলেন নিজেদের প্রাসঙ্গিক পরিকল্পনা। কাশীতে নির্মিত ভূগর্ভস্থ

পয়ঃপ্রণালী যেহেতু নানা সমস্যার জন্ম দিয়েছিল, তাই প্রিন্সেপ কলকাতায় ঐ ধরনের নিকাশীব্যবস্থার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেছিলেন। ফোর্বস জানিয়েছিলেন, কলকাতার অবস্থিতি জলনিকাশের উপযোগী। কারণ শকের সমীক্ষা অনুযায়ী শহরের নিম্নতম স্থানটি লবণহ্রদের উচ্চতম অংশের চেয়ে সাড়ে আট ফিট উঁচু। এই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে গঙ্গার চিৎপুর ব্রিজ সন্নিহিত অংশ থেকে পুরনো পার্ক স্ট্রিট কবরখানা পর্যন্ত একটি জলকপাট (Sluice gate) বিশিষ্ট প্রণালী (aqueduct) নির্মাণের প্রস্তাব রেখেছিলেন ফোর্বস। কলকাতার ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর জলীয় আবর্জনা এই প্রণালীতে ফেলতে চেয়েছিলেন তিনি। একটি প্রশস্ত খালের মাধ্যমে প্রণালীটিকে লবণহ্রদের সঙ্গে সংযুক্ত করার কথাও ফোর্বসের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয় যে ভূগর্ভস্থ বিস্তৃত পয়ঃপ্রণালীই কলকাতার মতো ঘনবসতিযুক্ত এলাকার নিকাশীব্যবস্থার একমাত্র সুষ্ঠু পন্থা।

ফিভার হাসপাতাল কমিটির উদ্যম বা প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত বিশেষ কার্যকর হল না। পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল অর্থাভাব।[৬]

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের রিপোর্ট

শকের সমীক্ষা, ফিভার হাসপাতাল কমিটির প্রতিবেদন, সিম্সের মানচিত্র এবং ফোর্বসের পরিকল্পনার ভিত্তিতে উইলিয়াম ক্লার্ক নামে এক স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ার ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার একটি নিকাশী-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।[৭] তখন পরিকল্পনাটির অনুমিত ব্যয় ছিল সাড়ে ছাব্বিশ লাখ টাকা। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ২০ নভেম্বর পুরসভার কমিশনারদের কাছে পরিকল্পনাটি পেশ করা হয়। এক মাস পরে সেটি পাঠানো হয় সরকারের কাছে। ক্লার্কের পরিকল্পনাটি বিচার-বিবেচনা করার জন্য ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে সরকার একটি 'ড্রেনেজ কমিটি' নিয়োগ করেন। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে কমিটি পরিকল্পনাটি অনুমোদন করে, অবশ্য কিছু রদবদলসাপেক্ষে।[৮] ইতিমধ্যে বহু সময় কেটে যাওয়ায় অনুমিত ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় তেত্রিশ লাখ টাকা। এছাড়া পয়ঃপ্রণালীটিকে সচল রাখার জন্য ভূগর্ভস্থ জল সরবরাহ-ব্যবস্থার খরচ ধরা হয় সাড়ে এগারো লাখ টাকা।[৯]

একসঙ্গে এত অর্থ বিনিয়োগ স্বাভাবিক কারণেই সম্ভব ছিল না। তাই স্থির হল, দশ বছর ধরে ধীরে-ধীরে পরিকল্পনাটি রূপায়িত হবে। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের ২৮ সংখ্যক আইনের ২৫ ধারার বলে সাড়ে সাত শতাংশ গৃহ-কর থেকে আহৃত অর্থের মধ্যে বার্ষিক দেড় লাখ টাকা এজন্য আলাদা করে রাখার নির্দেশ দেওয়া হল পুর-কমিশনারদের।[১০] একই আইনের ২৬ ধারার মাধ্যমে এই নিকাশীব্যবস্থার আওতাভুক্ত সমস্ত জমি-বাড়ির উপর আড়াই শতাংশ নিকাশী-কর ধার্য করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হল।[১১]

সরকার নিযুক্ত কমিটি তার রিপোর্টে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চতা এবং জোয়ার-ভাটার সময়ে গঙ্গা ও লবণহ্রদের জলস্তরের পরিমাপের উপর গুরুত্ব আরোপ করে-ছিল।[১২] সেই নির্দেশ মোতাবেক ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাস থেকে পরের বছরের মার্চ

মাস পর্যন্ত শহরের নানা এলাকার উচ্চতা মাপা হয়। তাছাড়া চিৎপুর, ধাপা, বামুন-ঘাটা, ট্যাংরা, টালির নালা এবং চাঁদপাল ঘাটে জোয়ার-ভাটার সময় জলের উচ্চতার বিভিন্নতাও নথিবদ্ধ করা হয়। পরিকল্পনার দ্রুত রূপায়ণের জন্য অধিগৃহীত হল কোতরং-এর ইটখোলা, ব্যবস্থা হল ইংল্যাণ্ড থেকে ইট তৈরির যন্ত্রপাতি আমদানির।[১৩]

রিপোর্টের শেষাংশে কমিটি প্রথমে পরিকল্পনাটির আংশিক রূপায়ণ চেয়েছিল। তারপর লব্ধ সাফল্য অনুযায়ী বাকি কাজ সম্পূর্ণ করাই ছিল কমিটির অভিপ্রেত।[১৪]

রেণ্ডেলের প্রস্তাব

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে সরকার স্থির করেন যে, ক্লার্ক-কৃত পরিকল্পনাটি সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডের কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ারের অভিমত নেওয়া প্রয়োজন। ওয়েস্টমিন্‌-স্টারের 'রেণ্ডেল ব্রাদার্স' নামক স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের এম. রেণ্ডেল তখন ঘটনাচক্রে ভারতে এসেছিলেন। তাঁর কাছেই পাঠানো হল ক্লার্কের খসড়া। ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তনের পর, ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রেণ্ডেল জবাব দিলেন। দেখা গেল, ক্লার্কের পরিকল্পনার সঙ্গে রেণ্ডেলের প্রস্তাবের কিছু ফারাক রয়েছে। ক্লার্ক চেয়েছিলেন সারকুলার রোডের আবেষ্টনীভুক্ত অঞ্চলের নিকাশী আবর্জনাকে ইণ্টালিতে নিয়ে গিয়ে পাম্প করে লবণহ্রদে ফেলতে।[১৫] কিন্তু রেণ্ডেল চাইলেন বিনা পাম্পে ঐ অঞ্চলের তরল আবর্জনা গঙ্গায় সরাসরি ঢেলে দিতে।[১৬]

রেণ্ডেলের প্রস্তাব পুর-কমিশনারদের মনঃপূত হল না।[১৭] ক্লার্কের পরিকল্পনাটির সরকারি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করলেন তাঁরা। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের ২০ এপ্রিল অনুমোদন পাওয়া গেল, কাজ শুরু হয়ে গেল ঐ বছরেই।[১৮]

করদাতারা প্রথমে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর উপযোগিতা বুঝতে পারেননি। বরং এই বিপুল অর্থব্যয়ের বিরুদ্ধে তাঁদের মধ্যে দানা বেঁধেছিল বিক্ষোভ। শহরের দক্ষিণাঞ্চলে কাজ শুরু হওয়ার পর, যখন উত্তরাঞ্চলে সম্প্রসারণের প্রশ্ন উঠল, তখন শহরবাসীরা তুললেন প্রবল আপত্তি। তাঁরা বললেন, অপরিসর গলিবহুল উত্তর কলকাতার পক্ষে ভূগর্ভস্থ নিকাশীব্যবস্থা অনুপযোগী। দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে পরীক্ষা করানোর পরই কাজ আরম্ভ হবে, এ-কথা জানিয়ে তখন কলকাতাবাসীদের আশ্বস্ত করা হয়েছিল। অনেকে তখন মাটির উপরেই পাকা নর্দমা তৈরির কথা বলেছিলেন, কিন্তু ক্লার্ক রাজি হননি। এ ধরনের নালা প্রশস্ত ও গভীর হওয়া প্রয়োজনীয়। কিন্তু সেরকম বৃহদাকার নালা পথচারী ও যানবাহনের বিপদ ডেকে আনবে—এই ছিল ক্লার্কের আশঙ্কা। তিনি আরও জানিয়ে-ছিলেন যে, ভূগর্ভস্থ প্রণালীর ক্ষেত্রে গড় আয়তন এক ফুটের বেশি হবে না।[১৯]

ক্লার্কের পরিকল্পনা

উইলিয়াম ক্লার্কের মতে পয়ঃপ্রণালীর কাজ হল ভূপৃষ্ঠের অব্যবহিত নীচের জল, বাড়ির তরল আবর্জনা ও বৃষ্টির জল নিষ্কাশন।[২০] ভূপৃষ্ঠের ঠিক নীচেই জমে থাকা জল বাড়িঘর স্যাঁতস্যাঁতে করে তোলে, তাই তার নিষ্কাশন গুরুত্বপূর্ণ।

ক্লার্কের পরিকল্পনায় একই প্রণালী দিয়ে বৃষ্টির জল ও তরল আবর্জনা প্রবাহিত করে অধিকাংশ বৃষ্টির জল সারকুলার ক্যানালে এবং আবর্জনা পাম্প করে বাইরের জলাশয়ে ফেলার ব্যবস্থা ছিল। মূল প্রণালী নির্মাণ শুরু হয় ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে, শেষ হয় ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে। দক্ষিণাঞ্চলের শাখা-প্রশাখা বা বাড়তি কাজ শেষ হতে আরও তিন বছর লেগেছিল। অন্যদিকে উত্তরাঞ্চলের কাজ ১৮৮৫-৮৬ খ্রীস্টাব্দের আগে সম্পূর্ণ করা যায়নি। নিষ্কাশন প্রণালীর কার্যক্ষমতা বজায় রাখার জন্য অধিকতর পরিমাণে জল-প্রবাহের প্রয়োজন ইতিমধ্যে দেখা দেয়। তাই কমিশনাররা ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের আগে থেকেই জলসরবরাহ-কেন্দ্র বাড়াতে শুরু করেন। এই সময়ে শোধিত জলসরবরাহের পরিমাণ দ্বিগুণ করে আট মিলিয়ন গ্যালন করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। একই সঙ্গে অশোধিত জলের সরবরাহ বাড়াবার জন্য মল্লিকঘাটে নির্মিত হয় নতুন পাম্পিং স্টেশন।[২১]

পরবর্তীকালে জি. সি. চ্যাটার্জি[২২] বা জেমস কিম্বারের[২৩] মতো ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা ক্লার্কের পরিকল্পনার প্রশংসাসূচক মূল্যায়ন করেছেন।

১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে সরকার পুরসভাকে বাধ্য করলেন সারকুলার ক্যানালে বৃষ্টির জল ফেলা বন্ধ করতে। তার বদলে ক্যানাল-লাইন বরাবর বৃষ্টির জল অন্যদিকে প্রবাহিত করার জন্য একটি নিরোধক প্রণালী (intercepting sewer) নির্মাণ এবং প্রধান প্রণালীর (main outfall sewer) সঙ্গে সংযোগসাধনের আদেশও একই সঙ্গে জারি হল। ইতিমধ্যে তরল আবর্জনা ও নিষ্কাশিত বৃষ্টির জলের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় এই পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

নিকাশীব্যবস্থার মধ্য পর্যায় ও ল্যাথামের রিপোর্ট

১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার শহরতলিতে নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের কথা ওঠায় পুর-সভার প্রধান ইঞ্জিনিয়ার জেমস কিম্বার একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। ঐ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বলডুইন ল্যাথাম নামে এক প্রখ্যাত স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ারকে তাঁর বোম্বাইয়ের কর্মস্থল থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। নিকাশীব্যবস্থা সম্পর্কে প্রায় এক মাস নিরীক্ষা চালিয়ে তিনি মার্চ মাসের ৩ তারিখে তাঁর রিপোর্ট পেশ করলেন। তাঁর প্রতিবেদনে প্রচলিত পয়ঃপ্রণালীর ত্রুটিবিচ্যুতি,[২৪] গঙ্গা ও লবণহ্রদে জোয়ারের সময়ের বিভিন্নতা,[২৫] বৃষ্টির জল ও আবর্জনার সমবেত নিষ্কাশন[২৬] প্রভৃতি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছিল। নিকাশীব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ল্যাথাম কতকগুলি গঠনমূলক প্রস্তাবও রেখেছিলেন। তার মধ্যে ছিল নিকাশীব্যবস্থার জলপ্রবাহ,[২৭] পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে বাতাস-চলাচল,[২৮] লবণহ্রদের উন্নতিবিধান,[২৯] বারংবার রাস্তা খনন এড়াতে ম্যানহোল স্থাপন বিদ্যাধরীতে আবর্জনা ফেলার যৌক্তিকতা প্রভৃতি প্রসঙ্গ।

১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ৩১ জুলাই ল্যাথামের রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে কিম্বার কলকাতা ও শহরতলির জলসরবরাহ ও নিকাশীব্যবস্থা-বিষয়ক একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। ল্যাথামের প্রস্তাবগুলির সঙ্গে কিম্বারের পরিকল্পনার বিশেষ সাদৃশ্য ছিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ল্যাথাম বা কিম্বারের মতামত বাস্তবায়িত হয়নি।[৩০]

হিউজেসের প্রকল্প

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে বাংলা সরকার এ. জে. হিউজেস নামক ইঞ্জিনিয়ারকে পুরসভাকে সাহায্য করার কাজে নিযুক্ত করেন। হিউজেস যে প্রকল্প রচনা করেন তাতে শহরতলির নিকাশীব্যবস্থার পরিকল্পনা, লবণহ্রদের জোয়ার-ভাটার বিবরণ, বৃষ্টিপাতের পরিসংখ্যান ও প্রাচ্যদেশীয় একটি দরিদ্র নগরীর পক্ষে আদর্শ জনস্বাস্থ্য পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছিল। বলডুইন ল্যাথামের কাছে এই প্রবন্ধটি প্রেরিত হলে তিনি কিছু বিরূপ মত ব্যক্ত করেছিলেন। তাই হিউজেস ও কিম্বার প্রকল্পটিকে নানাভাবে সংশোধন করেন। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে দু'জনে যে যৌথ রিপোর্ট পেশ করেন, তার সঙ্গে কিন্তু ল্যাথামের নির্দেশের মৌলিক পার্থক্য ছিল। পরবর্তীকালে কার্যক্ষেত্রে যদিও পরিকল্পনাটির নানা রদবদল ঘটেছিল, তবু নতুন নিকাশীপ্রকল্পের ভিত্তি হিসাবে এ রিপোর্ট যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু হল। কিন্তু তিন বছর পরে দেখা গেল, রূপায়ণকালে পরিকল্পনা নানাভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের এই অস্বস্তিকর অবস্থায় আবিষ্কৃত হল, পরিকল্পনা-বহির্ভূত নির্মাণে পুরসভার বহু অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে। শহরতলির প্রণালীনির্মাণের বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য তাই পুরসভা ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ১৫ মে তিন সদস্যের একটি উপদেষ্টা সমিতি নিয়োগ করল। ১৭ জুলাই উপদেষ্টারা তাদের মতামত প্রকাশ করলেন। সেই নির্দেশ মোতাবেক একটি খসড়া তৈরির পরিকল্পনা গৃহীত হল। ল্যাথামের নির্দেশে তখন জে. বল হিল শহরতলির নিকাশীপ্রকল্পের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হলেন।

বল হিলের পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২৪ নভেম্বর একটি রিপোর্ট পেশ করা হল। যথারীতি রিপোর্টটি ল্যাথামের কাছে গেল মতামতের জন্য, ল্যাথামের জবাব পাওয়া গেল ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর। এই দীর্ঘসূত্রতার পর কিছু ফল ফলল। বালিগঞ্জ ও মোমিনপুরের পাম্পিং স্টেশনের নির্মাণকার্য আমূল রূপান্তরিত হল। অনুমোদিত বাদবাকি কাজ বিলি-বন্দোবস্ত করে দেওয়া হল চৌদ্দটি কণ্ট্রাক্টের মাধ্যমে।[৩১]

নিকাশীব্যবস্থার বিন্যাস

পূতিগন্ধময় অঞ্চল থেকে পরিচ্ছন্ন শহরে পরিণত করার প্রয়াসে কলকাতার নিকাশী-ব্যবস্থার ইতিহাসকে মোটামুটি চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে, অর্থাৎ ১৮৫৯ থেকে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ক্লার্কের পরিকল্পিত ব্যবস্থার পত্তন ঘটে। ১৮৭৫ ও ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী দ্বিতীয় পর্যায় হল কিম্বারের আমল, যখন ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর কাজ সম্পূর্ণ হয়। তৃতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ ১৮৯১ থেকে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কিম্বার ও হিউজেস প্রথমে স্বতন্ত্র ও পরে যৌথভাবে পরিকল্পনা রচনা করেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ শুরু হয়। চতুর্থ পর্যায়ে বল হিল কর্তৃক শহরতলির নিকাশী-পরিকল্পনার কাজ নির্বাহিত হয়।[৩২]

কলকাতার নিকাশীব্যবস্থা সে সময়ে প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল : শহরাঞ্চলের ব্যবস্থা ও শহরতলির ব্যবস্থা। শহরাঞ্চল ও শহরতলির দূষিত পদার্থ যথাক্রমে পামার বাজার পাম্পিং স্টেশন ও বালিগঞ্জ পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই দুই পাম্পিং স্টেশনের নিষ্কাশিত আবর্জনা তপসিয়ায় মিলিত হয়ে শেষে বিদ্যাধরী নদীতে পড়ত। উভয় অঞ্চলের বৃষ্টির জলও একই ভাবে ওই দুটি পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে বিদ্যাধরীতে ফেলা হতো।[৩৩]

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শহরাঞ্চলের ভূগর্ভস্থ নিকাশীব্যবস্থার জন্য খরচ হয়েছিল এক কোটি দশ লাখ টাকা। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শহরতলির জন্য ব্যয়িত হয়েছিল ৬৯,৭৬,৭৭০ টাকা।[৩৪]

শহরাঞ্চলের ব্যবস্থা

শহরাঞ্চলের নিকাশীব্যবস্থার পরিধি ছিল ৪,১২৯ একর জুড়ে। শহরের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল ছ'টি প্রধান পয়ঃপ্রণালী। তার মধ্যে তিনটি প্রণালী পশ্চিমে হুগলী নদী থেকে পূর্বে আপার সারকুলার রোড পর্যন্ত প্রসারিত—একটি নিমতলাঘাট স্ট্রিট, একটি কলুটোলা স্ট্রিট ও একটি ধর্মতলা স্ট্রিট ধরে। চতুর্থটি হুগলী নদী থেকে শুরু হয়েছে শোভাবাজারে। সেখান থেকে হালসিবাগান পর্যন্ত আসার পর সেটি সারকুলার রোড ধরে ধর্মতলা স্ট্রিট পর্যন্ত চলে গিয়েছে। পঞ্চম প্রণালী টালির নালা থেকে যাত্রা করে লোয়ার সারকুলার রোড ধরে এসে ধর্মতলার সংযোগস্থলে মিশেছে। এই প্রণালীগুলির প্রত্যেকটি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। ষষ্ঠ বা শেষ প্রণালীটি তরল আবর্জনা নিষ্কাশনের প্রধান নির্গমপথ (main outfall sewer) হিসাবে ধর্মতলা স্ট্রিট—সারকুলার রোড সংযোগস্থল থেকে পামারবাজার পাম্পিং স্টেশনে চলে গিয়েছে।

ইট বা পাথরের শাখাপ্রণালীর মাধ্যমে এই প্রধান প্রণালীগুলি রাস্তার বা বাড়ির নর্দমাগুলির সঙ্গে সংযুক্ত। যেহেতু মলকুণ্ড (cess pits) বা খাটা পায়খানার সঙ্গে প্রণালীগুলির সংযোগ সম্ভব ছিল না, তাই সেগুলিতে সঞ্চিত মল-মূত্র পেইল-ডিপোর (pail-depot) মাধ্যমে প্রণালীতে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শাখাপ্রণালীগুলিতে থিতিয়ে থাকা ময়লা মনুষ্য-শক্তি (hand labour) বা জলতাড়নার (flushing) দ্বারা পরিষ্কার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। তাই অধিকাংশ শাখাপ্রণালীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল স্বয়ংক্রিয় জলতাড়ন কক্ষ (automatic flushing chambers)।[৩৫]

শহরতলির ব্যবস্থা

চার হাজার একর জুড়ে প্রসারিত এই ব্যবস্থায় প্রধান প্রণালীর সংখ্যা চার। তার মধ্যে দুটি প্রণালী আংশিকভাবে যৌথ। এই প্রণালীগুলি আবর্জনা বহন করে নিয়ে আসে বালিগঞ্জ পাম্পিং স্টেশনে। সেখানে পাম্প করে দূষিত পদার্থ চালনা করা হয় উঁচু প্রণালীতে (Suburban High Level Sewer)। উঁচু প্রণালী থেকে যুগ্ম প্রণালী (Combined Sewage Channel), বৃষ্টির জলের জন্য নির্দিষ্ট জলাশয় (Storm

Water Reservoir) ও জলকপাট (Suburban Sluice-gate) পেরিয়ে এই তরল আবর্জনা বিদ্যাধরীতে গিয়ে পড়ত।

মোমিনপুরে অবস্থিত একটি সহায়ক পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে খিদিরপুর ডক ও সন্নিহিত নিচু এলাকার দূষিত পদার্থ নিষ্কাশিত হয়। জাজেস কোর্ট রোডের ভূগর্ভস্থ প্রণালী দিয়ে সেই আবর্জনা চলে আসে বালিগঞ্জের পাম্পিং স্টেশনে। এই প্রণালীটি টালির নালার সঙ্গে একটি সাইফনের দ্বারা সংযুক্ত।

টালির নালা বা আদিগঙ্গা দক্ষিণ শহরতলিকে পূর্ব ও পশ্চিম অংশে বিভক্ত করেছে। এই দুই অংশের পয়ঃপ্রণালীগুলি কালীঘাট সেতুর উত্তরদিক দিয়ে টালির নালাকে অতিক্রম করেছে। সাইফনটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে আদিগঙ্গার তলা দিয়ে সহজেই তরল আবর্জনা বা বৃষ্টির জল নিয়ে আসা যায়, অথচ নৌকাদির চলাচল যেন ব্যাহত না হয়। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে জেসপ কোম্পানি সাইফনটি নির্মাণ করেছিল। খরচ পড়েছিল ২,২৪,৮০৫ টাকা।[৩৬]

খাল এলাকার নিকাশীব্যবস্থা

সাম্প্রতিককালে সংযোজিত শহরতলির নিকাশী সমস্যা জটিল হওয়ায় তৎকালীন কর্তৃপক্ষ বিষয়টি হাতে নিয়েছিলেন সবার শেষে। 'খাল এলাকা' (canal area) নামে অভিহিত এই অঞ্চলের পরিধি ছিল ৭৩২ একর। আপার সারকুলার রোড ও সারকুলার ক্যানালের মধ্যবর্তী অঞ্চলই 'খাল এলাকা' হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। এই এলাকার নিকাশীব্যবস্থা নির্মাণ শুরু হয় ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে, শেষ হয় ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। খরচ হয় সাড়ে চুয়াল্লিশ লাখ টাকা। এই প্রকল্পের অংশ হিসাবে প্রায় পাঁচ মাইল দীর্ঘ রাস্তা তৈরি করে সেই রাস্তাগুলির ভূগর্ভে প্রণালী প্রসারিত হয়। নতুন রাস্তাগুলির মধ্যে ১১,৫৯৬ ফিট দৈর্ঘ্যের রাস্তা হল ৬০ ফিট চওড়া এবং বাকি ১৩,৯৭০ ফিট রাস্তা হল ৪০ ফিট চওড়া।

অঞ্চলটি খুব নিচু হওয়ায় প্রণালীগুলিকে নাচেই পাততে হল। মানিকতলায় নির্মিত হল নতুন পাম্পিং স্টেশন। এখানে ওই নিচু প্রণালীর জল পাম্প করে ৯ ফিট উঁচুতে অবস্থিত উচ্চতাসম্পন্ন প্রণালীতে (High Level Sewer) ঢালার ব্যবস্থা হল। উঁচু প্রণালীটি সরাসরি সংযুক্ত হল পামারবাজার পাম্পিং স্টেশনের সঙ্গে। প্রকল্পের শেষে প্রধান ও শাখাপ্রণালীগুলির দৈর্ঘ্য দাঁড়াল যথাক্রমে ৩ ও ১১ মাইল।[৩৭]

বিদ্যাধরী নদীর অবনতি

'হুগলী-বিদ্যাধরী ক্যানাল এনকোয়্যারি'-র স্পেশাল অফিসার লিইস ও কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার অ্যাডাম-উইলিয়ামের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে বাংলা সরকার পুরসভাকে জানালেন যে, বিদ্যাধরী নদী দ্রুত বুজে আসছে। পরিস্থিতিটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এই নদীতেই শহর ও শহরতলি থেকে নিষ্কাশিত বর্জ্য পদার্থ ফেলা হতো।

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের জুন-জুলাই মাসে পুরসভার একটি কমিটির (Works Special Committee) কাছে হিউজেস ও বল হিলের পুরনো বিবৃতির অংশবিশেষসহ লিইস ও অ্যাডাম-উইলিয়ামের বক্তব্য পেশ করা হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হিউজেস ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, অনতিবিলম্বে বিদ্যাধরী মৎস্য প্রকল্প ও লবণহ্রদ বুজে যাবে। বিদ্যাধরীর বিভিন্ন অংশে ১৮৮৩ থেকে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে অ্যাডাম-উইলিয়াম যে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন, তার ভিত্তিতে তিনি বিদ্যাধরী বুজে যাওয়ার সম্ভাবনা,[৩৮] গুরুত্ব,[৩৯] কারণ[৪০] ও সমাধানের[৪১] বিষয়ে বিস্তারিত অভিমত প্রকাশ করেন। অ্যাডাম-উইলিয়ামের বক্তব্য সমর্থন করে লিইস দুটি স্বতন্ত্র সমাধানব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছিলেন।[৪২]

কলকাতার নিকাশীব্যবস্থার প্রয়োজনে বিদ্যাধরীকে প্রবাহমান রাখার জন্য ১৯১৩ থেকে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আলোচনা, সম্মেলন, বিতর্ক চলে। পুরসভা ও সেচবিভাগের সুদক্ষ প্রযুক্তিবিদ ও প্রশাসকরা নানা পরিকল্পনাও রচনা করেন। তার মধ্যে লিইস-এর 'গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক ক্যানাল প্রোজেক্ট' উল্লেখযোগ্য।[৪৩] বিদ্যাধরীকে বাঁচানোর জন্য শহরের দূষিত পদার্থকে পরিশুদ্ধ করার (purification) একটি খসড়া প্রস্তাব (আনুমানিক ব্যয় সহ) বল হিল দাখিল করেন। অ্যাডাম-উইলিয়াম রাখেন মাটি কাটার (dredging) প্রস্তাব, তিনিও আনুমানিক ব্যয়ের অঙ্ক উল্লেখ করেন।[৪৪]

সব আলাপ-আলোচনাকে ব্যর্থ করে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যাধরী নদীর আক্ষরিক 'মৃত্যু' ঘটে। কলকাতার নিকাশীব্যবস্থা অচল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। বিদ্যাধরীকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বি. এন. দে নামে এক প্রযুক্তিবিদকে তখন নিয়ে আসা হয়। তাঁর মতানুযায়ী গ্রীষ্মকালীন ও বর্ষার জল বহন করার জন্য দুটি স্বতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়। কুলটিগাং নদীতে বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের ব্যবস্থা হয় এই দুটি প্রণালীর মাধ্যমে। তার আগে দুটি জলাশয়ে আবর্জনা থিতিয়ে নেওয়ার (Sedimentation) ব্যবস্থাও গৃহীত হয়। কুলটিগাং এইসব দূষিত পদার্থ বহন করে নিয়ে যায় মাতলা মোহানায়।[৪৫]

বর্তমান অবস্থা

কলকাতার নিকাশীব্যবস্থার প্রধান খুঁত তিনটি। প্রথমত, কলকাতার ভূপৃষ্ঠ অনেকটা পিরিচের মতো (Saucer-shaped)। অর্থাৎ প্রান্তিক অঞ্চলগুলি উঁচু এবং কেন্দ্রস্থলটি নিচু। দ্বিতীয়ত, তরল আবর্জনা ও বৃষ্টির জল একই নির্গমপথের দ্বারা নিষ্কাশিত হয়। প্রবল বৃষ্টিপাত হলে এই যৌথ প্রবাহপথ উপচে যায়। কারণ, শহরাঞ্চলের প্রণালীগুলির বহনক্ষমতা ঘণ্টায় সিকি ইঞ্চি জল। শহরতলির নিকাশীপথের বহনক্ষমতা আরও কম, ঘণ্টায় মাত্র ⅙ ইঞ্চি।[৪৬] তাছাড়া রাস্তার নিকাশী নর্দমার সংখ্যাল্পতা, শাখাপ্রণালীগুলির ক্ষীণ পরিসরও রাস্তায় জল দাঁড়ানোর জন্য দায়ী।[৪৭] কলকাতার তৃতীয় দোষ হল, প্রণালীহীন ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার অনুপাত সমগ্র অঞ্চলের প্রায় চল্লিশ শতাংশ। কলকাতা শহরের একটি বড় অংশ জলাশয় ভরাট করে গড়ে ওঠায় সেগুলি নিচু এলাকায়

পর্যবসিত হয়েছে। পাম্প না করলে এইসব জায়গার নিকাশীব্যবস্থা চালু রাখা যায় না।

বর্তমান ব্যবস্থায় নিকাশী খালগুলির নির্গমমুখে আছে প্রয়োজনীয় জলকপাট। বানতলায় আছে তলানি থিতানোর জলাশয় (Sedimentation tank) ও উপ-পথ ব্যবস্থা (by-pass arrangement)। বর্ষার ও গ্রীষ্মের প্রবাহের জন্য নির্দিষ্ট আছে স্বতন্ত্র দুটি পথ। গ্রীষ্মকালীন শুখা মরসুমে, যখন দূষিত পদার্থই শুধু প্রবাহিত হয়, তখন নির্গম চলে একটি বিশেষ (DWF) প্রণালী দিয়ে। এই প্রণালীটি পুরোপুরি পাকা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু প্রাথমিক পর্বে অনেকটাই কাঁচা রয়ে গিয়েছিল।[৪৮]

দীর্ঘকাল বর্জ্য পদার্থ বহন করার ফলে খালগুলিতে তলানি জমতে শুরু করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে জলস্তরও উঁচু হতে আরম্ভ হয়, চাপ পড়তে থাকে পাম্পিং স্টেশনগুলির উপরে। এই শতকের পঞ্চাশের দশকে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে বিষয়টি সেচবিভাগের এক্তিয়ারভুক্ত হয়। তারপর থেকে খালগুলি যোগ্যভাবে পরিষ্কৃত হতে থাকায় পাম্পের উপর চাপ কমতে থাকে। বিশেষ (DWF) প্রণালীটির বাকি অংশ পাকা করা হয়, থিতানোর ব্যবস্থা সংস্কৃত ও সম্প্রসারিত হয়।[৪৯]

সাম্প্রতিক পরিকল্পনা

কলকাতার নিকাশীব্যবস্থার উন্নতিকল্পে পুরসভা কিছু 'মাস্টার প্ল্যান' প্রণয়ন করেছিল। সেগুলি সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে সি. এম. ডি. এ.-এর উপর ন্যস্ত হয়। সি. এম. ডি. এ. কলকাতার পয়ঃপ্রণালীহীন ও নিচু অঞ্চলগুলির জন্য কিছু পরিকল্পনা রচনা করে। কাশীপুর-বেলগাছিয়ার ভার নিজেদের হাতে রেখে মানিকতলার কাজ সি. আই. টি.-র উপর ও তপসিয়া-ট্যাংরা-টালিগঞ্জ প্রভৃতির কাজ তারা সি. এম. ডাবলিউ. এস. এ.-র উপর ন্যস্ত করে।[৫০]

পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে থিতিয়ে জমে যাওয়া পাঁক পরিষ্কার করা একটি বিরাট সমস্যা। সত্তরের দশকে এই মোট বস্তুর পরিমাণ ছিল ১৪০ লাখ কিউবিক ফিট। এই বিপুল পাঁক নিষ্কাশিত না হলে শহরের রাস্তায় জল জমা বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে বছরে ৯ লাখ কিউবিক ফিট করে জমা পাঁক সরানো হচ্ছে। এ জন্য ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে শুরু হয়েছে যন্ত্রপাতির ব্যবহার। বিষয়টির দায়িত্ব গ্রহণ করেছে সি. এম. ডি. এ.। সমস্ত পাঁক তিন বছরে সাফ করে ফেলার জন্য সি. এম. ডি. এ. তৈরি করেছে একটি দেড় কোটি টাকার পরিকল্পনা।[৫১]

কলকাতার নিকাশীব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধনের জন্য সি. এম. পি. ও. ছ'শো কোটি টাকার একটি 'মাস্টার প্ল্যান' রচনা করেছে। নিকাশী খালগুলির পুনরুজ্জীবন ও কয়েকটি নতুন পাম্প বসানোর কথা সে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। পাম্পগুলির শেষ সংস্কার হয়েছিল ১৯৩৭-৩৮ খ্রীস্টাব্দে।[৫২]

১৮৭৫-৭৬ খ্রীস্টাব্দকে যদি কলকাতার ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর প্রতিষ্ঠাবর্ষ ধরা হয়, তাহলে তার বয়স দাঁড়ায় একশো বছরের কিছু বেশি। এই নিকাশীব্যবস্থায় নানা গলদ

আছে ঠিকই, তবু সীমিত জনসংখ্যার জন্য নির্মিত ব্যবস্থাটি আজকের বিপুল জনগোষ্ঠীর চাহিদা মোটামুটি মিটিয়ে চলেছে।

উল্লেখপঞ্জী

১. Macleod Wylie, 'The Sanatory Condition of Calcutta'. 'Calcutta Review', 5.10.1846. As reprinted in : Pradip Chaudhury and others [Ed.], 'Calcutta : People and Empire' (India Book Exchange, 1975) p. 222.

২. S. W. Goode. 'Municipal Calcutta', (Calcutta Corporation, 1916), p. 108. [Later referred to as 'Goode']

৩. Ibid., p. 109.

৪. 'The drains were unpaved and coolies had to be continually employed in digging out the black mud and filth but in the absence of any fall or constant flow the relief was temporary. The bottom of the drain was often two feet below the supposed outlet and its deposit of filth comprising the content of privies in different stages of decomposition gave off, a stink so disagreeable that it was prudent not to disturb it.'—As quoted in Siva P. Samaddar, 'Calcutta Is' Calcutta, 1978), p. 92. [Later referred to as 'Samaddar']

৫. Ibid.

৬. Goode, pp. 111-112.

৭. G. C. Chatterjee, 'Calcutta Drainage Works (a brief history)', p. 2 [Later referred to as 'Chatterjee']

৮. 'First Report on the Drainage and Sewerage of Calcutta', p. 3. [Later referred to as 'First Report']

৯. Goode, p. 113.

১০. First Report, p. 4.

১১. Goode, p. 113.

১২. 'For any practical development of a general system for the Drainage of this city, it will be necessary first to obtain a series of very accurate levels of the surface of the town, and careful observations of the tides, both in the Hoogly and Salt Water Lake.'—First Report, p. 10.

১৩. Ibid., pp. 11-13.

১৪. 'The Committee recommends at first the construction of one of the receiving sewers, together with the whole of its collateral and minor branches experimentally, selecting either the one down Dhurrumtollah or Colootollah, which traverses the city from West to East, for that purpose. If this operation is attended with satisfactory successful results, the whole system may be carried out as speedily as possible'.—Ibid., p. 14.

১৫. Goode, p. 113.

১৬. রেণ্ডেলের প্রধান প্রস্তাব ছিল তিনটি : '(1) A revision and further modification of Mr. Clark's scheme as already modified by the Drainage Committee of 1857 making the Salt Water Lake the receiver of the drainage and sewerage of the town. (2) A new plan of Messrs. Rendel themselves for discharging the drainage of the town into the River Hoogly. (3) A Plan for supplying the city with water which Messrs. Rendel considered as indispensable adjunct to the drainage.'—Chatterjee, pp. 2-3.

১৭. 'The Municipal Commissioners very strongly deprecated what they called the disgorge of the whole sewage of the town into the River Hoogly, not only because it would constitute a menace to the sanitation of the city but also because it would be highly detrimental to the port, and lastly as it would be seriously prejudicial to the religious rights and customs of the Hindus.'— Ibid., p. 3.

১৮. Ibid.

১৯. Ibid., p. 4.

২০. Ibid.

২১. Ibid.

২২. পুরসভার সহ-সভাপতি জি. সি. চ্যাটার্জির মন্তব্য : '...the Scheme which Mr. Clark prepared and carried into execution has, with slight modification, stood the test of time. The only modification that appeared to be necessary during investigation in the nineties of the last century, was in regard to its outfall arrangements.'—Ibid.

২৩. ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে পুরসভার প্রধান ইঞ্জিনিয়ার কিম্বারের মন্তব্য : '...an

attentive consideration which the writer has been able to give for upwards of seven years to the design and operation of Calcutta Sewerage System, and to the pre-existing state of things carries the conviction that no better system could have been devised under the circumstances and the citizens of Calcutta have reason to be proud of their achievement.'— Ibid.

২৪. '...that a system of sewers that has been designed to deal with the sewage of a given population, can never be perfect until the whole population is connected upto the sewers, and hence the necessity for flushing arrangements. I regret to find that the flushing arrangements that were provided for the Calcutta Sewers in the original design and as now works instead of flushing and clearing the sewers, does positive injury, and in my opinion is the direct cause of much of the deposit now found in the sewers.'—'Drainage of Calcutta, Report by Mr. Baldwin Latham and Note with Estimates by Mr. James Kimber', 1891. pp. 1-2.

প্রণালীর নকশা সম্বন্ধে সমালোচনা করে তিনি লেখেন : 'An error was committed in the design of the sewers of Calcutta by making all the inverts of the sewers of varying characters at the point of juncture level or nearly level, so that when the sewage ceases to run parallel with the invert of the sewers the velocity and discharge of the sewers are greatly retarted.' -Ibid., p. 4.

২৫. The difference in the time of the tides in the Hoogly and Salt Lake is no advantage to the sewerage of Calcutta, and at present this difference in the time of the tides very injuriously affects the flushing arrangements of the existing sewers, which are flushed at high water from the Hooghly, and as a natural consequence no sooner does the flush water get through the sewers than it meets the high tide of Salt Lake at the mouth of the outfall sewer, which practically produces stagnation in the sewers'—Ibid., p. 2.

২৬. 'Calcutta has been sewered on what is termed the combined system on the rainfall and sewage are both admitted to the sewers, the present outfall is subject to tidal influence, so that

at the present time you have to contend with two uncertain elements—the tides and the rainfall. You may have outfall blocked by the tide at the time of an exceptionally heavy rainfall....It was a fatal error in a district like Calcutta to combine rainfall with the sewage, and not provide the means of dealing with this mixed rainfall and sewage when the sewers were tide-locked.'—Ibid., pp. 2-3.

২৭. 'With reference to the flushing arrangements I am of opinion that the present large sewers of Calcutta can best be flushed by a system of sectional flushing or a series of flushing gates should be introduced into them.'—Ibid., p. 13.

২৮. 'With reference to the question of the ventilation of the sewers all that is required is a series of vents that shall preserve the tension of the air within the sewer at the same pressure as it is outside the sewer, under the conditions of the fluctuation of the flow of the sewage going in within the sewers. The fluctuation in the rate of the flow in the sewers will effectually change the air of the sewers if the vents are provided.'—Ibid., p. 14

২৯. 'I consider it would be a great advantage to Calcutta if all that part of Salt Lake lying between Circular Canal, the Bidyadhari river, Tolly's Nullah and Calcutta was embanked and reclaimed, and thus operation would greatly facilitate the getting rid of the surface water from Calcutta, and would in my judgement be an immense advantage to Calcutta from a sanitary point of view.'—Ibid., p. 14.

৩০. Goode, p. 123.

৩১. Ibid., pp. 123-127.

৩২. Chatterjee, p. 5.

৩৩. Ibid.

৩৪ Ibid.

৩৫. Ibid., p. 6.

৩৬. Ibid.

৩৭. Ibid., p. 9.

৩৮. .. 'it was clear that so long as the conditions present then continued the Bidyadhari must keep on silting up until it totally

disappeared. It was quite certain that upper reaches would be high and dry at low tide after 2 or 3 years ; and in 10 years time from then there would be very little of the river left.'—Ibid., p. 10.

৩৯. 'This question very closely concern the Corporation : a large quantity of sewage and storm water is discharged from the Municipality during the year into the Bidyadhari and when this closes up, expensive works have to be undertaken, either to extend the outfall channels, and sluices to some other river further east or a new system of treatment of sewage will have to be introduced. The storm water can be diverted to the Hoogly at probably considerable expense but this cannot be done with the sewage ..The whole question depends on the keeping open of the Bidyadhari.'—Ibid.

৪০. '.. the principal reason was the change in the method of fish culture in Salt Lakes. Most of the spill channels were kept closed with cess dams so that a free spill occurred over a few acres only and nearly all the silt carried up by the tide was deposited in river bed itself.'—Ibid.

৪১. 'The remedy was the opening up of the spill of the Bidyadhari again into the Salt Lakes...By the adoption of this means, the silt lying in the bed would be carried up into the lakes and would gradually raise the level of the land, while the back flow on the ebb-tide would scour back the silt deposited in the river itself during the flow tide.'—Ibid., pp. 10-11.

৪২. '...he suggested two alternatives, viz., first the canalisation of the Bidyadhari River by throwing a dam as low down as possible and building a sluice to discharge the drainage water and to use the canalised river as an outfall channel for the sewage after treating the same by some process in order to render the effluent innocuous. The second alternative was to carry the sewage 14 miles further east and discharge it into the Kulti River, or further down into the Mutla River.'—Ibid., p. 12.

৪৩. 'The main features of the project were the construction of a waterway 250 ft. in width and 10 ft. deep from the Hoogly

River at Badartala, east of the Kidderpore Docks, running in an easterly direction for 32 miles to Kulti on the Kulti River, crossing the Bidyadhari River at a point 5½ miles below Byntola and 10 miles from Palmer's Bridge. The proposal was to cut off the Bidyadhari River from the tides by throwing a dam across this river at a point beyond the head of the Peali River, canalise the Bidyadhari River between this dam and Dhappa lock and the Peali River at its outfall into the Mutla. Provision was also made for branch from the 8th mile of the Grand Trunk Canal running northwards joining Tolly's Nullah just south of the entrance to the Port Commissioner's Boat Canal at Chetla, and to canalise the Tolly's Nullah upto its junction with the Hoogly by placing a lock along Hastings Road Bridge.'—Ibid., pp. 13-14.

৪৪. Ibid., pp. 14-15.

৪৫. Samaddar, p. 93.

৪৬. Ibid., p 94. Also see, R. G. Dam, 'Sewerage in Calcutta' in 'Sutanati Gazette', First Issue, November 1985, p. 31.

৪৭. Samaddar, p. 94.

৪৮. Ibid., p. 95.

৪৯. Ibid., pp. 95-96.

৫০. Ibid., p. 98.

৫১. Ibid., p. 99.

৫২. Ibid., pp. 99-100.

স্বীকৃতি : যে তিনটি নথির সাহায্যে বর্তমান নিবন্ধটি রচিত হল, সেগুলি ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার জন্য আমরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ।

সিদ্ধার্থ ঘোষ

পুরনো কলকাতার কলকব্জা

ঔপনিবেশিক শহরের প্রযুক্তি প্রয়াস

ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের পরবর্তীকালেই সত্যিকার কলকব্জার যুগ শুরু হয়। তার অবশ্যম্ভাবী ছায়া পড়ে ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশ ভারতবর্ষে, বিশেষ করে তার তৎকালীন রাজধানী কলকাতায়। আমাদের দেশে শিল্প-বিপ্লব ঘটেনি, সুষম পদ্ধতিতে যন্ত্রযুগের সূচনা হয়নি। যন্ত্র - বিশেষত বাষ্পচালিত যন্ত্রের প্রবর্তন বাংলার তাঁতীদের বাহুবলকে পরাস্ত করতে প্রাথমিকভাবে সাহায্য করেছিল। ম্যাঞ্চেস্টারের কলের কাপড় এদেশের বাজার দখল করল, কিন্তু বুনিয়াদি কলকারখানা কিছুই গড়ে উঠল না। এদেশে বাষ্পের কল প্রথমদিকে এসেছিল ইংরেজদের বাণিজ্যের সহায়তা করার জন্য। যাকে অনেকে ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের প্রধান চালিকাশক্তি রূপে গণ্য করেন, সেই বাষ্প-শক্তির অপরিসীম গুরুত্ব অবশ্য আমরা প্রথম টের পেয়েছিলাম পরিবহণের ক্ষেত্রে—কলের নৌকা ও তারপরে বাষ্পীয় শকটের প্রবর্তনের পর। ভারতবর্ষের আনাচ-কানাচ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ, বিদেশে রপ্তানি এবং বিদেশের পণ্য আমদানি ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের মধ্য দিয়েই এই দুটি আধুনিক কল ভারতের অর্থনীতিকে পুরোপুরি লণ্ডভণ্ড করার সুযোগ করে দিল ইংরেজদের।

এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবে কলকব্জার ব্যাপারটাকে কোনোদিনই আমরা মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারিনি। কলকব্জার উল্লেখ আমাদের কাছে একটা বিদেশী বিজাতীয় ঘ্রাণ বহন করে আনে। বুদ্ধি ও যুক্তির বিচারে আমরা যন্ত্রযুগের অপরিহার্যতা অস্বীকার করি না, কিন্তু অব্যক্ত একটা অনীহা থেকেই গেছে। রূপচাঁদ পক্ষী (জন্ম ১৮১৪) সিন্ধু কাফি রাগিণীতে বাঁধা 'কলিকাতা বর্ণন'-এ যে ছবি এঁকেছিলেন তা একটি কলের শহরের। সেখানেও লক্ষণীয়, পুরোটাই তাঁর কাছে এক বিস্ময়কর অবোধগম্য কাণ্ড এবং শেষ পর্যন্ত তিনি এর পরিণতি নিয়ে সরস কিন্তু তির্যক মন্তব্যই করেছেন:

> 'নিকাশ হচ্ছে ময়লা জল করছে প্রস্তুত ড্রেনেজ কল,
> ধুলো থামে দিলে জল, স্বতন্ত্র এক কল, অগ্নিদেব হলে প্রবল,
> নির্বাণ করে দমকল, গোরাদের চেহারা দেখে, ভয়ে পালায় বৈশ্বানর,
> পাল্লে জল যোগাবে. সাধ্যমতে সাধ্য কি যে পোড়ে ঘর॥

(মেসিনেতে দিলে দম, কোরে ঝমঝম, তেজে বেরোয় ওয়াটার)॥
পাটের কল আর ময়দার কল, রেঁড়ির কল,
কাপড়ের কল, আর সুরকীর কল,
জল তোলা কল, খোয়াভাঙ্গা কল, কলাকৃতি ঐরাবৎ,
করে এক দিবসে সোজা পথ।
সেরে দিলে কলে কলে, এরপরে কলেতে বানাবে ছেলে।
পুত্রহীন মহীমণ্ডলে থাকবে না মূলে, মলে করবে বিষয়ভোগ।'[১]

কিন্তু রূপচাঁদ পক্ষীর কাল থেকে আমরা আজ অনেকটা এগিয়ে এসেছি। কলকাতার ত্রিশতবার্ষিকী নিয়ে আমাদের গর্ব বা দুশ্চিন্তার হরেক মতভেদের মধ্যে সবচেয়ে হতাশাগ্রস্ত কটুভাষী সমালোচকও একটি বিষয়ে দ্বিধা পোষণ করেননি—সাহেবদের তৈরি টাউন হল, মেটকাফ হল, রাইটার্স বিল্ডিং ইত্যাদিকে সযত্নে রক্ষা করা উচিত। কলকাতার অনেকটাই যে সাহেবি ব্যাপার সেটা ঘরবাড়ি, স্থাপত্য কিংবা অপসারিত স্ট্যাচুর ক্ষেত্রে স্বীকার করে নিতে আমাদের দ্বিধা নেই, কিন্তু কলকব্জার ক্ষেত্রে আমাদের বিচারের মাপকাঠিটা স্বতন্ত্র। তার অন্যতম কারণ আমাদের ভিত্তিহীন হীনম্মন্যতা। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় বা সত্যেন্দ্রনাথ বসু আমাদের গর্ব। কিন্তু কারিগরি ক্ষেত্রে কলকব্জার জঙ্গলে আমাদের সম্মানরক্ষার কোনো উপযুক্ত পরিত্রাতা আমরা খুঁজে পাই না।

আসল বিস্ময় এখানেই যে, তীব্র প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও কলকব্জার কলকাতায় প্রতিভাধর বাঙালি কারিগর বা ইঞ্জিনিয়াররা অসামান্য কীর্তি রেখে গেছেন। কিন্তু আমাদের কারিগরি ইতিহাসচর্চার অভাবে তাঁরা আজ সকলেই বিস্মৃত।

কলকাতার ঘরবাড়ি নিয়ে সম্প্রতি বহু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু নীলমণি মিত্রের নামটি একবারও যথাযোগ্য গুরুত্বের সঙ্গে উল্লিখিত হতে দেখা যায়নি। প্রথম পাশ-করা (রুড়কি কলেজ থেকে) বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে শুধু নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন প্রকৃত 'বাঙালি' স্থপতি হিসাবেও কলকাতা তাঁর কাছে চির-কৃতজ্ঞ। সাহেবি পাঠশালায় শিক্ষা নিয়েছিলেন তিনি, কিছুদিন গোলামিও করেছিলেন, কিন্তু স্বাধীন স্থপতি ও নির্মাতারূপে আত্মপ্রকাশ করার পর তিনি কিন্তু ডোরিক, গথিক কি প্যালাডিয়ানের দাসত্ব করেননি। আধুনিক রীতির মধ্যেই হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের সম্মিলন ঘটিয়ে তিনি এই সাহেবি কলকাতায় সৃষ্টি করেছিলেন কয়েকটি অনবদ্য স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর। বাগবাজারের পশুপতি বসুর বাড়ি, বেলগাছিয়া ভিলার নবরূপায়ণ বা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির তার সাক্ষী।[২]

পুরনো কলকাতার কলকব্জার কথা চর্চা করতে গেলে প্রায় প্রতি পদে নীলমণি মিত্রের মতো বাঙালিদের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু হারিয়ে যাওয়া যুগের সাক্ষ্য হিসাবেই নয়, কলকব্জার এই ইতিহাস আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ গৌরবেরও কাহিনী।

ওয়াটসনের হাওয়া-কল

বন্দর কলকাতার প্রথম বড় কারখানা স্থাপিত হয়েছিল জাহাজ তৈরির জন্য। ওয়াটগঞ্জ অঞ্চল যাঁর স্মৃতি বহন করছে, এই কারখানা তৈরি করেছিলেন সেই কর্নেল ওয়াটসন। পরবর্তীকালে কিড সাহেবের কল্যাণে খিদিরপুর হয়ে উঠেছিল জাহাজ তৈরি ও মেরামতির কেন্দ্র। বিশাল আয়োজন করেছিলেন ওয়াটসন তাঁর কারখানার জন্য, যার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন উইলিয়াম হিকি, তাঁর স্মৃতিকথায়।

ওয়াটসনের সবচেয়ে বিস্ময়কর কীর্তি হল তাঁর হাওয়া-কল বা পবন চক্র। আশেপাশের সব বাড়িঘরের চেয়ে উঁচু একটা কাঠের তৈরি বাড়ির মাথায় বসানো ছিল কাপড়ের পাল লাগানো একটা চাকা। হাওয়া বইলেই বনবন করে সেটা ঘুরতো। হাওয়ার শক্তিকে প্রধানত কাঠ-চেরাইয়ের কাজে ব্যবহার করাই ছিল ওয়াটসনের উদ্দেশ্য।

বাষ্পশক্তিকে নিযুক্ত করার আগে বাহুবল ছাড়া পশুবলই ছিল ভারতে যন্ত্র-চালনার প্রধান উপায়। অবশ্য ভৌগোলিক সুবিধা থাকলে প্রাচীন ভারতে জলশক্তিও ব্যবহৃত হয়েছে চাকা ঘুরিয়ে (পানি চাক্কি) পেষাই করার কাজে। ভারতে কিন্তু পার্শিয়া বা হল্যাণ্ডের মতো প্রাচীনকাল থেকে উইণ্ডমিলের ব্যবহার ছিল না। সেদিক থেকে ওয়াটসনের যন্ত্রটি একটি ঐতিহাসিক 'প্রথম'। শুধু তাই নয়, পরেও সুদীর্ঘকাল ভারতে উইণ্ডমিলের প্রবর্তন ঘটেনি। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ই সম্ভবত প্রথম বাংলায় প্রবন্ধ ও বই লিখেছিলেন 'পবন চক্র' নির্মাণ প্রণালী ও তার উপযোগিতার বিষয়ে।

ওয়াটসনের অদ্ভুতকর্মা যন্ত্রটি কিন্তু অত্যন্ত স্বল্পায়ু পেয়েছিল। জাহাজঘাটার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ডাকসাইটে বাসিন্দা ভূকৈলাসের গোকুল ঘোষাল আদালতে নালিশ করেন যে, ঐ বেয়াক্কেলে যন্ত্রটা ভীষণ ঢ্যাঙা এবং সারাক্ষণ তাঁর অন্তঃপুরের দিকে চেয়ে থাকে! তাঁর জেনানার আব্রু রক্ষার জন্য এই আবেদন সত্যিই মঞ্জুরও হয়ে গেল। ওয়াটসন বাধ্য হলেন তাঁর হাওয়া-কলকে খুলে নামিয়ে নিতে। আসলে গোকুল ঘোষালকে মদত দিয়েছিল ওয়াটসনের বিরুদ্ধ পক্ষেরই কয়েকজন সাহেব।[৩]

হরেক রকম বাষ্পের কল ও গোলোকচন্দ্র

কলকাতায় ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে চাঁদপাল ঘাটে স্টিম ইঞ্জিন চালিত জলতোলা কল বসেছিল নগরবাসীদের জল সরবরাহ করার জন্য। সেই প্রথম কলের জল এল। একটি উন্মুক্ত প্রণালী দিয়ে জল প্রবাহিত হতো। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর পরে তোলা বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ডের একটি ফোটোগ্রাফে দেখা যায়, বর্তমান রাজভবনের পশ্চিমে ফুটপাথের কিনারায় সেই প্রণালী থেকে কয়েকজন লোক জল সংগ্রহ করছেন। চাঁদপাল ঘাটে কল বসানোর আগে স্বাস্থ্যহানিকর ধোঁয়া ও কলের গর্জনের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত শহরবাসীকে আশ্বস্ত করতে হয়েছিল। বাষ্পীয় কলের ইঞ্জিনিয়ার জেসপ সাহেবকে (জেসপ কোম্পানির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা) মিলিটারি বোর্ডের কাছে চিঠি দিয়ে জানাতে হয়েছিল যে, 'চুল্লীতে প্রথম আগুন দেওয়ার সময় ঘন কালো ধোঁয়া বেরোবে ঠিকই, কিন্তু কাজটা

যেহেতু ভোরবেলাতেই সেরে ফেলা হবে, বাতাস তখন পাতলা থাকবে, ধোঁয়া কখনোই নীচে নেমে আসবে না। তাছাড়া কল ঠিকমতো তৈরি হলে একটুও আওয়াজ বা কাঁপুনি টের পাওয়ার কথা নয়।'[৪]

কলকাতায় বাষ্পশক্তি চালিত প্রথম বড় আকারের কারখানা হল স্ট্র্যাণ্ড রোডের পুরনো টাঁকশাল। কিছুদিন আগে অবধি সেখানে 'সিল্‌ভার রিফাইনারি' ছিল। কারখানার বিশেষ প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে এই বাড়ি পরিকল্পনা ও নির্মাণ করেছিলেন ক্যাপ্টেন (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল) উইলিয়াম নেয়ার্ন ফোর্বস্‌। কারখানার যন্ত্রপাতিও তাঁর নির্দেশমাফিক আনানো হয়েছিল ইংল্যাণ্ড থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় বিদেশী ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তিনজনের অন্যতম ছিলেন ফোর্বস্‌। কলকাতাকেন্দ্রিক অভ্যন্তরীণ জলপথে সরকারি বাষ্পীয় পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির ক্ষেত্রেও তাঁর ছিল অসামান্য অবদান। আর স্থপতি হিসাবে তাঁর সেরা কীর্তি সেণ্ট পল্‌স্‌ ক্যাথিড্রাল। স্ট্র্যাণ্ড রোডের টাঁকশালে মুদ্রা তৈরির কাজে দুটি ৪০ অশ্বশক্তির, একটি ২৪ অশ্বশক্তির, একটি ২০ অশ্বশক্তির ও আরেকটি ১৪ অশ্বশক্তির বাষ্পের ইঞ্জিন বসানো হয়েছিল। সে যুগের বাষ্পীয় ইঞ্জিনের প্রয়োজন মেটাতে (বাষ্পকে জলে ঘনীভূত করার জন্য) একটি ভূগর্ভস্থ প্রণালীর দ্বারা গঙ্গার জলকে কারখানা অবধি প্রবাহিত করার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৫] প্রায়-পরিত্যক্ত এই বিশাল কারখানা এখনও টাঁকশাল কর্তৃপক্ষের অধিকারে রয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি সেটি পরিদর্শনের সময়ে (এপ্রিল ১৯৮৯) জানতে পেরেছি, অতীতের যন্ত্রপাতি কিছুই রক্ষা পায়নি। উল্লেখ করার মতো আছে শুধু একটি গৃহ-সংলগ্ন পুষ্করিণী, যা লক্‌-গেটের মধ্যস্থতায় গঙ্গার সঙ্গে সংযুক্ত।

সেকালের বাংলা সংবাদপত্রে সবিস্তারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে গঙ্গার তীরে গম সুজি ইত্যাদি পেষাই করার জন্য বাষ্পের কল 'স্ট্র্যাণ্ড মিল' স্থাপনের বিবরণ। ৮ অগাস্ট ১৮২৯-এর 'সমাচার দর্পণ' থেকে উদ্ধৃত করছি : 'এই কলের দ্বারা গোম পেষা যাইবে ও ধান ভানা যাইবে ও মর্দ্দনের দ্বারা তৈলাদি প্রস্তুত হইবে এবং এই সকল কার্য্যে ত্রিশ অশ্বের বলধারি বাষ্পের দুইটা যন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন হইবে। এতদ্দেশীয় অনেক লোক এই আশ্চর্য্য বিষয় দর্শনার্থে যাইতেছেন এবং আমরা আপনারদের সকল মিত্রকে পরামর্শ দিই যে তাঁহারা এই অদ্ভুত যন্ত্র বাষ্পের দ্বারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুই হাজার মোণ গোম পিষিতে পারে তৎস্থানে গমন করিয়া তাহা দর্শন করেন।'

আকারে অনেক ছোট ও উপযোগিতায় হয়ত বা অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু মর্যাদায় তুলনাহীন যে বাষ্পের যন্ত্রটির কথা এরপরেই উল্লেখ করতে হয় সেটির নির্মাতা গোলোকচন্দ্র।

'ইঞ্জিনিয়ার' শব্দটি ইংরেজি ভাষায় নবাগত। জেমস্‌ ওয়াট ও তাঁর সতীর্থরা প্রথম 'ইঞ্জিনিয়ার' অভিহিত হন স্টিম ইঞ্জিনের নির্মাতা হিসাবে। সেই আদিম অর্থে গোলোকচন্দ্রকে আমরা নির্দ্বিধায় 'প্রথম ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার' নামে অভিহিত করতে পারি। উইলিয়াম কেরী প্রতিষ্ঠিত এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দের

৯ জানুয়ারির অধিবেশনের কার্যাবলীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, কেরী সাহেবেরই পরামর্শে গোলোকচন্দ্র তাঁর তৈরি একটি স্টিম ইঞ্জিন সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনীর সময় সর্বজনসমক্ষে পেশ করবেন। ১৬ জানুয়ারি কলকাতার টাউন হলে শুরু হয় সেই প্রদর্শনী। গোলোকচন্দ্র তাঁর ইঞ্জিন দিয়ে পাম্প চালিয়ে ও জল তুলে সবাইকে বিস্মিত করে দেন। সেবার প্রদর্শনীর সর্বোচ্চ পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা তিনিই লাভ করেছিলেন।[৬]

গোলোকচন্দ্র ছিলেন টিটাগড়ের বাসিন্দা, পেশায় কামার।[৭] এর বেশি তাঁর সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। কিন্তু তাঁর এই ইঞ্জিন তৈরির পিছনে উইলিয়াম কেরী তথা শ্রীরামপুরের অদ্ভুতকর্মা মিশনারিদের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলা ভাষা ও বাংলা মুদ্রণশিল্পের বিকাশে কেরী ও তাঁর সতীর্থদের ভূমিকার কথা কারও অজানা নয়। কিন্তু ভারতে যন্ত্রযুগের সূচনায় তাঁদের অবদানের কথা সে-পরিমাণে আলোচিত হয়নি। শ্রীরামপুরে তাঁরাই ভারতের প্রথম বাষ্পশক্তি চালিত আধুনিক কারখানা স্থাপন করেন —সেটিই ভারতের প্রথম আধুনিক কাগজ তৈরির কারখানা।

কাগজের কলের জন্য কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে একটি স্টিম ইঞ্জিন আনানো হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের থোয়েট্স হিক্ অ্যাণ্ড রথওয়েল্স কোম্পানি থেকে। ১৮২০-র ২৭ মার্চ বারো অশ্বশক্তির এই ইঞ্জিনটি প্রথম চালু হয়। 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায় ইঞ্জিনটি চালু হওয়ার চার বছর পরেও বহু লোক এসে ভিড় জমাতো শুধু এটিকে নিরীক্ষণ করার জন্যই। জন ক্লার্ক মার্শম্যান বহুকাল পরে লিখেছিলেন, 'এই ইঞ্জিনটি প্রথম বাষ্পচালিত নৌকা বা রেল ইঞ্জিনের মতোই উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। সেকালে লোকমুখে যন্ত্রটি পরিচিত ছিল 'আগুনের কল' নামে।[৮]

উইলিয়াম কেরীর জীবনীকার জর্জ স্মিথ লিখেছিলেন 'আগুনের কল' দেখতে এসে লোকে শ্বেতাঙ্গ ইঞ্জিন চালককে প্রশ্নে-প্রশ্নে জর্জরিত করতো। সেই অনুসন্ধিৎসুদের দলে দেশী লোক ছাড়াও বহু ইউরোপীয়ানও থাকত। স্মিথ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখে গেছেন, কোনো রকম বিদেশী সাহায্য বা বিদেশী উপকরণ ছাড়াই গোলোকচন্দ্র এই যন্ত্রের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ তৈরি করেছিলেন।[৯]

গোলোকচন্দ্রের পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে 'ইঞ্জিনিয়ার' হিসাবে তাঁর কাছ থেকে আরও কিছু প্রত্যাশা করাও বোধহয় ঠিক নয়। গোলোকচন্দ্রের কিছু আগে ম্যাকনট বলে এক ইংরেজ ফোর্ট গ্লস্টারে (বাউড়িয়ায়) একটি স্টিম ইঞ্জিন তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তিনিও এর বেশি অগ্রসর হতে পারেননি। মনে রাখা দরকার, ১৮৬৫ অবধি ভারতে কাগজ উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও শ্রীরামপুরের কাগজ-কলটি শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। এই কাগজকল বন্ধ হওয়ার একমাত্র কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপ।

শ্রীরামপুরের কাগজের কলের সূত্র ধরে আমরা কলকাতার প্রথম সৃজনশীল আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারেরও সন্ধান পাই। তাঁর নাম উইলিয়াম জোন্স। এই উইলিয়াম জোন্সের পরামর্শ অনুসারেই শ্রীরামপুরে বাষ্পের ইঞ্জিনটি আমদানি করা হয়েছিল।[১০] জোন্স কলকাতায় আসেন ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে। সাধারণ কারিগর হিসাবে বছর দশেক কাজ করার

পর তিনি হাওড়ার অ্যালবিয়ন ঘাটে একটি ক্যানভাস তৈরির কারখানা খোলেন। জোন্স অনর্গল বাংলা বলতে পারতেন এবং জনশ্রুতি মতে হাওড়ায় শিল্পনগরী গড়ে ওঠার বীজটি তিনিই বপন করেছিলেন। হাওড়ার মানুষ তাঁকে 'গুরু জোন্স' বলে সম্বোধন করতো। তিনি একটি ছোট কাগজের কলও বসিয়েছিলেন, ১৮১১ খ্রীস্টাব্দের জাভা অভিযানের আগে সেই কল থেকে সরকারকে কার্ট্রিজ পেপার সরবরাহ করা হয়েছিল। স্থপতি হিসাবেও তাঁর নাম স্মরণীয়। ভারতের প্রথম গথিক রীতির গৃহ—বিশপ্‌স্ কলেজের (শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রাঙ্গণে সেটি আজও এক দর্শনীয় বস্তু) নির্মাতা তিনি। তবে জোন্সের সবচেয়ে বড় কীর্তি কারিগরি পারদর্শিতার সঙ্গে ভারতের প্রথম কয়লাখনি পরিচালনা। কয়লাখনির ইতিহাস রচয়িতারা তাঁকে 'ভারতীয় কয়লাখনি শিল্পের জনক' আখ্যা দিয়েছেন।[১১] রানীগঞ্জ কয়লাখনির পত্তন তাঁর হাতে। তবে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেননি জোন্স, সে সাফল্য যাঁর উদ্যোগে এসেছিল ঐ রানীগঞ্জ খনিকে কেন্দ্র করেই, তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর।

ডায়না, দ্বারকানাথ ও হানিফ সারেঙ

ইংল্যাণ্ডে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে কয়লার ব্যবহার শুরু হওয়ার পর থেকেই কয়লার চাহিদা বাড়তে থাকে। কয়লার চাহিদার সঙ্গে-সঙ্গে কয়লা সংগ্রহের জন্য পাতাল-প্রবেশের দরকার পড়ে। সেই সময়ে গভীর কয়লাখনি থেকে জল ছেঁচে বের করার জন্য স্টিম ইঞ্জিনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। কিন্তু কয়লার অধিক ব্যবহার ভারতে স্টিম ইঞ্জিন প্রচলনের প্রধান কারণ নয়। বরং তার বিপরীতটাই সত্যি। স্টিম ইঞ্জিন, বিশেষ করে স্টিমার ও রেলওয়ের চাহিদা মেটানোর জন্যই এখানে কয়লাশিল্পের বিকাশ ঘটে।

কলকাতার গঙ্গাবক্ষে যে বাষ্পীয় নৌকাটি প্রথম ধোঁয়া ছেড়ে, গায়ের দু'ধারে লাগানো চাকা (প্যাডেল হুইল) ঘুরিয়ে জল কেটে প্রথম তার উপযোগিতার কথা প্রমাণ করে, তার নাম 'ডায়না'। খিদিরপুরে কিড্ অ্যাণ্ড কোম্পানির ডক্-ইয়ার্ড থেকে ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে 'ডায়না'কে জলে ভাসানো হয়। দুটি ষোলো অশ্বশক্তির ইঞ্জিন বাদে পুরো স্টিমারটাই এখানে তৈরি হয়েছিল। লোহার পাত দিয়ে তৈরি জাহাজ প্রবর্তনের আগে, কলকাতার অধিকাংশ স্টিমার স্থানীয় জাহাজ-ঘাটাতেই তৈরি হয়েছে। 'কলের নৌকা' বা 'আগুন কলের না' প্রচলনের ব্যাপারটি শুধু বাংলা সাময়িকপত্রেরই নজর কাড়েনি, কালীঘাটের পটুয়ারা তার ছবি এঁকেছেন, পোড়ামাটির মন্দির-ফলকে আজও তার চিহ্ন আছে, আছে শান্তিপুরের তাঁতীদের বোনা বর্ণাঢ্য শাড়ির পাড়ে (আশুতোষ মিউজিয়ামের সংগ্রহভুক্ত)। 'ডায়না' সম্বন্ধে বিশেষ করে একটি কথা বলা প্রয়োজন। এটি শুধু ভারতের নয়, ব্রিটিশ নৌশক্তির মধ্যেও প্রথম বাষ্পচালিত গান্-বোট (কামান সংযুক্ত)। 'ডায়না' প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধে ব্রিটিশ নৌসেনার দারুণ উপকারে লাগে। বলা যেতে পারে, 'ডায়না'র এই সাফল্যই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতে স্টিমার প্রচলনে উৎসাহিত করে। মনে রাখা দরকার, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টররা অনেকেই ছিলেন পাল-তোলা

'ইস্টইণ্ডিয়াম্যান' জাহাজের মালিক এবং প্রথমদিকে বাষ্পীয় তরীর প্রচলন তাঁরা ভাল চোখে দেখেননি।[১২]

'ডায়না' জলে ভাসার বছর দুয়েকের মধ্যে, ১৮২৫-এ ইংল্যাণ্ড থেকে প্রথম বাষ্পীয় জাহাজ 'এণ্টারপ্রাইজ' এসে পৌঁছল কলকাতায়। কিছুটা পথ বাষ্পের শক্তিতে ও বাকিটা পাল তুলে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল এই ঐতিহাসিক জাহাজটি। 'এণ্টারপ্রাইজ'কে যিনি পরিচালিত করেছিলেন, সেই কম্যাণ্ডার জে. এইচ. জনস্টনও একটি ঐতিহাসিক নাম। পূর্বোক্ত ফোর্বস সাহেব ও জনস্টনের হাতেই গড়ে উঠেছিল কলকাতা তথা পূর্ব ভারতের সরকারি বাষ্পীয় জল পরিবহণ ব্যবস্থা। জনস্টন কিছুদিনের মধ্যেই 'স্টিম জনস্টন' নামে পরিচিত হয়েছিলেন।[১৩]

সামরিক কাজে স্টিমারের উপযোগিতা প্রমাণিত হলেও অর্থকরীভাবে কলকাতায় প্রথম যে স্টিমার কোম্পানিটি সাফল্য লাভ করে তার কর্ণধার ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। কার টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানি নামে ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসের প্রাণপুরুষ দ্বারকানাথ ১৮৩৬-এ 'ফোর্বস' নামে একটি স্টিমার কিনে 'ক্যালকাটা স্টিম টাগ অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। সমুদ্র মোহানা থেকে কলকাতা বন্দর অবধি বড় বড় জাহাজকে স্টিমার দিয়ে টেনে আনাই ছিল তাঁদের কাজ। 'টাগ' কোম্পানি প্রতিষ্ঠার মাত্র মাসখানেক আগে দ্বারকানাথ কিনেছিলেন রানীগঞ্জের কয়লাখনি। ১৮৩৬-এর দিন তিরিশেব মধ্যে দ্বারকানাথ তাঁর কয়লা ও বাষ্প উদ্যোগের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলা যায়। রানীগঞ্জের এই কয়লাখনিকে কেন্দ্র করেই ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছিল ভারতের বৃহত্তম কয়লা-খনির কোম্পানি 'বেঙ্গল কোল'-এর জাল।[১৪]

টাগ কোম্পানির জাহাজ-ঘাঁটিতে মেরামতির কাজের জন্য তৈরি হয়েছিল একটি কারখানা। ১৮৪৪ নাগাদ এই কারখানা বিক্রি হয়ে যায়। কিনে নেয় ইণ্ডিয়া জেনারেল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি। এর পত্তনের পিছনেও দ্বারকানাথের প্রভাব কাজ করেছিল। যাই হোক, পুরনো কলকাতার বিচিত্র কলকব্জার সবচেয়ে রাজকীয় যে প্রতীকটি রক্ষা পেয়েছে, সেটি ওই টাগ কোম্পানির একটি স্থবির স্টিম ইঞ্জিন, যা যন্ত্রের চাকা ঘোরাবার কাজে ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে এই ইঞ্জিনটি রয়েছে বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহালয়ের প্রাঙ্গণে। ইঞ্জিনটি উদ্ধার করা হয়েছিল 'সেণ্ট্রাল ইনল্যাণ্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির' রাজাবাগান ডকইয়ার্ড থেকে। 'সেণ্ট্রাল ইনল্যাণ্ড' প্রকৃতপক্ষে পূর্বোক্ত 'ইণ্ডিয়া জেনারেল'-এর প্রত্যক্ষ উত্তরসূরি এবং 'টাগ' কোম্পানির কাছ থেকেই ওই আদ্যিকালের ইঞ্জিনটি তারা ১৮৪৪-এ খরিদ করেছিল।[১৫]

কলের নৌকা ও 'ইণ্ডিয়া জেনারেল'-এর সূত্র ধরেই এবার একজন সম্পূর্ণ বিস্মৃত মানুষের কথায় আসা যাক, কলকাতা যাঁকে নিয়ে সত্যিই গর্বিত হতে পারে। ইণ্ডিয়া জেনারেল কোম্পানির কুড়ি টনের ছোট্ট স্টিমার 'নাজিরা'র পরিচালক নির্বাচিত হয়েছিলেন হানিফ সারেঙ, ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে। ভারতের পূর্ব ভূভাগের অভ্যন্তরীণ জলপথে তাঁর আগে আর কোনো ভারতীয় এই গৌরব অর্জন করতে পারেননি। ১৮৮২ নাগাদ হানিফ 'সুলতান' নামে আরও একটি স্টিমারের পরিচালনার দায়িত্ব পান। তখনও 'ইণ্ডিয়া

জেনারেল'-এর একুশটি স্টিমারের ৫০ জন পরিচালক, সহ-পরিচালক ও ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র ভারতীয়। 'সুলতান'-এর পর হানিফ দায়িত্ব নিয়েছিলেন 'বরিশাল' স্টিমারের। হানিফ সারেঙ চিরকাল কলকাতা-কাছাড় লাইনেই কাজ করেছিলেন। তাঁর এই অদ্ভুত কীর্তির একমাত্র সাক্ষ্য রয়েছে 'ইণ্ডিয়া জেনারেল'-এর নথিপত্রে এবং মুদ্রিত অক্ষরে তাঁর নামকে প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ওই কোম্পানিরই ইতিহাস-রচয়িতা অ্যালফ্রেড ব্রেম। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে ব্রেম অকপটে স্বীকার করেছিলেন যে, কোম্পানির চাকরিতে নিযুক্ত সারেঙকুলের পিতৃস্থানীয় হলেন হানিফ—'...Old Hanif Serang...may be regarded as the father of the large body of Serangs now employed in Company's service.'[১৬] আজও স্টিমারের কম্যাণ্ডারকে আমরা 'সারেঙ' নামেই অভিহিত করি, 'ক্যাপ্টেন' নয়।

হানিফের গৌরব আরও পরিস্ফুট হবে ১৮৭৫ সালের দৈনিক পত্রে প্রকাশিত নিম্নোক্ত সংবাদটির বিচারে। রেল ইঞ্জিনের চালক হিসাবে ভারতীয়দের নিয়োগ করার প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে জনৈক পত্রলেখক জানিয়েছিলেন, '...in the case of a political struggle or the repetition of the outbreak of 1857, will the Govt. fully depend for the transhipment of its troops and ammunition in the native staff?'[১৭]

গ্যাসের আলো

বৌবাজার ও বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের মোড়ে একটি বাড়ির বাইরের দেওয়ালে গ্যাসের আলো লাগাবার লোহার ব্র্যাকেটের গায়ে ঢালাই-করা হরফে এই শব্দক'টা এখনও পড়া যায়: 'MESSENGER & COMPANY. BIRMINGHAM. 1856.' এই জীর্ণ ও বর্তমানে অকেজো বস্তুটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ধরা পড়ে যখন জানা যায় ১৮৫৭-র জুলাই মাসে কলকাতার রাস্তায় প্রথম গ্যাসের আলো জ্বালিয়েছিল 'দা ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানি'। কাজেই ওই সামান্য ব্র্যাকেটটি নিশ্চয় প্রথম দফায় ইংল্যাণ্ড থেকে আনানো গ্যাসের আলো সংক্রান্ত যন্ত্র ও যন্ত্রাংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তবে কলকাতায় তার আগেও গ্যাসের আলো জ্বলেছে। ১৮২২-এর 'ক্যালকাটা গেজেটে' লেখা হয়েছিল, 'Nearly two years ago a complete gas light apparatus was brought to Calcutta.'[১৮] ঐ বছরেরই ৩০ মার্চের 'সমাচার দর্পণ' লিখেছিল যে, ধর্মতলার জনৈক ডক্টর টৌলমিন গ্যাসের আলো জ্বালার একটি সম্পূর্ণ যন্ত্র নির্মাণ করেছেন। সংবাদদাতা আশা প্রকাশ করেছিলেন, লটারি কমিটি অবিলম্বে কলকাতার রাস্তায় ঐ প্রকারের আলো বসাবেন।

ওরিয়েণ্টাল কোম্পানির গ্যাস উৎপাদনের প্রথম কারখানাটি ছিল বর্তমান মহম্মদ আলি পার্কের কাছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে স্থানান্তরিত হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত সেটি তার বর্তমান ঠিকানায়, ক্যানাল রোড ইস্ট-এ পাকাপাকি হয়ে বসে ১৮৮০তে। গ্যাস কোম্পানির এই কারখানা আজও আছে, রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তার গ্যাসাধার

তোলা-নামানোর ইস্পাতের বিরাট খাঁচাটি চোখে পড়ে। তবে উৎপাদন দীর্ঘকাল বন্ধ।

এই গ্যাস কোম্পানির মাঠ থেকেই বাঙালিদের মধ্যে প্রথম বেলুনে আরোহণ করেছিলেন রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কলকাতায় তাঁর আগে অবশ্য ১৭৮৫তে উইন্টল এসপ্ল্যানেড থেকে ও রবার্টসন প্রথমবার ১৮৩৬-এ মুচিখোলা থেকে বেলুনারোহণ করেন। নবগোপাল মিত্রের প্রথম বাঙালি সার্কাস কোম্পানির মল্লবীর রামচন্দ্র প্রথম বেলুনে চড়েন পার্সিভাল স্পেন্সারের সঙ্গে। ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানির প্রাঙ্গণ থেকে এই বেলুন ছাড়া হয়েছিল ১৮৮৯-এর ১০ এপ্রিল। এ বছরেরই মে রামচন্দ্র তাঁর নিজের বেলুন 'সিটি অফ ক্যালকাটা'য় চড়ে প্রথম একক আরোহণ করেন ঐ একই জায়গা থেকে।[৯] কলকাতা এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বহুবার বেলুনে করে আকাশে উড়েছিলেন রামচন্দ্র। কয়েকবার প্যারাসুটে করে অবতরণও করেছিলেন। কয়েকবার তিনি তাঁর দুঃসাহসী কন্যাকে নিয়েও বেলুনে চড়েছিলেন বলে জানা যায়।[১০] প্রথম আরোহণের বছর পাঁচ-ছয় পরে একটি দুর্ঘটনায় আহত হন তিনি। ১৮৯২-এর ৯ অগাস্ট নিউমোনিয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়।

ও'শনেসি ও শিবচন্দ্র নন্দী

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিয়ে গবেষণার কাজ আগেই শুরু হয়ে থাকলেও, ব্যাপকভাবে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে, ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রবর্তনের পর। 'ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার' বৃত্তিরও তখনই জন্ম হয়।

প্রথম ভারতীয় ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (ডিগ্রিধারী নয়, কিন্তু পেশাদার) শিবচন্দ্র নন্দী ভারতের বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার জন্মদাতাদের মধ্যে অন্যতম।

ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ প্রচলনের অব্যবহিত পূর্বে 'সেমাফোর' পদ্ধতিতে সমুদ্র মোহানা থেকে কলকাতা অবধি প্রধানত জাহাজ-চলাচল সংক্রান্ত খবর সাঙ্কেতে প্রেরণ করা হতো। কিছুদূর অন্তর স্থাপিত উঁচু স্তম্ভের মাথা থেকে 'সেমাফোর' যন্ত্র সাঙ্কেতিক চিহ্ন নির্দেশ করতো। দূরবীক্ষণের সাহায্যে পরবর্তী স্তম্ভ সেটি চিনে নিয়ে একই চিহ্ন প্রদর্শন করতো। এই রিলে প্রথায় পরিবাহিত হতো সংবাদ। গড়ের মাঠে বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম প্রাঙ্গণে একটি স্তম্ভ আছে, যেখান থেকে এককালে সময় নির্দেশ করে তোপ দাগা হতো। এই 'বল্ টাওয়ার'টি আমাদের পরিচিত। কিন্তু এই একই স্তম্ভ যে সেমাফোর প্রযুক্তির জন্যও ব্যবহৃত হতো সেটা অনেকেরই বোধহয় জানা নেই।

ভারতের বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার জনক উইলিয়াম ব্রুক ও'শনেসি ১৮৩৫-এ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে যোগ দেন রসায়ন ও মেটেরিয়া মেডিকার প্রথম অধ্যাপক হিসাবে। বহু প্রতিভার অধিকারী ও'শনেসি মিণ্ট মাস্টার, কেমিক্যাল এগ্‌জামিনার অফ মিণ্ট এবং এশিয়াটিক সোসাইটির জয়েন্ট সেক্রেটারির পদেও বৃত হয়েছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর বহু নিবন্ধ থেকে জানা যায়, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বিশেষ করে গ্যালভানিক ব্যাটারি বিষয়ক তাঁর অসংখ্য

গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার ও সাফল্যের কাহিনী। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বিদ্যুতের সাহায্যে বারুদে অগ্নিসংযোগ করে নদীবক্ষে নিমজ্জিত 'ইকুইটেব্‌ল্' জাহাজকে চূর্ণ করা। জাহাজটি 'ফলতা স্যাণ্ডস'-এর কাছে ডুবে যাওয়ায় নৌ-চলাচলে প্রচণ্ড বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮৩৯-এ জলের নীচে বারুদ দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অসাধ্যসাধন করেন ও'শনেসি।[২২]

এই বছরেই বোটানিকাল গার্ডেনে পরীক্ষামূলকভাবে ২১ মাইল লম্বা তার খাটিয়ে (একটি সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে তারটিকে বারবার পাক খাইয়ে বসানো হয়েছিল) ও'শনেসি তার দুই প্রান্তের মধ্যে সঙ্কেত বিনিময়ে সফল হন। আমেরিকাতেও প্রায় একই সময়ে প্রথম বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ লাইন বসানো হচ্ছিল ওয়াশিংটন ও বাল্টিমোরের মধ্যে। পরীক্ষায় সফল হলেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে কলকাতা ও ডায়মণ্ডহারবারের মধ্যে সংযোগকারী টেলিগ্রাফ লাইন টানার অনুমতি ও অনুদান পেতে তাঁর প্রায় দশ বছর সময় লেগেছিল। দশ মাসের মধ্যে, ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে টেলিগ্রাফ লাইনের একুশ মাইল দীর্ঘ প্রথমাংশের কাজ সম্পূর্ণ হয়। সেই প্রথম বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ লাইনের একাংশ, যা জলের তলা দিয়ে টানা হয়েছিল, সযত্নে প্রদর্শিত রয়েছে বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহালয়ে।

এই প্রথম লাইন পাতার প্রথম মুহূর্ত থেকেই শিবচন্দ্র নন্দী তার সঙ্গে যুক্ত। কিংবা তারও আগে থেকে। ১৮৪৬-এ ২২ বছর বয়সে শিবচন্দ্র কলকাতার টাঁকশালের রিফাইনারি ডিপার্টমেণ্টে যোগ দেন। তাঁর কারিগরি দক্ষতা তখনই ও'শনেসির নজরে পড়ে এবং অচিরে শিবচন্দ্র হয়ে ওঠেন ও'শনেসির দক্ষিণ হস্ত।

১৮৫১-য় ডায়মণ্ডহারবার প্রান্ত থেকে ঐতিহাসিক টেলিগ্রাফ লাইনের উদ্বোধনী সমাচারটি প্রেরণ করেন শিবচন্দ্র। সেটি কলকাতায় লর্ড ডালহাউসির উপস্থিতিতে গ্রহণ করেন ও'শনেসি। এর অব্যবহিত পরে, টেলিগ্রাফ বিভাগের প্রথম ভারতীয় কর্মী শিবচন্দ্র অন্যান্য সংবাদ প্রেরকদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ইস্ট ব্যারাকপুর থেকে এলাহাবাদ, বেনারস থেকে মির্জাপুর, মির্জাপুর থেকে শিউলি এবং কলকাতা থেকে ঢাকা পর্যন্ত ৯০০ মাইল টেলিগ্রাফ লাইন পাতার কাজের তত্ত্বাবধায়ক শিবচন্দ্র এক অসাধ্যসাধন করেছিলেন। শুধু দক্ষ কারিগর হিসাবেই নয়, শিবচন্দ্র সৃজনশীলভাবেও তাঁর অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন এবং ইঞ্জিনিয়ার রূপে সেখানেই তাঁর বিশেষ সার্থকতা। ইলেকট্রিক তার খাটাবার জন্য তখন লোহার খুঁটি আনানো হতো ইংল্যাণ্ড থেকে। শিবচন্দ্র তালগাছের গুঁড়িকে এই কাজে ব্যবহার করেন। কিভাবে তাতে ইনসুলেটর বসানো হবে ও তার সংযুক্ত করা হবে তার অপূর্ব কিছু ড্রইংও সংরক্ষিত আছে দিল্লীর ন্যাশনাল আর্কাইভসে। এই প্রসঙ্গে শিবচন্দ্র একটি চিঠিতে (১৮৫৫-র ৩০ সেপ্টেম্বর) ও'শনেসিকে জানিয়েছিলেন, '... ..I have to this day forwarded to your address at Agra drawings of the Toddy palm-posts with their various insulators in the various methods in which I have used them for your lines, together with that

of an obelisk lately erected at Dehree, as well as those proposed for the flying line across the Soane River and one for Baroon'.[২২]

শিবচন্দ্রের এই চিঠি লেখার কালেই বাংলা ভাষায় ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ বিষয়ে প্রথম এবং সম্ভবত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 'ইলেকট্রিব টেলিগ্রাফ বা তড়িৎ বার্তাবহ প্রকরণ' নামক এই বইটির লেখক শ্রীরামপুরের কালিদাস মৈত্র। এই বই রচনার আগের বছর, ১৮৫৪-য় তিনি কারিগরি বিষয়ে বাংলায় আরেকটি ঐতিহাসিক বই রচনা করেছিলেন, 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে'। টেলিগ্রাফের বইটি 'ম্যানুয়াল' জাতীয় হলেও তাতে ভারতবর্ষে টেলিগ্রাফ লাইনের বিস্তার ও তার সমস্যা নিয়ে কিছু আলোচনা আছে। তবে লেখকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান, বাংলায় সংবাদ প্রেরণের জন্য একটি প্রস্তাব। এই প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য ইংরেজি Key-board-এর বিকল্প ব্যবস্থার একটি চার্টও প্রণয়ন করেছিলেন তিনি।[২৩]

বিজলি আলোর কলকাতা

ও'শনেসি ব্যাটারি দিয়ে 'চারকোল' লাইট জ্বালিয়ে বেশ কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু বাষ্প ইঞ্জিন চালিত ডায়নামো মেশিনের (বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র) আগমনের পরেই বিদ্যুতের সাহায্যে আলো জ্বালানোর ব্যাপারটা কার্যকর রূপ নিয়েছিল।

ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি পত্তনের কুড়ি বছরেরও আগে ১৮৮০ নাগাদ বিজলি আলো জ্বালার ব্যাপারে কলকাতায় যে-ভদ্রলোক প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনিও ছিলেন টেলিগ্রাফ বিভাগের সঙ্গেই যুক্ত। সেই লুই শোয়েণ্ডলার ছিলেন কলকাতার চিড়িয়াখানার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম এবং ভারতের টেলিগ্রাফ বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ইলেক্ট্রিসিয়ান। ১৮৭৬-এ সরকারী নির্দেশ অনুসারে তিনি ভারতের রেল স্টেশনের ইলেকট্রিক আলো দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রথম পরীক্ষার ফলাফল ১৮৭৯-এর মার্চ মাসের 'প্রসিডিংস অফ দা এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল'-এ প্রকাশিত হয়।

১৮৮০-র ৩১ মে ও ১০ জুন পরীক্ষামূলকভাবে হাওড়া স্টেশনে বিজলি আলো জ্বালানো হয়। তার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছিলেন শোয়েণ্ডলার, ১৮৮১তে প্রকাশিত 'রিপোর্ট অন্ দা ইলেকট্রিক লাইট অ্যাট দা ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানিজ স্টেশন, হাওড়া (ক্যালকাটা)'-য়। চারটি 'ডায়নামো ইলেকট্রিক মেশিন' চালাবার জন্য পঁচিশ অশ্বশক্তির একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড স্টিম ইঞ্জিন কিনেছিলেন শোয়েণ্ডলার। স্টিম ইঞ্জিনটিকে দিনের বেলায় যাতে জল তোলার কাজে ব্যবহার করা যায় সে ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। চারটি ডায়নামো স্বতন্ত্র ভাবে চারটি কার্বন আর্ক ল্যাম্পকে জ্বালাত; হাওড়ার দুটি গুদামে প্রথম আলো জ্বালানোর জন্য ব্যবহৃত এই কার্বন আর্ক ল্যাম্পের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল কাচের আস্তরণবিশিষ্ট দস্তার প্রতিফলক। প্রতিটি বাতির উজ্জ্বলতার পরিমাপ ছিল ১০০ বর্গফিট পিছু ১০ 'ক্যাণ্ডেল পাওয়ার'। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে-কথাটি

শোয়েণ্ডলার জানাতে ভোলেননি, সেটি ভারতীয় কারিগরদের নৈপুণ্য ও পারদর্শিতা বিষয়ক। পরীক্ষার পুরো কাজটিই পরিচালনা করেছিলেন ভারতীয় কারিগররা। শোয়েণ্ডলার মন্তব্য করেছিলেন যে, এর থেকেই বোঝা যায় ভবিষ্যতে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্থানীয় কারিগরদের দিয়ে ভারতে বিজলি আলো জ্বালাতে কোনোই অসুবিধা হবে না, তারা স্বচ্ছন্দে ডায়নামো মেশিন বা বিজলি আলোর মেরামতির কাজও করতে পারবে। প্রসঙ্গত শোয়েণ্ডলার ভারতীয় স্টিম ইঞ্জিন চালকেরও প্রশংসা করে জানিয়েছিলেন কিভাবে তিনি একটি যন্ত্রাংশের ত্রুটি সংশোধন করেন।[২৮]

আমাদের একটি ভুল ধারণা আছে যে, কলকাতায় বৈদ্যুতিক মোটর চালিত পরিবহণ ব্যবস্থা শুরু হয় ১৯০২-এ, যখন ঘোড়ায় টানা ট্রামের বদলে ইলেকট্রিক ট্রাম প্রথম দেখা দেয় (১৮৮২-তে অবশ্য কিট্সন কোম্পানির ১৬ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট স্টিম ইঞ্জিন দিয়ে ট্রাম চালানো হয়েছিল)। বিজলি আলোর রূপকার শোয়েণ্ডলারের আরেকটি অসামান্য কীর্তি ১৮৮১-তে কলকাতার চিড়িয়াখানায় প্রমোদ ভ্রমণের জন্য ইলেকট্রিক রেলওয়ে ব্যবস্থার প্রবর্তন। এই বছরেরই ৩ জানুয়ারি 'স্টেটসম্যানে' প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, এই বৈদ্যুতিক ট্রেনের সেকেণ্ড ক্লাসের মাথাপিছু ভাড়া ছিল চার আনা, আর স্টেট ক্যারেজের জন্য আট আনা। সমকালীন 'বামাবোধিনী' পত্রিকাতেও এই ইলেকট্রিক রেলওয়ের খবর ছাপা হয়েছিল।[২৫] মনে রাখা দরকার মাত্র দু'বছর আগে, ১৮৭৯-এর বার্লিন প্রদর্শনীতে ওয়ার্নার সিমেন্স্ প্রথম ইলেকট্রিক রেলওয়ে ব্যবস্থা জনসমক্ষে পেশ করেন।

দে, শীল অ্যাণ্ড কোম্পানি

আমাদের আলোচ্য আমল ছিল কার্বন আর্ক ল্যাম্পের যুগ। আর্ক ল্যাম্প জ্বালানো ও তা ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার বহু ঝঞ্ঝাট ছিল। অত্যন্ত উজ্জ্বল ও প্রচণ্ড হিস্হিস্ শব্দ সৃষ্টিকারী এই আলো ঘরের মধ্যে ব্যবহারের উপযোগী ছিল না। তাছাড়া কার্বনের দুটি রডের প্রান্তের মধ্যে সারাক্ষণ বজায় রাখতে হতো সমান দূরত্ব এবং আলো জ্বললেই কার্বনের রড পুড়ে ছোট হতে থাকতো। ফলে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা প্রজ্বলিত অবস্থায় কার্বন রডের প্রান্ত দুটিকে ক্রমেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হতো।

গর্জনশীল আর্ক ল্যাম্প জ্বালানোর এই ঝঞ্ঝাটের কথা মনে রাখা দরকার, সে-যুগে বাঙালির ইলেকট্রিক কোম্পানি 'দে, শীল'-এর সাফল্যের খতিয়ান নেওয়ার জন্য। ১৮৮৫-র ৩০ জানুয়ারি এবং ঐ বছরের ১ ফেব্রুয়ারির 'স্টেটসম্যান' সংবাদপত্র বিবাহের শোভাযাত্রায় একটি নতুন জিনিস চোখে পড়ার কথা উল্লেখ করে। রাতের শোভা-যাত্রার বিজলি আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিল চিৎপুরের রাস্তা। সেদিন ১৫০০ ক্যাণ্ডেল পাওয়ার শক্তিবিশিষ্ট 'সেরিন' ল্যাম্প 'অত্যন্ত উজ্জ্বল ও স্থিরভাবে' আলোক বিতরণ করেছিল। প্রতিবেদনে জানানো হয়, ইলেকট্রিসিয়ান ভদ্রলোকের পদবী 'শীল,' তিনি দে, শীল অ্যাণ্ড কোম্পানির অংশীদার। তখন এই কোম্পানির ঠিকানা ছিল ৩৬ ওয়েলিংটন স্কোয়ার।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যদের সম্মানার্থে ১৮৮৬-র ২৮ ডিসেম্বর একটি সান্ধ্য পার্টির আয়োজন হয়েছিল। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি 'Very kindly sang a few songs of his own composition assisted by a strong chorus.' এই উপলক্ষে দে, শীল অ্যাণ্ড কোম্পানি সভাগৃহকে বিজলি আলোয় উদ্ভাসিত করে এবং তাদের নিজেদের তৈরি ইলেকট্রিক যন্ত্রও প্রদর্শন করে। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ফাদার লাফোঁ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক মিস্টার এলিয়ট তাঁদের এই যন্ত্রের প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন।

মহারানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি অনুষ্ঠান উপলক্ষে ১৮৮৭-র ১৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতা আলোকসজ্জায় শোভিত হয়। মিডলটন স্ট্রিটে দ্বারভাঙার মহারাজার গৃহটিতে তখন বিজলি আলো জ্বালিয়েছিল দে, শীল কোম্পানি। মনে রাখা দরকার, কলকাতার খুব কম বাড়িতেই তখন বিজলি আলো জ্বালানো হয়েছিল। গভর্নর্স হাউসেও সে সময়ে বিজলি আলো দেওয়া হয়নি।

১৮৮৮-র ২০ জানুয়ারি টাউন হলে 'মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি'র বার্ষিক অধিবেশন ও প্রদর্শনীতে (annual 'conversation'-এ) এই কোম্পানি ঘোড়ার গাড়িতে ব্যবহারের জন্য নিজেদের তৈরি ব্যাটারি দিয়ে জ্বালা ইলেকট্রিক আলো প্রদর্শন করে। তাছাড়া তাঁদের ইলেকট্রিক মোটর চালিত সেলাই-কল ও টেবিল ফ্যানও খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। স্বয়ং লর্ড ডাফ্‌রিন 'had a conversation with the manufacturer, and congratulated him on his ingenuity.'[২৬]

১৯১২-র থ্যাকার্স ক্যালকাটা ডাইরেক্টরি থেকে এই প্রতিভাধরের পুরো নামটি জানা যায় : কালিদাস শীল। তিনি তখন এই কোম্পানির ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর। ৬ নম্বর সাগর ধর লেন-এ অবস্থিত দে, শীল অ্যাণ্ড কোম্পানি সে-সময়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, সায়েন্টিফিক ইন্সট্রুমেণ্ট মেকার, ইলেকট্রোপ্লেটার, গিল্ডার, এনগ্রেভার, ওয়াচ-মেকার ও বাস ফাউণ্ডারের কাজ করতো।

পাঙ্খা এবং ইলেকট্রিক পাঙ্খা

উষ্ণ আর্দ্র কলকাতায় যন্ত্রের সাহায্যে টানা-পাখা চালানোর সমস্যা সমাধানের জন্য অসংখ্য উদ্ভাবক মাথা ঘামিয়েছেন। তার মধ্যে কয়েকজন বাঙালিরও নাম পাওয়া যায়। ঘড়ি-যন্ত্র ব্যবহার করে টানা-পাখা ও ঘোরানো-পাখা নির্মাণের পেটেণ্ট নেওয়ার জন্য রাধাকিশোর সিংহ ও যামিনীকান্ত রায় ১৯০৪-এ দরখাস্ত করেন (সংখ্যা ৮৫)। আর. কে. সিন্‌হা ১৯০৭-এ দরখাস্ত করেন (সংখ্যা ৬৯) একটি হট্‌-এয়ার ইঞ্জিন চালিত ফ্যানের পেটেণ্ট নেওয়ার জন্য। এমনকি কলকাতার পেটেণ্ট অফিসে প্রথম যে দরখাস্তটি জমা পড়েছিল, সেটিও 'পাঙ্খা-পুলিং মেশিনারি' সংক্রান্ত। ১৮৫৬-র ২ সেপ্টেম্বর আলফ্রেড ডি-পেনিং এই দরখাস্ত পেশ করেন। কিন্তু টানা-পাখার চালকের ভূমিকায় মানুষের পরিবর্তে যন্ত্রকে নিযুক্ত করার কাজে এঁরা কেউই খুব সফল হননি।[২৭]

১৮৯০ থেকে কাজ শুরু করে প্রায় আট বছর পরে হিট্‌লি গ্রেশাম লিমিটেড প্রথম একটি মোটামুটি কার্যোপযোগী 'পাঙ্খা-পুলিং মেশিন' তৈরি করেন। কেরোসিনকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে একটি হট্-এয়ার ইঞ্জিন চালিয়ে তার সাহায্যে টানা-পাখা দোলানোর ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৯৮-এর সেপ্টেম্বর সংখ্যার 'ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ার' পত্রিকার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, শিয়ালদার প্ল্যাটফর্মে এইরকম 'হিট্‌লি-পাঙ্খা' বসানো হয়েছিল।

এর বছর দেড় দুয়ের মধ্যেই ইমামবাগ লেনে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির প্রথম জেনারেটিং স্টেশন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। আলোও নয়, যন্ত্রের চাকা ঘোরাবার জন্য মোটরও নয়, সি. ই. এস. সি.-র প্রথম ব্যবসায়িক সাফল্য এসেছিল ঘরে-ঘরে ইলেকট্রিক-পাখা প্রবর্তনের সুবাদে। লোকে যাতে ইলেকট্রিক কানেকশন নেয় তার জন্য এই কোম্পানি তখন মাসিক চার টাকা হারে ইলেকট্রিক ফ্যান ভাড়া দেওয়ারই ব্যবসা শুরু করেছিল।[২৮]

আলোর ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রাস্তার আলোর ব্যাপারে ইলেকট্রিসিটি কিন্তু দীর্ঘকাল গ্যাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। ১৯১৩-য় বালিগঞ্জ স্টোর রোডে (বর্তমান গুরুসদয় দত্ত রোডে) গ্যাস বনাম বিজলি আলোর একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার আয়োজন করা হয়। তখন বলা হয়েছিল, এই পরীক্ষার পর খরচের তুলনামূলক বিচার শেষ হলে একটি বিশেষ কমিটি স্থির করবে কলকাতার কিছু রাস্তায় বাড়তি আলো দেওয়ার জন্য ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করা হবে কিনা। প্রতিবেদনে এ-কথাও জানানো হয়েছিল যে, ইলেকট্রিক আলোর উজ্জ্বলতা ৪৫ থেকে ৫০ ক্যাণ্ডেল পাওয়ার, আর গ্যাসের আলোর ক্যাণ্ডেল পাওয়ার ৬০।[২৯]

হেমেন্দ্রমোহন বসু ও উপেন্দ্রকিশোর রায়

উপেন্দ্রকিশোর ওরফে ইউ. রে. এবং তাঁর ভগ্নিপতি হেমেন্দ্রমোহন ওরফে এইচ. বোস-এর বিবিধ কীর্তির মধ্যে এই প্রবন্ধে শুধু মানুষের স্মৃতিকে অমর করার দুটি যান্ত্রিক কৌশল সংক্রান্ত অবদানই সংক্ষেপে আলোচিত হবে। মৃত্যুর পরেও মানুষের প্রতিকৃতি ও কণ্ঠস্বর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে যথাক্রমে ক্যামেরা এবং ফোনোগ্রাফ।

১৮৪০-এ কলকাতায় ফোটোগ্রাফির আগমন ও তৎপরবর্তী প্রায় আশি বছর বাঙালিদের ফোটোগ্রাফিচর্চার বিশদ বিবরণ বর্তমান প্রবন্ধকারের একটি গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ফোটোগ্রাফির কারিগরি ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রেখেছেন একজন মাত্র বাঙালি। তাঁর নাম উপেন্দ্রকিশোর। মুদ্রণ বিশারদ হিসাবে উপেন্দ্রকিশোরের সৃজনীশক্তি টেকনিক্যাল ফোটোগ্রাফির উন্নতি সাধনেই নিযুক্ত হয়েছিল। ফোটোগ্রাফ বা পেইন্টিঙের প্রতিচ্ছবি সুলভে বইয়ের পাতায় ছাপার জন্য হাফটোন ব্লকের প্রচলন হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। হাফটোন ব্লক তৈরির জন্য প্রয়োজন হয় এক বিশেষ ধরনের ক্যামেরার, যাকে 'প্রসেস ক্যামেরা' বলা হয়। উপেন্দ্রকিশোরের কারিগরি গবেষণা এই প্রসেস ক্যামেরা সংক্রান্ত।

প্রসেস ক্যামেরা ব্যবহারের পদ্ধতিকে বিজ্ঞানসিদ্ধ করে তোলা, তার মধ্যে গাণিতিক নির্ভুলতা আনা এবং এই ক্যামেরাকে অভিনবভাবে ব্যবহার করার বহু দিশা তিনি দেখিয়েছিলেন। সেকালে মুদ্রণ বিশারদরা যে-পত্রিকাকে 'বাইবেল' রূপে গণ্য করতেন, সেই 'পেনরোজেস্ পিকটোরিয়াল অ্যানুয়াল'-এ ১৮৯৭ থেকে ১৯১১-১২-র মধ্যে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র সুকুমারের দুটি গবেষণাপত্রের কথা বাদ দিলে আজ অবধি দ্বিতীয় কোনো বাঙালি বা ভারতীয় এ সম্মান অর্জন করতে পারেননি। প্রসেস ক্যামেরার সঙ্গে ব্যবহার করার জন্য, উপেন্দ্রকিশোর প্রস্তাবিত 'সিক্সটি ডিগ্রি স্ক্রিনের' আইডিয়াটি আত্মসাৎ করে শুলৎজে নামক জনৈক তঞ্চক নিজের নামে যখন পেটেন্ট গ্রহণ করে, পেনরোজের পাতাতেই উপেন্দ্রকিশোর নিরাসক্তিভরে জানিয়েছিলেন, 'To the craft it matters little who gets the credit for a particular invention. What directly concerns them is the addition of a valuable resource to their equipment.' প্রসেস ক্যামেরার সঙ্গে ব্যবহারের জন্য আরও দুটি যন্ত্রাংশ নির্মাণ করেছিলেন তিনি। 'মাল্টিপ্‌ল ডায়াফ্রাম' ও 'স্ক্রিন অ্যাডজাস্টমেন্ট ইণ্ডিকেটর'। শেষোক্ত যন্ত্রাংশটি পেনরোজ কোম্পানি তাদের প্রসেস ক্যামেরার সঙ্গে অতিরিক্ত অ্যাক্সেসরি হিসাবে বিক্রি করতো।[৩০]

কেশতৈল 'কুন্তলীন' ও এই সুবাদে প্রবর্তিত 'কুন্তলীন পুরস্কার'-এর সূত্রেই এইচ. বোসের নাম আজও মুষ্টিমেয় লোক মনে রেখেছেন। কিন্তু হেমেন্দ্রমোহনের সৃজনশীলতার সেরা পরিচয় রয়েছে 'ফোনোগ্রাফ' রেকর্ডের উৎপাদনের প্রকৌশল আয়ত্ত করার মধ্যে। গ্রামোফোন যন্ত্রের আদি পুরুষ ফোনোগ্রাফ। এডিসন যার আবিষ্কর্তারূপে জনপ্রিয় কল্পনায় স্বীকৃত। ফোনোগ্রাফে যে রেকর্ড বাজত তার আকার চ্যাপটা থালার মতো নয়, চোঙার মতো। তাই তাকে সিলিণ্ডার রেকর্ড বলা হতো। মোমের রেকর্ডও বলতো অনেকে। কারণ, এক বিশেষ ধরনের মোমের আবরণের গায়েই খাঁজ কেটে কেটে শব্দদের বন্দী করা হতো সেখানে।

কলকাতায় ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ফোনোগ্রাফ এসে পৌঁছয়। আনিয়েছিলেন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ফাদার লাফোঁ, ক্লাসে ছাত্রদের অনুশীলনের জন্য। লাফোঁর ছাত্র জগদীশচন্দ্র বসুও ফোনোগ্রাফ আনিয়েছিলেন ১৮৯১ নাগাদ এবং রবীন্দ্রনাথসহ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন গায়ক-গায়িকার গান রেকর্ড করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'খামখেয়ালি সভা'র প্রথম অধিবেশনেও (২৪ মাঘ, ১৩০৩) 'ফোনোগ্রাফ যন্ত্র শ্রবণ' করার উল্লেখ রয়েছে।

প্রচলিত ধারণা অনুসারে 'এইচ. এম. ভি.' (বর্তমান 'গ্রামোফোন কোম্পানি অফ ইণ্ডিয়া') ভারতের প্রথম রেকর্ড-নির্মাণকারী সংস্থা। কলকাতায় এই কোম্পানি তাদের শাখা অফিস খুলেছিল ১৯০১-এ। কিন্তু বেলেঘাটায় তাদের রেকর্ড তৈরির কারখানা স্থাপিত হয় ১৯০৭-এ। তবে বছর দুয়েক আগেই এইচ. বোস ৪১, ধর্মতলা স্ট্রিটে স্থাপন করেছেন 'দা টকিং মেশিন হল'। এটি ছিল ফোনোগ্রাফ যন্ত্র ও সিলিণ্ডার রেকর্ড

বিক্রয়ের সংস্থা। শুধু আমদানি করা রেকর্ড বিক্রি নয়, নিজের তৈরি রেকর্ডও বিক্রি করতেন তিনি। এইচ. বোসের রেকর্ডের শিল্পীই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের কালে এইচ. বোস শুধুমাত্র দেশপ্রেমের গানের পসরা নিয়েই ব্যবসা শুরু করেন। এই কোম্পানির ১৯০৬-এর মার্চ মাসের ক্যাটালগ থেকে জানা যায়, তখন রবীন্দ্রনাথের চোদ্দটি ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বারোটি গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে, এছাড়াও 'বন্দে মাতরম্' সম্প্রদায় গীত 'বন্দে মাতরম্' এবং কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'ভাই সব দেখ চেয়ে বাজার ছেয়ে' বা 'নবীন এ অনুরাগ রেখ রেখ মনে রেখ' ইত্যাদি উদ্দীপনাময় গানের রেকর্ডও প্রকাশিত হয়েছিল।

গ্রামোফোন রেকর্ড বাজানো ও সংরক্ষণ করা তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক হওয়ায় ক্রমেই সিলিণ্ডার রেকর্ডের কদর কমতে থাকে। হেমেন্দ্রমোহন তখন ফ্রান্সের বিখ্যাত রেকর্ড নির্মাতা (এবং সিনেমা ব্যবসায়ী) প্যাথে কোম্পানির সঙ্গে একটি চুক্তি করে যৌথভাবে 'Pathe—H. Bose's Record' লেবেলে গ্রামোফোনের ডিস্ক রেকর্ড নির্মাণ শুরু করেন। হেমেন্দ্রমোহন গৃহীত সিলিণ্ডার রেকর্ডগুলি ফ্রান্স বা বেলজিয়ামের কারখানা থেকে ডিস্ক রেকর্ডে রূপান্তরিত হয়ে আসত। Pathe—H. Bose's Record-এ রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' (আবৃত্তি) এবং 'বন্দে মাতরম্' গান কবিকণ্ঠের প্রাচীনতম উদাহরণ, যা সংরক্ষিত হয়েছে। 'এইচ. বোসেস্ রেকর্ড' অর্থাৎ সিলিণ্ডার রেকর্ড একটিও রক্ষা পায়নি, এখন অবধি এই অনুমান।

ভারতের প্রথম রেকর্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা, স্বদেশী রেকর্ডের জন্মদাতা এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম রেকর্ড-নির্মাতা এইচ. বোস-এর উদ্যোগ একবারই স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ১৯০৬-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড এগ্রিকালচারাল এগজিবিশন'-এ এইচ. বোস-এর নির্মিত 'সিলিণ্ডার রেকর্ড' একটি স্বর্ণপদক লাভ করে। উল্লেখযোগ্য, যাঁর বিচারে তিনি পুরস্কৃত হন, তিনি জগদীশচন্দ্র বসু।[৩১]

চক্রযানের কলকাতা

চক্রযানের কলকাতা বললে ঘোড়ার গাড়ি থেকেই শুরু করা উচিত। কিন্তু এই প্রবন্ধের পরিসর কলকাতার যানবাহনের সম্পূর্ণ ইতিহাস সংক্ষেপেও পেশ করার অনুমতি দেয় না। কলকাতার ট্রামওয়ে ও রেলওয়ের কথা বিচ্ছিন্নভাবে হলেও অনেকেই আলোচনা করেছেন। এখানে শুধু সাইকেল ও হাওয়াগাড়ি সম্বন্ধে কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

সাইকেলের আদিপুরুষ দুই বা তিন চাকাওলা 'ভেলোসিপেড'-এ চাকা ঘোরানোর জন্য চেন বা প্যাডেল ছিল না। আরোহী তাতে চড়ে পায়ে করে ঠেলে-ঠেলেই অগ্রসর হতো। ১৮৬৭-৬৮ নাগাদ বর্ধমানের মহারাজা এই ধরনের একটি তিন চাকার সাইকেল আনিয়েছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত একটি সংবাদের সূত্রে তা জানা যায়।[৩২] বছর দুই পরে, ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে

(১০ শ্রাবণ) 'সুলভ সমাচার'-এ প্রকাশিত হয়, 'বছর দুই হইল, কলিকাতায় দুই চাকার ও তিন চাকার এক রকম গাড়ী আসিয়াছে, যাহার উপর চড়িয়া পা নাড়াইলেই গাড়ীর মতো দৌড়ায়।' বোঝা যাচ্ছে প্যাডেল-যুক্ত সাইকেলের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। কিন্তু এর চেয়েও উল্লেখযোগ্য একটি সংবাদ পূর্বোক্ত পত্রেই প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের (১২৭৭ সনের) ১৫ অগ্রহায়ণ, 'কলিকাতায় অনেকে দেখিয়া থাকিবেন তিন চাকার একরকম গাড়ী আছে, তাহা ঘোড়ায় টানে না, যিনি চড়েন তাঁহাকেই দুই পা দিয়া চাপ দিতে হয়, আর গাড়ীখানি ঘোড়ার গাড়ী অপেক্ষাও দৌড়াইয়া চলিয়া যায়। সম্প্রতি সাঁতরাগাছিতে একজন কর্ম্মকার [প্রসন্নকুমার ঘোষ] বুদ্ধি খাটাইয়া একখানি সেই রকম গাড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহাতে অগ্রে একজন এবং পশ্চাতে দুইজন পা দিয়া চাকা ঘুরাইয়া থাকে এবং গাড়ীখানি আপনাআপনি চলিয়া যায়।'

প্রসন্নকুমার ঘোষের নির্মিত এই সাইকেলটি কারিগরি পরিভাষায় ছিল 'ট্যাণ্ডেম' সাইকেল, অর্থাৎ যা একাধিক সওয়ারির সম্মিলিত প্রয়াসে ধাবমান হয়।

তিন চাকার সাইকেলে চড়ে কলকাতার রাস্তায় ভ্রমণ আজ যতই বিস্ময়কর মনে হোক, খ্যাতনামা বাঙালিদের মধ্যেও অনেকেই তখন এই ধরনের সাইকেল ব্যবহার করতেন বলে জানা যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে অসিতকুমার হালদার 'রবি-তীর্থ' গ্রন্থে লিখেছেন, 'তখন নতুন নতুন সাইকেল উঠেছে, বড়দাদা মহাশয় ব্রাউন পেপারে জামা তৈরি করে সাইকেল চড়ে সারা চৌরঙ্গী পরিভ্রমণ করেছিলেন।' কলকাতার প্রথম বাঙালি ফোটোগ্রাফিক স্টুডিওর প্রতিষ্ঠাতা নীলমাধব দে দীর্ঘকাল নিয়মিত ট্রাই-সাইকেল ব্যবহার করেছেন।[৩৩]

বিচিত্র রূপধারী আরেক ধরনের প্রাচীন দ্বিচক্রযান কলকাতার রাস্তায় দেখা দিয়েছিল। ইংরেজিতে এদের বলা হয় 'পেনি-ফার্দিং' অর্থাৎ এদের চাকা দুটি আকারে অসমান। সাধারণত সামনের চাকাটি হতো বিশাল আকারের এবং পিছনেরটি খুবই ছোট। এই ধরনের সাইকেলে চড়ে আমেরিকার থমাস স্টিভেন্স ১৮৮৬র সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় আসেন। পাঁচদিন এ শহরে কাটিয়েছিলেন তিনি। সাইকেলে চেপে তিনিই প্রথম বিশ্বপর্যটন করেন। কলকাতার ডালহাউসি অ্যাথলেটিক ক্লাবের বাইসাইকল শাখার সতেরোজন সদস্য তাঁর সঙ্গে একদিন ময়দানে শুভেচ্ছা-মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন।[৩৪]

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র জ্যোৎস্নানাথের পেনি-ফার্দিং চড়া নিয়ে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী লিখেছেন, '...দুই ভাইয়ে মিলে সেকালের সেই পুরোনো মস্ত উঁচু বাইসিক্লে জোড়াসাঁকোর গলি দিয়ে যাচ্ছেন। এমন সময় এক বুড়ি চুনের বস্তা নিয়ে আগে আগে যাচ্ছে। জ্যোৎস্নাদা তার ঘাড়ে গিয়ে পড়ে তাকে ফেললেন, নিজেও পড়লেন। তাঁর দেখাদেখি সুরেনও পড়ে গেলেন। পরে বুড়ি উঠে গা ঝেড়েঝুড়ে পিছন দিকে ঘুরে শুধু 'সঙ' এই কথাটি শ্লেষের স্বরে উচ্চারণ করে দু'ছেলেকে অপ্রস্তুত করে দিয়ে চলে গেল।'[৩৫]

উনবিংশ শতাব্দীতে সাইকেল চড়ার শখ চেপেছিল আরও তিনজন বাঙালি মনীষীর। জগদীশচন্দ্র বসু, নীলরতন সরকার ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রায় ক্লাব তৈরি করেছিলেন। রোজ সকালে চাকায় চড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতেন তাঁরা। জগদীশচন্দ্রের পত্নী অবলা দেবী ও নীলরতনের পত্নী নির্মলা দেবীকে তাঁরা দলে টেনেছিলেন। তাঁদের এই দলেরই আর-এক সদস্য হেমেন্দ্রমোহন বসু হলেন প্রথম বাঙালি, যিনি বড় আকারে সাইকেলের ব্যবসা শুরু করেন। ভারতে সাইকেল-নির্মাণ শিল্পের প্রবর্তক 'সেন-পণ্ডিত' ও 'সেন-র‍্যালে' সংস্থার স্থাপক সুধীরকুমার সেন তাঁর প্রথম বাইসাইকেলটি কিনেছিলেন ৬৬-১ হ্যারিসন রোডে এইচ. বোসের দোকান থেকে। সে সময়ে গিরিশচন্দ্র শর্মা ও চিত্ততোষ বসু গয়া ও হাজারিবাগ হয়ে রাঁচি ঘুরে আসার পর বাঙালি সাইক্লিস্ট হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[৩৬]

এইচ. বোস শুধু সাইকেল নয়, মোটরগাড়ির ব্যবসাতেও বাঙালিদের মধ্যে প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন। ৪৪ ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে অবস্থিত তাঁর গ্রেট ইস্টার্ন মোটর কোম্পানির বিজ্ঞাপন নিয়মিত প্রকাশিত হতে শুরু করে ১৯১১ থেকে।

কলকাতায় মোটরগাড়ির আগমন ঘটে কবে? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে পরিষ্কার করে বলে নেওয়া দরকার, মোটরগাড়ি বলতে আমরা কি বোঝাতে চাই। পেট্রল পুড়িয়ে যে গাড়ি চলে? কিন্তু শুধু পেট্রল কেন, ইলেকট্রিক বা বাষ্পচালিত মোটরগাড়িও কলকাতার রাস্তায় দেখা দিয়েছে বিংশ শতাব্দী শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। যদি 'অটোমোবাইল'-এর বাংলা প্রতিশব্দ বিচার করি, তাহলে স্বয়ংচালিত যে কোনো রাস্তায় চলার যন্ত্রযানকেই মোটরগাড়ি বলা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিত-ভাবেই বলতে পারি ১৮৭৩-এ কলকাতায় প্রথম এইরকম যন্ত্রযান চালাবার কৃতিত্ব কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ার উইলিয়াম ক্লার্কের। তিনি নিজের ডিজাইন অনুসারে রাস্তা-গড়ার জন্য এই রোড-রোলারটি তৈরি করিয়ে আনিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ড থেকে। এরপর ১৮৭৫-এ তিনি আরও একটি রোড-রোলার আনান।[৩৭]

শুধু যাত্রীবাহী মোটরগাড়ি প্রথম কবে কলকাতায় এল, তা নিয়ে কিঞ্চিৎ মতদ্বৈধ আছে। রাধারমণ মিত্র 'কলিকাতা দর্পণ'-এ ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের উল্লেখ করার পর অনেকেই বিনা প্রশ্নে এই সনটিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। রাধারমণবাবু তাঁর তথ্যের সূত্র উল্লেখ করেননি। ১৮৯৬-এর সংবাদপত্র কিন্তু এই তথ্য সমর্থন করে না। সমকালীন পত্রিকায় ১৮৯৯-এর ফেব্রুয়ারির পূর্বে কলকাতায় মোটরগাড়ি আগমনের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি। আর খবরের কাগজে মোটরগাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন শুরু হয় ১৯০০ থেকে। তবে ডানলপ কোম্পানির নথিপত্র প্রমাণ করে যে, ভারতের প্রথম মোটরগাড়িটি কলকাতায় পৌঁছেছিল ১৮৯৭-এ। কলকাতার প্রথম মোটরগাড়ির ক্রেতাদের মধ্যে Aubert নামে এক ব্যক্তি বাষ্পচালিত 'সারপলেট' ও অ্যাণ্ড্রু ইউল কোম্পানির রেনল্ডস্ একটি 'পুজো' (Peugeot) কিনেছিলেন। বাঙালিদের মধ্যে প্রথম মোটরগাড়ির খরিদ্দার জনৈক সি. বসাক (C. Bysak)।[৩৮]

কলকাতায় প্রথম কে সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে মোটরগাড়ি তৈরি করেছিলেন সেবিষয়ে

কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই। স্ব-শিক্ষিত যন্ত্রবিদ বিপিনবিহারী দাস বালিগঞ্জে তাঁর নিজস্ব গ্যারেজে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে একটি মোটরগাড়ি নির্মাণ করেন। গাড়িটি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি কিনেছিল এবং মতিলাল নেহরু ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সেটি ব্যবহার করতেন। এর বছর দুই পরে তিনি দ্বিতীয় গাড়িটি নির্মাণ করেন কলকাতা কর্পোরেশনের জন্য। নভেম্বর মাসে গাড়ির ট্রায়াল-রান হয় এবং পুলিশ গাড়িটির জন্য ৩৫৯৭৭ নম্বর বরাদ্দ করে। টায়ার, স্পার্ক প্লাগ, কারবুরেটর ও ম্যাগনেটো ছাড়া এই ১৫ অশ্বশক্তির চার সিলিণ্ডার বিশিষ্ট গাড়িটির বাকি সবকিছুই একা হাতে বানিয়েছিলেন তিনি। সার্থকনামা 'স্বদেশী' গাড়িটি তিন হাজার টাকায় কিনেছিল কর্পোরেশন। মিউনিসিপ্যাল গেজেটের পাতাই সাক্ষী যে, তৎকালীন বাঙালি কাউন্সিলাররাই ছিলেন বিপিনবিহারীর সবচেয়ে বড় সমালোচক। বি. কে. বসু, সুশীলচন্দ্র সেন, ভূপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, পি. এন. গুহ ও প্রোফেসর এস. সি. সেন প্রমুখ আগাগোড়া সন্দেহ প্রকাশ করে এসেছেন দাসের এই উদ্যোগের সাফল্য ও উপযোগিতা সম্বন্ধে। ডি. পি. খৈতান, সন্তোষকুমার বসু (মেয়র) এবং মোটর ভিহিকল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জে. সি. গুপ্ত ছিলেন বিপিনবিহারীর পক্ষে।

১৯৩৮-এ মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে মৃত্যু হয় বিপিনবিহারীর। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ দিয়ে 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট' জানিয়েছিল যে, বিপিনবিহারী গোয়ালিয়র রাজ্যের জন্যও একটি মোটরগাড়ি তৈরি করেন এবং সেটি বহু বছর ধরে ভালভাবেই চালু ছিল। মৃত্যুর সময়ও তিনি একটি গাড়ি তৈরির কাজ করছিলেন।[৩৯]

আকাশবাণীর কল

রেডিওর বাংলা প্রতিশব্দ 'আকাশবাণী' প্রণয়নের কৃতিত্ব সুকুমার রায়ের। ১৯২২-এ 'স্বদেশ' পত্রিকায় রেডিও বিষয়ে তিনি যে প্রবন্ধ রচনা করেন তার নামই ছিল 'আকাশবাণীর কল'।

উল্লেখযোগ্য, ঐ বছরেরই ১২ মার্চ কলকাতায় 'মার্কনি' ওয়্যারলেস্ যন্ত্রের সাহায্যে প্রথম বিনা তারে শব্দবার্তা পাঠানো হয়। 'হ্যালো, হ্যালো, দা স্টেটসম্যান্! ব্যারাকপুর রেসকোর্স থেকে বলছি…'—কলকাতার এই প্রথম বেতারবার্তা। অবশ্যই ভাষাটি ছিল ইংরেজি।[৪০]

বেতারে সঙ্কেত প্রেরণের গবেষণা অবশ্য বহুকাল আগেই শুরু করেছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। ১৮৯৫-এ তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে 'মাইক্রোওয়েভ' বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ সৃষ্টি, প্রেরণ ও গ্রহণ ব্যবস্থা প্রথম প্রদর্শন করেন। প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ঘর থেকে পাঠানো তরঙ্গটি একটি বন্ধ ঘরের দরজা ও দেওয়াল ভেদ করে ধরা পড়েছিল অধ্যাপক পেড্লারের ঘরে রাখা গ্রাহক যন্ত্রে। ঐ বছরেই টাউন হলে জগদীশচন্দ্র বেতার তরঙ্গের সাহায্যে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের বিপুল বপু ও দুটি রুদ্ধ কক্ষের বাধা পেরিয়ে পরবর্তী ঘরে একটি লোহার গোলা ও পিস্তল ছুঁড়ে দর্শকদের স্তম্ভিত করে দেন।[৪১]

কলকাতার প্রথম নিয়মিত বেতার অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয় ১৯২৩-এ। কলকাতা

হাইকোর্টের সামনে টেম্পল চেম্বার্সের উপর তলায় স্থাপিত একটি স্টুডিও থেকে 'রেডিও ক্লাব অফ বেঙ্গল' প্রতিদিন সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা ইউরোপীয় ও এক ঘণ্টা ভারতীয় সঙ্গীত প্রচার শুরু করে। কানে হেডফোন লাগিয়ে শুনতে হতো এই অনুষ্ঠান।[৪২]

১৯২৫ নাগাদ কলকাতায় আর একটি ট্রান্সমিটার থেকে সান্ধ্য অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়, ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্স-এর বেতার গবেষণাগার থেকে। এই গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর শিশিরকুমার মিত্রই নির্মাণ করেছিলেন ট্রান্সমিটার যন্ত্রটি। গবেষণারত ছাত্রদের স্বার্থেই পরীক্ষামূলকভাবে এই সম্প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছিল।

কলকাতার বর্তমান রেডিও স্টেশনের জন্ম ১৯২৭-এর ২৬ অগাস্ট। সেকালের 'ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি' নামে একটি বেসরকারি সংস্থাই শেষ পর্যন্ত 'আকাশবাণী' কেন্দ্রে পরিণত হয়।[৪৩]

১৯২৭ অবধি কলকাতায় এই দুটি ছাড়া তৃতীয় কোনো ট্রান্সমিটার ছিল না। শিশিরকুমারের বেতার যন্ত্রের কল সাইন ছিল 2 C Z। ১৯২৭-এ 'বিচিত্রা' পত্রিকায় দুই কিস্তিতে শিশিরকুমার বেতার-বার্তা প্রেরণের বৈজ্ঞানিক কৌশল ও সহজেই বেতার গ্রাহক-যন্ত্র নির্মাণের প্রণালী বিবৃত করেন। প্রবন্ধের সঙ্গে বিজ্ঞান কলেজে তৈরি বেতার-বার্তা প্রেরক ও নৈসর্গিক বৈদ্যুতিক উৎপাত ধরবার (Atmospherics) যন্ত্রের আলোকচিত্রও মুদ্রিত হয়।

'স্পেকট্রোস্কোপি'তে ডক্টরেট খেতাবধারী শিশিরকুমারের উদ্যোগে ও একক প্রচেষ্টাতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্তরে ১৯২৫-এ 'বেতার' (বর্তমানে 'রেডিও ইলেকট্রনিক্স') বিষয়ে পাঠক্রম ও গবেষণা প্রবর্তিত হয়। ফ্রান্সে প্রোফেসর গাটন-এর গবেষণাগারে রেডিও-ভাল্‌ভ্‌ নিয়ে গবেষণা করার সময়েই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে এই নতুন পাঠ প্রবর্তনের ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন এবং সমর্থনও লাভ করেছিলেন। শুধু কলকাতা নয়, ভারতেও 'ইলেকট্রনিক্স' গবেষণার পথিকৃৎ শিশিরকুমার এম. এস-সি (পদার্থবিদ্যা) কোর্সে শুধু 'বেতার' বিষয়ে একটি 'পেপার' চালু করেই নিরস্ত হননি। গবেষণাগারে তিনি মাইক্রোফোন, লাউডস্পিকার ও ইলেকট্রন টিউব তৈরি করেছেন, 'বায়ুমণ্ডল' নিয়ে, বিশেষ করে 'আয়োনোস্ফিয়ার' নিয়ে চালিয়েছেন আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা।

চারের দশকে শিশিরকুমার, মেঘনাদ সাহা ও এস. এস. ভাটনগরের উদ্যোগে বোর্ড অফ সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের (বর্তমানে সি. এস. আই. আর.) অধীনে গঠিত হয় 'রেডিও রিসার্চ কমিটি'। ভারতে রেডিও ইলেকট্রনিক্সের কারিগরি বিকাশের ক্ষেত্রে এই কমিটির ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। অদূর ভবিষ্যতে ইলেকট্রনিক্সের বিপুল সম্ভাবনার কথা অনুধাবন করে দূরদর্শী শিশিরকুমার মেঘনাদ সাহার সক্রিয় সমর্থনে ১৯৪৯-এ একটি নতুন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগ সৃষ্টি করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। রেডিও ফিজিক্স ও ইলেকট্রনিক্স-এর এই বিভাগটি এশিয়া মহাদেশের মধ্যে প্রথম এই

জাতীয় প্রয়াস। ১৯৬২-তে 'সেণ্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডি ইন রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স' নামে বিভাগটির নতুন নামকরণ হয় এবং শিশিরকুমার বৃত হন তার অধ্যক্ষ রূপে।[৪৪]

এই প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও পরবর্তীকালে ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ উৎপাদনে ভারত কেন বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে রইল, সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়।

ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র-নির্মাতা হিসাবে কলকাতার আর-এক গর্ব বামাদাস চট্টোপাধ্যায়। তিনিও বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র! হয়তো, শিশিরকুমারেরই ছাত্র। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দেই 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর লেখা 'বেতার টেলিগ্রাফ' নামে একটি প্রবন্ধ। ১৯৩৩ নাগাদ সবাক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের প্রোজেক্টরের সঙ্গে ব্যবহারের জন্য একটি শব্দযন্ত্র তৈরি করেন তিনি। 'রূপবাণী' সিনেমা আজন্ম বামাদাসের এই 'সিস্টোফোন' ব্যবহার করেছে। নীচে উদ্ধৃত বিজ্ঞাপন থেকে সিস্টোফোনের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও সমাদরের কথা অনুধাবন করা সম্ভব[৪৫] :

চিত্র প্রদর্শকগণ :

আপনারা আপনারদের চিত্রগৃহের শব্দযন্ত্রের জন্য অযথা অধিক ব্যয় করেন কেন ?

ভারতে প্রস্তুত

সিস্টোফোন

Sound on Film Equipment

আধুনিক সমস্ত বৈদ্যুতিক যন্ত্রে গঠিত ভারতে প্রস্তুত

CYSTOPHONE

ব্যবহার করুন

ছ' মাসের মধ্যে দশ জায়গায় 'সিস্টোফোন' বসানোই এর সাফল্য প্রমাণ করে। প্রস্তুতকারী কর্তৃক বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা সর্ব্বত্র পরিদর্শন করা হয়। বিশেষ বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন।

সরকার দত্ত এণ্ড কোং

ষ্টিফেন্স হাউস, ৫, ড্যালহাউসী স্কোয়ার

কলিকাতা

শেষের কথা

এই প্রবন্ধ কলকাতার কারিগরি ইতিহাসের আনুপূর্বিক বিবরণ হিসাবে রচিত হয়নি। কলের শহরেরই অন্তর্গত পরিবহণ বা মুদ্রাযন্ত্রের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়নি। এখানে

দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে ইংরেজ আমলের বাঙালি কারিগর, নির্মাতা ও যন্ত্রবিদদের প্রতিভার দিকে। পরিশেষে এটুকুই বলা প্রয়োজন যে, নীলমণি মিত্রের কথা ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য করলে দেখা যায় যে, গোলোকচন্দ্র, শিবচন্দ্র নন্দী, হানিফ সারেঙ, এমনকি উপেন্দ্রকিশোরও কিন্তু কারিগরি বিদ্যার কোনো প্রথাগত পাঠ গ্রহণ করেননি। বাঙালির এই কারিগরি দক্ষতা সত্ত্বেও এদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে নতুন সঙ্কটই সৃষ্টি হয়েছিল। রক্তে যাঁদের কারিগরি দক্ষতা ছিল, তাঁরা সুযোগ পাননি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পাঠগ্রহণের। পাঠগ্রহণ করলেন উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানরাই। তৈরি হল নতুন এক চাকরিজীবী শ্রেণী—'বাবু' ইঞ্জিনিয়ার। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রেলপথ ও পূর্ত বিভাগের কাজকর্ম তদারকির মধ্যেই তাঁদের জীবন ব্যয়িত হল। এটাও সত্যি যে, পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্টের চাহিদা মেটানোর জন্য ভারতীয়দের প্রশিক্ষণ দিতেই স্থাপিত হয়েছিল ভারতের প্রথম তিনটি সরকারিভাবে স্বীকৃত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ—রুড়কিতে, পুণায় ও কলকাতায় (পরে শিবপুরে স্থানান্তরিত)।

উল্লেখপঞ্জী

১. বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ৪র্থ খণ্ড, ১৯৬৬, পৃঃ ৯৪২-৯৪৭।

২. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, 'সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী ইঞ্জিনীয়ার নীলমণি মিত্র', 'প্রবাসী', আশ্বিন ১৩৩২। নীলমণির মৃত্যুসংবাদের জন্য দ্র. 'দ্য ইণ্ডিয়ান মিরার', ২৬ অগাস্ট ১৮৯৪; 'দ্য স্টেটসম্যান', ২৮ অগাস্ট ১৮৯৪; 'অমৃতবাজার পত্রিকা', ২৮ অগাস্ট ১৮৯৪।

৩. William Hickey 'Memoirs of...(1775-1782)', Vol. II, 1918, pp. 143, 147-148.

৪. Jessop & Co., 'General Catalogue', 1936.

৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ৩য় খণ্ড, ১৩৪২, পৃঃ ২৮৮।

৬. A. C. Das Gupta (ed.), 'The Days of John Company Etc.', 1959, p. 393.

৭. Ibid., p. 273.

৮. Sunil Kr. Chatterjee, 'William Carey and Serampore', 1984, pp. 48-49.

৯. George Smith, 'The Life of William Carey : Shoe-maker and Missionary', Everyman's (n. d.), p. 232.

১০. Ibid., pp. 231-232.

১১. 'Acharya Prafulla Chandra Roy', Calcutta University, 1962, p. 69. Also see, W. G. Forrest, 'Cities of India', 1903, p. 275.

১২. Amitabha Ghosh, 'Introduction of Steamboats in India', Bulletin of the Victoria Memorial Hall, Calcutta, Vol. IX, 1975, pp. 32-44.

১৩. Surendra Nath Sen, 'Early Career of Kahnoji Angria and other papers', 1941, pp. 138-157.

১৪. Blair B. Kling, 'Partner in Empire', 1981.

১৫. Alfred Brame, 'India General Steam Navigation Company', 1900, p. 17.

১৬. Ibid., p. 148.

১৭. 'The Statesman', 2.3.1875.

১৮. H. D. Sandemann, 'Selections from Calcutta Gazette (1816-1823)', 1869, p. 457.

১৯. সিদ্ধার্থ ঘোষ ও স্বপন বসু, 'উড়ল বেলুন গড়ের মাঠে', 'দেশ' বিনোদন, ১৩৯৬, পৃঃ ১৭১-১৮২।

২০. Major H. Hobbs, 'Scraps from My Diary', 1954, p. 30.

২১. W. B. O' Shanghnessy, 'Notes on Lectures on Natural Philosophy, First Series in Galvanic Electricity', 1841.

২২. K. Sridharani, 'Story of the Indian Telegraph', 1953. এ ছাড়াও দ্র. হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, 'শিবচন্দ্র নন্দী', 'মাসিক বসুমতী', কার্তিক ১৩৬০; সিদ্ধার্থ ঘোষ, 'কারিগরি কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ', ১৯৮৭, পৃঃ ৩৩-৫৬।

২৩. কালিদাস মৈত্র, 'ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ বা তড়িৎ বার্তাবহ প্রকরণ', ১৮৫৫।

২৪. L. Schwendler, 'Report on the Electric Light at the East India Railway Coy's Station at Howrah (Calcutta)', 1881.

২৫. 'বামাবোধিনী পত্রিকা', শ্রাবণ ১২৮৮, পৃঃ ১-২।

২৬. Ranabir Roychoudhury, 'Calcutta a Hundred Years Ago', pp. 97, 132, 138, 154.

২৭. পেটেন্ট অফিসের নথি।

২৮. 'The Statesman', 13.1.1901.

২৯. 'The Statesman', 13.9.1913.

৩০. সিদ্ধার্থ ঘোষ, 'কারিগরি কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ', পৃঃ ৫৭-১৬৭।

৩১. তদেব, পৃঃ ১৬৮-২৯৬।

৩২. হরিপদ ভৌমিক, 'কলকাতায় যখন সাইকেল এল', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ৪.৪.১৯৮২।

৩৩. সিদ্ধার্থ ঘোষ, 'ছবি তোলা : বাঙালির ফোটোগ্রাফি চর্চা', ১৯৮৮, পৃঃ ১১৭।
৩৪. Thomas Stevens, 'Around the World on a Bicycle', 1888, pp. 295-320.
৩৫. ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, 'সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর', 'সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিক সংকলন' (গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষ চৌধুরী স.), পৃঃ ১০।
৩৬. মণি বাগচি, 'সুধীরকুমার সেন জীবনচরিত' (n. d.), পৃঃ ৩০, ৩৯।
৩৭. S. W. Goode, 'Municipal Calcutta', pp. 249-250.
৩৮. Dunlop & Co., Diamond Jubilee Souvenir, 1959.
৩৯. 'Calcutta Municipal Gazette', 19.9.1931 ; 19.3.1932 ; 21.5.1932 ; 9.4.1932 ; 9.4.1938.
৪০. 'The Statesman', 13.3.1922.
৪১. দিবাকর সেন, 'ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার জনক জগদীশচন্দ্র', ১৯৮৪, পৃঃ ৮-৯।
৪২. J. N. Bhar, 'Biographical Memoirs of Fellows of the National Institute of Sciences', Vol. I, 1966, p. 112.
৪৩. 'Akashvani', July 24-30, 1977.
৪৪. J. N. Bhar, cit. Supra, pp. 112, 119-120.
৪৫. গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ, 'সোনার দাগ', ১৯৮২, পৃঃ ১৮৬-১৮৭।

কমল সরকার

কলকাতার চারুকলা সমিতি

ব্রাশ ক্লাব থেকে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস

কলকাতায় ললিতকলাচর্চার সূত্রপাত ঔপনিবেশিক যুগে। ইউরোপীয় কলারসিক ও শিল্পীদের উদ্যোগে পাশ্চাত্য আদর্শে স্থাপিত চারুকলা সমিতিগুলিই সেই সূত্রপাতের উদ্‌গাতা। কলকাতার প্রথম চারুকলা সমিতির নাম 'ব্রাশ ক্লাব'। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই সমিতিই ছিল শহর কলকাতার প্রথম যৌথ প্রদর্শনীর আয়োজক। ব্রাশ ক্লাবের আগে কলকাতায় যেসব চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলি ছিল একক ব্যক্তিকেন্দ্রিক। অষ্টাদশ শতক থেকেই বিদেশী শিল্পীরা দোকান, হোটেল কিংবা ভাড়া নেওয়া বাড়িতে নিজেদের আঁকা ছবি সাজিয়ে শিল্পপিপাসুদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতেন। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপিত হতো এইসব ব্যক্তিগত প্রদর্শনীর কথা। বলা বাহুল্য, প্রদর্শিত ছবিগুলি বিক্রি করা এবং পৃষ্ঠপোষকদের কাছে চিত্রাঙ্কনের কাজে নিযুক্তির আশাতেই এই একক প্রদর্শনীগুলির আয়োজন করতেন শিল্পীরা। বিভিন্ন শিল্পীর ছবির একত্রিত যৌথ প্রদর্শনী সেযুগে ছিল কল্পনাতীত। চারুকলা অনুশীলনের কোনো শিক্ষায়তনও তখন কলকাতায় ছিল না।

ব্রাশ ক্লাব আয়োজিত কলকাতার প্রথম যৌথ প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল টাউন হলে। উনিশ শতকে কলকাতার অন্যান্য যেসব স্থানে চিত্র প্রদর্শনী আয়োজিত হতো, তার মধ্যে ছিল ডালহাউসি ইনস্টিটিউট, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম এবং গভর্নমেণ্ট স্কুল অফ আর্ট-এর বৌবাজার ও চৌরঙ্গি-স্থিত বাড়ি দুটি। চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল থ্যাকার, স্পিংক অ্যাণ্ড কোম্পানির বইয়ের দোকানেও। প্রধানত সদ্য-আগত ইউরোপীয় শিল্পীদের ছবিই সেখানে প্রদর্শিত হতো। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে স্পিংকের গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয় উইলিয়াম সিম্পসনের আঁকা ছবির প্রদর্শনী।[১]

যাই হোক, কলকাতায় চারুকলা অনুশীলনের বিকাশে ব্রাশ ক্লাব এবং তার অনুবর্তী সমিতিগুলির ভূমিকা স্মরণার্হ। এইসব সমিতির অধিকাংশের নামই আজ বিস্মৃত, বিস্মৃত তাদের পৃষ্ঠপোষক শিল্পানুরাগীরা এবং সংযুক্ত শিল্পীরা। চারুকলা সমিতিগুলির ইতিবৃত্তের মাধ্যমে কলকাতার ললিতকলা আন্দোলনের একটি বিস্মৃত পরম্পরা তুলে ধরা হল এই নিবন্ধে।

ব্রাশ ক্লাব

কলকাতার আদিতম চারুকলা সংস্থা ব্রাশ ক্লাবের সঠিক প্রতিষ্ঠাকাল নির্ধারণ সম্ভব হয়নি। সম্ভবত, ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের শেষে অথবা ১৮৩১-এর জানুয়ারি মাসে জন্ম হয় ক্লাবটির। ক্লাবের প্রথম সম্পাদক উইলিয়াম কার কলকাতার ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহযোগী হিসাবেও পরিচিত। দ্বারকানাথ ও তিনি ছিলেন 'কার টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানি'র পরিচালক— অংশীদার।

১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি টাউন হলে ব্রাশ ক্লাবের প্রথম প্রদর্শনীর উদ্বোধন সম্পন্ন হয়। প্রখ্যাত ইউরোপীয় শিল্পীদের সঙ্গে কলকাতার পেশাদার ও শৌখিন ইউরোপীয় শিল্পীদের ছবিও প্রদর্শিত হয় ঐ প্রদর্শনীতে।

গুইডো, ক্যানালেত্তো, জোশুয়া রেনল্ডস, হেনরি রেবার্ন, বেঞ্জামিন ওয়েস্ট প্রমুখ শিল্পীর সঙ্গে ঐ প্রদর্শনীতে টিলি কেটল, জর্জ চিনারি, হাচিনসন, হাডসন ও চার্লস পোট-এর ছবিও প্রদর্শিত হয়। ড্যানিয়েল, ক্যাসানোভা, রেনেট, ডি'অয়লি ও জর্জ বিচি-র ছবিও দেখানো হয়েছিল ঐ প্রদর্শনীতে।

পরের বছর ব্রাশ ক্লাব টাউন হলে আয়োজন করে দ্বিতীয় প্রদর্শনীর (১৩ জানুয়ারি ১৮৩২)। দ্বিতীয়বারেও ছিল একাধিক বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর ছবি। তাঁরা হলেন রেমব্রান্ত, ক্যারাভাজ্জো, ক্যানালেত্তো। ওঁদের সঙ্গে উপস্থাপিত করা হয় টেলিয়ার্স, ক্লঁদ, অ্যালবার্ট ডোরে, টার্নার, থমাস লরেন্স ও গ্রোভারের ছবি। এছাড়া জোফানি, রবার্ট হোম আর জেন ড্রামণ্ডের ছবিও ছিল প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ।

দুটি প্রদর্শনীতেই একাধিক বিশিষ্ট ইউরোপীয়, ভারতীয় ও ইউরেশিয়ান সংগ্রাহকের সংগ্রহ থেকে আনা হয়েছিল কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি। তাঁরা হলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, শ্রীনাথ মল্লিক, শ্রীরামপুরের রঘুরাম গোস্বামী ও স্বনামধন্য হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। কিন্তু দ্বিতীয় প্রদর্শনীটি ডিরোজিওর দেখা হয়নি। দ্বিতীয় প্রদর্শনীর উদ্বোধনের সতেরো দিন আগে তাঁর মৃত্যু হয় (২৬ ডিসেম্বর ১৮৩১)।

ব্রাশ ক্লাব কতদিন টিকে ছিল বলা সম্ভব নয়। তবে ব্রাশ ক্লাবই যে কলকাতার প্রথম চারুকলা সংস্থা এবং এই সংস্থাই যে কলকাতায় চিত্র প্রদর্শনী শুরু করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।[২]

সোসাইটি ফর ইমপ্রুভমেন্ট অফ ওরিয়েন্টাল পেন্টিং অ্যাণ্ড স্কাল্পচার—১৮৪২

'ব্রাশ ক্লাব'-এর প্রতিষ্ঠার কিঞ্চিদধিক এক দশক পরে আর-একটি চারুকলা সংস্থার কথা জানা যায়। এই সংস্থাটির উদ্যোক্তা ছিলেন কয়েকজন 'এডুকেটেড নেটিভ'। শিক্ষিত ভারতীয়দের তৎপরতায় কলকাতায় গড়ে তোলা ঐ সংস্থাটির লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইউরোপীয় চিত্রকলার পরিবর্তে রসজ্ঞ ঐ ভারতীয়রা দৃষ্টি দিয়েছিলেন প্রাচ্যের চিত্র ও ভাস্কর্যকলার প্রচার ও উন্নতিসাধনে। কিন্তু সংস্থাটি আদৌ বাস্তব অস্তিত্ব লাভ করেছিল কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে সংস্থাটি গড়ে

তোলার জন্য যে তৎপরতা শুরু হয়েছিল তার খবর লিপিবদ্ধ হয়ে আছে তৎকালীন সংবাদপত্রে।

সংস্থাটি গড়ার প্রথম খবর বেরিয়েছিল কলকাতার দৈনিক 'ইংলিশম্যান'-এ। 'ইংলিশম্যান'-এ প্রকাশিত খবরটি পুনর্মুদ্রিত হয় শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'য় ('কনটেমপোরারি সিলেকশানস' : ২৪ মার্চ ১৮৪২)। খবরটিতে বলা হয়েছিল :

'We understand that some of the educated Natives have it in contemplation to establish in Calcutta a society for the improvement of 'Oriental painting and sculpture' : an object, which it properly appreciated and duly encouraged, cannot fail. We believe, to prove it the end highly beneficial to the Indian community.'

কিন্তু কে বা কারা সংস্থাটির উদ্যোক্তা ছিলেন তার কোনো উল্লেখ খবরে না থাকায় কলারসিক ঐ ভারতীয়দের নাম জানা যায় না। তাছাড়া, তাঁরা কোনো প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন কিনা তাও অজ্ঞাত। তবুও এই উদ্যোগটি উল্লেখযোগ্য। কারণ, 'ওরিয়েণ্টাল' শিল্পকলা সচেতন কয়েকজন রসজ্ঞ যে এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তা নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক।

সোসাইটি ফর দ্য প্রোমোশান অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট—১৮৫৪

ইঙ্গ-বঙ্গীয় ও দেশীয় যুবকদের শিক্ষায়তনের মাধ্যমে ব্যবহারিক শিল্পকলায় পারদর্শী করে তোলার উদ্দেশ্যে এই সংস্থাটি স্থাপন করেন কয়েকজন ইউরোপীয় ও বাঙালি শিল্পানুরাগী। এই সমিতিটি থেকেই 'কলকাতার স্কুল অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট'-এর জন্ম হয়।

সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রথমে একটি সভা আয়োজিত হয় বাংলা সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারি হজসন প্র্যাটের বাড়িতে (৩১ মার্চ ১৮৫৪)।[৩] এই সভায় স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। তবে প্রাথমিক কাজ সম্পাদনের জন্য সভায় গঠিত হয় একটি সাব-কমিটি। স্যর সিসিল বিডন ঐ কমিটির সভাপতি হন। জেমস লং, উইলিয়াম মানি, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজা প্রতাপ-চন্দ্র সিংহ প্রমুখ কয়েকজন বৃত হন সদস্যের পদে।

পরে যখন স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়, তখন সভাপতি নির্বাচিত হন কর্নেল ই. গুডউইন। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বেথুন সোসাইটিতে গুডউইনের প্রদত্ত একটি বক্তৃতার ('দ্য ইউনিয়ন অফ সায়েন্স ইণ্ডাস্ট্রি অ্যাণ্ড আর্ট') দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই উদ্যোক্তারা এই সংস্থাটি গঠন করতে মনস্থ করেছিলেন। তাছাড়া তাঁদের সামনে ছিল মাদ্রাজের আর্ট স্কুলের দৃষ্টান্ত। ডাক্তার আলেকজাণ্ডার হান্টারের একক প্রচেষ্টায় প্রায় চার বছর আগে (১৮৫০) মাদ্রাজের আর্ট স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

'স্কুল অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট'-এর জন্য গঠিত কমিটির সম্পাদক হন হজসন প্র্যাট ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। সভাপতি ও সম্পাদক বাদে কমিটির সদস্যসংখ্যা ছিল পনেরো। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সিসিল বিডন, জেমস লং, ডাক্তার সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী,

রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, হেনরি উড্রো প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। স্কুল পরিচালনার জন্য ইংরেজ ও ভারতীয়রা চাঁদা দিয়েছিলেন। ভারতীয় দাতাদের মধ্যে প্রতাপচন্দ্র সিংহ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সত্যচরণ ঘোষাল ও রাজেন্দ্রচন্দ্র দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। স্কুল প্রতিষ্ঠার পর বর্ধমানের মহারাজা দেন পাঁচশো টাকা। স্কুলটির কাজ শুরু হয় গরানহাটায়, রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের বাড়িতে (১৬ অগাস্ট ১৮৫৪, সোমবার)।

মোট আটাশজন পূর্ব ভারতীয় ছাত্রকে নিয়ে স্কুলের উদ্বোধন হয়। সে সময় এখানে ড্রয়িং, মডেলিং ও এনগ্রেভিং শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। একশো কুড়ি টাকা বেতনে এম. অ্যানজিয়ার ড্রয়িং শিক্ষক নিযুক্ত হন। জনৈক বেলজিয়ান শিল্পী উপযাচক হয়ে বিনা বেতনে মডেলিং শিক্ষা দিতে শুরু করেন। মূর্তিকলায় অনন্যসাধারণ নৈপুণ্যের অধিকারী এক ভারতীয় শিল্পীকেও এই সময়ে শিক্ষাদানে নিযুক্ত করা হয়েছিল। গভর্নমেন্ট হাউসের (রাজভবন) উত্তরদিকের প্রধান সোপানশ্রেণীর দু'পাশে উপবিষ্ট দুটি সিংহমূর্তি তাঁরই গড়া। তৎকালীন পত্রপত্রিকায় এই ভারতীয় শিক্ষকটির নাম নেই। আমাদের অনুমান, তিনি মৃৎশিল্পী নবকুমার পাল।[৪]

দ্বারোদ্ঘাটনের প্রায় দু' মাস পরে মঁসিয়ে বি. রিগোর শিক্ষকতা শুরু। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন স্কুলটির তত্ত্বাবধায়ক। তিনশো টাকা বেতনে তিনি মডেলিং ও স্থাপত্যবিষয়ক চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দিতেন। স্কুলটির লিথোগ্রাফির শিক্ষক হয়ে কলকাতায় আসেন থমাস ফ্রান্সিস ফাওলার। মাত্র সাতাশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হলে (১৮৫৬) ফ্রেজার ও বেনেট লিথোগ্রাফির ক্লাস নিতে শুরু করেন।

১৮৫৪ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত গরানহাটার বাড়িতে অবস্থানের পর কলুটোলার একটি বাড়িতে (এখন যেখানে মেডিকাল কলেজের চক্ষু-হাসপাতাল রয়েছে) উঠে আসে স্কুলটি। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এ বাড়িতে থাকার পর আমহার্স্ট স্ট্রিটের কাছে ১৬৩-১৬৪ বৌবাজার স্ট্রিটে স্কুলটি স্থানান্তরিত হয়। স্কুলের স্বার্থেই পাশের বাড়িতে (১৬৫-১৬৬) উদ্বোধিত হয়েছিল ভারতের প্রথম আর্ট গ্যালারি। তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক ঐ আর্ট গ্যালারির দ্বারোদ্ঘাটন করেন (৬ এপ্রিল ১৮৭৬)।[৫]

১৮৯২ পর্যন্ত দীর্ঘ আটাশ বছর স্কুল অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট বৌবাজারের বাড়িতে ছিল। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে স্কুলের আর্থিক দায়দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করায় শিক্ষায়তনটির নাম হয় গভর্নমেণ্ট স্কুল অফ আর্ট। সরকারি অধিগ্রহণের পর প্রথম অধ্যক্ষ হন হেনরি হোভার-লক। লক-এর তৎপরতায় জ্যামিতিক চিত্রকলার শিক্ষক নিযুক্ত হন শ্যামাচরণ শ্রীমানী। স্বনামধন্য শিল্পী অন্নদাপ্রসাদ বাগচিকে স্কুলের হেডমাস্টার নিয়োগ করেন লক (১৮৮০)। অন্নদাপ্রসাদ অয়েল পেন্টিং ও লিথোগ্রাফি শিক্ষা দিতেন।[৬]

চৌরঙ্গির বর্তমান অবস্থানে গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্ট সরে আসে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে। কলেজে পরিণত হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানটির নামান্তর হয়েছে 'গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাফট' (১ জুলাই ১৯৫১)।

জুলে স্যামবার্গ, উইলিয়াম হেনরি জবিন্স, ই. বি. হ্যাভেল, ওলিন্টো গিলার্ডি (অস্থায়ী), পার্সি ব্রাউন প্রমুখ ইউরোপীয়রা এই শিক্ষায়তনে অধ্যক্ষতা করেছেন। হ্যাভেলের সময়ে স্কুলের উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০৫)। মস্তিষ্কবিকৃতির পর হ্যাভেল কলকাতা ত্যাগ করলে অবনীন্দ্রনাথ প্রায় দশ বছর অস্থায়ী অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। উপাধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন স্বনামধন্য যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। পরবর্তী সময়ে মুকুল দে, অতুল বসু, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ এই শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।[৭]

ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটি—১৮৮৯

কলকাতার চিত্রকলার ইতিহাসে ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটির ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। এই সংস্থাটিও কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় রাজকর্মচারীর উদ্যোগে গঠিত হয়।

১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে সংস্থাটির জন্ম। ইউরোপীয়দের পাশাপাশি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভারতীয়ও যুক্ত ছিলেন সংস্থাটির সঙ্গে।

লেফটেনান্ট গভর্নর স্যার স্টুয়ার্ট বেলি সোসাইটির প্রথম সভাপতি। এডোয়ার্ড ভ্যাসি ওয়েস্টম্যাকট নির্বাচিত হন এই সংস্থার প্রথম অবৈতনিক সম্পাদক। বাংলার বিভিন্ন শহরে ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি করেছেন ওয়েস্টম্যাকট। যখন কমিশনার অব এক্সাইজ হয়ে তাঁর কলকাতায় অবস্থান, তখনই জন্ম হয় ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটির।

ওয়েস্টম্যাকটের বাসস্থান ২, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিট-এ ছিল সোসাইটির দপ্তর। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর উৎসাহেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই সোসাইটি।

প্রথমে এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন মাত্র দু'জন ভারতীয়। তাঁরা হলেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং শিল্পী অন্নদাপ্রসাদ বাগচি। সংস্থার ইউরোপীয় সদস্যদের মধ্যে উইলিয়াম হেনরি জবিন্স-এর নাম উল্লেখযোগ্য। জবিন্স তখন কলকাতার গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ। এছাড়া, বেভারিজ, বিচারপতি বেভার্লি, ব্রটন, স্যার অ্যালেন ক্রফট প্রমুখ আরও কয়েকজন ইউরোপীয়ও যুক্ত ছিলেন এই সংস্থার সঙ্গে। এঁদের কেউ সৈনিক, কেউ ডাক্তার।[৮]

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি সোসাইটির প্রথম প্রদর্শনীর আয়োজন। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের 'লবি'-তে সাজানো হয়েছিল প্রদর্শনীটি। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে আসেন সস্ত্রীক বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন। ভাইসরয় ল্যান্সডাউনই ছিলেন ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক।

ডাবলিউ বি. উলেন, মিস ইভানস প্রমুখ আরও কয়েকজন ইউরোপীয়দের ছবি ছিল প্রদর্শনীতে। উলেন পেয়েছিলেন ল্যান্সডাউনের দেওয়া স্বর্ণপদকটি।

আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ জবিন্স-এরও ছবি ছিল প্রদর্শনীতে। ভেনিসের দুটি দৃশ্যচিত্র দিয়েছিলেন তিনি।

যশস্বী প্রতিকৃতি-শিল্পী জেমস আর্চার-এরও ছবি ছিল প্রদর্শনীতে। প্রতিকৃতি দুটি

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর আর উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের। জবিন্স আর আর্চারের ছবি দুটি প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

প্রদর্শনীতে একাধিক ভারতীয় শিল্পীর শিল্পকর্মও প্রদর্শিত হয়। এঁদের মধ্যে যদুনাথ পাল, পেস্টনজি বোমানজি, কালীধন চন্দ্র আর ললিতমোহন বসুর শিল্পকর্মগুলি পুরস্কৃত হয়।

প্রথম প্রদর্শনীতে অন্নদাপ্রসাদ বাগচি আর জলধিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও অংশ নেন। জলধিচন্দ্রের ছবিটি ছিল সেকালের খ্যাতিমান সঙ্গীতজ্ঞ গোপাল চক্রবর্তী বা 'নুলো গোপাল'-এর প্রতিকৃতি।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, নবাব স্যর খাজা আশানুল্লা, দিনাজপুরের মহারাজা গিরিজানাথ রায় এবং আরও অনেকে পুরস্কার দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করেন প্রদর্শনীটির।

ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটি টিকে ছিল বেশ কয়েক বছর। তবে, এই সংস্থার শেষ প্রদর্শনীটি কবে অনুষ্ঠিত হয় তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়।[৯]

দি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য প্রোমোশান অফ ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড ন্যাশনাল গ্যালারি—১৮৯২

ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটির জন্মের দু'বছর পরে জন্ম হয় এই চারুকলা সংস্থাটির। সংস্থার উদ্যোক্তারা সকলেই ছিলেন বাঙালি। ভারতীয় ছাড়া এই সংস্থায় কোনো ইউরোপীয় সদস্য ছিলেন না। ভারতীয় শিল্পীদের সঙ্ঘবদ্ধ ও উৎসাহিত করার জন্যই গঠন করা হয়েছিল সংস্থাটি।

আক্ষরিক অর্থে চারুকলা সংস্থা বলতে যা বোঝায় উদ্যোক্তারা সেভাবেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সংস্থাটিকে। এ বিষয়ে অদ্ভুত দূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হয়েছিল তাঁদের পরিকল্পনায়। উদ্যোক্তাদের মুখ্য লক্ষ্য ছিল ভারতীয় শিল্পীদের ললিতকলাচর্চায় উৎসাহ দিয়ে তাঁদের শিল্পকর্মের এক জাতীয় সংগ্রহশালা বা গ্যালারি গড়ে তোলা। সংস্থাটির নামের মধ্যেই রয়েছে সে ইঙ্গিত। এই উদ্দেশ্যে একটি 'স্কেচ ক্লাব' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন তাঁরা। বিদেশী শিল্পকলা সম্পর্কেও গভীর ঔৎসুক্য ছিল তাঁদের। তাই বিদেশী শিল্পীদের চিত্র ও ভাস্কর্যকলার নিদর্শন সংগ্রহ এবং শিল্পকলা সম্পর্কিত এক পাঠাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও গৃহীত হয়েছিল।[১০]

প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে খবরের কাগজের মাধ্যমে একাধিক আবেদন প্রচার করা হয়। এ বিষয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন উদ্যোক্তারা। অতঃপর সংস্থাটি গঠনের জন্যে অ্যালবার্ট হলে আয়োজিত এক সভায় মিলিত হন সবাই (৫ অগাস্ট ১৮৯২)।

ঠিক ছিল অ্যালবার্ট হলের সভায় সভাপতিত্ব করবেন মার্বেল প্যালেসের দেবেন্দ্র মল্লিক। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্র নিজেও ছিলেন শিল্পী। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতির জন্য সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ শিল্পী গঙ্গাধর দে।

সংস্থার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গঙ্গাধর

দে, অন্নদাপ্রসাদ বাগচি, মন্মথনাথ চক্রবর্তী, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখ কৃতী শিল্পীরা। ইটালিতে গিয়ে যে প্রথম বাঙালি ছাত্র চিত্র ও ভাস্কর্যকলা অনুশীলন করে-ছিলেন সেই রোহিণীকান্ত নাগও ছিলেন এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। এছাড়া, গিরীশচন্দ্র পাল, ললিতমোহন বসু, বসন্তকুমার রায়, কার্তিকচন্দ্র নাগ প্রমুখ আরও কয়েকজন শিল্পী প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই যুক্ত ছিলেন সংস্থাটির সঙ্গে।

সংস্থার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন গঙ্গাধর দে; সহ-সভাপতি অন্নদাপ্রসাদ বাগচি। প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। মন্মথনাথ চক্রবর্তী ছিলেন প্রমথনাথের সহকারী। তৈলচিত্র শিল্পী প্রমথনাথের বাড়িতে ছিল সংস্থার দপ্তর। ঠিকানা—১৪/১ ছিদাম মুদি লেন।[১১]

স্বল্পায়ু সংস্থা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য প্রোমোশান অফ ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড ন্যাশনাল গ্যালারি। জন্মের পর দুটি বছরও অতিক্রম করতে পারেনি। উদ্যোক্তারা কতদূর কী করেছিলেন তার বিশদ বিবরণও পাওয়া যায় না। 'অন্নদা-জীবনী' গ্রন্থে (১৩১৪) এই সংস্থা সম্পর্কে লেখা হয়েছিল, 'স্বর্গীয় প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের যত্নে 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য প্রোমোশান অফ ফাইন আর্টস' নামে একটি শিল্প সভা স্থাপিত হয়।…রবি বর্মা প্রমুখ ভারতের সকল শিল্পীই ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে বাগচী মহাশয় সভাপতির কার্য করেন। কিন্তু সভা দুই বৎসর মাত্র জীবিত থাকিয়া লুপ্ত হয়।'

তবুও এই চারুকলা সংস্থাটির প্রসঙ্গ আলোচনার যোগ্য। কারণ, ভারতীয় শিল্পীদের একত্র করে সংস্থা গঠনের বিষয়টি এঁরাই প্রথম কার্যকরী করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, প্রায় একশো বছর আগে একটি জাতীয় গ্যালারি প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন ওঁরা দেখেছিলেন তা থেকেই ওঁদের দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু প্রদর্শনীই নয়, ন্যাশনাল গ্যালারি বা ন্যাশনাল মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই দেশের শিল্পী ও সাধারণ মানুষের নান্দনিক চেতনাকে উদ্দীপিত করাই ছিল সংস্থাটির লক্ষ্য।

বঙ্গীয় কলা-সংসদ—১৯০৫

জাতির চরম অসন্তোষ আর অবমাননার দিনে অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের প্রাক্-মুহূর্তে জন্ম হয়েছিল বঙ্গীয় কলা-সংসদের। বঙ্গীয় কলা-সংসদও ভারতীয় শিল্পীদের সংস্থা। পর-পর তিনটি সভায় আলাপ-আলোচনার পর বঙ্গীয় কলা-সংসদ গঠিত হয়। এই চারুকলা সংস্থা প্রতিষ্ঠার অগ্রণী উদ্যোক্তা ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সংস্থাটি গঠনের উদ্দেশ্যে চৈতন্য লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সভা। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ১০ জুন আয়োজিত ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন অবনীন্দ্রনাথ। বিভিন্ন আর্ট স্কুল এবং নানা আর্ট স্টুডিওর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন সভায়।[১২]

এরপরে অনুষ্ঠিত হয় অপর সভা দুটি। রবীন্দ্রনাথ ও জলধিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরের দুটি সভায় সভাপতিত্ব করেন। রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সভাতেই

সংস্থার নামকরণ করা হয় 'বঙ্গীয় কলা-সংসদ'। রবীন্দ্রনাথই ঐ নাম রাখার প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন।

বাঙালি শিল্পীদের সঙ্ঘবদ্ধকরণ এবং তাঁদের প্রদর্শনীর আয়োজন করাই ছিল সংস্থার প্রধান লক্ষ্য।

অতঃপর জোড়াসাঁকোয় গগনেন্দ্র-সমরেন্দ্র-অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে কলা-সংসদের প্রথম সাধারণ সম্মেলন বা অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। বহু শিল্পী এবং আর্ট স্কুলের ছাত্র ও কলারসিকেরা উপস্থিত ছিলেন ঐ অধিবেশনে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ অধিবেশনেই কলা-সংসদের কার্যনির্বাহক সমিতিটি গঠন করা হয় (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৫)।

কলা-সংসদের পৃষ্ঠপোষক নির্বাচিত হন প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর ; সভাপতি অন্নদাপ্রসাদ বাগচি। সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন অবনীন্দ্রনাথ। বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ বসু, মন্মথনাথ চক্রবর্তী, রণদাপ্রসাদ গুপ্ত, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, ননীগোপাল গোস্বামী ও পবেশনাথ সেন প্রমুখ প্রথিতযশা শিল্পীরা যুক্ত ছিলেন সংস্থাটির সঙ্গে। শিল্পকলা জগতের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ও. সি. গাঙ্গুলিও ছিলেন এই সংস্থার সদস্য। কলা-সংসদের কার্যনির্বাহক সমিতির তরুণ এক সদস্য হিসেবেই ললিতকলার জগতে আত্মপ্রকাশ অর্ধেন্দ্রকুমারের। অবনীন্দ্রনাথের বাড়ি ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে ছিল কলা-সংসদের অফিস।[১৩]

কিন্তু বঙ্গীয় কলা-সংসদও স্বল্পায়ু সংস্থা। সম্ভবত, কোনো প্রদর্শনীই তাঁরা করতে পারেননি। ইতিমধ্যে যাঁর বাড়িতে ছিল সংসদের কার্যালয় এবং যিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন ঐ সংস্থার সম্পাদক, তিনি, অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ সরকারি আর্ট স্কুলে ভাইস-প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন (১৫ অগাস্ট ১৯০৫)। অনুমান, গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের দায়িত্ব নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন তিনি। আবার ঐ সময়েই আকস্মিকভাবেই মৃত্যু হয় সংস্থার সভাপতি অন্নদাপ্রসাদ বাগচির (৩ অক্টোবর ১৯০৫)। ফলে, বঙ্গীয় কলা-সংসদেরও অবলুপ্তি ঘটে।

দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট—১৯০৭

অর্থের বিনিময়ে শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করতেন এমন কয়েকজন বিশিষ্ট সংগ্রহকারীর উদ্যোগে সংস্থাটি গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্দেশ্য ছিল এই সংস্থার মাধ্যমে তাঁদের মত সংগ্রহকারীরা একত্রিত হয়ে সংগৃহীতব্য সামগ্রীর গুণাগুণ বিচার-বিশ্লেষণ এবং সে সম্পর্কে মতামত আদান-প্রদান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন। সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথাও তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, শুধু এই কাজটির মধ্যেই সংস্থাটি আবদ্ধ থাকবে না। প্রাচীন ও সমকালীন প্রাচ্যকলার পর্যালোচনা, প্রসার ও এই বিষয়ে শিল্পী ও রসজ্ঞদের সচেতন করার প্রস্তাবটিও নিতে হবে। এই উদ্দেশ্য রূপায়ণের জন্য নিয়মিত প্রদর্শনী, ঘরোয়া সম্মিলনী, বক্তৃতা প্রদান ইত্যাদির প্রস্তাবও নিয়েছিলেন উদ্যোক্তারা। ঐ সঙ্গে

সমকালীন ভারতীয় শিল্পী ও ছাত্রদের উৎসাহিত করার জন্য তাঁদের প্রদর্শনী ও পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়।

বর্তমান শতকের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এই সংস্থাটি গড়ে তোলার নেপথ্যে ছিলেন বহু প্রতিপত্তিশালী রসবেত্তা ও সংগ্রাহক, যাঁদের অনেকেই সর্বোচ্চ স্তরের ইউরোপীয় রাজকর্মচারী। তাঁদের কেউ বিচারপতি, কেউবা সৈনিক, সিভিলিয়ান, ব্যারিস্টার অথবা চিকিৎসক। এছাড়া, ইউরোপীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন কর্ণধারও যুক্ত হন সংস্থাটির সঙ্গে। ভারত ও বাংলা সরকারের প্রশাসনিক পর্যায়ের রাজকর্মচারীদের জন্যই দীর্ঘকাল ধরে সরকারি আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করে সংস্থাটি।

হাইকোর্টের বিচারপতি স্যর রবার্ট ফুলটন র‍্যাম্পিনির সভাপতিত্বে সি. এফ. লারমরের বাড়িতে আয়োজিত এক সভায় সংস্থাটির জন্ম (২৭ এপ্রিল ১৯০৭)। কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ আর্ল কিচনার ইণ্ডিয়ান সোসাইটির প্রথম সভাপতি; স্যর রবার্ট ফুলটন গ্রহণ করেন সহ-সভাপতির পদ। সিনক্লেয়ার অ্যাণ্ড ম্যারে কোম্পানির সিনিয়র পার্টনার নর্মান ব্লাণ্ট এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্বাচিত হন যুগ্ম সম্পাদক।[১৪]

স্যর রবার্ট ফুলটনের সঙ্গে আরও দুই বিচারপতি স্যর জন জর্জ উডরফ ও স্যর হারবার্ট হোমউড গোড়াপত্তনের সময় যোগ দেন সংস্থায়। এছাড়া হার্বার্ট হোপ রিজলি, ডাডলে বি. মেয়ারস, সি. এফ. লারমর, মিউজিয়ামের ডিরেক্টর ডঃ নেলসন অ্যানানডেল, এইচ. পি. মার্টিন, ই. থরনটন প্রমুখ কয়েকজন বিদেশীও প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন সংস্থাটির সঙ্গে।

তাঁদের সঙ্গে কয়েকজন সুপরিচিত বঙ্গসন্তানও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন সংস্থাটির সংগঠনে। তাঁদের মধ্যে গগনেন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, আশুতোষ চৌধুরী, জে. চৌধুরী ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইণ্ডিয়ান সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য।

প্রতিষ্ঠার আদি পর্বে সদস্যদের গৃহে 'অ্যাট হোম' অর্থাৎ ঘরোয়া সম্মিলনীর মাধ্যমে সদস্যদের সংগৃহীত ও রচিত কলাসামগ্রী প্রদর্শনীর প্রথা ছিল। লারমর, উডরফ, মেয়ারস ও অবনীন্দ্রনাথের গৃহে এবং অ্যানানডেলের উদ্যোগে মিউজিয়ামে ঘরোয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। এমনকি লর্ড কিচনারও এই ধরনের এক সম্মিলনীতে সদস্যদের আমন্ত্রণ করেন ফোর্ট উইলিয়ামে (২১ জানুয়ারি ১৯০৮)।

সম্মিলনীগুলিতে ইউরোপীয়, ভারতীয়, জাপানী ও চীনা চিত্রকলা ও অন্যান্য সামগ্রী যথা পোর্সেলিন, ব্রোঞ্জ, লিথোগ্রাফ, এচিং প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। সমকালীন শিল্পী, যেমন অবনীন্দ্রনাথ, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, ঈশ্বরীপ্রসাদ বর্মা, ভাস্কর চিন্তামণি, টি. এ. আচার্য, নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের শিল্পকলার নিদর্শনও প্রদর্শিত হয় ঐ সম্মিলনীগুলিতে।

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি ইণ্ডিয়ান সোসাইটির প্রথম প্রকাশ্য প্রদর্শনীর আয়োজন গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে। ভারতবর্ষ, চীন ও জাপানের প্রাচীন ও আধুনিক চিত্রকলার নানা কৌতূহলোদ্দীপক নিদর্শন ছিল প্রদর্শনীতে। সঙ্গে মুঘল, রাজস্থানী ও

পাহাড়ী শৈলীর চিত্রও প্রদর্শিত হয়। ই. বি. হ্যাভেল, গগনেন্দ্রনাথ ও মিঃ আর্ল ও চাম্বা স্টেটের সংগ্রহ থেকে আনা হয় ঐ সামগ্রীগুলি। উডরফ ও থরনটন দিয়েছিলেন চীনা ও জাপানী চিত্রকলার কয়েকটি বিস্ময়কর নিদর্শন।

সমকালীন শিল্পী ও ছাত্রদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ, যামিনীপ্রকাশ, ঈশ্বরীপ্রসাদ ও নন্দলাল এবং সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির শিল্পকর্মও ছিল প্রথম প্রদর্শনীতে। ওঁদের সঙ্গে পেস্টনজি বোমানজি, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, প্রিয়নাথ সিংহ, রামেশ্বরপ্রসাদ বর্মা প্রমুখ আরও কয়েকজনের চিত্রকলাও প্রদর্শিত হয়।

ইয়োকোয়াইমা তাইকান, কাকুসো ওকাকুরা, য়োশিও কাতসুতা, হিসিদা সুনসো, কিমুরা বুজান, ওটাকে চিকুহা প্রমুখ জাপানী শিল্পীর ছবিও ছিল প্রদর্শনীতে। স্বত্বাধিকারী গগনেন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন ঐ ছবিগুলি।

সিমলা ও দিল্লীর প্রখ্যাত কিউরিও সংগ্রাহক ইমরে সোয়াইজার-এর সংগৃহীত নানা দুর্লভ সামগ্রীও আনা হয়েছিল প্রদর্শনীর জন্য। ষোড়শ শতকের ত্রিশটি রাগ-রাগিণীর ছবি ও একটি পুরনো গ্রন্থও ছিল। এছাড়া, শাজাহানের পারিবারিক প্রার্থনার কার্পেট, চীনা 'ভাস' এবং বেশ কিছু মণি-মুক্তাও দেখানো হয়।[১৫]

প্রতিষ্ঠার প্রায় আট বছর পর শিল্পকলা অনুশীলনের জন্য একটি চারুকলা কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি। পুরনো হিন্দুস্থান বিল্ডিং অর্থাৎ সমবায় ম্যানসনের ১১ নম্বর স্যুটে (এখন ফুটনানি চেম্বার্স) চারুকলা কেন্দ্রটি অবস্থিত ছিল। সরকারি আর্ট স্কুল থেকে পদত্যাগ করার পর অবনীন্দ্রনাথের তত্বাবধানে কেন্দ্রটি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন নন্দলাল। নন্দলালের 'কলাভবন'-এ যোগদানের পর ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার কেন্দ্রের অধ্যক্ষতার দায়িত্ব নেন।

বিচারপতি উডরফ, গভর্নর কারমাইকেল, মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাব, স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি, স্যর চার্লস কেষ্টিভেন, স্যর ই. সি. বেণ্টহল প্রমুখ অনেকেই এই সংস্থার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। গভর্নর রোনাল্ডসেও এই সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ভগিনী নিবেদিতা, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ কুমারস্বামী, জেমস. এইচ. কাজিনস, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং স্টেলা ক্র্যামরিশও সংস্থার পোষক হিসাবে পরিচিত।

তৎকালীন গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসের পৃষ্ঠপোষকতায় গভর্নমেণ্ট হাউসে (রাজভবন) ইণ্ডিয়ান সোসাইটি চিত্রকলা প্রদর্শনীর আয়োজনও করেছিল (৪ ডিসেম্বর ১৯১৯)। ঐ সময় গভর্নর ইণ্ডিয়ান সোসাইটির আর্ট স্কুল পরিচালনা ও 'রূপম্' প্রকাশের জন্য ২০,০০০ টাকা মঞ্জুর করেন।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দে (জানুয়ারি) সোসাইটির সদস্য অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত কলা-বিষয়ক ইংরেজি ত্রৈমাসিক 'রূপম্'-এর আত্মপ্রকাশ। 'রূপম্'-এর প্রথম দুটি সংখ্যার প্রকাশক ছিলেন স্বয়ং সম্পাদক। তৃতীয় সংখ্যা থেকে (জুলাই ১৯২০) 'রূপম্' ইণ্ডিয়ান সোসাইটির মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রায় দশ বছর প্রকাশের পর 'রূপম্' বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে সংস্থার অপর মুখপত্র 'জার্নাল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এর আত্মপ্রকাশ। অবনীন্দ্রনাথ ও স্টেলা ক্র্যামরিশ ষান্মাসিক এই মুখপত্রের যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন।

সোসাইটি থেকে আরও কয়েকটি ফোল্ডার এবং গ্রন্থও প্রকাশ করা হয়। সংস্থাটি এখনও চলমান।

ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ আর্ট—১৯২০

পাশ্চাত্য চিত্রকলার রীতিনীতির অনুরাগী একদল শিল্পী, যেমন হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, ভবানীচরণ লাহা, যোগেশ শীল, অনাদি সান্যাল, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি. জি.) এবং অতুল বসু প্রমুখর উদ্যোগে গঠিত হয় এই চারুকলা সংস্থা। হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়ি ২৪, বিডন স্ট্রিটে সংস্থার অফিস ছিল।

সংস্থার প্রথম সম্পাদক অনাদি সান্যাল। ছ'মাস পরে দ্বিতীয় সম্পাদক নির্বাচিত হন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি. জি.)। তারপর তৃতীয় সম্পাদক হন অতুল বসু। যামিনী রায়, নীতিশ লাহিড়ী ও আর্যকুমার চৌধুরীও যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে। সদস্য-শিল্পীদের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং তাঁদের প্রদর্শনীর আয়োজন ও চিত্রকলার প্রকাশন এই সংস্থার লক্ষ্য ছিল।

সদস্যদের ছবি ও রচনা প্রকাশনের জন্য 'ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ আর্ট' নামে এক মনোজ্ঞ ইংরেজি ত্রৈমাসিকও প্রকাশ করেন এই সংস্থা। সাময়িকীটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নাটোর ও কাশিমবাজারের দুই মহারাজা—জগদিন্দ্রনাথ রায় ও মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও জলধর সেন সাময়িকীটির প্রকাশনার তত্ত্বাবধান করতেন।

এই শিল্পীচক্রের উদ্যোগে আরও কয়েকটি চিত্রসঙ্কলন প্রকাশিত হয়। তবে এটিও স্বল্পস্থায়ী সমিতি। এঁদের অধিকাংশ সদস্য পরে 'সোসাইটি অফ ফাইন আর্টস' নামে আর একটি সংস্থা গঠন করেন।

দ্য সোসাইটি অফ ফাইন আর্টস—১৯২১

এই চারুকলা সংস্থাটির জন্ম এমন কয়েকজন শিল্পীর উদ্যোগে, যাঁরা পাশ্চাত্য চিত্রকলার রীতিনীতির অনুরাগী ছিলেন। পাশ্চাত্য চিত্রকলার অনুরাগী ঐ শিল্পীদের অগ্রণী ভবানীচরণ লাহা। ভবানীচরণই এই সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। তাঁর সহকারী নির্বাচিত হন শিল্পী অতুল বসু।

গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল পার্সি ব্রাউন আর ভাইস-প্রিন্সিপাল যামিনী-প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ও শিল্পী আর্যকুমার চৌধুরীও প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন সংস্থাটির সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন বেশ কয়েকজন অভিজাত কলারসিক, যাঁদের অনেকেই ছিলেন পাশ্চাত্য চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক। স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র, নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, রাজা হৃষীকেশ লাহা, মহারাজা

প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ আরও কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার সময় যুক্ত ছিলেন সংস্থাটির সঙ্গে।

বাংলার গভর্নর আর্ল অফ রোনাল্ডসে সোসাইটি অফ ফাইন আর্টসের প্রথম পৃষ্ঠপোষক ; প্রথম সভাপতি বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাব।[১৬]

১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর সংস্থার প্রথম প্রদর্শনীর আয়োজন। সরকারি আর্ট স্কুলে প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন আর্ল অফ রোনাল্ডসে।

ভারতীয় শিল্পীদের সঙ্গে একাধিক ইউরোপীয় শিল্পীর চিত্রও প্রদর্শিত হয় ঐ প্রদর্শনীতে। এঁদের মধ্যে কার্লটন স্মিথ, ডি. কিং, পি. মজুমদার, হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, সতীশ সিংহ, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, যামিনী রায়, বিনায়ক পাণ্ডুরং কারমারকার ও অতুল বসুর নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রদর্শনীতে বিগতকালের একাধিক বিখ্যাত ইউরোপীয় শিল্পীর চিত্রকলাও প্রদর্শিত হয়। রাজা-মহারাজা এবং শিল্পসংগ্রাহকদের সংগ্রহ থেকে আনা হয়েছিল ঐ চিত্রগুলি। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্যর এডোয়ার্ড বার্ন জোন্স-এর নাম করা যেতে পারে। পার্সি ব্রাউনের স্ত্রী মুরিয়েল পার্সি ব্রাউনের সংগ্রহ থেকে আনা হয়েছিল বার্ন জোন্স-এর আঁকা ছবিটি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অতুল বসুর বিখ্যাত দুটি চিত্র 'বেঙ্গল টাইগার' আর 'কমরেডস' প্রথম প্রদর্শিত হয় এই সংস্থারই দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে (১৯২২)। দ্বিতীয় প্রদশনীটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন গভর্নর লর্ড লিটন। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নিজে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে প্রদর্শনীটি দেখিয়েছিলেন।[১৭]

এই চারুকলা সংস্থাটিও দীর্ঘজীবী হতে পারেনি। মাত্র সাত বছর টিকে ছিল সোসাইটি অফ ফাইন আর্টস। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে অবলুপ্ত হয় সংস্থাটি।

আর্ট রিবেল সেণ্টার—১৯৩৩

ত্রিশের দশকের উল্লেখযোগ্য এই চারুকলা সংস্থাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন কয়েকজন তরুণ যাঁরা পরবর্তী সময়ে শিল্পী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। সংস্থাটির নাম থেকেই অনুমান করা যায়, এই সংস্থার সদস্যরা শিল্পকলার জগতে বিরোধীর ভূমিকা নিতে চেয়েছিলেন।

বিদ্রোহী ঐ তরুণদের নেতা ছিলেন ভোলা চট্টোপাধ্যায়। তিনিই আর্ট রিবেল সেণ্টারের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। শিল্পী গোবর্ধন আশ সংস্থার প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। অবনী সেন, কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার, মনোজ বসু, সুরেন দে, সমর দে প্রমুখ শিল্পীরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন সংস্থাটির সঙ্গে।

ভারতের শিল্পকলার ঐতিহ্যের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য অথচ আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পকলা আন্দোলনের মর্মকথার উপলব্ধি ছিল ঐ শিল্পীদের লক্ষ্য। অপরদিকে ধ্রুপদী রীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ঐ শিল্পীরা ছিলেন বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক।

আর্ট রিবেল সেণ্টার সংগঠনের দু' বছর আগে এই শিল্পীরাই গড়েছিলেন 'ইয়ং আর্টিস্টস ইউনিয়ন' নামে একটি সংস্থা। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বর্ষপূর্তি উপলক্ষে টাউন হলের

রবীন্দ্র মেলায় ৭৭ ও ৭৮ নম্বর স্টলে তাঁদের প্রথম প্রদর্শনীর আয়োজন (১৯৩১)। পরে 'ইয়ং আর্টিস্টস ইউনিয়ন'-এর উদ্যোগেই জন্ম নেয় আর্ট রিবেল সেন্টার।[১৮]

১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের ২০ এপ্রিল রিবেল সেন্টারের প্রথম প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন আইনজ্ঞ এ. কে. বসু। ৪৯, ধর্মতলা স্ট্রিটে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে ললিতমোহন সেন, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, রেণু রায়, বিমল মজুমদার, অজিত গুপ্ত, গোবর্ধন আশ, দিগিন ভট্টাচার্য, সুরেন দে, খগেন রায় প্রমুখর সঙ্গে আরও অনেকের শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। মোট ছেচল্লিশ জন শিল্পীর ১৮১টি শিল্পসামগ্রী উপস্থিত করা হয়েছিল প্রথম প্রদর্শনীতে। প্রথম প্রদর্শনীতে যামিনী রায়, সতীশ সিংহ, প্রিয়রঞ্জন সেন প্রমুখ শিল্পী ও শিল্পরসিকেরা উপস্থিত থেকে উৎসাহিত করেন শিল্পীদের।[১৯]

প্রতিষ্ঠার সময় দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করা সত্ত্বেও দীর্ঘজীবী হতে পারেনি সেন্টার। উল্কার মতো ললিতকলার আকাশে এসে সমিতিটি মিলিয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি।

অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস—১৯৩৩

অতঃপর অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের অভ্যুদয়। আর্ট রিবেল সেন্টারের প্রথম প্রদর্শনীর চার মাস পরে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে অ্যাকাডেমি সংগঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস অস্তিত্বের অর্ধশতবর্ষ পূর্ণ করেছে। এদেশের শিল্পকলা অনুরাগী বা সংস্কৃতি-সচেতন মানুষের কাছে অ্যাকাডেমির পঞ্চাশ বছর পূর্তির বার্তাটি নিঃসন্দেহে আনন্দের। কারণ, গড়ে তোলার চেয়ে ভাঙতেই যে দেশে বেশি উৎসাহ, সে দেশে কোনো প্রতিষ্ঠান দীর্ঘজীবী হওয়াটা বিস্ময়ের বিষয়।

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট নামের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটি যখন ললিতকলার আকাশে দীপ্যমান, তখনই জন্ম হয় যে নতুন নক্ষত্রটির, তারই নাম অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস। আত্মপ্রকাশের পর ধীরে ধীরে অ্যাকাডেমিই হয়ে ওঠে এ প্রান্তের এক অনন্য সংস্থা। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অ্যাকাডেমির উত্তরণের সে ইতিহাস ব্যাপক ও বিস্ময়কর।

১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের ১৫ অগাস্ট আয়োজিত কলকাতার নাগরিকদের সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন মহারাজা প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর। প্রবীণ ও প্রখ্যাত শিল্পপতি স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভায় সভাপতিত্ব করেন।

স্যর ডেভিড এজরার প্রস্তাবক্রমে ঐ সম্মেলনে যে চারুকলা সংস্থাটির জন্ম হয় তার নাম ছিল 'ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস'। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, স্থাপত্যকলা, খোদাই প্রভৃতি শিল্পকর্মে উৎসাহ ও প্রেরণাদানের উদ্দেশ্যে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বক্তৃতা প্রসঙ্গে সম্মেলনের আহ্বায়ক মহারাজা প্রদ্যোতকুমার সংস্থার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে ভাইসরয়, কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ ও বাংলার গভর্নরকে পৃষ্ঠপোষকতার আহ্বান জানান।[২০]

অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাটি ঘোষিত হওয়ার পর তৎকালীন সংবাদপত্রগুলিতে

অভিনন্দন জানানো হয় উদ্যোক্তাদের। শুধু সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমেই নয়, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে লেখা হয়েছিল এক সম্পাদকীয় (২৯ অগাস্ট)। 'ভারতীয় কলাভবন' শীর্ষক ঐ নিবন্ধে অ্যাকাডেমির কর্মসূচী প্রসঙ্গে যা লেখা হয়েছিল তার মাধ্যমেই সংস্থাটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। তাই ঐ সম্পাদকীয় নিবন্ধটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল এখানে :

'ভারতবর্ষের সকল বিভিন্ন ধারাকে একত্রিত করিয়া এবং ইহার সহিত প্রতীচ্য কলাবিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা সংযুক্ত করিয়া কোনো বৃহত্তর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান এখনও গড়িয়া উঠে নাই।

'আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক বর্তমানে এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। ইঁহাদের পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হইয়াছে 'ইণ্ডিয়ান একাডেমী অব আর্টস'। উদ্যোগী ও পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজা স্যর প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর, কলিকাতা মিউজিয়ামের সেক্রেটারি ও ইম্পিরিয়াল রেকর্ডরক্ষক শ্রীযুক্ত এ. এফ. এম. আবদুল আলি, এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভ্যান ম্যানেন, কলিকাতার ঐতিহাসিক সমিতির শ্রীযুক্ত এন. গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

'সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন সভা হইয়া গিয়াছে। মহারাজা স্যর প্রদ্যোতকুমার সভাপতিরূপে ইহার উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি বিবৃত করিয়াছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় প্রকার কলাবিদ্যার প্রসারের জন্য একাডেমী হইতে ব্যবস্থা করা হইবে। যাহাতে সকল প্রকারের শিল্পী ও কলাবিদ যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহ ও সাহায্য পান, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতি বৎসর কলিকাতা শহরে কলা ও কারুশিল্পের প্রদর্শনী করা হইবে।

'ইঁহাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, ইউরোপের দেশসমূহে কলাবিদ্যার নিদর্শনসমূহ রক্ষার জন্য যেরূপ পাবলিক গ্যালারী আছে, এখানেও তদনুরূপ আয়োজন করা হইবে।......

'ইঁহাদের ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি হইয়াছেন শ্রীযুক্ত আবদুল আলি এবং যুগ্ম-সম্পাদক হইয়াছেন শ্রীযুক্ত ভ্যান ম্যানেন এবং শ্রীযুক্ত অতুল বসু। আমরাও ইঁহাদের চেষ্টার সাফল্য কামনা করি।'

লক্ষণীয়, প্রতিষ্ঠার সময় সংস্থাটির নামকরণ করা হয়েছিল 'ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস'। ঠিকানা ছিল ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, ২৭ চৌরঙ্গী। ঐ নাম ও ঠিকানা দিয়ে ছাপানো হয়েছিল সংস্থার লেটারহেড এবং অন্যান্য কাগজপত্রও। এমনকি 'ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' শিরোনামের ছাপানো আবেদনপত্রও পাঠানো হয়েছিল নানা জায়গায়। অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক অতুল বসু স্বাক্ষরিত ঐ আবেদনপত্রে ছিল অ্যাকাডেমির আসন্ন প্রদর্শনীর প্রস্তুতির ইঙ্গিত।

কিন্তু সংস্থার নাম 'ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' করা নিয়ে প্রবল হইচই-এর সৃষ্টি হয় বোম্বাইতে। বিশেষত 'স্যর জে. জে. স্কুল অফ আর্টের' অধ্যক্ষ

ক্যাপ্টেন গ্ল্যাডস্টোন সলোমন এবং 'বোম্বে আর্ট সোসাইটি'র কয়েকজন সদস্য প্রচণ্ড আপত্তি তোলেন ঐ নাম নিয়ে। তাঁদের বক্তব্য, কলকাতার নতুন এই চারুকলা সংস্থাটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান নয়, একটি আঞ্চলিক সংস্থা মাত্র। সেই কারণে সংস্থার নামের সঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান' শব্দটি ব্যবহার করতে দিতে তাঁদের আপত্তি। 'ইণ্ডিয়ান' কথাটি থাকলে সকলেই যে ধরে নেবে সংস্থাটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান!

এ বিষয়ে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে জে. জে. স্কুল অফ আর্টের সেণ্ট্রাল হলে একটি সভারও আয়োজন করা হয়েছিল এবং পালটা এক অল-ইণ্ডিয়া আর্ট অ্যাকাডেমি গঠনের প্রস্তাবও নেন তাঁরা। সেদিনের ঐ সভায় উদ্যোক্তারা ভারত সরকারের সমালোচনাও করেন। কারণ, লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউস অলংকরণের জন্য যে চারজন শিল্পীকে ভারত সরকার ইংল্যাণ্ডে পাঠায় তাঁরা সকলেই ছিলেন বাঙালি। ললিতমোহন সেন, ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা, রণদাচরণ উকিল ও সুধাংশু চৌধুরীকে নির্বাচন করে ভারত সরকার পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছেন, এমন কথাও বলা হয়েছিল ঐ সভায়।

বোম্বাইয়ের আপত্তি আর প্রতিবাদ গিয়ে পৌঁছয় দিল্লীতে। লর্ড উইলিংডন তখন ভাইসরয়। তিনি নিজেই এই বিষয়ে মধ্যস্থতা করেন এবং তাঁরই অনুরোধে 'ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' থেকে 'ইণ্ডিয়ান' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। সেই থেকে সংস্থার নাম হয় 'অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস'। অ্যাকাডেমির প্রথম প্রদর্শনীর আয়োজনও করা হয়েছিল নতুন নামেই।

অ্যাকাডেমির প্রথম প্রদর্শনী সফল করে তোলা এবং সর্বভারতীয় রূপ দেওয়ার জন্য গঠন করা হয়েছিল একটি 'ওয়ার্কিং কমিটি'। একাধিক শিল্পী, শিল্প-শিক্ষক এবং কলা-রসিককে নিয়ে গঠিত হয় ঐ কমিটি। যুগ্ম-সম্পাদক অতুল বসুও সেই কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল প্রদর্শনীর দায়িত্ব। এজন্য তিনি প্রভূত পরিশ্রম করেন। বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি শহরে গিয়ে শিল্পসামগ্রী সংগ্রহ করেন তিনি।

বাংলার গভর্নর স্যর জন অ্যাণ্ডারসনকে পৃষ্ঠপোষক নির্বাচিত করে গঠিত হয় এক শক্তিশালী কমিটি। তাঁর সঙ্গে সহ-পৃষ্ঠপোষক হিসাবে নির্বাচিত হন আরও ছ'জন। তাঁরা ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য, কোচবিহারের মহারানী, মুর্শিদাবাদের নবাব আমির-উল-ওমরাহ, দ্বারভাঙার মহারাজা কামেশ্বর সিং এবং স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মহারাজা প্রদ্যোতকুমার নির্বাচিত হন সভাপতি। বিচারপতি বাকল্যাণ্ড, মহারাজা শশিকান্ত আচার্যচৌধুরী, ঢাকার নবাব খাজা হবিবুল্লা, রায়পুরের লেডি সিনহা, লেডি যদুমতি মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী সরলা রায়, শ্রীমতী জন লর্ড উইলিয়ামস ও নদীপুরের রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ নির্বাচিত হন সহ-সভাপতি।

অ্যাকাডেমির সংগঠনের নেপথ্যে ছিলেন আরও নানা খ্যাতিমান মানুষ। অ্যাকাডেমির বিভিন্ন কমিটির সঙ্গে যুক্ত ঐ ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে কস্টেলো, লর্ড উইলিয়ামস, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, কে. সি. নাগ, চারুচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক প্রমুখ বিচারপতির নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, লর্ড সিনহা, স্যর কেদারনাথ দাস, স্যর

আবদুল্লা ও স্যর হাসান সুরাবর্দি, দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, পার্সি ব্রাউন, রমাপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার, জে. পি. গাঙ্গুলি, ভবানীচরণ লাহা, যামিনীকান্ত সেন, অধ্যাপক শাহেদ সুরাবর্দি, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, মণি দাশগুপ্ত, স্টেলা ক্র্যামরিশ, যামিনী রায় ও রসময় ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য।

তদানীন্তন ভারতের রাজন্যবর্গ ও ভূম্যধিকারী এবং অন্য শিল্পরসিকদের প্রদত্ত চাঁদার সাহায্যে অ্যাকাডেমির তহবিল গড়ে ওঠে এবং ঐ অর্থের সাহায্যে শিল্পীদের পদক ও নগদ অর্থ পুরস্কার দেওয়া হয়। নেপাল, জম্মু ও কাশ্মীর, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, বরোদা, গোয়ালিয়র, যোধপুর, পাতিয়ালা, কপুরতলা, ভূপাল ও ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যের রাজন্যবর্গ এবং বারাণসী, দ্বারভাঙা ও ময়মনসিংহের ভূম্যধিকারীরা অ্যাকাডেমির তহবিলে চাঁদা দেন। দাতাদের ঐ তালিকায় আগা খাঁও ছিলেন।

১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের দোতলায় গভর্নর স্যর জন অ্যাণ্ডারসন অ্যাকাডেমির প্রথম প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এক পক্ষকালের জন্য খোলা ছিল প্রদর্শনীটি। ভাইসরয় লর্ড উইলিংডন সস্ত্রীক দেখেন আটশোরও বেশি সামগ্রীযুক্ত এই প্রদর্শনী।

ভারতীয় ও ভারতে বসবাসকারী বিদেশী শিল্পী ও ভাস্করদের শিল্পকলা সামগ্রীর সঙ্গে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর, মহারাজা প্রদ্যোতকুমার, পার্সি ব্রাউন, ভবানীচরণ লাহা, রিচার্ড হাওয়ার্ড, অমল হোম প্রমুখ আরও কয়েকজনের সংগৃহীত চিত্র প্রদর্শিত হয়।

ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক সংগ্রহ থেকে আনা ঐ সামগ্রীগুলির মধ্যে ভ্যান ডাইক, স্যর এডোয়ার্ড বার্ন জোন্স, ম্যাদর ব্রাউন, উইলিয়াম ড্যানিয়েল, স্যর লরেন্স, অ্যালমা টাডেমা, জি. পি. জ্যাকম হুড ও অসওয়াল্ড ম্যালুরা প্রমুখর চিত্রকলার নিদর্শন ছিল। ম্যাদর ব্রাউনের আঁকা তৈলচিত্রটি আনা হয় প্রদ্যোতকুমারের সংগ্রহ থেকে। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের পালাবদলের এক অবিস্মরণীয় মুহূর্তকে রূপায়িত করা হয়েছে ঐ ছবিটিতে। ছবির বিষয় পলাশির যুদ্ধের পর মীরজাফর আর ক্লাইভের সাক্ষাৎকার।

প্রদ্যোতকুমার আরও যে ছবিগুলি দিয়েছিলেন তার অন্যতম ছিল 'ইম্পিরিয়াল দরবার, দিল্লী' (১৯১২)। জি. পি. জ্যাকমহুডের আঁকা ছবিটির সঙ্গে ছিল সোভিয়েত সরকারের বিক্রি করে দেওয়া আরও একটি ছবি। রাশিয়ার স্ট্রোগ্যানফ প্রাসাদের ঐ ছবিটির নাম 'ভেনাস কিউপিডা ও সাইকি'। শিল্পী লুকা গিয়োরদানো।

রিচার্ড হাওয়ার্থ দেন বার্ন জোন্সের ছবি দুটি। নাম 'মিউজিক' আর 'পোয়েট্রি'। স্যর লরেন্স অ্যালমা ট্যাডেমার ছবিটিও আসে ঐ একই সংগ্রহ থেকে। ছবির নাম 'দ্য মমি'।

মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর ভ্যান ডাইকের আঁকা একটি প্রতিকৃতি দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। প্রতিকৃতিটি মার্কুইস স্পিনোলার।

উইলিয়াম ড্যানিয়েলের দুটি দৃশ্যচিত্র ছিল প্রদর্শনীর অতিরিক্ত আকর্ষণ। ছবি দুটি দিয়েছিলেন পি এন. টেগোর। একটি ভাগলপুরের 'হিল হাউস', অন্যটি 'হাউস অফ অগাস্টাস ক্লিভল্যাণ্ড'।

ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে এসেছিল আরও যে কয়েকটি উল্লেখ্য সামগ্রী, তার অন্যতম রবীন্দ্রনাথের আঁকা একটি ছবি। কবির সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও সুধাংশু চৌধুরীর চিত্রকলার নিদর্শনও প্রদর্শিত হয়। অমল হোমের সৌজন্যে পাওয়া গিয়েছিল ছবিগুলি।

ঐ সামগ্রীগুলির সঙ্গে যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, বোম্বাইয়ের মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর ও তাঁর কন্যা অম্বিকা ধুরন্ধর, এল. এন. টাস্কার, জি. এস. হলদনকর ও এস. এম. পিঠাওয়ালার তৈলচিত্র প্রদর্শিত হয়।

অন্য যে শিল্পীরা ঐ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ভবানীচরণ লাহা, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ দাস, প্রমথ মল্লিক, যামিনী রায়, অতুল বসু, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, বসন্তকুমার গাঙ্গুলি ও এস. জি. ঠাকুর সিং-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

অবনীন্দ্রনাথের কয়েকজন ছাত্রের শিল্পকলার নিদর্শনও রাখা হয়েছিল প্রথম প্রদর্শনীতে। তাঁরা হলেন নন্দলাল বসু, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও সারদাচরণ উকিল।

আবার নন্দলাল ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের ছাত্রদের চিত্রকলার নিদর্শনও ছিল প্রদর্শনীতে। ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, অর্ধেন্দুপ্রসাদ ও সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পী অংশগ্রহণ করেন প্রদর্শনীতে।

তাঁদের সঙ্গে জ্যোতিষ সিংহ, যোগেশ শীল, দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য, শৈলজ মুখোপাধ্যায়, রসময় ভট্টাচার্য, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, গোবর্ধন আশ, ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু গুপ্ত, রাধাচরণ বাগচি, ভবেশ সান্যাল, সমর দে, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীর শিল্পচর্চার নিদর্শন উপস্থাপিত করা হয়।

ছাত্রদের উৎসাহিত করার জন্য অ্যাকাডেমির কর্তৃপক্ষ প্রদর্শনীতে তাঁদের শিল্পকর্মের নিদর্শনও রাখেন। ছাত্রদের মধ্যে কমলারঞ্জন ঠাকুর, ইন্দু রক্ষিত, কানোয়াল কৃষ্ণ, নীরদ মজুমদার, বাসবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অজিতকৃষ্ণ গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রদর্শিত শিল্পকর্মের মধ্যে একাধিক ইউরোপীয় পুরুষ ও মহিলা শিল্পীর আঁকা ছবি ছিল। ঐ শিল্পীদের অন্যতম শ্রীমতী নোরা ভিভিয়ান। প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি ছিল ছ'টি। শ্রীমতী ভিভিয়ানের আঁকা ঐ ছ'টি ছবির সেটটিকে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম হিসাবে (বেস্ট গ্রুপ অফ একজিবিট) চিহ্নিত করা হয় এবং তাঁকেই দেওয়া হয় গভর্নর স্যর জন অ্যাণ্ডারসনের স্বর্ণপদকটি।

তেলরঙের শ্রেষ্ঠ ছবি আঁকার জন্য অ্যাকাডেমির সভাপতি প্রদ্যোতকুমারের নামাঙ্কিত স্বর্ণপদক ও রামপুরের নবাব প্রদত্ত পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয় সতীশচন্দ্র সিংহকে। 'আফটার বাথ—গ্যাঞ্জেস' ছবির জন্য তাঁকে দেওয়া হয়েছিল পুরস্কার দুটি।

তেলরঙের শ্রেষ্ঠ নিসর্গ-চিত্র হিসাবে পুরস্কৃত হয় ক্যাপ্টেন এস. সি. ডাবলিউ. ফোরসবেরির আঁকা 'সারে হিলস'। অ্যাকাডেমির নামাঙ্কিত স্বর্ণপদক ও একশো টাকা পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয় শিল্পীকে। এছাড়া ভি. জি. কুলকার্নি ও রাসবিহারী দত্ত দুটি আর্থিক পুরস্কার পান তেলরঙের ছবির জন্য। কুলকার্নির 'ভেটারেন' আর রাসবিহারীর 'আ স্কেচ ফ্রম লাইফ' যথাক্রমে দুশো আর একশো টাকা পুরস্কার পেয়েছিল।

তেলরঙের শ্রেষ্ঠ ছবির সেট বিবেচিত হয় ললিতমোহন সেনের আঁকা দশটি ছবি। এজন্য তাঁকে দেওয়া হয়েছিল দ্বারভাঙা গোল্ড মেডেল। প্রহ্লাদ কর্মকার, বিমল মজুমদার, ফণী সান্যাল, আদিনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আরও কয়েকজন তেলরঙে ছবি আঁকার জন্য পুরস্কৃত হন।

জলরঙের ছবির জন্য লেডি ট্রেঞ্চ ও শ্রীমতী ডেভিড মারে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার পান তাঁদের 'দ্য রোড ওভার দ্য ডাউনস : উটকামণ্ড' এবং 'চেনারবাগ : শ্রীনগর' ছবি দুটির জন্য। যথাক্রমে দুশো এবং একশো টাকা পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করা হয় ঐ মহিলাশিল্পী দু'জনকে। তাঁরা ছাড়াও জি. এস. হলদনকর, পি. মজুমদার, কার্লটন স্মিথ প্রমুখ আরও কয়েকজন জলরঙের জন্য পুরস্কৃত হন।

'ইণ্ডিয়ান পেন্টিং' রীতির শিল্পীদেরও পুরস্কৃত করা হয়েছিল প্রথম প্রদর্শনীতে। সুস্পষ্টভাবে ঐ রীতিটিকে 'ইণ্ডিয়ান পেন্টিং' না বলে বলা হয়েছিল 'ইণ্ডিয়ান স্টাইল'। ঐ স্টাইলের শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে বিবেচিত হয় যামিনী রায়ের 'যশোদা'। 'যশোদা'র জন্য তাঁকে দেওয়া হয়েছিল দুশো টাকা পুরস্কার।

ভারতীয় রীতির দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন লাহোরের রূপ কৃষ্ণ। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টের ছাত্র রূপ কৃষ্ণের ছবিটির নাম 'এ ভিলেজ সাইলক'। এছাড়া মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় রীতিতে আঁকা ছবির জন্য পুরস্কৃত হন।

ভাস্কর্যকলার জন্যও ছিল নানা পুরস্কার। প্রমথ মল্লিক, কামাখ্যানাথ দাস, ই. এ. রহিম ও কালোশশী বন্দ্যোপাধ্যায় পুরস্কারগুলি পান। ছাত্রছাত্রীরাও পেয়েছিলেন কয়েকটি পুরস্কার। তাঁদের মধ্যে কুমারী ইলা মজুমদারকে দেওয়া হয় এন. এন. মিত্র প্রদত্ত পুরস্কার। অবনী সেন, সুশীল সেন, যতীন সাহা প্রমুখ আরও কয়েকজনও পেয়েছিলেন পুরস্কার।

অ্যাকাডেমির প্রথম প্রদর্শনী থেকে বিক্রিও হয়েছিল অনেক ছবি। বিক্রিত ছবির সংখ্যা জানা না গেলেও প্রায় পঁচিশ হাজার টাকার ছবি কিনেছিলেন কলারসিকেরা।[২১]

পরবর্তী সময়ে প্রতিবারই একজন বিশিষ্ট মানুষকে আমন্ত্রণ করা হতো অ্যাকাডেমির প্রদর্শনী উদ্বোধনের জন্য। একবার উদ্বোধনের জন্য প্রদ্যোতকুমার হায়দ্রাবাদের নিজামকে আমন্ত্রণ করেন। সদলবলে কলকাতায় এসে অ্যাকাডেমির চতুর্থ বার্ষিক প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন নিজাম (২২ ডিসেম্বর ১৯৩৬)।[২২] তখন অ্যাকাডেমির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৬)। সেই সময়ে তাঁর সহযোগী ছিলেন ডি. সি. ঘোষ।

অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয়ের অন্যতম জন ভ্যান ম্যানেন ছিলেন সুইডেনের মানুষ। যখন অ্যাকাডেমির জন্ম হয়, তখন তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারি। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে তাঁর এশিয়াটিক সোসাইটিতে যোগদান। তার আগে জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ায় তিনি চাকরি করতেন। কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিকের পদেও নিযুক্ত ছিলেন

তিনি। প্রায় ষোলো বছর এশিয়াটিক সোসাইটির দায়িত্ব পালনের পর তাঁর পদত্যাগ (১৯৩৯)।

অ্যাকাডেমির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক অতুল বসুর (১৮৯৮—১৯৭৭) পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। কলকাতার গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুল ও লণ্ডনের রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে তাঁর চারুকলা অনুশীলন। ইংল্যাণ্ডের বাকিংহাম প্যালেস ও উইণ্ডসর ক্যাসলে সংগৃহীত 'রয়্যাল পোর্টেট' অনুলিপির জন্য ভারত সরকার তাঁকে মনোনীত করেন। কলকাতার গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুল এবং ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলেও তিনি অধ্যক্ষতা করেন। প্রতিকৃতি চিত্রকলায় তাঁর অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। পার্লামেণ্ট, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা, কলকাতার রাজভবন, এশিয়াটিক সোসাইটি ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে তাঁর আঁকা তৈলচিত্র সংগৃহীত আছে।

রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুত্র মহারাজা প্রদ্যোতকুমারের জন্ম ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর। শৌরীন্দ্রমোহনের অগ্রজ মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁকে দত্তক নেন। কলকাতার হিন্দু স্কুলে তাঁর বাল্যশিক্ষা। অতঃপর ব্যারিস্টার এফ. পিকক তাঁর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন এবং পিককের অধীনেই তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ব্যারিস্টার পিকক ছিলেন বাংলার প্রধান বিচারপতি স্যর বার্নেস পিকক-এর পুত্র।

পিতা ও পিতৃপুরুষের বিপুল শিল্পসামগ্রীর সঙ্গে প্রদ্যোতকুমারের আশৈশব পরিচয়। তাঁদের পারিবারিক শিল্পসামগ্রীগুলি পাথুরিয়াঘাটার প্রাসাদ, টেগোর ক্যাসল এবং সিঁথির এমারেল্ড বাওয়ারে সংগৃহীত ছিল। ফলে, অল্প বয়স থেকেই তিনি হয়ে ওঠেন ললিতকলার অনুরাগী। সহজাত ঐ অনুরাগই করে তোলে তাঁকে এক পৃষ্ঠপোষক ও বিশেষজ্ঞ। ললিতকলার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ১৯০৫-এ। ঐ বছরেই তিনি বঙ্গীয় কলাসংসদের পৃষ্ঠপোষক নির্বাচিত হন।

কলকাতার দুটি ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের অছিও ছিলেন তিনি। কলকাতাব এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে কর্মকর্তা হিসাবে তাঁর যে যোগাযোগ, তাও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। ঐ সংস্থাগুলিতে সংগৃহীত আছে দুর্লভ যে শিল্পসামগ্রীগুলি, তার প্রতিও ছিল তাঁব অসীম কৌতূহল আর মমতা।

পরবর্তী সময়ে ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল এবং সোসাইটি অফ ফাইন আর্টস ও অন্যান্য চারুকলা সংস্থার সঙ্গেও তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু প্রদ্যোতকুমারের খ্যাতি অ্যাকাডেমির জন্যই। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। কিন্তু অ্যাকাডেমির পূর্ণ বিকাশ তাঁর দেখা হয়নি। অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠাব প্রায় নয় বছর পর তাঁর পরলোকগমন। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ২৭ অগাস্ট বারাণসীতে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল উনসত্তর।

মহারাজা প্রদ্যোতকুমারের মৃত্যুর পর স্যর আবদুল হালিম গজনভি অ্যাকাডেমির সভাপতি নির্বাচিত হন (সেপ্টেম্বর ১৯৪২)। সহ-সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রদ্যোতকুমারের পুত্র প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে।

প্রদ্যোতকুমারের মৃত্যুর পর এক শোকসভায় তাঁর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে অ্যাকাডেমির নিজস্ব একটি ভবন নির্মাণের প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল অ্যাকাডেমির ঐ বাড়িতে নিয়মিত চিত্র প্রদর্শনী, কলাবিষয়ক আলোচনা এবং বক্তৃতা ও সভা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে। প্রস্তাবটি কার্যকরী করার জন্য স্থপতি বার্নার্ড ম্যাথুসকে পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

কিন্তু ক্যাথিড্রাল রোডে অ্যাকাডেমির বাড়িটি গড়ে ওঠে অন্য এক পরিস্থিতিতে। ঐ ঘটনাটির সঙ্গে জড়িত অ্যাকাডেমির বর্তমান সভাপতি শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত চেষ্টা।

অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর ইতিহাস অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে যদি এই পর্যালোচনায় অ্যাকাডেমির সভাপতির বিষয় আলোচনা না করা হয়। অ্যাকাডেমির পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসের অর্ধেকের বেশি সময় এই সংস্থার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন ঐ সভানেত্রী লেডি রাণু মুখোপাধ্যায়। আগেই বলেছি, সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোতকুমার আমৃত্যু জড়িত ছিলেন অ্যাকাডেমির সঙ্গে। তাঁর সেই সংযোগের সময়কাল ন' বছর। কিন্তু ত্রিশ বছরের উপর অ্যাকাডেমির সঙ্গে যুক্ত আছেন লেডি রাণু।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারীর কন্যা লেডি রাণু ললিতকলার প্রতি অনুরাগ-বশে একদা নিজেও করেছেন চিত্রকলার অনুশীলন। স্বনামধন্য শিল্পপতি স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র স্যর বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবাহের পরে এ বিষয়ে তিনি অধিকতর উৎসাহী হন। ললিতকলার ঐ অনুরাগই নিয়ে আসে তাঁকে অ্যাকাডেমির অঙ্গনে।

অ্যাকাডেমির রূপারোপের জন্য শুধু অর্থব্যয়ই নয়, এই সংস্থার সংগ্রহশালা সমৃদ্ধ করার জন্য বহু দুষ্প্রাপ্য দেশী-বিদেশী শিল্পসামগ্রীও তিনি দান করেন। পিতৃসূত্রে কৈশোরে বিশ্বকবির সান্নিধ্যলাভ হয় তাঁর। শান্তিনিকেতনের ছাত্রী হয়ে কবির সঙ্গে থাকতেন তিনি 'উত্তরায়ণ'-এ। তাঁর আসল নাম প্রীতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম দেন রাণু। কারণ, তাঁকে দেখে নিজের কন্যা রাণুকে মনে পড়ত কবির। সেই থেকে কবির ডাকে 'প্রীতি' হন 'রাণু। কৈশোর থেকে বিশ্বকবির স্মৃতি-বিজড়িত যে বিবিধ সামগ্রী সংগ্রহ করেন রাণু, তার কৌতূহলোদ্দীপক কয়েকটি নিদর্শন তিনি দান করেন অ্যাকাডেমিকে। অ্যাকাডেমির রবীন্দ্র গ্যালারিতে আছে ঐ নিদর্শনগুলি।

মোটামুটিভাবে অ্যাকাডেমিকে অবলম্বন করে তাঁকে সক্রিয় হতে দেখি ১৯৫০ থেকে। লেডি রাণু তখন সাহিত্যচক্র 'রবিবাসর'-এর সদস্যা। আবার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এরও তিনি সভাপতি তখন। সেই কারণে 'রবিবাসর'-এর ঐ বছরের ষোড়শ অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয় ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে। মিউজিয়ামে চলছিল তখন অ্যাকাডেমির বার্ষিক প্রদর্শনী। সভানেত্রী লেডি রাণুর আমন্ত্রণেই রবিবাসরের অধিবেশনটি বসে অ্যাকাডেমির প্রদর্শনী কক্ষে। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন অর্ধেন্দ্র-কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

'রবিবাসর'-এর ঐ অধিবেশনে অ্যাকাডেমি সম্পর্কে সেদিন তিনি যা বলেছিলেন,

সেখানেই পাওয়া যাবে অ্যাকাডেমির গ্যালারি বা গৃহনির্মাণের ইঙ্গিত। তাঁর ঐ ভাষণটি প্রকাশিত হয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় (১৮ জানুয়ারি ১৯৫০)। উদ্ধৃত করা হল তাঁর ঐ বক্তৃতার অংশবিশেষ :

'সভার প্রারম্ভে নিখিল ভারত চারুকলা প্রদর্শনীর সভানেত্রী ও রবিবাসরের একমাত্র সদস্যা লেডি রাণু মুখোপাধ্যায় সকলকে সাদর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং প্রদর্শনীতে রক্ষিত চিত্রগুলি সদস্যগণকে দেখান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে, ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট স্বর্গীয় মহারাজা স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও যত্নে ভারতীয় শিল্পিগণকে শিল্পকলায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ইহার প্রতিষ্ঠা হয় এবং তিনি আশা করেন যে, শীঘ্র এই সমিতির উদ্যোগে কলিকাতায় একটি 'জাতীয় চিত্র-শালা' প্রতিষ্ঠিত হইবে।'

লেডি রাণুর ঐ 'জাতীয় চিত্রশালা' বাস্তবে পরিণত হয় আরও কয়েক বছর পরে। তিনি নিজেই লিখেছেন ঘটনাটি।

পঞ্চাশের দশকে বিশ্ববিখ্যাত বেহালাবাদক ইয়েহুদি মেনুহিন কলকাতায় এসে এক অনুষ্ঠান করেন। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছিল নিউ এম্পায়ারে। সেবারে জওহরলাল নেহরুর আমন্ত্রণে ভারতে এসেছিলেন মেনুহিন। মেনুহিনের নিউ এম্পায়ারের অনুষ্ঠানে জওহরলালও গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়।

অনুষ্ঠানের বিরতির সময় নেহরু দুঃখ করে বিধানচন্দ্রকে বলেছিলেন যে, বিদেশী অতিথিদের ভারতের চিত্র ও ভাস্কর্য দেখাবার মতো কোনো আর্ট গ্যালারি কলকাতায় নেই। তাই সেদিন তিনি লেডি রাণুকে দেখিয়ে বিধানচন্দ্রকে বলেছিলেন কলকাতায় একটি আর্ট গ্যালারি গড়ে তোলার দায়িত্ব দিতে পারেন ওঁকে। আলোচনার সময় নেহরু মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, আর্ট গ্যালারিটি যেন শহরের কেন্দ্রস্থলে হয়।

বলা নিষ্প্রয়োজন, লেডি রাণু তখন অ্যাকাডেমির সভাপতি এবং অ্যাকাডেমির কোনো নিজস্ব ভবন তখনও ছিল না। তাই ঐ সূত্রে তিনি অ্যাকাডেমির গৃহ নির্মাণের সুযোগ পান।

অনুষ্ঠানের পরের দিন ডাঃ রায় টেলিফোনে লেডি রাণুকে ডেকে পাঠান রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। সেইদিনই ডাঃ রায় সমকালীন ললিতকলা ও অন্যান্য কলাবিষয়ক সামগ্রীব একটি সংগ্রহশালা ও প্রেক্ষাগৃহের পরিকল্পনা করতে বলেন তাঁকে।

এরপর স্বরাষ্ট্রসচিব ও পুলিশ কমিশনারকে সঙ্গে নিয়ে ময়দান এলাকায় ঘুরে গ্যালারির উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের দায়িত্বও দেন তাঁকে।

লেডি রাণুর পছন্দ হয় ক্যাথিড্রাল রোডের শান্ত পরিবেশটি। কারণ, ঐ রাস্তায় তখন সেন্ট পল্স ছাড়া আর কোনো অট্টালিকা ছিল না। সেজন্য সেন্ট পল্স-এর লাগোয়া পুকুরসংলগ্ন নির্জন ঐ প্লটটি তিনি পছন্দ করেন। সরকারও তাঁকে ঐ জমিটি বরাদ্দ করেন। তারপর তাঁর নির্বাচিত ঐ জায়গাটিতেই গড়ে ওঠে অ্যাকাডেমির বাড়ি। বাড়িটি গড়ে তুলতে যে অর্থের প্রয়োজন হয় তা প্রধানত অ্যাকাডেমির অছি

পরিষদের চেয়ারম্যান ও লেডি রাণুর স্বামী স্যর বীরেন মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে দান হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল।

অ্যাকাডেমির নিজস্ব ভবন পড়ে ওঠার পর ঐ বাড়িতে নন্দলাল বসুর চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। নন্দলালের ঐ প্রদর্শনীটিই অ্যাকাডেমির নতুন বাড়ির প্রথম অনুষ্ঠান। অ্যাকাডেমির নতুন বাড়ির কোনো আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা না হলেও নন্দলালের ঐ প্রদর্শনীর মাধ্যমে গৃহের উদ্বোধন সূচিত হয়।

১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় নন্দলালের পঞ্চাশটি নির্বাচিত চিত্রের ঐ প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন রাজ্যের শিক্ষাসচিব ডঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেন। রোগশয্যায় আঁকা শিল্পীর ঐ প্রদর্শনীটি কয়েকদিন পরে এসে দেখে যান উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন।

নন্দলালের শিল্পকর্ম প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রদর্শনীর যে সূচনা অ্যাকাডেমির নতুন বাড়িতে, তা অব্যাহত আছে আজও।

অ্যাকাডেমির নিজের গ্যালারিতে আরও যে অনুষ্ঠানের আয়োজন ষাটের দশকে ঘটেছিল তার অন্যতম সিকিমের মহারাজা স্যর ত্যাসি নামগিয়ালের চিত্র প্রদর্শনী। শখের শিল্পী সিকিমের মহারাজার আঁকা চল্লিশটি ছবির ঐ প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেছিলেন রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু (ফেব্রুয়ারি ১৯৬১)।

অতঃপর ঐ বছরেই বিশ্বকবির আঁকা ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন অ্যাকাডেমিতে। কারণ, সারা দেশে তখন পালিত হচ্ছে রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী।

১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের ১৮ মে বিশ্বকবির আঁকা একান্নটি ছবির ঐ প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন কবি-কন্যা মীরা দেবী। উদ্বোধন প্রসঙ্গে পিতার উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, 'সুন্দরের আসন তিনি নিজের হাতে পেতে গিয়েছেন। সেই সুন্দরের পূজারী শিল্পী-কবিকে আমার প্রণাম জানাই।'

অ্যাকাডেমির নতুন বাড়িতে শুধু স্বল্পস্থায়ী প্রদর্শনীর আয়োজনই নয়, স্থায়ী কয়েকটি গ্যালারিও গড়ে তোলা হয়েছে। অ্যাকাডেমির ঐ গ্যালারিগুলির অন্যতম 'রবীন্দ্র গ্যালারি'। বিশ্বকবির আঁকা ছবি ও তাঁর পাণ্ডুলিপির নিদর্শন সংগৃহীত আছে এখানে।

এছাড়া 'গ্যালারি অফ মিনিয়েচার পেন্টিং', 'কনটেমপোরারি আর্ট গ্যালারি' (১৯৬৬) এবং 'গ্যালারি অফ ওল্ড এনগ্রেভিংস অ্যাণ্ড স্কেচেস'-এ (১৯৭০) প্রদর্শিত হয় নানা মনোজ্ঞ নিদর্শন।

এই গ্যালারিগুলিতে নিজের সংগৃহীত নানা শিল্পসামগ্রী দান করেছেন শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়। ইংল্যাণ্ড থেকে এনেও তিনি অ্যাকাডেমিকে দিয়েছেন কলকাতা-সম্পর্কিত বিবিধ শিল্পবস্তু। মিনিয়েচার গ্যালারিতে তাঁর পিতা ফণিভূষণ অধিকারী প্রদত্ত সতেরোটি প্রাচীন ছবির একটি সেটও রক্ষিত আছে। এছাড়া পুরনো শাড়ি ও কার্পেটের বিস্ময়কর সংগ্রহও আছে অ্যাকাডেমিতে।

ক্যাথিড্রাল রোডে নিজের বাড়িতে অ্যাকাডেমির যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা, তার অগ্রগতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছেন রাণু মুখোপাধ্যায়। পঞ্চাশের দশক

থেকে অ্যাকাডেমি পরিচালনায় তাঁর সঙ্গে আরও যাঁরা একাত্ম হয়ে কাজ করেছেন বা করছেন তাঁদের মধ্যে সতীশচন্দ্র সিংহ, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও জগদীশচন্দ্র সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী সময়ে যুগ্মভাবে কে. ডি. ঘোষের সঙ্গে রমেন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র সিংহ অবৈতনিক সম্পাদকের দায়িত্ব বহন করেন।

ঐ সময় থেকে অ্যাকাডেমির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন রথীন মৈত্র ও সুনীল পাল। অ্যাকাডেমির একজিকিউটিভ কমিটিতে (১৯৫০) দেবাংশু রায়চৌধুরী, শৈলজ মুখোপাধ্যায় প্রমুখর সঙ্গে ছিল রথীন মৈত্র ও সুনীল পালের নাম। রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গেও একদা অ্যাকাডেমির যুগ্ম-সম্পাদক হয়ে কাজ করেছেন রথীন। তারপর অ্যাকাডেমির অঙ্গনে একে-একে পদার্পণ করেন চিন্তামণি কর, গোপাল ঘোষ এবং ইন্দ্র দুগারের মতো শিল্পী। সুবর্ণ-জয়ন্তীর সময় (১৯৫৮) অ্যাকাডেমির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদকও ছিলেন রথীন। তখন তাঁর সহযোগী গোপাল ঘোষ।

সমকালীন শহর কলকাতার শিল্পকলা আন্দোলনে অ্যাকাডেমির যে ভূমিকা, তার নেপথ্যে ওঁরা সবাই। ওঁদের মতো আরও অনেক শিল্পী ও শিল্পদরদীর নিরলস প্রচেষ্টায় অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস আজ এই শহরের অগ্রণী প্রতিষ্ঠান। অ্যাকাডেমির অর্ধশতবর্ষে উত্তরণের মূলে রয়েছে ওঁদেরই নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতা। প্রদ্যোতকুমার থেকে লেডি রাণু—যিনিই হোন না কেন, যখনই তাঁরা এসেছেন অ্যাকাডেমির নেতৃত্বে, তখনই তাঁদের পাশে থেকে এই প্রতিষ্ঠানকে করে তুলেছেন এক সর্বজনীন শিল্পসংস্থা।

উল্লেখপঞ্জী

১. Advertisement (To be dedicated by Special Permission to Her Most Gracious Majesty), 'The Friend of India', January 5, 1860.

২. কমল সরকার, 'কলকাতার প্রথম চিত্রপ্রদর্শনী', 'দেশ', ২৫ আষাঢ় ১৩৮৯, ১০ জুলাই ১৯৮২ (৪৯ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা)।

৩. 'Weekly Epitome of News', 'The Friend of India', April 6, 1854. Also see, 'The School of Industrial Art', 'The Friend of India', August 24, 1854.

৪. শরচ্চন্দ্র দেব, 'কলিকাতার ইতিহাস', 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি', বৈশাখ ১২৯৩, পৃ. ২৫৫-২৫৬।

৫. যোগেশচন্দ্র বাগল, 'কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র' (প্রথম সং, আষাঢ় ১৩৬৬), 'কলা-মহাবিদ্যালয়' নিবন্ধ।

৬. কমল সরকার, 'শিল্পী সপ্তক' (এপ্রিল ১৯৭৭), 'হেনরি হোভার লক' নিবন্ধ। আরও দ্র. কমল সরকার, 'ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী' (জুলাই ১৯৮৪)।

৭. Jogesh Chandra Bagal, 'History of the Government College of Art and Craft' (Calcutta, 1964).

৮. 'Calcutta Art Society', 'The Englishman', June 5, 1889.
৯. 'Calcutta Art Society—Opening of the First Exhibition', 'The Englishman', January 21, 1890.
১০. 'We beg to call prominent attention to the following' (Editorial Note), 'The Bengalee', June 4, 1892.
১১. Editorial Note, 'The Bengalee', August 13, 1892.
১২. 'Calcutta and Mofussil—An Artist's Meeting', 'The Amrita Bazar Patrika', June 13, 1905.
১৩. বিবিধ প্রসঙ্গ ও মন্তব্য, 'শিল্প ও সাহিত্য', আশ্বিন ১৩১২ (৫ বর্ষ, ৬ সংখ্যা)।
১৪. 'The Oriental Art Society of India', 'The Englishman', April 30, 1907.
১৫. 'Exhibition of Oriental Paintings', 'The Englishman', January 30, 1908.
১৬. 'The Society of Fine Arts—Prospectus of the First Annual Exhibition' (1921).
১৭. 'Growth of Society of Fine Arts—Second Exhibition', 'The Statesman', December 22, 1922.
১৮. 'ইয়ং আর্টিস্ট ইউনিয়ন', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ২৪ ডিসেম্বর ১৯৩১ (৮ পৌষ ১৩৩৮)।
১৯. 'Neo Bengal School of Art—Exhibition of the Art Rebel Society', 'The Amrita Bazar Patrika', April 21, 1933.
২০. 'Indian Fine Arts—Proposed Academy in Calcutta—Notable Step—Inaugural Address by Maharaja Tagore', 'The Statesman', August 16, 1933.
২১. 'Academy of Fine Arts, Calcutta—Catalogue and Price List of the First Annual Exhibition (1933-1934)'.
২২. 'ফাইন আর্টস একাডেমীর বাৎসরিক প্রদর্শনী--যাদুঘরে নিজাম কর্তৃক উদ্বোধন', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ২৩ ডিসেম্বর ১৯৩৬ (৮ পৌষ ১৩৪৩)।

শঙ্কর ভট্টাচার্য

কলকাতার সাধারণ নাট্যশালা

১৮৭২—১৯৭২

প্রথম বাংলা সাধারণ নাট্যশালা

১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর কলকাতার ৩৬৫, আপার চিৎপুর রোডে, মধুসূদন সান্যালের বাড়ির উঠোনে প্রথম বাংলা সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ন্যাশানাল থিয়েটার' নামক এই নাট্যশালাটির দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছিল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক দিয়ে। সেই ঐতিহাসিক বাড়িটির বর্তমান ঠিকানা ২৭৯ এ-এফ, রবীন্দ্র সরণি। হস্তান্তরের সুবাদে সেদিনের 'সান্যাল বাড়ির' নাম হয়ে গিয়েছে 'মল্লিকদের ঘড়িওয়ালা বাড়ি'।

ন্যাশানাল থিয়েটার স্থাপনের ব্যাপারে যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি (১৮৫০-১৯০৮), নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫০-১৮৮২) ও ধর্মদাস সুর (১৮৫০-১৯১০)। মতদ্বৈধতার কারণে থিয়েটার খোলার আগেই দল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)। পরে তিনি যোগ দিয়েছিলেন অবৈতনিক অভিনেতারূপে।

বাঙালির এই প্রথম সাধারণ নাট্যশালার আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র বিরানব্বই দিন (৭ ডিসেম্বর ১৮৭২ থেকে ৮ মার্চ ১৮৭৩ পর্যন্ত)। অন্তর্দ্বন্দ্বে ন্যাশানাল থিয়েটার দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় ন্যাশানাল আর হিন্দু ন্যাশানাল থিয়েটারে। পরে দুটি দলেরই বিলুপ্তি ঘটে।

ওরিয়েন্টাল থিয়েটার

ন্যাশানাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার অনতিপরে, ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি, ঠনঠনিয়া-কালীতলার কাছে ২২২, কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে (বর্তমানে বিধান সরণি) কৃষ্ণচন্দ্র দেবের বাড়িতে খোলা হয় 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার'। ঝামাপুকুর অঞ্চলের কয়েকজন নাট্যামোদীর উদ্যোগে স্থাপিত এই সাধারণ নাট্যশালায় মাত্র চার-পাঁচ রাত অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বেঙ্গল থিয়েটার থেকে প্রেসিডেন্সি থিয়েটার

ধনকুবের আশুতোষ দেব ওরফে ছাতুবাবু (১৮০৫-১৮৫৬) পুরনো কলকাতার একজন

প্রবাদপুরুষ। বিডন স্ট্রিটের (বর্তমানে দানী ঘোষ সরণি) পৈতৃক ভদ্রাসনের উলটোদিকে তাঁর একটি খালি জমি ছিল, যা লোকমুখে পরিচিত ছিল 'ছাতুবাবুর মাঠ' নামে। সেই মাঠের কিয়দংশ ভাড়া নিয়ে ছাতুবাবুরই দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ (১৮৩৪-১৮৮০) কলকাতার তৃতীয় সাধারণ নাট্যশালা 'বেঙ্গল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। লিউয়িসের লাইসিয়াম থিয়েটারের ধাঁচে মাটির দেওয়াল এবং খোলার চাল দিয়ে থিয়েটারগৃহ নির্মিত হয়। বেঙ্গল থিয়েটারের আগে আর কোনো সাধারণ নাট্যশালার নিজস্ব বাড়ি ছিল না। খোলার বাড়ি হলেও এটিই কলকাতার প্রথম স্থায়ী নাট্যশালা। পরবর্তীকালে অবশ্য খোলার বদলে করোগেটেড শিটের চাল হয়েছিল।

গোড়ার দিকে বাংলা সাধারণ নাট্যশালায় পুরুষেরাই স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করতেন। বেঙ্গল থিয়েটারই সর্বপ্রথম স্ত্রী-ভূমিকাগুলি অভিনয় করানোর জন্য বারাঙ্গনাদের নিয়োগ করেন। প্রথম যে চারজন বারাঙ্গনাকে অভিনয়ের কাজে নিয়োগ করা হয়, তাঁদের নাম গোলাপ (পরে সুকুমারী দত্ত), এলোকেশী, জগত্তারিণী ও শ্যামা।

১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ১৬ অগাস্ট মাইকেল মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক দিয়ে ৯, বিডন স্ট্রিটের পূর্ববর্ণিত বাড়িতে বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ৭ জানুয়ারি মহারানী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স অ্যালবার্ট ভিক্টরকে রাজকীয় সংবর্ধনা জানানোর জন্য গড়ের মাঠে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে 'শকুন্তলা' নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয় দেখিয়ে বেঙ্গল থিয়েটার 'রয়াল' উপাধি পায়। পরবর্তী ১১ জানুয়ারি থেকে বেঙ্গল থিয়েটার নামধারণ করে 'রয়াল বেঙ্গল থিয়েটার'।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর (৮ অক্টোবর ১৮৮০) পরে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯০১) আমরণ থিয়েটার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই (২০ এপ্রিল ১৯০১) রয়াল বেঙ্গল থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর এই নাট্যশালা ভাড়া নিয়ে এখানে একে-একে দেখা দেয় অরোরা থিয়েটার (১৯০১-১৯০২), ইউনিক থিয়েটার (১৯০৩-১৯০৪), ন্যাশানাল থিয়েটার (১৯০৫-১৯১১), গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার (১৯১১), গ্র্যাণ্ড ন্যাশানাল থিয়েটার (১৯১১-১৯১৪), থেসপিয়ান টেম্পল (১৯১৫-১৯১৬), প্রেসিডেন্সি থিয়েটার (১৯১৭-১৯১৮)।

তারপর এখানেই বিডন স্ট্রিট ডাকঘর স্থাপিত হয়। এখনও বেঙ্গল থিয়েটারের জায়গায় বিরাজ করছে ডাকঘরটি।

ভুবনমোহন নিয়োগীর গ্রেট ন্যাশানাল

সেকালে কলকাতার একজন ডাকসাইটে ধনী ছিলেন ভুবনমোহন নিয়োগী (১৮৫৭-১৯২৭)। ভুবনমোহনের অর্থে ও স্বত্বাধিকারে কলকাতায় একটি সাধারণ নাট্যশালা স্থাপিত হয়েছিল। ৬, বিডন স্ট্রিট (এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার) মহেন্দ্রনাথ দাসের খালি জমি ইজারা নেন ভুবনমোহন। ধর্মদাস সুর সেখানে গড়ের মাঠের লিউয়িস থিয়েটারের আদলে কাঠের তৈরি এক সুদৃশ্য নাট্যশালা নির্মাণ করেন। নাট্যশালাটির

নামকরণ করা হয় 'গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার'। গ্রেট ন্যাশানালের দ্বারোদ্ঘাটন হয় ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর।

গ্রেট ন্যাশনাল সম্প্রদায় প্রথমে অভিনেত্রী নিয়োগ করেননি। অভিনেত্রী নেওয়া শুরু হয় 'সতী কি কলঙ্কিনী' মঞ্চস্থ করার সময়ে (১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪)। গোড়ায় পাঁচজন অভিনেত্রী নিযুক্ত হন। তাঁরা হলেন রাজকুমারী (রাজা), ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী, হরিদাসী ও গায়িকা যাদুমণি। কিছুদিন পরেই এখানে অভিনেত্রী হিসাবে যোগ দেন বিনোদিনী।

১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের অগাস্ট মাসে ভুবনমোহন গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার ইজারা দিয়ে দেন কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কিন্তু কৃষ্ণধন বাড়িভাড়া বাকি ফেলতে থাকায় ভুবনমোহন আবার থিয়েটারের ভার তুলে নেন নিজের হাতে। এই সময়ে গ্রেট ন্যাশানালের ডিরেক্টর ও ম্যানেজার নিযুক্ত হন যথাক্রমে উপেন্দ্রনাথ দাস ও অমৃতলাল বসু। গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার তখন বেশ জমে উঠেছে। কিন্তু 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' (৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৫), 'গজানন্দ ও যুবরাজ' (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬) প্রভৃতি পালা অভিনয় করার অপরাধে রাজরোষে পড়তে হয় গ্রেট ন্যাশানালকে। সেই সূত্রে ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক, মানহানিকর ও অশ্লীল নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করে অর্ডিনান্স জারি করেন ইংরেজ সরকার (২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬)। পরে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন (১৮৭৬) বিধিবদ্ধ হয়। মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ার ফলে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। অবস্থা সামলানোর জন্য ভুবনমোহন গ্রেট ন্যাশানাল গিরিশচন্দ্রকে ইজারা দেন (অক্টোবর ১৮৭৭)। গিরিশচন্দ্র গ্রেট ন্যাশানালের নাম বদলে রাখেন 'ন্যাশানাল থিয়েটার'। কিন্তু অনতিকাল পরেই গিরিশচন্দ্র ইজারার অধিকার হস্তান্তর করেন। অতঃপর ন্যাশানাল থিয়েটার ক্রমাগত হাত বদলাতে থাকে। শেষে ট্যাক্স বাকি পড়ার দায়ে থিয়েটার নিলামে উঠলে প্রতাপচাঁদ জহুরি নামে এক মাড়ওয়ারী ব্যবসাদার ন্যাশানাল থিয়েটার কিনে নেন। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারি থেকে প্রতাপচাঁদের কর্তৃত্বে ন্যাশানাল থিয়েটারের যাত্রারম্ভ হয়।

১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে গিরিশচন্দ্র ও তাঁর অনুরক্ত অভিনেতৃরা প্রতাপচাঁদের থিয়েটার ছেড়ে দেন। ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে প্রতাপচাঁদ ন্যাশানাল থিয়েটার ভাড়া দিয়ে দেন। ক্রমাগত ভাড়াটে বদলের ফলে ন্যাশানাল থিয়েটারে ভাঙন ধরে।

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের জুলাই-অগাস্ট মাসে দেউলিয়া ভুবনমোহন নিয়োগী নিজের স্ত্রীর নামে ন্যাশানাল থিয়েটার ভাড়া নেন। গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার নাম দিয়ে ভুবনমোহন অভিনয়ের বন্দোবস্ত করলে প্রতাপচাঁদ তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। সে মামলায় প্রতাপচাঁদ জয়ী হন। গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। হাতিবাগানের স্টার থিয়েটারের অংশীদাররা আড়াই হাজার টাকায় কিনে নিয়ে প্যাভিলিয়ানটি ধূলিসাৎ করে দেন। উত্তরকালে ঐ জমির উপরেই মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্টার থেকে মনোমোহন

১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতাপচাঁদ জহুরির ন্যাশনাল থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করার পর গিরিশচন্দ্র তাঁর অনুরাগী শিল্পীদের নিয়ে একটি নতুন দল গড়লেন—'ক্যালকাটা স্টার কোম্পানি'। এই দল বেঙ্গল থিয়েটারের মঞ্চ ভাড়া নিয়ে তিন রাত্রি (২৮ মার্চ, ৩১ মার্চ ও ৭ এপ্রিল ১৮৮৩) অভিনয় করে।

এই ঘটনাগুলির কয়েক মাস আগে গুর্মুখ রায় মুসাদ্দি (১৮৬৪-১৮৮৬) নামে এক ধনী মাড়ওয়ারী যুবক শর্তসাপেক্ষে একটি থিয়েটার গৃহ করে দেওয়ার প্রস্তাব রাখেন গিরিশচন্দ্রের কাছে। শর্তটি হচ্ছে, বিনোদিনীকে গুর্মুখের রক্ষিতা হয়ে থাকতে হবে। ক্যালকাটা স্টার কোম্পানির অভিনেতাদের কাতর অনুরোধে বিনোদিনী তাঁর পূর্বরক্ষকের আশ্রয় ছেড়ে গুর্মুখের শর্ত মেনে নিলেন। বাগবাজারের বিখ্যাত ধনী কীর্তিচন্দ্র মিত্রের ৬৮, বিডন স্ট্রিটের খালি জমি ইজারা নিয়ে গুর্মুখ এক পাকা নাট্যশালা তৈরি করালেন। কথা ছিল, বিনোদিনীর নামেই থিয়েটারের নাম রাখা হবে 'বি. থিয়েটার'। কিন্তু ক্যালকাটা স্টার কোম্পানির অভিনেতাদের চক্রান্তে থিয়েটারটি শেষ মুহূর্তে 'স্টার থিয়েটার' নামে রেজেস্ট্রিকৃত হয়। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ২১ জুলাই গিরিশচন্দ্রের 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক দিয়ে স্টার থিয়েটারের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। ঐ বছরের শেষদিকে আত্মীয়দের চাপে ও ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে গুর্মুখ রায় স্টারের স্বত্ব বিক্রি করে দেন এগারো হাজার টাকায়। তখন থিয়েটারের মালিক হলেন অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, দাশুচরণ নিয়োগী ও হরিপ্রসাদ বসু। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ স্টারের এই মঞ্চে 'চৈতন্য-লীলা'র অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। অভিনয়দর্শনে প্রীত হয়ে তিনি বিনোদিনীকে স্পর্শ করে বলেন, 'চৈতন্য হোক্।' ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে সহকর্মীদের দুর্ব্যবহারের জন্য বিনোদিনী মঞ্চজীবন চিরতরে পরিত্যাগ করেন।

'রূপ-সনাতন' অভিনয়ের সময় (২১ মে ১৮৮৭) ধনকুবের মতিলাল শীলের (১৭৯১-১৮৫৪) পৌত্র গোপাললাল শীল কূটকৌশলে স্টার থিয়েটারের জমি কিনে নিয়ে স্টারের স্বত্বাধিকারীদের উচ্ছেদের নোটিশ দেন। স্টারের স্বত্বাধিকারীরা তিরিশ হাজার টাকায় গোপাললালকে থিয়েটারগৃহ ছেড়ে দিলেও স্টার থিয়েটারের নাম (Good will) হাতছাড়া করেননি। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের ৩১ জুলাই বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে স্টার থিয়েটারের শেষ অভিনয় 'বুদ্ধদেবচরিত' আর 'বেল্লিক বাজার'।

স্টারের বাড়িতে, কেদারনাথ চৌধুরীকে ম্যানেজার করে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের ৮ অক্টোবর গোপাললাল শীল খুললেন 'এমারেল্ড থিয়েটার'। থিয়েটার জমাতে না পেরে বিশ হাজার টাকা বোনাস আর মাসিক সাড়ে তিনশো টাকা মাইনেয় গিরিশচন্দ্রকে ম্যানেজার করে নিয়ে আসেন গোপাললাল। বোনাসের টাকা থেকে ষোলো হাজার টাকা গিরিশচন্দ্র নিঃশর্তভাবে তুলে দিলেন স্টারের স্বত্বাধিকারীদের হাতে—হাতিবাগানে স্টার থিয়েটারের নতুন বাড়ি তৈরির জন্য। কিছুকাল পরে গোপাললাল তাঁর থিয়েটার-গৃহটি লীজ দিয়ে সরে গেলেন। তারপর কয়েকবার লেসী-বদল হয়। অর্ধেন্দুশেখরও শেষ-

দিকে এই থিয়েটারের লেসী হয়েছিলেন এবং তার ফলে দেনার দায়ে তাঁর বসতবাড়িটি বিক্রি হয়ে যায়। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে এমারেল্ড থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়।

এমারেল্ড বন্ধ হয়ে গেলে নীলমাধব চক্রবর্তী তার জায়গায় সিটি থিয়েটার খোলেন। কিন্তু নীলমাধব বাড়িভাড়া না দিতে পারায় গোপাললাল সিটি থিয়েটার উঠিয়ে দেন। নীলমাধবের পর অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯১৬) থিয়েটারগৃহটি লীজ নেন। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১৬ এপ্রিল উদ্বোধিত হয় অমরেন্দ্রনাথের 'ক্লাসিক থিয়েটার'। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের প্রথমার্ধে ক্লাসিক থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায় ও নিলামে ওঠে। শরৎকুমার রায় তখন এক লাখ আট হাজার টাকায় থিয়েটারটি কিনে নিয়ে নতুন নামকরণ করেন 'কোহিনূর থিয়েটার'। এই কোহিনূর থিয়েটারেই অর্ধেন্দুশেখরের শেষ মঞ্চাবতরণ— 'প্রফুল্ল' আর 'নবীন তপস্বিনী'-তে যথাক্রমে 'যোগেশ' আর 'জলধরের' ভূমিকায় (৯ অগাস্ট ১৯০৮)। পরের মাসেই অর্ধেন্দুশেখরের মৃত্যু হয় (১৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৮)। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ১৭ জুলাই কোহিনূর থিয়েটার নিলামে বিক্রি হয়ে যায়।

এক লাখ এগারো হাজার টাকার কোহিনূর থিয়েটার কিনে নিয়ে মনোমোহন পাঁড়ে স্বনামে তার নামকরণ করেন 'মনোমোহন থিয়েটার'। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর এই থিয়েটারের দ্বারোদঘাটন হয়, ম্যানেজার হন দানীবাবু। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি মনোমোহন থিয়েটারের শেষ নাট্যাভিনয় 'ললিতাদিত্য'।

ছ' মাস পরে, মনোমোহন রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নিয়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ী স্থাপন করলেন তাঁর 'নাট্যমন্দির'। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ৬ অগাস্ট যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা' নাটক দিয়ে নাট্যমন্দিরের উদ্বোধন হয়। 'সীতা'-র অভিনয় ভারতীয় নাট্যমঞ্চের এক যুগান্তকারী ঘটনা। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের শেষে শিশিরকুমার মনোমোহন থিয়েটার ছেড়ে দেন।

১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত 'মিত্র থিয়েটার', ১৯২৭-এর জুন থেকে ১৯২৮-এর জুন পর্যন্ত 'আর্ট থিয়েটার' মনোমোহন মঞ্চে অভিনয় করে। ১৯২৮-এর অগাস্ট মাসে অরোরা ফিল্মের অনাদি বসু মনোমোহন রঙ্গমঞ্চ লীজ নেন। ১৯২৯-এর ডিসেম্বর থেকে লেসী হন প্রবোধচন্দ্র গুহ। প্রবোধচন্দ্রের পরিচালনাধীনে এখানকার শেষ অভিনয় মন্মথ রায়ের 'কারাগার' (১ মার্চ ১৯৩১)। তারপর নতুন রাস্তা চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ তৈরির জন্য ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট থিয়েটারগৃহটি ভেঙে ফেলে।

মনোমোহন থিয়েটারের স্থিতিস্থান ছিল বর্তমান চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ আর দানী ঘোষ সরণির সংযোগস্থলের উত্তর-পূর্ব কোণে, ঠিকানা ছিল ৬৮, বিডন স্ট্রিট। বিনোদিনীর আত্মত্যাগে আর গুর্মুখ রায়ের টাকায় যে সুদৃশ্য নাট্যশালা নির্মিত হয়েছিল, আজ তার চিহ্নমাত্র নেই, এমনকি তার ছবিও দুষ্প্রাপ্য। শুধু ঐ নাট্যশালার প্রাঙ্গণে যে শিবলিঙ্গটি ছিলেন, তিনি এখনও স্বস্থানে বিরাজ করছেন।

বীণা থিয়েটার

১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়ের (১৮৪৯-১৮৯৪)

প্রতিষ্ঠিত বীণা থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হয় ৩৮, মেছুয়াবাজার স্ট্রিটে। বাংলা সাধারণ নাট্যশালায় যখন অভিনেত্রী-নিয়োগ চালু হয়ে গেছে, তখন রাজকৃষ্ণ বীণায় পুরুষদের দিয়ে স্ত্রীভূমিকাগুলি অভিনয় করাতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ঋণ-পরিশোধের আশায় ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে রাজকৃষ্ণ থিয়েটারটি ভাড়া দিয়ে দেন আর্য নাট্য-সমাজকে। কিন্তু তাঁরাও থিয়েটার চালাতে পারলেন না, বছর ঘোরার আগেই নভেম্বর মাসে তাঁদের অভিনয় বন্ধ হয়ে গেল। এরপর নট ও নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস মঞ্চটি ভাড়া নিয়ে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'নিউ ন্যাশানাল থিয়েটার' খুললেন। কিন্তু চালাতে না পারায় পরের বছরের মার্চ মাসে উপেন্দ্রনাথকে বিদায় নিতে হল। থিয়েটারের দায়িত্বভার তখন স্বহস্তে ফিরিয়ে নিলেন রাজকৃষ্ণ। বারাঙ্গনা-অভিনেত্রী নিয়ে তিনি ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের ২০ জুলাই থেকে শুরু করলেন 'মীরাবাঈ' নাটকের অভিনয়। টিকিটের দাম ছিল দু' আনা, কিন্তু এক আনাতে দাম নামিয়েও থিয়েটার চালাতে পারলেন না রাজকৃষ্ণ। ঋণের দায়ে তিনি সর্বস্বান্ত হলেন। রাজকৃষ্ণের বড় সাধের বীণা থিয়েটার হাতছাড়া হয়ে গেল।

পরবর্তীকালে এই নাট্যমঞ্চে বিভিন্ন সময়ে দেখা দেয় 'ইণ্ডিয়ান থিয়েটার', 'সিটি থিয়েটার', 'ভিক্টোরিয়া অপেরা হাউস' ও 'গেইটি থিয়েটার'। আরও পরে নাট্যগৃহটি রূপান্তরিত হয় চিত্রগৃহে। বর্তমানে সিনেমা-হলটির নাম 'জওহর', ঠিকানা ২২, কেশব সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৯।

হাতিবাগানের স্টার

গোপাললাল শীলের চাপে বিডন স্ট্রিটের আদত রঙ্গমঞ্চ থেকে স্থানচ্যুত হওয়ার পর স্টারের নতুন ঠিকানা হল ৭৫/৩, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট (বর্তমানে ৭৯/৩/৪, বিধান সরণি)। বিডন স্ট্রিটে স্টার থিয়েটারের শেষ অভিনয় ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের ৩১ জুলাই। প্রায় দশ মাস পরে, ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের ২৫ মে, হাতিবাগানের নতুন বাড়িতে গিরিশচন্দ্রের 'নসীরাম' নাটক দিয়ে স্টার থিয়েটারের নবপর্যায় শুরু হয়। স্বত্বাধিকারী রইলেন সেই আগেকার চারজনই—অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, দাশুচরণ নিয়োগী ও হরিপ্রসাদ বসু।

১৯১১ খ্রীস্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টার থিয়েটার লীজ নেন। অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর (৬ জানুয়ারি ১৯১৬) পর অনঙ্গমোহন হালদার ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে লেসী হন। পরের বছর স্টার লীজ নেন গিরিমোহন মল্লিক। এরপর নট-নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটার ছেড়ে যোগ দেন স্টারের ম্যানেজার-পদে।

সেই সময়ে স্টার রঙ্গমঞ্চে আর্ট থিয়েটার লিমিটেড নামে একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্সের হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, সলিসিটর ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, সতীশচন্দ্র সেন, কুমারকৃষ্ণ মিত্র এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর হন। প্রবোধচন্দ্র গুহ সেক্রেটারি ও অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ম্যানেজার হিসাবে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনভার গ্রহণ করেন।

১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের ৩০ জুন স্টার মঞ্চে আর্ট থিয়েটারের প্রযোজনায় অপরেশচন্দ্রের

'কর্ণার্জুন' মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকেই তিনকড়ি চক্রবর্তী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অহীন্দ্র চৌধুরী সাধারণ নাট্যশালায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।

১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে আর্ট থিয়েটার উঠে যায়। তারপর শিশিরকুমার স্টার থিয়েটার ভাড়া নিয়ে সেখানে প্রথমে 'নাট্যমন্দির', পরে 'নব নাট্যমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি নব নাট্যমন্দিরের অবলুপ্তির পর বিমল পাল স্টারের লেসী হন। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে আবার স্টারের লেসী-বদল হয়। নতুন লেসী হলেন সলিলকুমার মিত্র, ইনি মিনার্ভা থিয়েটারের অংশীদার মহেন্দ্রকুমার মিত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র। ১৯৫০-এর দশকে স্টারের মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের আমূল সংস্কার সাধন করা হয়। স্থাপিত হয় ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র। স্টার থিয়েটারই কলকাতার প্রথম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা।

স্টার থিয়েটারে শেষ পালাবদল ঘটে ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের ১ এপ্রিল। ঐদিন সলিলকুমার মিত্র স্টারের ইজারাস্বত্ব, ব্যবসা, ব্যবসায়িক সুনাম (Goodwill) ও পরিসম্পদ ৮৭, লেনিন সরণির রণজিৎ পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড তথা রঞ্জিতমল কাংকারিয়াকে হস্তান্তরিত করে দেন।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬, বিডন স্ট্রিটে যে জমির উপরে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার ছিল, সেই জমিটা লীজ নেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়। তাঁরই উদ্যোগে গিরিশচন্দ্র-অনূদিত 'ম্যাকবেথ' দিয়ে 'মিনার্ভা থিয়েটারের উদ্বোধন হয় ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি।

বেহিসেবি খরচ করার ফলে ঋণগ্রস্ত হয়ে নাগেন্দ্রভূষণ মিনার্ভা থিয়েটার প্রমথনাথ দাসের কাছে বন্ধক রাখেন। পাওনাদারের তাড়নায় পরে বন্ধকী থিয়েটারের আট আনা অংশ তিনি প্রমথনাথকে বিক্রি করতে বাধ্য হন। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে নাগেন্দ্রভূষণ ও প্রমথনাথের যৌথ দেনার দায়ে হাইকোর্টের নিলামে ওঠে মিনার্ভা থিয়েটার। মঞ্চটি তখন কিনে নেন বেণীমাধব রায় ও অতুল রায়। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ সরকার মিনার্ভা থিয়েটার এঁদের কাছ থেকে ক্রয় করেন। নরেন্দ্রনাথের হাত থেকে আবার মিনার্ভা যায় প্রিয়নাথ দাসের স্বত্বাধিকারে। অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে প্রিয়নাথের কাছ থেকে মিনার্ভা লীজ নেন। পরের বছর চুনিলাল দেবকে থিয়েটার চালানোর ভার ছেড়ে দিলেও লীজের অধিকার ধরে রেখেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। পরে তিনি তা হস্তান্তর করলেন মনোমোহন পাঁড়েকে। চুনিলাল দেব মিনার্ভা ছেড়ে চলে গেলেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে মিনার্ভা আবার নীলামে উঠলে লেসী মনোমোহন ষাট হাজার টাকায় থিয়েটারটি কিনে নিলেন। মনোমোহনের অংশীদার (Working Partner) হলেন অ্যাটর্নি মহেন্দ্রকুমার মিত্র। বাইশ হাজার টাকার বিনিময়ে মনোমোহন পরে মহেন্দ্রকুমারকে এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার করে নিয়েছিলেন।

১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি গিরিশচন্দ্রের প্রয়াণ ঘটে। তার আগে, ১৯১১

খ্রীস্টাব্দের ১৫ জুলাই এই থিয়েটারেই তাঁর শেষ মঞ্চাবতরণ, 'বলিদান' নাটকে করুণাময়ের ভূমিকায়।

১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ১২ মে মহেন্দ্রকুমার মিত্রের মৃত্যু হয়। ঐ সময়ে মনোমোহন পাঁড়ে মিনার্ভা থিয়েটারের দখল নেন। মহেন্দ্রকুমারের ভাই উপেন্দ্রকুমার তখন নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্রের তরফে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মিনার্ভা ছিল মনোমোহনের পরিচালনাধীন। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে হাইকোর্টের আদেশে মিনার্ভার লেসী হন উপেন্দ্রকুমার মিত্র। অপরেশচন্দ্রকে ম্যানেজার করে তিনি মিনার্ভা চালাতে থাকেন। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ১৮ অক্টোবর অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয় মিনার্ভা। প্রায় তিন বছর বহু কষ্ট স্বীকার করে উপেন্দ্রকুমার ভ্রাম্যমাণ থিয়েটাররূপে মিনার্ভার দলটিকে বাঁচিয়ে রাখেন। নতুন বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হলে ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের ৮ অগাস্ট মহাতপচন্দ্র ঘোষের 'আত্মদর্শন' নাটক নিয়ে মিনার্ভা সম্প্রদায় আবার নিজস্ব মঞ্চে অভিনয় শুরু করে। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে উপেন্দ্রকুমার মিত্র মিনার্ভার কর্তৃত্ব ছেড়ে দেন। পরের বছর জুলাই মাসে মিনার্ভার নতুন লেসী হন হেমেন মজুমদার। ১৯৩৯ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত মিনার্ভা ছিল এন. সি. গুপ্ত, চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেলোয়ার হোসেনের কর্তৃত্বাধীন। এরপর কৃষ্ণ কুণ্ডু কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময়ে মিনার্ভা বারেবারে বন্ধ হয়েছে এবং খুলেছে। নানা ব্যক্তি নানা সময়ে থিয়েটার ভাড়া নিয়েছেন। ১৯৫৯ থেকে উৎপল দত্তের লিটল থিয়েটার গ্রুপ এই মঞ্চে নিয়মিত অভিনয় শুরু করেন। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত মিনার্ভায় অভিনীত প্রতিটি নাটকেই তাঁরা প্রয়োগনৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তাঁদের আমলে মিনার্ভা নবজীবন পেয়েছিল।

কার্জন থেকে নাট্যভারতী

৯১, হ্যারিসন রোডে (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) কার্জন থিয়েটার নামে একটি নাট্যশালা ছিল। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর নীলমাধব চক্রবর্তী ঐ মঞ্চে তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে 'সিটি থিয়েটার' খুলেছিলেন। তারপর মঞ্চটিতে স্থান পায় অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'গ্র্যাণ্ড থিয়েটার' (১৯০৫) আর 'নিউ ক্লাসিক' (১৯০৬)। আরও পরে কার্জন থিয়েটারের নাম হয় অ্যালফ্রেড থিয়েটার। এটা ছিল পার্শীদের থিয়েটার। কুড়ির দশকে ম্যাডানের বেঙ্গলি থিয়েট্রিকাল কোম্পানি (১৯২৩), শিশিরকুমার-সম্প্রদায় (১৯২৪), মিনার্ভা থিয়েটার (১৯২৪), মিত্র থিয়েটার (১৯২৬) এই মঞ্চে অভিনয় করেছিলেন।

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ৫ অগাস্ট এই মঞ্চেই রঘুনাথ মল্লিক স্থাপন করেন 'নাট্যভারতী'। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে রঘুনাথ তাঁর লীজের স্বত্ব মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়কে হস্তান্তরিত করেন। 'নাট্যভারতী' বন্ধ হয়ে যায় ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে। বর্তমানে এই নাট্য-মঞ্চটি চলচ্চিত্রগৃহে রূপান্তরিত, নাম—গ্রেস সিনেমা।

কুড়ির দশকের কিছু ঘটনা

কুড়ির দশকে ম্যাডান কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় বেঙ্গলি থিয়েট্রিকাল কোম্পানি

কর্নওয়ালিস থিয়েটারে (বর্তমানে শ্রী সিনেমা) বাংলা নাটকের অভিনয় আরম্ভ করে। এই মঞ্চেই ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলমগীর' নাটকের নামভূমিকায় রূপদান করে শিশিরকুমার ভাদুড়ি রাতারাতি বিখ্যাত হন। সাধারণ নাট্যশালায় সেই তাঁর প্রথম অভিনয়। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে 'রঘুবীর' এবং 'চাণক্য'-র ভূমিকায় অভিনয়ের পর শিশিরকুমার ম্যাডান থিয়েটার ছেড়ে দেন। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে মনোমোহন মঞ্চে স্থাপিত হয় তাঁর 'নাট্যমন্দির', সে-কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের ২৩ জুন থেকে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ২৫ মার্চ পর্যন্ত 'নাট্যমন্দিরে'র ঠিকানা ছিল কর্নওয়ালিস থিয়েটার।

এদিকে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে ভবানীপুরের পূর্ণ থিয়েটারে স্বল্পকালের জন্য একটি সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

নাট্যনিকেতন—শ্রীরঙ্গম—বিশ্বরূপা

২/এ, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটে 'নাট্যনিকেতন'-এর উদ্বোধন হয় ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ মার্চ। এই নাট্যশালাটি নির্মাণ করান প্রবোধচন্দ্র গুহ। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে ক্যালকাটা থিয়েটার্স লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী যশোদানন্দন ঘোষ থিয়েটারটি ইজারা নেন। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের জুনে নাট্যশালাটির দায়দায়িত্ব আবার নিজের হাতে তুলে নেন প্রবোধচন্দ্র।

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি এই মঞ্চেই আত্মপ্রকাশ করে শিশিরকুমার ভাদুড়ির 'শ্রীরঙ্গম'। চোদ্দ বছর চলার পর বাড়িভাড়া বাকি পড়ার দায়ে শ্রীরঙ্গম শিশিরকুমারের হাতছাড়া হয়ে যায় (২৪ জানুয়ারি ১৯৫৬)। ছ'মাসের মধ্যেই আবির্ভূত হয় 'সরকার ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড'-এর 'বিশ্বরূপা' (৮ জুন ১৯৫৬)। বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে কিছুদিন মঞ্চটিতে রবিবারে প্রভাতী নাট্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। সে অভিনয়গুলি হয়েছিল 'গিরিশ থিয়েটার'-এর পতাকাতলে।

রঙমহল

'রঙমহল' প্রতিষ্ঠিত হয় অভিনেতা রবি রায় ও 'অন্ধ গায়ক' কৃষ্ণচন্দ্র দে-র উদ্যোগে। এই নাট্যশালার উদ্বোধন করেন নট-নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ৮ অগাস্ট যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' নাটক দিয়ে রঙমহলের যাত্রা শুরু। নাটকটির নির্দেশনা ও আলোকনিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিলেন যথাক্রমে শিশিরকুমার ও সতু সেন। নিমাই, বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতার চরিত্রে রূপদান করেছিলেন যথাক্রমে শিশিরকুমার, প্রভা এবং কঙ্কাবতী। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে শিশির মল্লিক রঙমহলের পরিচালনভার গ্রহণ করেন। সহযোগীরূপে থাকেন যামিনী মিত্র ও সতু সেন। সতু সেনের উদ্যোগে কলকাতায় সর্বপ্রথম রঙমহলেই ঘূর্ণায়মান মঞ্চ সংস্থাপিত হয়। এই ঘূর্ণায়মান মঞ্চে অভিনীত প্রথম নাটক অনুরূপা দেবীর 'মহানিশা' (১৭ এপ্রিল ১৯৩৩)। বইটির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে রঙমহলের কর্তৃত্বের ভার নেন অমর ঘোষ। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে সে ভার যায়

যামিনী মিত্র, রঘুনাথ মল্লিক এবং কৃষ্ণচন্দ্র দে-র উপর। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে তিনজনের যৌথ কর্তৃত্বের বদলে একক দায়িত্ব পান যামিনী মিত্র। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে লেসী হন অভিনেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু বেহিসেবিপনার জন্য তিনি বিপুল ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েন। দেউলিয়া হয়ে শরৎচন্দ্রকে রঙমহলের লীজ ছেড়ে দিতে হয়। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে সীতানাথ মুখোপাধ্যায় ও অমিয় বসু পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে লেসী হন বিঠলভাই মানসাটা ও জিতেন বসু। ষাটের দশকে রঙমহলের শিল্পীগোষ্ঠী লেসীদের কাছ থেকে মঞ্চটি ভাড়া নিয়ে নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। এখন বিভিন্ন পেশাদার গোষ্ঠী এখানে নিয়মিত অভিনয়ের আসর বসান।

চিপ থিয়েটার ও রঙ্গমহল

১৫৭/এ, ধর্মতলা স্ট্রিটে 'চিপ্ থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয় অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, ভূপেন চক্রবর্তী প্রভৃতির উদ্যোগে। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের ৭ জানুয়ারি বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'ক্রীতদাসী' নাটক দিয়ে এই মঞ্চটি উদ্বোধিত হয়েছিল।

নতুন বাজারের কাছে 'রঙ্গমহল' মঞ্চটির দ্বারোদ্ঘাটন হয় ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর, 'চিত্রাঙ্গদা' নাটক দিয়ে। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে চিপ্ থিয়েটারের শিল্পীগোষ্ঠী এখানে যোগদান করলে থিয়েটারটির নতুন নামকরণ হয় 'রূপমহল'। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'আবুল হাসান' ও মহেন্দ্র গুপ্তের 'উত্তরা' অভিনীত হওয়ার পর এই নাট্যশালাটির অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয়।

অন্যান্য কয়েকটি নাট্যশালা

চল্লিশের দশকে কালীঘাট অঞ্চলে স্থাপিত হয় রামচন্দ্র চৌধুরীর 'কালিকা থিয়েটার' (৫, সদানন্দ রোড)। নাট্যশালাটির যাত্রা শুরু হয় ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর, শরৎচন্দ্রের 'বৈকুণ্ঠের উইল' দিয়ে। বইটির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে নাট্যশালাটি চিত্রগৃহে রূপান্তরিত হয়।

পঞ্চাশের দশকে কোরিন্থিয়ান রঙ্গমঞ্চে (৫, ধর্মতলা স্ট্রিটে) 'সুন্দরম' নামে একটি সাধারণ নাট্যশালার আবির্ভাব হয়েছিল। অনতিকালের মধ্যেই অবশ্য নাট্যশালাটির তিরোভাবও ঘটে।

মানিকতলা খালপুলের কাছে (২০/২ সি, ক্যানাল ওয়েস্ট রোড) শ্যামমোহিনী দেবীর 'কাশী বিশ্বনাথ ইনস্টিটিউট'-এর উদ্বোধন হয় ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি। ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে মহেন্দ্র গুপ্ত এবং তাঁর সম্প্রদায় এখানে অভিনয় শুরু করেন। সেই সময় থেকেই নাট্যশালাটি 'কাশী বিশ্বনাথ ইনস্টিটিউট'-এর পরিবর্তে 'কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ' নামে সাধারণ্যে পরিচিতি লাভ করে। তারপর থেকে বিভিন্ন পেশাদার নাট্যসম্প্রদায় মঞ্চটি ভাড়া নিয়ে নিয়মিত অভিনয় করে আসছেন।

সত্তরের দশকে আবির্ভূত হয় 'রঙ্গনা' ও 'প্রতাপ মঞ্চ'। 'রঙ্গনা'র (১৫৩/২এ,

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) জন্ম ১৯৭০-এ, আর 'প্রতাপ মঞ্চে'র (৮৪, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) আবির্ভাব ১৯৭২-এ।

শেষের কথা

১৮৭২ থেকে ১৯৭২—এই সুদীর্ঘ একশো বছরের মধ্যে কলকাতায় যেসব সাধারণ নাট্যশালা স্থাপিত হয়েছিল, সেগুলির জন্ম, বিবর্তন, রূপান্তর ও কর্তাবদলের রূপরেখা এখানে সংক্ষেপে সংকলিত হল। নাটক, নাট্যপ্রয়োগ, অভিনয়ধারা বা অভিনেতৃদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আলোকপাতের সুযোগ এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে নেই। এখানে শুধুই আলোচিত হল নাট্যগৃহগুলির প্রসঙ্গ।

আলোচিত নাট্যশালাগুলি ছাড়াও কলকাতায় রয়েছে মহাজাতি সদন মঞ্চ, রবীন্দ্র সদন, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের মঞ্চ, কলামন্দির ও শিশির মঞ্চ। উত্তর কলকাতার বাসুদেব মঞ্চ, বিজন থিয়েটার, সারকারিনা, গিরিশ মঞ্চ এবং দক্ষিণ কলকাতার থিয়েটার সেন্টার, মুক্ত অঙ্গন, যোগেশ থিয়েটার, অবন মহল, অহীন্দ্র মঞ্চ ও তপন থিয়েটার বয়সে নবীন হলেও কলকাতার নাট্যরসিকমহলে সুপরিচিতি পেয়েছে। এই মঞ্চগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটির জন্ম ১৯৭২-এর পরে। নিউ আলিপুর অঞ্চলের পিয়ালী মঞ্চে কিছুদিন অভিনয় হয়েছিল, কিন্তু নাট্যশালাটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটির নিজস্ব মঞ্চের নাম যথাক্রমে রথীন্দ্র মঞ্চ ও অবনীন্দ্র মঞ্চ।

বিগত ১১৮ বছরে কলকাতার সাধারণ নাট্যশালাকে নানা বিপর্যয় অতিক্রম করতে হয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আগেই দেখেছি, আর্থিক বিপত্তি কিভাবে নাট্যরসিক পৃষ্ঠপোষকদের সর্বস্বান্ত করেছে, ঘটিয়েছে অজস্র নাট্যশালার রূপান্তর তথা অবলুপ্তি। তবুও যে কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা সাধারণ নাট্যশালা বিলুপ্ত বা গৌরবচ্যুত হয়নি, তার পিছনের কারণ অর্ধেন্দুশেখর-গিরিশচন্দ্র-শিশিরকুমারের অনন্য অবদান এবং সর্বস্তরের নাট্যকর্মীদের আন্তরিক কুশলতা। সেই উত্তরাধিকারের গুণেই কলকাতার নাট্যচর্চা আজও সগৌরবে বহমান।

হরিপদ ভৌমিক

কলকাতার পুকুর

সংবাদে—সাহিত্যে—লিপিফলকে

'বাপীকূপতড়াগানি দেবতায়তনানিচ।
পতিতান্যুদ্ধরেদ যস্ত স পূর্ত্তফলমশ্নুতে ॥'
—লিখিত সংহিতা, ৪ শ্লোক

'কূপারামতড়াগেষু দেবতায়তনেষু চ।
পুনঃসংস্কার কর্ত্তা চ লভতে মৌলিকং ফলম্ ॥'
—বিষ্ণুস্মৃতি, ৯১ অধ্যায়

জলের অন্য নাম জীবন। তাই শাস্ত্রের বিধান, জলাশয় সংস্কার করলে দেবমন্দির সংস্কারের সমতুল পুণ্যলাভ হয়, আর জলাশয়-দেবমন্দিরের সংস্কার-ফল নতুন প্রতিষ্ঠার সমান। শুধু সংস্কৃত শাস্ত্রের পুঁথির পাতাতেই নয়, বাঙালির লোকজীবনেও আছে জলাশয় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ। তাই লৌকিক প্রবাদ বলছে, 'ঘর করবে গুটি গুটি, পুকুর দেবে একটি।' বাস্তুভিটার সঙ্গে পুকুরঘাট না হলে বাঙালির যেন চলত না।

কলকাতা একদিনে শহর হয়ে ওঠেনি। জনবাহুল্যের দৌলতে তার যে নগরায়ণ ঘটেছিল, আদিপর্বে তাতেও ছিল গ্রাম্য গন্ধ। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'তখন জলের কল ছিল না, প্রত্যেক ভবনে এক-একটি কূপ ও প্রত্যেক পল্লীতে দুই চারিটি পুষ্করিণী ছিল। এই সকল পচা দুর্গন্ধময় জলপূর্ণ পুষ্করিণীতে কলিকাতা পরিপূর্ণ ছিল। অনুমান করি, যখন কলিকাতার পত্তন হয় তখন বর্তমান রাজধানীর আদিম স্থানে দুই একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ভিন্ন সমগ্র স্থান ধানের ক্ষেত ছিল। শহর যেমন বাড়িয়াছে লোকে ধানের ক্ষেতে পুষ্করিণী খনন করিয়া করিয়া বাস্তুভিটা প্রস্তুত করিয়াছে। এইরূপে প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহের সঙ্গে সঙ্গে এক-একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী হইয়াছে। এই অনুমানের আর একটি প্রমাণ এই যে, পুষ্করিণী সকল শহরের পূর্বাংশেই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইত; কারণ সুতানুটী, গোবিন্দপুর প্রভৃতি আদিম গ্রামসকল নদীর পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল; সেখানে অধিক পুষ্করিণীর প্রয়োজন ছিল না।

'এই পুষ্করিণীগুলি জ্বরের উৎসস্বরূপ ছিল। এতদ্ভিন্ন গবর্নমেণ্ট স্থানে স্থানে কয়েকটি দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন, তাহাতে কাহাকেও স্নান করিতে দিতেন না; সেইগুলি

লোকের পানার্থ ছিল। তন্মধ্যে লালদিঘী সর্বপ্রধান ছিল। উড়িয়া ভারীগণ ঐ জল বহন করিয়া গৃহে গৃহে যোগাইত।'[১]

কলকাতায় কলের জলের প্রচলন হওয়ার পর পুকুরগুলি তাদের প্রয়োজনীয়তা হারায়। 'ভারত সংস্কারক' পত্রিকায় তখন লেখা হয়, 'কলিকাতায় জলের কল হইয়া কূপ ও পুষ্করিণী সকল অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছে।'[২] একদিকে ফুরোচ্ছিল প্রয়োজন, অন্যদিকে বাড়ছিল জমির চাহিদা। আবার রোগের 'উৎসস্বরূপ' পুকুরগুলিকে বোজাতে তৎপর ছিল পুরসভা।[৩] এই ত্রিমুখী চাপের প্রকোপে কলকাতার অধিকাংশ পুকুরই ভরাট হয়ে গেল, জলাশয়বহুল অঞ্চল ক্রমে পরিণত হল পুষ্করিণী-বিরল শহরে।

কলকাতার পুকুরের বিষয়ে নানা বিবরণ ছড়িয়ে আছে পুরনো সংবাদপত্র আর গ্রন্থাদির পাতায়। তারই কিছু উপাদান এই নিবন্ধে উদ্ধৃত হল।

কালীঘাটের কালীকুণ্ড

কালীঘাটের কালীকুণ্ডই বোধহয় কলকাতার টিকে থাকা পুকুরগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। এই পুকুরটির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখায়, 'ইহা এখন সামান্য পুষ্করিণীর মত দেখা যায়। ইহার বর্ত্তমান আয়তন অন্যূন ১০ কাঠা হইবে। পূর্ব্বে ইহার আয়তন সমধিক বিস্তৃত ছিল।...এখন পর্য্যন্ত অনেকে কালীঘাটে আসিয়া গঙ্গাস্নান না করিয়া এই হ্রদে অবগাহন করিয়া থাকেন।

'অতি পূর্ব্বে ইহা গঙ্গার অতলস্পর্শ দহ ছিল, ক্রমে চর পড়িয়া গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ তল উন্নত হওয়াতে উহা হ্রদরূপে (Lagoon) পরিণত হইয়াছে।...এইরূপে উৎপন্ন হ্রদের জল স্বভাবতই বিস্বাদ হইয়া থাকে। কালীকুণ্ড হ্রদও সে নিয়মের বহির্ভূত নহে! এখন ইহার জল...অপরিষ্কার ও বিস্বাদ। ইহার জলের এইরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য দুইবার ইহার পঙ্কোদ্ধার করিবার চেষ্টা করা হয়। ১৮৭১ অব্দে কালীর সেবাইত অধিকারিগণ আপনাদের মধ্যে চাঁদা করিয়া ইহার সামান্য সংস্কার করেন। পরে ১৮৮৭ অব্দে আলিপুরের মিউনিসিপালিটী হইতে ইহার পঙ্কোদ্ধার করা হয়। কিন্তু ইহার সমুদয় জল অনেক চেষ্টা করিয়াও একেবারে সেচনা করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহা সুগভীর ও গঙ্গার নিকটবর্ত্তী হওয়ায় জল সেচন করিলেও ক্ষণমধ্যে আবার জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।'[৪]

কলকাতার প্রবাদপুরুষ বৈষ্ণবদাস (বৈষ্ণবচরণ) শেঠ নাকি কালীঘাটে একটি দিঘি খনন করিয়ে দিয়েছিলেন। কথিত আছে, জনৈক রাজমাতাকে জলসংক্রান্তি ব্রত উপলক্ষে একশো আটটি গঙ্গাজল ভরা রুপোর কলসী দান করতে দেখে বৈষ্ণবদাসের মায়ের অনুরূপ বাসনা জাগে। পরের বছর জলসংক্রান্তি উপলক্ষে বৈষ্ণব শেঠ মা-কে দিয়ে একশো আটটি দিঘি স্থাপন করিয়েছিলেন। দিঘিগুলির কোনোটি ছিল পুরীতে কোনোটি কাশীতে; একটি ছিল কালীঘাটে।[৫]

লালদিঘি

'ভাল-জল লালদীঘি হিম সরোবর,
চারি ধারে ফুলবন শোভা মনোহর,
দুই ধারে দুই ঘাট সুন্দর সোপান,
চৌদিকে লোহার রেল শূলের সমান;
* * * *
চারিদিকে অট্টালিকা মধ্যে সরোবর,
অপরূপ-দরশন অতীব সুন্দর।'

লালদিঘির এই বর্ণনা দীনবন্ধু মিত্রের।[৬] এই জলাশয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কলকাতার প্রাচীন তন্তুবায় শেঠবংশের স্মৃতি। নগেন্দ্রনাথ শেঠের দাবি, লালদিঘি খনন করিয়েছিলেন লালমোহন শেঠ, তাঁর নামেই জলাশয়টির নামকরণ হয়েছিল।[৭] কিন্তু ওলন্দাজ সেনানায়ক স্ট্যাভোরিনাস লিখে গেছেন ভিন্ন কথা। তাঁর মতে, ইংরেজ কোম্পানিই পানীয় জলের প্রয়োজন মেটাতে এই দিঘি খনন করিয়েছিল।[৮]

লালদিঘি খননের কৃতিত্ব ইংরেজ কোম্পানির কিনা, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও লালদিঘিকে যে ইংরেজরাই সুদৃশ্য করে তুলেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁরা শুধু জলাশয়টির পঙ্কোদ্ধার বা আয়তনবৃদ্ধিই করেননি, তার সঙ্গে পাহারাদারির ব্যবস্থা, চারপাশের রাস্তা মেরামত ও সংলগ্ন বাগানে কমলালেবু গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করেছিলেন ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে।[৯]

লালদিঘির এই যত্নপ্রসূত সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্য কোম্পানির আইনকানুন ছিল কঠোর। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে লালদিঘির বাগান থেকে ফুল ছিঁড়ে জনৈক মহিলা বিপাকে পড়েছিলেন, 'একজন বিবী লালদীঘি ভ্রমণকালীন বৃক্ষ হইতে একটা ফুল তুলিয়াছিলেন, এই অপরাধে পুলিসের বিচারে তাঁহাকে ১ টাকা দণ্ড দিতে হইয়াছে।'[১০]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে একবার প্রস্তাব করা হয়েছিল লালদিঘিকে ভরাট করার। 'লালদীঘি ভরাটের প্রস্তাব' প্রসঙ্গে তখন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় লেখা হয়, 'কলিকাতা ডালহৌসী স্কোয়ার বা লালদিঘী যে স্থানে অবস্থিত সে স্থানটিতে মোটর দাঁড়াইবার বা বিমান আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একটি সুপ্রশস্ত ঘাঁটি তৈরী করিবার উদ্দেশে পুকুরটি ভরাট করার প্রস্তাব চলিতেছে। লালদিঘীর চারি পাড়ে বহু সরকারী ও বেসরকারী আপিস আছে, সুতরাং সে অঞ্চলে মোটর গাড়ীর ভিড় হওয়াটা অসঙ্গত নয় এবং এককালে বহু মোটর গাড়ী দাঁড় করাইয়া রাখাও অপরিহার্য্য। তাছাড়া আপিস আদালত বহু লোক অধ্যুসিত হওয়ায় এ অঞ্চলে বিমান আক্রমণ হওয়াটাও অসম্ভব নয়। কাজেই এ স্থানে প্রস্তাবিত ঘাঁটি হওয়া দরকার, সুতরাং হইবেও, কিন্তু লালদিঘীর সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের ফোর্ট উইলিয়মের স্মৃতি জড়িত, কাজেই অনেকে এই প্রস্তাবে দুঃখিত হইবেন।'[১১]

বলা বাহুল্য, লালদিঘি ভরাটের প্রস্তাব কার্যকর হয়নি।

গোলদিঘি

দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধুনী কাব্যে' লালদিঘির মতো গোলদিঘিও স্থান পেয়েছে,

'দেখ মাতা, গোলদীঘি, বড় রক্ত জোর,
বিরাজে দক্ষিণ দিকে হেয়ারের গোর,
* * * *
উত্তরে বিরাজে হিন্দু কালেজ গম্ভীর,
গৌরবে উজ্জ্বল মুখ, উন্নত শরীর।'[১২]

'গোলদীঘি' শীর্ষক নিবন্ধে এই জলাশয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছিলেন, 'শুনা যায়, সংস্কৃত কলেজের ইষ্টকালয় অধ্যাপকগণের বাসের জন্য ও তৎসংলগ্ন এই জলাশয় তাঁহাদের স্নানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা ম্লেচ্ছের প্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিকায় স্নান করিতে সম্মত হন নাই। যাক্, সে প্রত্নতত্ত্ব বা ঐতিহাসিক কাহিনী। ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে দেখিলে এই নামটা কতকটা সোনার পাথরবাটীর মত ; কেননা দীঘি বলিতে আমরা খুব লম্বা (দীর্ঘ) চারিকোণা জলাশয়ই বুঝি ; তাহা আবার গোলাকৃতি হয় কিরূপে ? যাহা হউক, নামে মালুম হয় (এবং আমাদেরও যেন স্মরণ হয়) ইহা এককালে গোলাকার ছিল, ক্রমে চতুষ্কোণ হইয়া পড়িয়াছে। তবে তাহা প্রাকৃতিক বিবর্ত্তনে নহে, কৃত্রিম উপায়ে। জ্যামিতির Quadrature of curvilinear area অর্থাৎ Squaring a circle-এর সুন্দর দৃষ্টান্ত ! ...যাক্, সময় ও সামর্থ্যের অভাবে এই সকল গবেষণা শেষ পর্য্যন্ত চালাইতে পারিলাম না। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন মৌলিক গবেষকদিগের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইবে। এই সেকেলে অক্ষম লেখক শুধু দিঙ্মাত্র প্রদর্শন করিলেন।'[১৩]

গোলদিঘি নিয়ে গণ্ডগোল

পুরনো কলকাতায় গোলদিঘি একটি ছিল না, তিনটি ছিল। সে প্রসঙ্গে ললিতকুমার লিখেছেন, 'গোলদীঘির প্রসঙ্গে একটু গোলমালের কথা আছে।... মির্জ্জাপুর পার্ক, কলেজ্ স্কোয়ার, এমনকি ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারকেও গোলদীঘি বলিতে শুনিয়াছি। (শেষেরটিকে গোলপুকুর বলিতেও শুনিয়াছি ;) ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারের দীঘি বা পুকুর (অর্থাৎ জলাধার) ফল্গুর ন্যায় 'অন্তঃশিলা' ছিল ; এক্ষণে উহা শূন্যগর্ভ ; মির্জ্জাপুর পার্কে এক সময় একটা দীঘি ছিল বটে (আমরা দেখিয়াছি), কিন্তু তাহা পল্লীগ্রামের 'ডোবা'রও অধম হইয়া পড়িয়াছিল ; বহুদিন যাবৎ তাহা ভরাট হইয়াছে ; তথাপি তালগাছ-শূন্য তালপুকুরের মত ইহা আজও গোলদীঘি নামে বিড়ম্বিত এবং ইহার দক্ষিণ দিকের গলি মির্জ্জাপুর ট্যাঙ্ক্ লেন্ নামে অভিহিত। অনেকে প্রভেদের জন্য বড় গোলদীঘি ও ছোট গোলদীঘি, অথবা পটোলডাঙ্গার গোলদীঘি ও চাঁপাতলার গোলদীঘি বলে।'[১৪] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছোট গোলদিঘি বা মির্জাপুর ট্যাঙ্কের বর্তমান নাম 'শ্রদ্ধানন্দ পার্ক', মির্জাপুর ট্যাঙ্ক লেনের পরিবর্তিত নাম 'রজনী গুপ্ত রো'।

মনোহর দাস তড়াগ

চৌরঙ্গির মনোহর দাস তড়াগের বিস্তারিত ইতিহাস লেখা আছে তীরবর্তী মর্মরফলকে, 'কাশী নিবাসী ৺ গোপাল দাস সাহের সুপুত্র মনোহর দাস সাহা সংবৎ ১৮৫৭ (ইং ১৮০০) সালে গরুর জল পানার্থ এই বৃহৎ পুষ্করিণী নির্ম্মাণ করেন। এতদ্ব্যতীত পুষ্করিণীর চারি কোণে চারিটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শিব, বিষ্ণু, দুর্গা ও সূর্য্যদেব স্থাপনা করেন। এই স্থান তাঁহারই নামে সর্ব্বদা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। ভারতের সকল প্রদেশের ব্যবসায়ী সমাজে সুপরিচিত কলিকাতা মহানগরীর "মনোহর দাসের কাটরা" ইঁহারই দ্বারা নির্ম্মিত, এবং প্রথমে এই কাটরারই নাম ছিল 'বড়বাজার।' সেই সময় নগরাধিকারীগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিদর্শনের জন্য এই কাটরার পূর্ব্ব দিকের এক বড় রাস্তার নাম দিয়াছিলেন 'মনোহর দাস স্ট্রীট', এবং ঐ নাম অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

'এই উদার মহাপুরুষ ভারতের বহু তীর্থস্থানে মন্দির, ঘাট, কুণ্ড আদি নির্ম্মাণ করিয়া সেই সকল স্থানে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। কোন কোন স্থানে তাঁহার নামাঙ্কিত শিলাখণ্ডও বর্ত্তমান আছে।

'এই মহাপুরুষের কীর্ত্তি ও স্মৃতি রক্ষার্থ এবং তাঁহার বংশধরগণের প্রতি সর্ব্বসাধারণের আশীর্ব্বাদার্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমতিক্রমে সংবৎ ২০০৫ ইং ১৯৪৮ সনে তাঁহার নামাঙ্কিত এই স্ফটিক শিলা তাঁহার পৌত্র জানকী দাস, তস্য পৌত্র মাধবদাসের পুত্র পৌত্রগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইল।'

তড়াগের চার কোণের চারটি বিগ্রহশূন্য মন্দিরের মধ্যে পূর্বদিকের দুটি পাতাল রেলের কাজের জন্য ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি সে দুটি প্রায় হুবহু পুনর্নির্মিত হয়েছে।

শ্যামপুকুর

বর্তমান 'শ্যামপুকুর স্ট্রিট' ও 'শ্যামপুকুর লেন' কলকাতার বুকে বিদ্যমান থাকলেও শ্যামপুকুরের পুকুরটি গেছে হারিয়ে। এ-বিষয়ে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছিলেন, '১৭৪৯ খৃষ্টাব্দের গবর্নমেণ্টের কাগজপত্রে "শ্যামবাজার" নামক পল্লীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পল্লীতে অতি বৃহৎ একটী প্রাচীন দীঘিকা ছিল, ইহার নাম ছিল "শ্যামপুকুর", সম্প্রতি এই পুষ্করিণী দূষিত হইয়া যাওয়ায় গত বৎসরে বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছে।'[১৫]

বটতলার পুকুর

বটতলার সাহিত্যের কথা কারও অজানা নয়। একটি পুকুরের তীরবর্তী জোড়া বটগাছ থেকে অঞ্চলটির নামকরণ হয়েছিল "বাঁধা-বটতলা"। 'বাঁধা-বটতলা নামক স্থানে পূর্ব্বে একটী পুষ্করিণী ও একত্র যোড়া দুটি বটগাছ ছিল। এখানে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন গ্রন্থগুলি অতি দুর্দ্দশার সহিত মুদ্রিত ও বিক্রীত হইয়া থাকে।'[১৬]

সিংহীবাগানের পুকুর

সিংহীবাগান (সিংহবাগান) পল্লীর একটি পুকুরের কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন, 'দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকিতাম—চোখে পড়িত আমাদের বাড়ির ভিতরের বাগান-প্রান্তের নারিকেল শ্রেণী ; তাহারই ফাঁক দিয়া দেখা যাইত 'সিঙ্গির বাগান' পল্লীর একটা পুকুর, এবং সেই পুকুরের ধারে যে তারা গয়লানী আমাদের দুধ দিত তাহারই গোয়ালঘর।'[১৭] এই পুকুরটি সম্পর্কে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরও স্মৃতিচারণা করেছেন, 'আমাদের বাড়ীর গায়ের কাছেই "সিংহবাগানে" একটা প্রকাণ্ড পুকুর ছিল। এই সিংহবাগান স্বনামধন্য ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের পূর্ব্বপুরুষদিগের অধিকারভুক্ত ছিল এবং বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সুন্দরলাল মিশ্রের অধিকারভুক্ত। এখন বাগানের পরিবর্ত্তে সেখানে একটা প্রকাণ্ড বস্তি জমিয়া উঠিয়াছে। পুকুরটী বর্ত্তমান রাজেন্দ্র মল্লিক স্ট্রীটের ঠিক পূর্ব্ব পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। উহা আমাদের বাড়ীর পূর্ব্বদিকস্থ খিড়কী দরজা হইতে দুই পা দূরে ছিল বলিলেই চলে। আমার বয়স যখন আন্দাজ পাঁচ বৎসর, তখন মিউনিসিপালিটি এই পুকুরটী আবর্জ্জনা দ্বারা ভরাট করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।'[১৮]

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পুকুর

শৈশবস্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাড়ির পুকুরের অনবদ্য ছবি এঁকেছেন, 'জানালার নীচেই একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট—দক্ষিণধারে নারিকেলশ্রেণী। গণ্ডিবন্ধনের বন্দী আমি জানালার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্তদিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম, প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষত্বটুকুও আমার পরিচিত।...এমনি করিয়া দুপুর বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য, নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলা সারাবেলা ডুব দিয়া গুগলি তুলিয়া খায় এবং চঞ্চুচালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে।'[১৯]

রবীন্দ্রনাথের শৈশবেই পুকুরটির বিদায়-ঘণ্টা বেজেছিল। সে প্রসঙ্গে 'ছেলেবেলা'য় তিনি লিখেছেন, 'তখন রাস্তার ধারে বাঁধানো নালা দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গার জল আসত। ঠাকুরদার আমল থেকে সেই নালার জলের বরাদ্দ ছিল আমাদের পুকুরে। যখন কপাট টেনে দেওয়া হত ঝর্ ঝর্ কল্ কল্ করে ঝরণার মতো জল ফেনিয়ে পড়ত। মাছগুলো উল্টোদিকে সাঁতার কাটবার কসরত দেখাতে চাইত। দক্ষিণের বারান্দার রেলিঙ ধরে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতুম। শেষকালে এল সেই পুকুরের কাল ঘনিয়ে, পড়ল তার মধ্যে গাড়া-গাড়া রাবিশ। পুকুর বুঁজে যেতেই পাড়াগাঁয়ের সবুজ ছায়া-পড়া আয়নাটা যেন গেল সরে।'[২০]

রবীন্দ্রনাথ যদি এই পুকুরকে তাঁর লেখায় স্থান না দিতেন তবুও এই পুকুর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পেত। কারণ, এই পুকুরে স্নান করে, এরই পাড়ে বসে দেবেন্দ্রনাথ

ঠাকুর 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে সেই সভার নাম বদলে রাখা হয় 'তত্ত্ববোধিনী সভা'। দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'আমাদের বাড়ীর পুষ্করিণীর ধারে একটা ছোট কুঠরী চূনকাম করাইয়া পরিষ্কার করিয়া লইলাম। এদিকে দুর্গাপূজার কল্প আরম্ভ হইল। আমাদের বাটীর আর সকলে এই উৎসবে মাতিলেন। আমরা কি শূন্য-হৃদয় হইয়া থাকিব? আমরা সেই কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে আমাদের হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ করিয়া একটি সভা স্থাপন করিলাম। আমরা সকলে প্রাতঃস্নান করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া পুষ্করিণীর ধারে সেই পরিষ্কৃত কুঠরীতে আসিয়া বসিলাম।...আমি প্রস্তাব করিলাম যে, এই সভার নাম "তত্ত্বরঞ্জিনী" হউক... '[২১]

গুড়ের মা-র পুকুর

বর্তমান যদুনাথ দে রোড ও চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ের সংযোগস্থলের অনতিদূরে অবস্থিত 'গুড়ের মা-র পুকুর'। সেকালে যে এই পুকুরটিকে দিকচিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করা হতো, তা জানা যায় ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের একটি নীলাম নোটিস থেকে, 'সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার কলিকাতায় শরিফ [শেরিফ—হ. ভৌ.] সাহেব মদন দাসের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিএশ নামক পরবানার ক্ষমতাতে বিক্রয় করিবেন। বিশেষতঃ কলিকাতা নগরে গুড়িয়ার মার পুকুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ বসত বাটী এবং তাহার সঙ্গে...ভূমি...বিক্রীত হইবেক।'[২২] ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের আর একটি নীলাম নোটিস থেকে জানা যাচ্ছে, পুকুরটি ছিল 'শহর কলিকাতার চাঁদনীর ইমামবাগ নামক স্থানের' সন্নিকটে অবস্থিত।[২৩]

শর্ট বস্তির পুকুর

ক্যামাক স্ট্রিটের অদূরবর্তী শর্ট বস্তি অঞ্চলে উইলিয়াম ক্যামাকের বিস্তৃত নাবাল জমি ছিল। কোম্পানি সেই জমি কিনে যে একটি পুকুর খননের বন্দোবস্ত করেছিল, সে-কথা এই সংবাদটি থেকে জানা যায়, 'মোং কলিকাতার ষাটবস্তিতে শ্রীযুত কেমাক সাহেবের যে স্থান ছিল সে সকল শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর খরিদ করিয়াছেন যে হেতুক সে স্থান নীচ ভূমি বর্ষাকালে তাহাতে জল হইয়া অনেক লোকের ক্ষতি হয় এখন কোম্পানী বাহাদুর তাহাতে মৃত্তিকা উঠাইয়া মধ্যস্থানে চতুষ্কোণ ময়দান রাখিয়া এক পুষ্করিণী ও বাগান করিবেন এবং চতুর্দিগস্থ স্থান ক্ষুদ্র ২ ভাগ করিয়া বিক্রয় করিবেন। ইহাতে কোম্পানীর লাভ হইবেক এবং লোকেরদিগেরও উপকার হইবেক ও শহরের সৌষ্ঠব হইবেক।'[২৪]

বসাক দিঘি বা 'বসাকের পুষ্করিণী'

বর্তমান মার্কাস স্কোয়ারের সাবেক নাম ছিল 'বসাক দিঘি'। তাই পাশের একটি রাস্তার নামও ছিল 'বসাক দিঘি লেন'। কিন্তু ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের সংবাদপত্রে 'বসাক দিঘি' নামের পরিবর্তে পুকুরটি বর্ণিত হয়েছে 'বসাকের পুষ্করিণী' নামে, 'মহানগর কলিকাতার

অন্তঃপাতী মেছুয়াবাজার স্ট্রিট নামক স্থানের সামীল ও তন্মধ্যস্থিত ১২৫ নম্বর ভূক্ত ভাড়াটিয়া জমি, মায় পুষ্করিণী এবং জমির কিয়দংশ যাহাকে বসাকের পুষ্করিণী বলে। যাহার পরিমাণ অনুমান চারি বিঘা সাড়ে দশ কাঠা এবং সাড়ে পাঁচ ছটাক।' পুকুর সমেত ঐ জমির চতুঃসীমা ছিল, 'উত্তর সীমানায় হরসুন্দরী দাসী এবং অপরাপরের ভাড়াটিয়া জমি। দক্ষিণ সীমানায় মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, পূর্ব সীমানায় একটি পথ যাহা মিউনিসিপাল কর্তৃক একটি ড্রেন অর্থাৎ পয়ঃপ্রণালী ভরাট করা হইয়াছে এবং পশ্চিম সীমানায় প্রাগুক্ত বসাকের পুষ্করিণীর অপর অংশ।'[২৫]

হেদুয়া

বর্তমান আজাদ হিন্দ বাগের আদত নাম 'হেদুয়া'। নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, 'মালীর বাগান ছাড়াইয়া পূর্ব্বে "হেদো" বা "হেদুয়া" নামক স্থান। "হেদো" হ্রদ শব্দের অপভ্রংশ, ৭০/৮০ বর্ষ পূর্ব্বে, এখানে বনজঙ্গলে পরিবৃত জঘন্য জলা বা 'দহ' ছিল, তাহা হইতেই ইহার নাম "হেদো" হইয়াছে।…পূর্ব্বকার সেই বন কাটাইয়া এবং 'জলা' পরিষ্কার করিয়া বর্ত্তমান 'হেদুয়া পুকুর' হইয়াছে।'[২৬] হেদুয়া যে সেকালে সুপেয় জলের উৎস ছিল, সে কথা জানা যায় মহেন্দ্রনাথ দত্তের রচনা থেকে, '…খাইবার জন্য চাকরেরা হেদুয়া হইতে বাঁকে জল আনিত। তখনকার দিনে হেদুয়ার জল ছিল উৎকৃষ্ট।…গঙ্গাজলে পোকা হইত না। হেদুয়ার পুকুরের জল কিছুদিন রাখিলেই পোকা হইত, পরে কলের জলও জালায় রাখিলে সরু সরু পোকা হইত।'[২৭] মহেন্দ্রনাথ শিমলা অঞ্চলের অন্য দুটি পুকুরের কথাও উল্লেখ করেছেন, 'আমরা মাধব পালের পুকুরে স্নান করিতাম। হেয়ার স্কুলের হেডমাষ্টার ভোলানাথ পালের পুকুরে সকলে স্নান করিত। সকালে পুকুরে স্নান করা ও সাঁতার কাটা একটা প্রথা ছিল এবং সকলেই কিছু কিছু সাঁতার কাটিতে পারিত। পরে কলের জল হইলে সেটা কেবল খাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত, স্নান পাতকুয়া বা অন্য পুকুরে হইত।'[২৮]

'সংবাদ প্রভাকর' : হেদুয়া থেকে কোম্পানির পুকুরে

'সংবাদ প্রভাকর' ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হতো হেদুয়ার তীরবর্তী একটি বাড়ি থেকে। পত্রিকায় লেখা থাকত, 'এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়ার হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণদিগস্থ গলির ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।' কিন্তু ২৪ ডিসেম্বর ১৮৫৩ তারিখের 'প্রভাকর'-এ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে, হেদুয়ার ধার থেকে পত্রিকার কার্যালয় স্থানান্তরিত হচ্ছে 'কোম্পানির পুকুরের' পাড়ে, 'এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা দেশ-বিদেশীয় সমুদয় সাহায্যকারি হিতকারি বন্ধু ও সর্ব্বসাধারণ মহাশয় দিগ্যে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, প্রভাকর যন্ত্রালয় অদ্য দিবসে সিমুলিয়ার হেদুয়া পল্লীর (৪৪-৬ সংখ্যক) বাটী হইতে উঠিয়া সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের স্ট্রীটের

মধ্যস্থ (৪২ নম্বর) ভবনে স্থাপিত হইল। ঐ বাটী কোম্পানির পুকর নামে বিখ্যাত পুকুরের পূর্বদিগে, রাস্তার উত্তরভাগে।'

বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত 'কোম্পানির পুকুরের' পোশাকি নাম ছিল 'ব্ল্যাকোয়্যার স্কোয়ার'। বর্তমান নাম 'সাধক রামপ্রসাদ উদ্যান'। পুকুরটি অবশ্য বহুদিন আগেই অন্তর্হিত হয়েছে।

জোড়াপুকুর

বর্তমান গিরিশ পার্কের জায়গায় আগে দুটি পুকুর ছিল। তাই বিগত শতাব্দীতে স্থানটি পরিচিত ছিল 'জোড়াপুকুর স্কোয়ার' হিসাবে, লোকমুখের চলতি নাম ছিল 'খোঁড়ার মাঠ'। নিজের পিতামহের সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, '…তিনি বৈকালে আমাদের খিড়কির দিকে গলির মোড়ে… জোড়াপুকুর স্কোয়ারে বেড়াতে যেতেন আমায় সঙ্গে নিয়ে। খোঁড়ার মাঠ বলেই আমরা তখন জানতাম। এই খোঁড়ার মাঠ এখন গিরীশ পার্ক হয়েছে, তার যেখানে এখন নাট্যাচার্য গিরীশ ঘোষের মর্মরমূর্তি বসেছে, তখন ঠিক তার সামনে ছিল ডোমপাড়ার বস্তি আর চিত্তরঞ্জন এভিনিউ তখন ছিল জোড়াপুকুর স্কোয়ার লেন মাত্র।'[২৯]

জোড়াপুকুরের পুকুর দুটি অবলুপ্ত হয়ে গেলেও তার স্মৃতি জেগে রয়েছে 'জোড়াপুকুর লেন' ও 'জোড়াপুকুর স্কোয়ার লেন' নামক দুটি গলির মধ্যে।

কার্জন পার্কের পুকুর

বর্তমান ধর্মতলা ট্রাম ডিপোর জায়গায়, সুরেন্দ্রনাথ পার্কে (ভূতপূর্ব কার্জন পার্ক) একটি পুকুর ছিল। এই পুকুরটি সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয় গল্প পরিবেশন করেছেন নিধুলাল ভট্টাচার্য, 'এখন যেখানে কার্জ্জন পার্ক ঐ স্থানে একটি ভুজাওয়ালা অর্থাৎ ছাতুওয়ালা ঐ স্থানে বসিয়া বিক্রয় করিত। পদব্রজে যাহারা যাইত অধিকাংশ লোকেই উহার নিকট ছাতু পানীয় জল খাইত। ইহাতে তাহার বেশ লাভ হইত। হঠাৎ লর্ড ক্লাইভের ১,০০,০০০ লক্ষ টাকার বিশেষ প্রয়োজন হয়। তখন তাহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদের বলেন যে টাকার বন্দোবস্ত কর, তখন দালালরা ঐ ভুজাওয়ালাকে বলিল যে, ইংরাজ গবর্ন-মেণ্টের এক লক্ষ টাকার প্রয়োজন আছে, তুমি দিতে পার? সে হাসিয়া বলিল আমি দিব। তখন লর্ড ক্লাইভের নিকট তাহাকে লইয়া যাওয়া হইল এবং ভুজাওয়ালাকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। দালালদের বলিলেন, রাজা বা জমিদার নেই যে টাকা দেয়। তাহারা বলিল না ও দেবে।

'তাহার পরদিন স্থির হইল সেইদিন টাকা দিবার কথা ঠিক—সেই সময় গরুর গাড়ী যোগে কাঁচা টাকা (Coin) প্রেরণ করিল তখন নোট ছিল না। কারণ সে যাহা লাভ করিত মাটির ভিতর পুঁতিয়া রাখিত। সরকারী কর্ম্মচারী টাকা গুনিয়া লইল এবং তাহার পর লর্ড ক্লাইভ তিন বৎসরের জন্য এগ্রিমেণ্ট হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া টাকা গ্রহণ করিলেন। যখন তিন বৎসর অতিক্রম হইয়া গেল তখন ভুজাওয়ালাকে ডাকিয়া

পাঠাইলেন···। ···এখন সকল লোক জানিতে পারিয়াছে যে তাহার প্রচুর টাকা আছে। তখন তাহার প্রাণনাশ হইতে পারে, সেই জন্য ভূজাওয়ালা লর্ড ক্লাইভকে বলিল আমি টাকা লইব না। তাহার পরদিন আসিয়া বলিল সাহেব আমার টাকার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিন। "কি ব্যবস্থা হইবে?" আমার যে টাকা ঐ টাকা আপনার নিকট থাকুক, ঐ টাকা দিয়া আমি যে স্থানে ভূজা বিক্রয় করি ঐ স্থানে একটি তালাও খনন করিয়া দিন। সেই তালাওটির নামে ধর্ম্মতালাও অর্থাৎ ধর্ম্মতলা নাম হইয়াছে।'[৩০]

এ গল্পটি চিত্তাকর্ষক হলেও আসলে নিছক 'গল্প'ই। পুকুরটি খনিত হয়েছিল কোম্পানির উদ্যমে, ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের ৭ জানুয়ারি তার ঠিকা দেওয়া হয়েছিল। একই সঙ্গে আরও দুটি পুকুর খনিত হয়েছিল হরিণবাড়ির কাছে। এই তিনটি পুকুরের মধ্যে দুটি ছিল সাহেবদের পানীয় জলের জন্য নির্দিষ্ট। অন্য পুকুরটি ছিল সাধারণের পানীয় জল ও ঘোড়াদের স্নান করানোর জন্য।

পচা পুকুরে মা গঙ্গার আবির্ভাব

'কলিকাতার উত্তর অংশে বাঙ্গালীদিগের পল্লীতে মুরলীবাগান নামে একটি পল্লী আছে। তথায় মান্ধাতার আমলের একটি ক্ষুদ্র রকমের মহাসাগর অবস্থিতি করিতেছে। আহা তড়াগবরের কি চমৎকার শোভা! এ শোভায় কুমুদ-কহ্লার কোকনদ নাই—হংস-কারণ্ডব চক্রবাক নাই—আছে কেবল মহাপচা পাঁক, কীট-কিলবিলায়িত দুর্গন্ধের মাতৃ-ভূমি পচা জল, আর ম্যালেরিয়ারূপী কশ্যপমুনির অদিতি স্বরূপ বহুকাল-সঞ্চিত সু-উত্তম পচা আবর্জ্জনা।

'গত শনিবার প্রাতঃকালে উক্ত অঞ্চলে হঠাৎ মহা হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার উপস্থিত হইল; দলে দলে লোকগণ "মা গঙ্গার জয়" রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে তদভিমুখে ধাবিত হইতেছে; ···ব্যাপার কি জানিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইলাম।

'···শুনিলাম যে মুরলীবাগানের অন্তর্গত একটি উত্তম পচা পুকুরে মায়ের আবির্ভাব হইয়াছে, কারণ সেই পুষ্করিণীর পচা পাঁক ও পচা জল হইতে আতর গোলাপের ন্যায় উৎকৃষ্ট সদ্গন্ধ বাহির হইয়া সেই পাড়া আমোদিত করিতেছে, দেখি বাস্তবিকই তাই! ···ভক্তিমান হিন্দু নরনারীগণ···সৌগন্ধবান পচা পুকুরের···জলে স্নান করিতেছে···। কেহ কেহ সেই পুকুররূপী গোমুখী সম্ভূত গঙ্গাবারি বোতলে পুরিয়া ৪/৫ টাকা মূল্যেও বিক্রি করিয়াছে।···এদিকে সিমলা অঞ্চলে প্রসিদ্ধ গন্ধদ্রব্য ব্যবসায়ী এইচ বসু বাস করেন। তিনি বিলাত হইতে নানা প্রকার এসেন্স আমদানি করিয়া থাকেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি জাহাজ হইতে এসেন্সের বোতল ভরা কতকগুলি বাক্স গাড়ী বোঝাই করিয়া নিজের গুদামে চালান দেন। জোটিতে মাল লইয়া গো-গাড়ী গা-ঢাকা দেয়। তিনি পুলিসে সংবাদ দেন, কিন্তু পুলিস গাড়ী বা ঐ বাক্সগুলির কোন কূল কিনারা করিতে পারেন নাই।

'বসুজ মহাশয় ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী।·· তাঁহার মনে কেমন সন্দেহ হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় যাইয়া দেখিলেন বহু লোক সমাগম এবং সদ্গন্ধে পাড়াটী ভুরভুর করিতেছে।

গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াই তিনি বুঝিলেন যে, ইহা এসেন্সের গন্ধ। পুলিসে যাইয়া তিনি সংবাদ দিলে পুলিস আসিয়া পুকুরে জাল ফেলাইয়াও যখন কিছুই পাইলেন না, তখন সকলেরই প্রবল বিশ্বাস হইল যে, একে কলিকাল, মা গঙ্গা ত পৃথিবীতে থাকিবেনই না, তার উপর আবার ইংরাজের রাজ্য, তাই মা ভাগীরথী খাত ছাড়িয়া আজ এইখানে আবির্ভূত হইয়াছেন। মা গঙ্গার জয়।

'উক্ত পুষ্করিণীতে কিছুই না পাওয়ায় তন্নিকটস্থ আর একটি পুকুরেও জাল ফেলা হয়, তথা হইতে গোটা কত ভাঙ্গা শিশি বোতল পাওয়া যায়। তাহা দেখিয়া বসুজ মহাশয় বলিলেন "এই বোতলেই আমার এসেন্স ছিল। অতএব পূর্ব্বোক্ত পুকুরটি [ভাল] করিয়া খোঁজা হউক।" তাহাই হইল। এবারে সেই পুকুর হইতে [কয়েকটি] বোতল প্রভৃতি বাহির হইল।

'ঐ পুকুরের নিকট একখানি গো-গাড়ির আড্ডা আছে। তাহার সর্দ্দারকে ধরিয়া ঐ আড্ডা অনুসন্ধান করায় কয়েকটা বাক্স বাহির হইয়াছে। এখন ঐ সর্দ্দার হাজতে আছে। গাড়োয়ান পলাতক।

'ইতি মা গঙ্গার আবির্ভাব কথা।'[৩১]

১৯১১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এই সংবাদটি সম্পর্কে বেশি বলার প্রয়োজন নেই। এমন আকস্মিক দেবমাহাত্ম্যলাভ বোধহয় কলকাতার আর কোনো পুকুরের ক্ষেত্রে ঘটেনি।

পুকুরে প্রাণহানি

পুকুরকে কেন্দ্র করে প্রাণহানির ঘটনা সেকেলে কলকাতায় আকছার ঘটত। জলমগ্ন হয়ে মৃত্যুর পাঁচটি ঘটনার বিবরণ আমরা উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করলাম সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠা থেকে।

১. গোয়াবাগান : ১৮৩১—'গত ৫ শ্রাবণ বুধবার দিবসে প্রায় বেলা ৯ ঘণ্টার সময় বাহির শিমুলার শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্ত্তির পত্নী অত্যল্প বয়স্কা কি অক্ষণে উক্ত দিনে গুয়াবাগানের সরোবরে স্নান করণার্থে গমন করিয়া ঐ অবলা বালা জলে খেলা করিতে২ একেবারে শেষ খেলা খেলিয়াছেন অর্থাৎ শমন ভবন গমন করিয়াছেন, এ অতি দুঃখের বিষয় যেহেতু বংশজ ব্রাহ্মণের অতি কষ্ট সৃষ্ট্যা বিবাহ নির্বাহ হয় সুতরাং তাহাতে শ্রীহীন হইলে ইহার অধিক আর দুঃখ কি আছে।'[৩২]

২. জানবাজার : ১৮৫২—'...২৬ জ্যৈষ্ঠ বেলা দুই প্রহর দুই ঘটিকার সময়ে জানবাজার নিবাসি শ্রীযুত বাবু চণ্ডীচরণ দত্ত মহাশয়ের বাটীর অন্তঃপুরস্থ পুষ্করিণীতে উক্ত বাবুর পুত্রবধূ এবং তাহার দাসী এতদুভয়ে গাত্রমার্জ্জন করণার্থে অবরোহণ করিয়াছিলেন দৈব দুর্বিপাকে উক্ত রমণী জলমগ্ন হওয়াতে পরিচারিকা নিজ কর্ত্রীকে অকূল জীবনে পতিতা দর্শনে আকুল চিত্তে তাহাকে উত্তোলন করণার্থে জলে অবগাহন করাতে উভয়ে একত্রে জড়িত হইয়া জীবন সঞ্চারিণী জীবনে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন।'[৩৩]

৩. শ্যামবাজার : ১৮৫৪—'শ্যামবাজার নিবাসী রাজু নিয়োগির এক কন্যা মঙ্গলবার

সন্ধ্যাকালে ভোজন করিয়া খিড়কী পুষ্করিণীতে আচমন করিতে যাইয়া জলে ডুবিয়া যায় ঐ বাড়ীতে অনেকগুলিন কুমারী আছে এ জন্য রাত্রিতে ঐ কন্যার অনুসন্ধান হয় নাই, পর দিবস প্রাতঃকালে জলপান বিভাগকালীন তাহাকে না দেখিয়া পুষ্করিণীতে অনুসন্ধানে মৃতদেহ উদ্ধৃত হইয়াছে।'[৩৪]

৪. চাঁপাতলা : ১৮৬২– 'কল্য বেলা দুই প্রহরের সময়ে একটি বৃদ্ধ স্ত্রীলোক চাঁপাতলার দীঘিতে জল আনিতে গিয়া জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।'[৩৫]

৫. মানিকতলা : ১৮৭৯—'গত রবিবার তিন বৎসরের একটী ছেলে ও চার বৎসরের একটী মেয়ে দুই একসঙ্গে মানিকতলার একটী পুকুরে ডুবে মরিয়াছে। তাহাদের মা বাপ অনেকক্ষণ ধরিয়া খুঁজিয়া না পাওয়াতে যখন পুকুরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন ঐ ছেলেটীর শরীর ভাসিয়া উঠে দেখা যায়। পিতা মাতার অযত্নেই ছেলেদের এইরূপ অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।'[৩৬]

শেষ ঘটনাটি বাদ দিলে বাকি সব ক'টি ক্ষেত্রেই জলমগ্ন হয়েছেন মহিলারা। পর্দাপ্রথা কি তাঁদের সন্তরণশিক্ষার অন্তরায় ছিল ?

অন্য ধরনের একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল শিয়ালদায়, ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে, 'শিয়ালদহের স্টেসনের নিকটে যে বাজার ও পুষ্করিণী হইতেছে, সেই পুষ্করিণীর মৃত্তিকার বৃহৎ ঢিবি হইয়াছে। কয়েকজন মজুর সেই ঢিবির নীচ হইতে মৃত্তিকা খনন করিতেছিল, হঠাৎ ঢিবির মাথা ভাঙ্গিয়া পতিত হইয়া দুইজন মজুর হত হইয়াছে। মজুরেরা ত আহাম্মক, তত্ত্বাবধায়কেরাও কি অন্ধ ছিলেন ?'[৩৭]

স্নানার্থিনীর শ্লীলতাহানি

পুকুরকে কেন্দ্র করে যে নানা অসামাজিক কাণ্ডও ঘটত, তার সাক্ষ্য আছে সংবাদপত্রেরই পাতায়, 'শুনা গেল যে মোং মীরজাপুর নিবাসি কোন কায়স্থের পরম সুন্দরী যুবতী স্ত্রী সমীপবর্ত্তিনী পুষ্করিণী মধ্যে গাত্রধৌতার্থ গমন করিয়াছিল ইতিমধ্যে ঐ কামিনীকে একাকিনী পাইয়া তত্রস্থ বর্দ্ধিষ্ণু সীতারাম ঘোষের পুত্র বাবু পীতাম্বর ঘোষ কএক জন লোক সমভিব্যাহারে আসিয়া বলে অবলার অম্বর ধরিয়া অন্তঃপুরে লইয়া স্বাভিলাষ পূর্ণ করিয়া পরিত্যাগ করাতে কামিনী রাগিণী হইয়া অতি দ্রুত গমনে পটলডাঙ্গার থানায় গমন করিয়া সমুদায় বিবরণ নিবেদন করাতে পরদিবস প্রাতে জমদ্দার সকলের সবানবন্দি লিখিয়া এক্ষণে পুলিশে প্রেরণ করিয়াছে এতাবন্মাত্র শুনা গিয়াছে পরে বিচার হইলে এ বিষয়ের সত্য মিথ্যা যাহা হয় তাহা প্রকাশ করা যাইবেক।'[৩৮]

স্নানের ফতোয়া

কলকাতাবাসীরা কোন কোন পুকুরে স্নান করতে পারবেন, সে বিষয় নির্ধারণ করে একটি বিজ্ঞপ্তি ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'শহর কলিকাতা শোভা বৃদ্ধি করনের কমিস্যনরদের আজ্ঞাক্রমে' বিজ্ঞপ্তিটি স্বাক্ষর করেন কমিশনারদের সেক্রেটারি জে. ও. বেকেট। বিজ্ঞপ্তির বয়ান ছিল এইরকম, 'সন ১৮৫২ সালের ১২ আইনের ৪১ ধারার

১৩ প্রকরণের মর্ম্মানুসারে সকল লোককে অনুমতি প্রদান করা যাইতেছে যে…নীচের লিখিত পুষ্করিণীতে স্নান করিতে পারিবেক।

'৬। দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীটস্থিত ব্লাকোএর সাহেবের পুষ্করিণী।

'৭। জানবাজার ষ্ট্রীটস্থিত নিয়োগী পুষ্করিণী।

'৮। রাডন ষ্ট্রীট ও থিওটার ষ্ট্রীটস্থিত ** নং পুষ্করিণী।

ইহা ছাড়া অন্য কোন পুষ্করিণীতে স্নান করিতে পারিবেক না।'[৩৯]

বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যাচ্ছে, তখনও জানবাজার স্ট্রিটের ধারে, তালতলার নিয়োগী-পুকুরের অস্তিত্ব ছিল। এ পুকুরটির নামে আগে একাধিক রাস্তা ছিল। এখন শুধু নিয়োগীপুকুর বাই লেন সেই বিলুপ্ত জলাশয়টির নাম বহন করছে।

নিলাম নোটিসে ছোটখাটো পুকুর

দেউলিয়া ব্যক্তিদের সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করার জন্য সেকালের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতো জমিজমার বিস্তারিত বিবরণ ও চৌহদ্দি। সেইসব 'নিলাম নোটিস' থেকে বহু পুকুরের হদিস পাওয়া যায়, যেমন—দরজিপাড়ার প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের পুকুর,[৪০] শিয়ালদার বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীর[৪১] ও ওয়াকিয়া বানুর পুকুর,[৪২] কলুটোলার কৈলাসনাথ দে'র পুকুর,[৪৩] জানবাজারের গোল্‌বদি মিস্ত্রির পুকুর[৪৪] প্রভৃতি। মানচিত্র, পথপঞ্জী (almanac) ও অন্যান্য সহায়ক সূত্রের সাহায্যে এই তথ্যগুলিকে সম্পূর্ণ করে তুললে কলকাতার জলাশয়গুলির বিস্তারিত ইতিহাস রচিত হতে পারে।

উল্লেখপঞ্জী

১. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', 'শিবনাথ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ' (সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৯), পৃঃ ২৬৬।

২. 'ভারত সংস্কারক', ৩১ অক্টোবর ১৮৭৩, ১৬ কার্তিক ১২৮০।

৩. ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কলিকাতায় চলাফেরা : সেকালে আর একালে' (কল্লন, ১৯৮৮), পৃঃ ৭-৮ [পরবর্তী পাদটীকায় 'কলিকাতায় চলাফেরা' নামে উল্লিখিত]।

৪. সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'কালীক্ষেত্র দীপিকা' (হরিপদ ভৌমিক সম্পাদিত সং, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৬), পৃঃ ৭৪-৭৫।

৫. নগেন্দ্রনাথ শেঠ, 'কলিকাতাস্থ তন্তু-বণিক জাতির ইতিহাস' (কলকাতা, ১৯৫০), পৃঃ ৩৮ [পরবর্তী পাদটীকায় 'তন্তুবণিক' নামে উল্লিখিত]।

৬. দীনবন্ধু মিত্র, 'সুরধুনী কাব্য' (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত সং, সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৭০), পৃঃ ১২৯ [পরবর্তী পাদটীকায় 'সুরধুনী কাব্য' নামে উল্লিখিত]।

৭. তন্তুবণিক, পৃঃ ২২।

৮. As quoted in, H. E. A. Cotton, 'Calcutta Old and New' (General, 1980, Revised edition, ed. N. R. Roy), p. 268.
৯. হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'কলিকাতা সেকালের ও একালের' (পি. এম. বাক্‌চি, তৃতীয় সং, ১৯৮৫, নিশীথরঞ্জন রায় ও অরবিন্দ ভট্টাচার্য সম্পাদিত), পৃঃ ৩০৪, ৩৭৩।
১০. 'সংবাদ প্রভাকর', ৩ মে ১৮৪৯, ২২ বৈশাখ ১২৫৬।
১১. 'ভারতবর্ষ', আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ১৩৪-১৩৫।
১২. 'সুরধুনী কাব্য', পৃঃ ১২৯।
১৩. ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহারা' (ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌, ১৩৩৪), পৃঃ ১২৮-১২৯ (পাদটীকা)।
১৪. তদেব, পৃঃ ১৩০।
১৫. নগেন্দ্রনাথ বসু, 'বিশ্বকোষ', তৃতীয় ভাগ (কলকাতা, ১২৯৯), পৃঃ ২৮২।
১৬. তদেব, পৃঃ ২৮৩।
১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', নবম খণ্ড (বিশ্বভারতী, ১৩৯৬, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সং, পৃঃ ৪১৬ [পরবর্তী পাদটীকায় 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' নামে উল্লিখিত]।
১৮. 'কলিকাতায় চলাফেরা', পৃঃ ৮।
১৯. 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', পৃঃ ৪১৪-৪১৫।
২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেবেলা' (বিশ্বভারতী সং)।
২১. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্বরচিত জীবন-চরিত', সুকুমার সেন ও অন্যান্য (সম্পাঃ), 'আত্মকথা', প্রথম খণ্ড, (অনন্য প্রকাশন, ১৯৮১), পৃঃ ১৪।
২২. 'সমাচার চন্দ্রিকা', ১৬ এপ্রিল ১৮৩১।
২৩. 'সংবাদ প্রভাকর', ১১ অগাস্ট ১৮৫২।
২৪. 'সমাচার দর্পণ', ১১ নভেম্বর ১৮২০।
২৫. 'সংবাদ প্রভাকর', ৯ মাঘ ১২৯৮।
২৬. নগেন্দ্রনাথ বসু, 'বিশ্বকোষ', তৃতীয় ভাগ (কলকাতা, ১২৯৯), পৃঃ ২৮৫।
২৭. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, 'কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা' (মহেন্দ্র পাবলিশিং, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৭৮), পৃঃ ৪।
২৮. তদেব, পৃঃ ৫।
২৯. প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'প্রাণকুমারের স্মৃতিচারণ' (আনন্দধারা, ১৩৭৪), পৃঃ ১৫০।
৩০. নিধুলাল ভট্টাচার্য্য, 'কালীঘাটের ঐতিহাসিক কথা' (কলকাতা, ১৩৬৪)।
৩১. 'রিপোর্টারের পত্র', 'সুলভ সমাচার', ১ সেপ্টেম্বর ১৯১১।
৩২. 'সমাচার চন্দ্রিকা', ১৭ শ্রাবণ ১২৩৮।
৩৩. হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি, 'সংবাদ প্রভাকর', ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৯।

৩৪. 'সম্বাদ ভাস্কর', ২৮ মাঘ ১২৬০।
৩৫. 'সোমপ্রকাশ', ১ পৌষ ১২৬৯।
৩৬. 'সুলভ সমাচার', ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৬।
৩৭. 'সোমপ্রকাশ', ৭ মাঘ ১২৬৯।
৩৮. 'সমাচার দর্পণ', ২৭ আষাঢ় ১২৩২।
৩৯. 'সংবাদ প্রভাকর', ১১ বৈশাখ ১২৬৯।
৪০. 'সংবাদ প্রভাকর', ১০ এপ্রিল ১৮৪৯।
৪১. 'সংবাদ প্রভাকর', ১৪ মে ১৮৪৯।
৪২. 'সংবাদ প্রভাকর', ১৫ অগাস্ট ১৮৫৬।
৪৩. 'সংবাদ প্রভাকর', ২৯ মার্চ ১৮৫৩।
৪৪. 'সংবাদ প্রভাকর', ১৪ জুন ১৮৫২।

দেবাশিস বসু

কলকাতার পল্লীনাম

তালিকার সন্ধানে

একটি শহরের পল্লীবিন্যাসের মধ্যে নিহিত থাকে তার চরিত্রের নানা গুরুত্বপূর্ণ দিক। যেহেতু কলকাতা গড়ে উঠেছে কোনো পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা ছাড়াই, তাই তার পাড়াগুলিও জন্ম নিয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, তাদের ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে বাসিন্দাদের চাহিদাকে কেন্দ্র করে। পাড়াগুলির জন্ম, বিবর্তন বা নামকরণের বিবরণ বিশ্লেষিত হলে কলকাতার সামগ্রিক ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কারণ, একেকটি পল্লী তো আসলে এই বিরাট মহানগর-সৌধের একেকটি ইট।

কলকাতার পল্লীনাম নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক বা সমাজতাত্ত্বিক কোনো গবেষণা করতে গেল সর্বাগ্রে চাই একটি তালিকা। কলকাতার সমস্ত পল্লীনাম শনাক্ত করতে হলে তন্ন তন্ন করে সরেজমিন অনুসন্ধান চালাতে হবে সারা শহর জুড়ে। বলা বাহুল্য, কোনো ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সে কাজ সম্পাদন অসম্ভব, তার জন্য প্রয়োজন যূথবদ্ধ প্রয়াস। আমরা এখানে বই, মানচিত্র, পথপঞ্জী ও অন্যান্য সূত্রের সাহায্যে ৬০৯টি পল্লীনামের একটি প্রাথমিক তালিকা সংকলন করলাম। অদূর ভবিষ্যতে কোনো সুযোগ্য গবেষকদল কলকাতার পল্লীনামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করবেন, এই আশা নিয়েই আমাদের অসম্পূর্ণ উদ্যোগটুকু প্রকাশিত হল।

কলকাতার বিস্তার ও পঞ্চান্নগ্রাম

১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১০ নভেম্বর সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে তিনটি গ্রাম কিনে ইংরেজ কোম্পানি জমিদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।[১] সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা নামক সেই তিনটি গ্রাম ছিল বর্তমান মহানগরের বীজস্বরূপ। তারপর থেকে বাড়ন্ত শহরের বিরামহীন ক্ষুধা মেটাতে অজস্র গ্রাম আত্মবিসর্জন করেছে কলকাতার জঠরে। শহরের পাকযন্ত্রে পড়ে গ্রামগুলি রূপান্তরিত হয়েছে মহানগরের পল্লীতে, পল্লীনামে পরিণত হয়ে বেঁচে রয়েছে সেইসব গ্রামনামের অধিকাংশের স্মৃতি।

কলকাতার এই বুভুক্ষু আগ্রাসনের সূত্রপাত ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে। ঐ বছর মুঘল সম্রাটের অনুমতি নিয়ে কলকাতার আশেপাশে ছড়িয়ে থাকা আটত্রিশটি গ্রাম ইংরেজ কোম্পানি কিনে নেয়। আটত্রিশটির মধ্যে পাঁচটি গ্রাম অবস্থিত ছিল গঙ্গার অপর পারে

(সালকিয়া, হাওড়া, কাসুন্দিয়া, রামকৃষ্ণপুর ও বেতড়)। বাদবাকি তেত্রিশটি গ্রাম ছিল কলকাতার সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত। কাঁকুড়গাছি, বাগমারি, শিয়ালদা, ট্যাংরা প্রভৃতি সেই তেত্রিশটি গ্রাম আজ কলকাতা শহরের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত।[২]

পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের পর, নিজেদের উপনিবেশটিকে সুসংহত করে তোলার দিকে নজর দিল ইংরেজ কোম্পানি। এতদিন মারাঠা খাতের আবেষ্টনীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল কলকাতার পরিধি। এবারে এই বেষ্টনীর বাইরে অবস্থিত পনেরোটি 'ডিহি'-কে জুড়ে দেওয়া হল কলকাতার অঙ্গে। পনেরোটি ডিহি ছিল সর্বসাকুল্যে পঞ্চান্নটি গ্রামের সমষ্টি। কলকাতার ঐতিহাসিক আলোচনার সর্বত্র এ গ্রামসমষ্টি 'পঞ্চান্নগ্রাম' নামে অভিহিত হয়েছে। পূর্বোক্ত তেত্রিশটি গ্রামের অনেকগুলিই ছিল 'পঞ্চান্নগ্রামের' অন্তর্ভুক্ত।[৩]

কলকাতার এক্তিয়ারে ঢুকেও পঞ্চান্নগ্রাম কিন্তু প্রথমে মূল শহরের অংশ হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর কলকাতার চৌহদ্দি-সংক্রান্ত একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। তাতেও কেবল মারাঠা খাতের অন্তর্বর্তী অঞ্চলকেই দেওয়া হয়েছিল খাস শহরের সম্মান।[৪] পঞ্চান্নগ্রাম তখনও নিছক শহরতলি।[৫] এখন পঞ্চান্নটি গ্রামের অধিকাংশই কলকাতার প্রাণচঞ্চল পল্লীতে পর্যবসিত, কয়েকটি অবশ্য আজও পশ্চাদ্‌পর শহরতলির এলাকাধীন।

পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্ভুক্ত সব ক'টি গ্রামের অবস্থিতিনির্দেশ ইতিপূর্বে মুদ্রিত কোনো গ্রন্থেই আলোচিত হয়নি। আংশিক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তিও ঘটেছে। তাই বর্তমান নিবন্ধে আমরা পঞ্চান্নটি গ্রামেরই অবস্থান নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছি। যদিও তার মধ্যে কয়েকটি গ্রাম কলকাতার পৌরাঞ্চলের বহির্ভূত, তবুও বিষয়টিকে পূর্ণতা প্রদানের জন্য আমরা সেই নামগুলিও তালিকায় গ্রহণ করেছি।

নগরায়ণ ও পল্লীনাম

অষ্টাদশ শতকে কলকাতার যে বিস্তার শুরু হয়েছিল, আজও তা অব্যাহত রয়েছে। পশ্চিমে গঙ্গা থাকায় সেদিকে বাড়তে পারেনি কলকাতা। পূর্বেও তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল লবণহ্রদের ধারে পৌঁছে। পরে সে হ্রদ বুজিয়ে 'বিধাননগর' তৈরি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ভিন্ন ধাঁচের এই পরিকল্পিত উপনগরীকে কলকাতার স্বতঃস্ফূর্ত বিস্তারের ফসল বোধহয় না বলাই ভাল। কলকাতার প্রধান প্রসার ঘটেছে উত্তরে ও দক্ষিণে। এই ব্যাপ্তিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে দেশবিভাগ।

সুতানুটি-গোবিন্দপুর-কলকাতা একদিনে শহর হয়ে ওঠেনি। আবার যেসব গ্রামকে কলকাতা শহর গ্রাস করেছে, তাদেরও রূপান্তর ঘটেনি রাতারাতি। মূল শহরের অংশে পরিণত হওয়ার আগে পঞ্চান্নগ্রামকে 'শহরতলি' হতে হয়েছিল। অন্যান্য গ্রামাঞ্চলও সে রীতি অনুসরণ করেছে, তাদের পরিবর্তন ঘটেছে ধাপে ধাপে। নগরায়ণের প্রথম পর্বে কলকাতা-বা তার সংলগ্ন গ্রামাঞ্চল ধীরে ধীরে বর্জন করে তার কৃষিনির্ভর চরিত্র। পরবর্তীকালে নবজাত শহরের জনবাহুল্যের চাপ ছাপ ফেলে সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলে,

আবাদী জমি বাস্তুতে পরিণত হতে শুরু করে। শহরের ধনিক শ্রেণীর সদস্যরা অনতিদূরে অবস্থিত খোলামেলা পরিবেশে গড়ে তোলেন বাগান তথা বাগানবাড়ি। জমির চাহিদা দিনে দিনে বাড়তে থাকে, বোজানো শুরু হয় পুকুর-দিঘি, তার উপরে বা পাশে গড়ে ওঠা জনবসতির অনেক ক্ষেত্রেই নামকরণ হয় জলাশয়টির নামে। জনপদটির সাবেক বাসিন্দারা স্থানচ্যুত হন, পুরনো পল্লীবিন্যাসকে ভেঙে গজিয়ে ওঠে নতুন অধিবাসীদের নতুন পাড়া। ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে জমির দাম অবিরাম ঊর্ধ্বমুখী হয়ে চলে। অর্থের মোহে বা অবস্থান্তরের কারণে অনেক বাগানবিলাসী পরিবার বিক্রি করে দেন পূর্বপুরুষের সাধের বাগানবাড়ি। বাগান চিরে রাস্তা বেরোয়, টুকরো করে বিক্রি হয় জমি, একটিমাত্র হোল্ডিং থেকে প্রস্তুত হয় অজস্র বাই-নম্বরযুক্ত বাড়ি। পল্লীটির নামের মধ্যেই শুধু বেঁচে থাকে একটি হারিয়ে যাওয়া বাগানের স্মৃতি। কোথাও কোথাও পূর্ব-পরিচয় ঢাকা পড়ে যায় নব্য অধিবাসীদের আধিপত্যে। বাগানের স্মৃতি মুছে দিয়ে তারই বুকের উপর গজিয়ে ওঠে বামুনপাড়া বা মুসলমানপাড়া। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে স্থাপিত হয় নতুন বাজার-হাট। তার মধ্যে কয়েকটি স্থায়িত্ব পায়, বাকিগুলি ডুবে যায় অবলুপ্তির অতলে। চাউলপটি, ময়রাপটি প্রভৃতি নামের মধ্যে রয়ে যায় তাদের রেশ। এত ভাঙাগড়ার মধ্যেও অনেকক্ষেত্রেই জেগে থাকে গ্রামটির সাবেক নাম। সেভাবেই বেঁচে গিয়েছে পঞ্চান্নগ্রামের অধিকাংশের নাম, সেভাবেই টিকে থাকছে যাদবপুর, সন্তোষপুর, মোমিনপুর নামগুলি। আর দাঁড়িয়ে থাকে লোকদেবতার 'থান' গুলি, চট করে দেবস্থানের বিলুপ্তি ঘটে না। কারণ, সাবেক বাসিন্দাদের মতো নতুন বসতিকারীদেরও যে 'তেনাদের' দরকার। গাছতলার বদলে দেবতাটির মাথার উপর ওঠে ইট-কাঠের আচ্ছাদন, তৈরি হয় রগরগে রঙের মন্দির। দেবতার কৌলীন্য বাড়লেও 'তলা' শব্দটা ঘোচে না, 'শীতলা মন্দিরের' বদলে লোকে তখনও বলে চলে 'শীতলাতলা'। আরও কিছু 'তলা' বেঁচে থাকে লোকমুখে। সেগুলি বহন করে প্রাচীন কিছু বৃক্ষের স্মৃতি, যেমন—বটতলা বা ডালিমতলা।

পার্শ্ববর্তী জনবসতিকে চেনার দিকচিহ্ন হিসাবে পুকুর, বাগান, বাজার বা লোক-দেবতার 'থান'-এর ব্যবহার গ্রামবাংলার এক প্রথাসিদ্ধ রীতি। গ্রামনাম বা গ্রামবাংলার পল্লীনামের তালিকার দিকে তাকালে এর সত্যতা সহজেই অনুধাবন করা যাবে। কলকাতার বিস্তারের ফলে গ্রামাঞ্চল নগরায়ণের পথে পা দিলেও তার গা থেকে গ্রাম্য গন্ধ চট করে চলে যায় না। নতুন পাড়াগুলিকে চেনার জন্য যখন নামকরণের প্রয়োজন হয়, তখন তা সাধিত হয় শনাক্তকরণের সেই সনাতন গ্রাম্য রীতি অনুসরণ করে। কখনও আবার অনুসৃত হয় একটি স্বতন্ত্র গ্রাম্য পদ্ধতি। অবস্থিতি অনুযায়ী পাড়ার নাম হয় উত্তর-দক্ষিণ-পুব বা পশ্চিম পাড়া, নয়তো অধিবাসীদের জাতপাত ও পেশার পরিচয় জড়িয়ে দেওয়া হয় পল্লীর নামে।

গ্রাম থেকে নগরাঞ্চলে রূপান্তরিত হওয়ার এই দীর্ঘ পদ্ধতি স্বাভাবিকভাবেই সময়-সাপেক্ষ। তাই মহাকালের একটি বিশেষ মুহূর্তে সব ক'টি পরিবর্তনশীল অঞ্চলের চেহারা একরকম থাকে না। দুশো বছরে পঞ্চান্নগ্রামের স্বাতন্ত্র্যের বেমালুম বিলুপ্তি ঘটেছে।

একশো বছর আগে যে বালিগঞ্জ ছিল মর্যাদাহীন শহরতলি, আজ সে জায়গাই নগর-কৌলীন্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। আবার কলকাতার পৌরাঞ্চলের (ওয়ার্ড ৫৭, ৫৮) ভিতরে থেকেও চিংড়িহাটা, মাকালতলা, তাপুরিয়াঘাটা, অনন্তমাতাল, আরুপোতা, বৈঁচতলা প্রভৃতি অঞ্চল আজও 'গ্রাম' অভিধায় অভিহিত।[৬] ১৯৮৪ থেকে যাদবপুর, গার্ডেন রিচ প্রভৃতি দক্ষিণ শহরতলির কিছু অঞ্চল ঢুকে এসেছে কলকাতার পৌরসীমার মধ্যে। এইসব অঞ্চল নগরায়ণের শেষ গণ্ডির সমীপবর্তী। অন্যদিকে যেসব অঞ্চলে দ্রুত নগরায়ণ চলছে, সেসব এলাকায় দেখা যায় পথনামের ব্যবহার ঢিলেঢালা, সে তুলনায় পল্লীনাম বেশি জনপ্রিয়। কিন্তু নগরায়ণের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পল্লীনামের জায়গা পথনাম অধিকার করতে থাকে।

কলকাতার পল্লীনামের বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পথনামে স্থান পেলে পল্লীনামের আয়ু দীর্ঘায়িত হয়। পথনামে স্থান পাওয়ায় পটলডাঙা, সিমলা, গরানহাটা প্রভৃতি পল্লীনাম স্থায়িত্ব পেয়েছে। কিন্তু সে সৌভাগ্য না হওয়ায় বিজিতলা, ভিস্তিপাড়া বা গ্যাঁড়াতলা আজ বিস্মৃত। অবশ্য পথনামে ব্যবহৃত হলে পল্লীনাম নিয়ে যে বিভ্রান্তিও সৃষ্টি হয়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'চিৎপুর'। চিৎপুরের প্রকৃত অবস্থান চিৎপুর রোডের উত্তরপ্রান্তে, খালেরও উত্তরে। তবু আমরা অম্লানবদনে 'রবীন্দ্র সরণি'-কে 'চিৎপুর' বলে অভিহিত করি।

পল্লীনামের চরিত্র

আমাদের পল্লীনামের প্রয়োগ বেশ শিথিল। তাই ঝামাপুকুর আর ঠনঠনিয়া অথবা পটলডাঙা আর মির্জাপুরের মধ্যে বিভাজনের সীমারেখা কলমের দৃঢ় আঁচড়ে আঁকা অসম্ভব। বর্তমান নিবন্ধে পরিবেশিত তালিকায় দেখা যাবে, অনেক ক্ষেত্রে পাশাপাশি দুটি রাস্তা দুটি স্বতন্ত্র পল্লীনাম বহন করছে। রীতিগত শৈথিল্যের কথা জানা না থাকলে ব্যাপারটি বিভ্রান্তিকর বলে মনে হবে। পল্লীনামের ব্যবহার যে কতটা আলগা, একটি উদাহরণ দিলে সেটা বোঝা যাবে। রাধানাথ মল্লিক লেন নামক নাতি-দীর্ঘ গলিটি বিভিন্ন জায়গায় পটলডাঙা, আড়পুলি, চাঁপাতলা ও গোয়ালাপুকুর—চারটি পল্লীনামে অভিহিত হয়েছে।[৭] বর্তমান নিবন্ধে পল্লীগুলির যে অবস্থিতিনির্দেশ দেওয়া হল, সেটি ব্যবহারকালেও এই বিষয়টি খেয়াল রাখা দরকার।

পল্লীনামের ফর্দ করতে গিয়ে আর একটি ব্যাপার আমাদের চোখে পড়েছে। পল্লীগুলির আয়তনের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই—কোনোটি একাধিক ওয়ার্ড জুড়ে বিস্তৃত, আবার কোনোটি বা একটি গলির অংশ মাত্র। কলকাতার অংশবিশেষে রূপান্তরিত অনেক গ্রামের নাম পরিণত হয়েছে পল্লীনামে। স্বভাবতই সেই পল্লীনামগুলি বৃহৎ অঞ্চলের দ্যোতক। আবার সেইসব গ্রামের বুকে গড়ে ওঠা একেকটি পল্লী প্রসব করেছে একেকটি নাম। এই উপ-পল্লীগুলির আকার স্বাভাবিক কারণেই ছোট।

সব মিলিয়ে বিষয়টি বেশ গোলমেলে। পুরো প্রসঙ্গটি আলোচনা করতে হলে একটি

স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখতে হয়। এখানে শুধু বিভ্রান্তি এড়াতে কিছু প্রাথমিক জটিলতার কথা জানিয়ে রাখা হল।

অনুসৃত নীতি

১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে পুরসভা কলকাতার একশোটি ওয়ার্ডের চৌহদ্দি ও পথনামের একটি তালিকা প্রকাশ করেছিলেন।[৮] মোটামুটি সেই তালিকার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলির পল্লীনামই আমরা সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি। তবে পঞ্চান্নগ্রামের ক্ষেত্রে যে সেই সীমানার বাইরেও আমাদের পা বাড়াতে হয়েছে, সে-কথা আমরা আগেই জানিয়েছি।

কলকাতার অনেক রাস্তা অতীতে দেশজ নামে পরিচিত ছিল, যেমন—বন্দুকওয়ালা গলি, মীর-ই-জানি গলি, মাখনওয়ালা গলি। এগুলি পথনাম বলে বর্তমান তালিকায় গৃহীত হয়নি। ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনস, মার্লিন পার্ক, রেইনি পার্ক, সানি পার্ক, কুইন্স পার্ক প্রভৃতি নামগুলিও পথনাম বলে বর্জিত হয়েছে। বড়বাজারের 'কাটরা' বা খুব ছোট 'পটি'গুলি যেহেতু 'পল্লী' নয়, তাই তালিকায় স্থান পায়নি। একই কারণে বাদ পড়েছে একাধিক পুকুর ও বাজার। তবে খোলাখুলি একটি স্বীকারোক্তি গোড়াতেই সেরে রাখা ভাল। কোনটি যে নিছক 'স্থাননাম', আর কোনটি যে 'পল্লীনাম' তা অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্ট নয়। তাই দৃঢ় কোনো নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। যান্ত্রিক কঠোরতার গণ্ডি এড়িয়ে আমরা চেষ্টা করলাম সীমিত পরিসরের মধ্যে যথাসাধ্য বেশি তথ্য সংকলন করার।

তালিকা (বর্ণানুক্রমিক)

১. অন্তবাদ (Auntobad)—পঞ্চান্নগ্রামের অন্যতম গ্রাম অন্তবাদ ছিল ডিহি শ্রীরামপুরের অন্তর্ভুক্ত।[৯] উত্তরে বৈঁচতলা, পশ্চিমে ধলন্দ, দক্ষিণে চৌবাগা—এই ত্রিসীমানা দিয়ে বেষ্টিত ছিল অন্তবাদ।[১০]

২. অরফ্যানগঞ্জ—অরফ্যানগঞ্জ রোড, ডায়মণ্ডহারবার রোড ও টালির নালার মধ্যবর্তী ত্রিভুজাকৃতি অঞ্চল।[১১]

৩. অ্যাণ্টনিবাগান—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের পশ্চিমধারে 'অ্যাণ্টনিবাগান লেন' এখনও রয়েছে (ওয়ার্ড ৩৭)।[১২]

৪. আকবরপুর—মেণ্ডিসের মানচিত্রে (১৮৪৫) দেখা যাচ্ছে, খিদিরপুরের দক্ষিণে ও আপার অরফ্যান স্কুলের পশ্চিমে ছিল 'Ainkburpoor'।[১৩]

৫. আড়কুলি—বর্তমান মদনগোপাল লেনের (ওয়ার্ড ৪৮) পূর্বনাম ছিল 'আড়কুলি লেন'।[১৪]

৬. আড়পুলি—বর্তমান সুরেন্দ্রলাল পাইন লেনের (ওয়ার্ড ৪০, ৪৮) পূর্বনাম ছিল 'আড়পুলি লেন'।[১৫] আড়কুলি ও আড়পুলি পল্লীনাম দুটি নিয়ে বিস্তর গণ্ডগোল। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত শঙ্কর ঘোষ লেন ও সন্নিহিত অঞ্চলকে 'আড়পুলী' বলেছেন।[১৬] লোকনাথ ঘোষও এই শঙ্কর ঘোষের পরিবারকে বলেছেন

'The Ghose Family of Arpuli'।[১৭] কিন্তু আড়পুলি লেনের (বা সুরেন্দ্রলাল পাইন লেনের) অবস্থান শঙ্কর ঘোষ লেনের বহু দক্ষিণে, মেডিকাল কলেজের উলটোদিকে। এই রাস্তার সামান্য দক্ষিণেই আবার আড়কুলি লেন (বা মদনগোপাল লেন)। তাহলে আড়পুলি লেন এবং আড়কুলি লেন প্রায় পাশাপাশি। এ দুটি নাম কি তবে একই শব্দের দুটি অপভ্রংশ? মৌখিক আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীরাধারমণ মিত্র আমাদের বলেছেন, 'আড়কুলি' ফার্সি শব্দ। 'কুলি' শব্দের অর্থ রাস্তা, কোনো বড় রাস্তা থেকে যে পথ আড়াআড়ি বেরিয়ে যায়, তাকে বলা হয় 'আড়কুলি'। তাঁর মতে, 'আড়পুলি' শব্দ 'আড়কুলি' থেকে অপজাত। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সম্পাদিত একাধিক বাংলা দলিলে আমরা দেখেছি যে, রাধানাথ মল্লিক লেন ও সন্নিহিত অঞ্চলকে অভিহিত করা হচ্ছে 'মৌজা আড়পুলী' নামে। সব মিলিয়ে বিষয়টি অত্যন্ত জটিল।

৭. আতাবাগান—বর্তমান চণ্ডীবাড়ি স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ১৬) পূর্বনাম 'আতাবাগান স্ট্রিট (লেন)'.[১৮] সন্নিহিত পাড়াটির নামও আতাবাগান।

৮. আদিগঙ্গা চর—টালির নালা, গঙ্গা ও কবিতীর্থ সরণির মধ্যবর্তী ত্রিভুজাকৃতি অঞ্চল।[১৯]

৯. আনন্দপুর—কাঁকুড়গাছির দক্ষিণ-পূর্বে ও নারকেলডাঙা মেন রোডের উত্তরধারের একটি অঞ্চল।[২০]

১০. আমপোস্তা—পি. এম. বাকচির ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ডাইরেক্টরিতে ২১৫ ও ২২৫ দরমাহাটা স্ট্রিটের মধ্যবর্তী অঞ্চল এই নামে অভিহিত।[২১]

১১. আমড়াতলা—এখনও ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে আমড়াতলা স্ট্রিট ও লেন রয়েছে।

১২. আয়নাপটি—পি. এম. বাকচির পূর্বোক্ত ডাইরেক্টরিতে সোয়ালো লেন 'চীনাবাজার আয়নাপট্টি' নামে অভিহিত। সন্নিহিত একটি অঞ্চল 'গেলাসপটি' নামে পরিচিত ছিল ('গেলাসপটি' দ্র.)।

১৩. আরকপুর—বর্তমান আনোয়ার শাহ রোডের পূর্ব অংশ ও সন্নিহিত অঞ্চল।[২২]

১৪. আরমানিটোলা—আরমেনিয়ান স্ট্রিট ও সন্নিহিত অঞ্চলের সাবেক নাম।[২৩]

১৫. আরিফনগর—শকের মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে, এ অঞ্চলটির অবস্থান গার্ডেন রিচের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে।

১৬. আলগুদাম—জ্যাকসন'স ঘাট স্ট্রিট ও সংলগ্ন এলাকা।[২৪]

১৭. আলিপুর—৭৪ ও ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে আলিপুর অ্যাভেনিউ, আলিপুর পার্ক প্লেস, আলিপুর পার্ক রোড, আলিপুর রোড এখনও আলিপুর গ্রামের স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে।

১৮. আলুপোস্তা—পি. এম. বাকচির পূর্বোক্ত ডাইরেক্টরিতে ২৩১ ও ২৩২ দরমাহাটা স্ট্রিটের মধ্যবর্তী এলাকাটি 'আলুপোস্তা' নামে অভিহিত।

১৯. আহিরিটোলা—আহিরিটোলা স্ট্রিট, ফার্স্ট লেন ও বাই লেন (ওয়ার্ড ১৯, ২০) এখনও এই পল্লীনামটি বহন করছে।

২০. আহিরিপুকুর—আহিরিপুকুর রোড, ফার্স্ট লেন ও সেকেণ্ড লেন (ওয়ার্ড ৬৯) এই পল্লীনামের বাহক। আহিরিপুকুরের (আহিরিতালাও) পাশে 'আহিরিবাগান' নামে একটি বস্তিও ছিল ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে।[২৫] গুরুসদয় রোড ও আহিরিপুকুর রোডের সংযোগস্থলের পশ্চিমধারে, বর্তমান 'পোদ্দার নিকেত'-এর জায়গায় ছিল আহিরিপুকুরের অবস্থিতি।[২৬]

২১. ইংরেজটোলা—ইংরেজটোলা বলতে যদিও আমরা আলগাভাবে পুরো সাহেব-পাড়াই বুঝি, তবু পি. এম. বার্কচির পূর্বোক্ত ডাইরেক্টরিতে থিয়েটার রোড বিশেষভাবে 'ইংরেজটোলা' নামে অভিহিত হয়েছে।

২২. ইঁন্দ্র—সারকুলার গার্ডেন রিচ রোড ও তারাতলা রোডের সংযোগস্থলের দক্ষিণ-পূর্বে বিস্তীর্ণ অঞ্চল।[২৭]

২৩. ইব্রাহিমপুর—৯৬ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও ইব্রাহিমপুর রোড রয়েছে।

২৪. ইমামবাগ—প্রিন্সেপ স্ট্রিট ও সন্নিহিত অঞ্চল। প্রিন্সেপ স্ট্রিটের সাবেক নাম 'ইমামবাগ লেন' ও প্রিন্সেপ লেনের পূর্বনাম 'ইমামবাগ সেকেণ্ড লেন'।[২৮]

২৫. উখড়া—সারকুলার গার্ডেন রিচ রোডের উত্তরধারে, ডুমেইন অ্যাভেনিউ ও সত্য ডাক্তার রোডের মধ্যবর্তী অঞ্চল।

২৬. উড়িয়াপাড়া—১—এখনও ৫৪ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে 'উড়িয়াপাড়া লেন'।

২৭. উড়িয়াপাড়া—২—বর্তমান রমানাথ কবিরাজ লেনের (ওয়ার্ড ৫১) পূর্বনাম 'উড়িয়াপাড়া লেন'।[২৯]

২৮. উড়িয়াবাগান—বেলিয়াঘাটা মেন রোডের উত্তরধারে, সরকার বাজার ও আলোছায়া সিনেমা থেকে সমদূরত্বে অবস্থিত।

২৯. উত্তরপাড়া—উত্তরে বরাহনগর থেকে দক্ষিণে গান ফাউণ্ড্রি রোড, পশ্চিমে কাশীপুর রোড থেকে পূর্বে সাঁতরাপাড়া পর্যন্ত একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল 'উত্তরপাড়া' নামে পরিচিত ছিল। বর্তমান হেম দে লেনের (ওয়ার্ড ২) সাবেক নাম 'ইস্ট উত্তরপাড়া লেন'।[৩০]

৩০. উলফৎবাগান—উডবার্ন পার্ক ও সন্নিহিত এলাকার পুরনো নাম।[৩১]

৩১. উলুবেড়িয়া—পঞ্চান্নগ্রামের অন্যতম গ্রাম উলুবেড়িয়া ছিল ডিহি শ্রীরামপুরের অন্তর্ভুক্ত।[৩২] উলুবেড়িয়ার অবস্থিতি ছিল বন্দেল ও কসবার মাঝে।[৩৩] ফার্ন রোড ও প্লেসের পূর্বনাম যথাক্রমে উলুবেড়িয়া রোড ও লেন।[৩৪]

৩২. উল্টোডাঙা (উল্টোডিঙি)—উল্টোডাঙা ছিল পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্ভুক্ত একটি ডিহি তথা গ্রাম।[৩৫] উল্টোডিঙি রোড (ওয়ার্ড ১২) এখনও পল্লীনামটি বহন করছে।

৩৩. একডালিয়া (একডালা)—৬৮ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে 'একডালিয়া প্লেস'।

৩৪. একবালপুর—৭৮ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে 'একবালপুর লেন'।

৩৫. এন্টালি (ইন্টালি)—পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্ভুক্ত এই গ্রাম তথা ডিহিটির[৩৬] স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে 'ডিহি এন্টালি রোড' (ওয়ার্ড ৫৫)। বাংলায় আগে অঞ্চলটির নাম লেখা হতো 'ইটালি', উচ্চারণ করা হতো 'ইটিলি'।

৩৬. ওয়াটগঞ্জ—বর্তমান কবিতীর্থ সরণির পুরনো নাম 'ওয়াটগঞ্জ স্ট্রিট',[৩৭] সংলগ্ন এলাকাটিও 'ওয়াটগঞ্জ' নামে পরিচিত। 'ওয়াটগঞ্জ স্কোয়ার' (ওয়ার্ড ৭৫) এখনও রয়েছে।

৩৭. ওয়ারিসবাগান—বর্তমান মেটকাফ লেনের (ওয়ার্ড ৪৬) পূর্বনাম 'ওয়ারিসবাগান লেন'।[৩৮]

৩৮. কড়েয়া—বেনেপুকুরসহ কড়েয়া গ্রাম ছিল ডিহি তপসিয়া তথা পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্ভুক্ত।[৩৯] কড়েয়া রোড (ওয়ার্ড ৬৪, ৬৯) সেই প্রাচীন গ্রামটির স্মৃতি বহন করছে।

৩৯. কদমতলা—পানি ঘাট এবং গোয়ালিয়র মনুমেণ্টের মাঝে গঙ্গাতীর ছিল 'কদমতলা ঘাট'। এ. কে. রায় লিখেছেন যে, সংলগ্ন 'কদমতলা' পল্লীর নামেই ঘাটটির নামকরণ হয়েছিল।[৪০]

৪০. কপালিটোলা—কপালিটোলা লেন (ওয়ার্ড ৪৭) এখনও নামটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

৪১. কপালিবাগান—৫৭ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে কপালিবাগান লেন।

৪২. কপিডাঙা—খিদিরপুরের বর্তমান নেতাজি সুভাষ ডক অঞ্চল।[৪১]

৪৩. কপিবাগান—বাগবাজারের ঠাকুর রাধাকান্ত লেনের (ওয়ার্ড ৭) সাবেক নাম 'কপিবাগান লেন'।[৪২]

৪৪. কবরডাঙা—১—রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট ও শিবতলা স্ট্রিটের সংযোগস্থলের দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল কবরডাঙার অবস্থিতি।[৪৩] বর্তমান শিবু ঠাকুর লেনের নামও ছিল 'কবরডাঙা স্ট্রিট'।[৪৪]

৪৫. কবরডাঙা—২—শিয়ালদা স্টেশনের অদূরে অবস্থিত 'কাশিমবাজার রাজবাটী' ও সংলগ্ন অঞ্চল এক সময়ে পরিচিত ছিল 'কবরডাঙা' নামে।[৪৫]

৪৬. কবিরাজবাগান—অরবিন্দ সেতুর দক্ষিণ-পূর্বে, হরিশ নিয়োগী রোডের একাংশ।

৪৭. কমলনয়নের বেড—শকের মানচিত্রে 'Cummul Nyan Ka Baree'-র উল্লেখ রয়েছে। এটি যে একটি পল্লীনাম ছিল সেটা বোঝা যায় ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের পথপঞ্জী থেকে।[৪৬] সেখানে নামটিকে পথনামের মধ্যে ঢুকিয়ে পল্লীটির অন্তর্গত অনেকগুলি বাড়ির বাসিন্দাদের নামোল্লেখ করা হয়েছে। আবার ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের পথপঞ্জীতে মল্লিক স্ট্রিটের দেশজ নাম দেওয়া আছে 'Kamul-Roy-Ka-bair'।[৪৭] কমলনয়নের পদবী অবশ্য 'রায়' ছিল না, তাঁর পদবী ছিল 'মল্লিক'।

৪৮. কম্বুলিয়াটোলা—কম্বুলিয়াটোলা লেন (ওয়ার্ড ১০) এখনও পল্লীনামটিকে জীবিত রেখেছে।

৪৯. কয়লাঘাট (কয়লাঘাটা)—বর্তমান বাবু তারাপদ মুখার্জি সরণির পূর্বনাম 'কয়লাঘাট স্ট্রিট'। রাস্তাটির সঙ্গে স্ট্র্যাণ্ড রোডের সংযোগস্থল এবং সন্নিহিত

অঞ্চল এখনও ঐ নামে পরিচিত বলেই রেলের স্থানীয় অফিসটির নামের সঙ্গে 'কয়লাঘাট' শব্দটি যুক্ত হয়েছে।

৫০. কয়লাহাটা—প্রিন্স দ্বারকানাথের অনুজ রমানাথ ঠাকুর ছিলেন কয়লাহাটার ঠাকুরবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কয়লাহাটা পল্লীর অনেকটাই গুঁড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেছে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিট। রমানাথের ভদ্রাসনের জায়গায় এখন বিরাজ করছে বাঙ্গুরদের 'বেঙ্কটেশ্বর মন্দির'।[৪৮]

৫১. কলভিনবস্তি—লোয়ার সারকুলার রোডের উত্তরধারে, ক্যামাক স্ট্রিট ও বর্তমান লর্ড সিনহা রোডের মাঝামাঝি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে ছিল এই পল্লীটি।[৪৯]

৫২. কলাবাগান—১—মেছুয়াবাজার স্ট্রিটের উত্তরধারে, হ্যালিডে স্ট্রিট ও শম্ভুচন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিটের মাঝে ছিল সাবেক কলাবাগানের অবস্থিতি।[৫০] বর্তমানে হ্যালিডে স্ট্রিটের জায়গায় রয়েছে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ।

৫৩. কলাবাগান—২—প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের কাছে এখনও রয়েছে 'কলাবাগান লেন' (ওয়ার্ড ৯৪)।

৫৪. কলাবাগান—৩—তৃতীয় কলাবাগানের অবস্থিতি বেলেঘাটায়, চড়কডাঙা রোডের পূর্বধারে।

৫৫. কলাবাগান—৪—আর একটি কলাবাগান অবস্থিত ছিল বাগবাজারে, খালের ধারে।[৫১]

৫৬. কলিঙ্গা—'কলিঙ্গা'-র নাম বিকৃত হয়ে 'কলিন লেন' ও 'কলিন স্ট্রিটের' (ওয়ার্ড ৫২, ৬২) মধ্যে টিকে রয়েছে। বর্তমান পেম্যাণ্টল স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৬২) আদি নাম কলিঙ্গা ফার্স্ট লেন। এই গলিটি ১৮৪১-এ ছিল স্থাননামবহুল—'almost every turn in this lane has a name amongst the natives, but they have been so mutilated, that it is not possible now to shew the boundary of each name...now that a great number of houses belonging to it have been broken down for Wellesley Square and its Street.'[৫২]

৫৭. কলুটোলা—কলুটোলা স্ট্রিট অনাগারিক ধম্মপাল স্ট্রিটে নামান্তরিত হলেও এখনও ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে 'কলুটোলা লেন'।

৫৮. কলুপাড়া—৯১ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে 'কলুপাড়া লেন'।

৫৯. কসবা—বালিগঞ্জ রেলস্টেশনের পূর্বদিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল।

৬০. কসাইটোলা—বর্তমান বেণ্টিঙ্ক স্ট্রিট ও সন্নিহিত অঞ্চলের সাবেক নাম।[৫৩]

৬১. কসাইপাড়া—৬০ নম্বর ওয়ার্ডে কসাইপাড়া লেনের অবস্থিতি।

৬২. কসাইবস্তি—২৯ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে কসাইবস্তি ক্রস লেন, ফার্স্ট লেন ও সেকেণ্ড লেন। পুরো অঞ্চলটিরই নাম 'কসাইবস্তি'।

৬৩. কাওড়াপাড়া—চিৎপুর ব্রিজের ধারে, বসিরিশাহের দরগার অদূরে ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে 'কাওড়াপাড়া' নামে একটি পল্লী ছিল।[৫৪]

৬৪. কাঁকুড়গাছি—পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্ভুক্ত কাঁকুড়গাছি গ্রাম ছিল ডিহি শুঁড়ার এলাকাধীন।[৫৫] কাঁকুড়গাছি রোড, ফার্স্ট লেন ও সেকেণ্ড লেন (ওয়ার্ড ৩০,৩১) গ্রামটির স্মৃতি টিকিয়ে রেখেছে।

৬৫. কাঁকুড়িয়া—দক্ষিণদাঁড়ির পূর্বদিকে অবস্থিত[৫৬] এই গ্রামটি ছিল পঞ্চান্নগ্রাম তথা ডিহি বাগজোলার অন্তর্ভুক্ত।[৫৭] অঞ্চলটির বর্তমান নাম 'কাঁকুড়ি', এটি এখন সল্টলেক থানার এলাকাধীন।[৫৮]

৬৬. কাঁকুলিয়া—কাঁকুলিয়া রোড এই পল্লীনামটি বহন করছে (ওয়ার্ড ৬৮, ৯০)।

৬৭. কাজিপাড়া-১—১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে আপার সারকুলার রোড ও উল্টোডাঙা (ব্রিজ) রোডের সংযোগস্থলের উত্তরদিকে অবস্থিত ছিল 'কাজিপাড়া'।[৫৯] পল্লীটির যে নামান্তর ছিল 'কাগজিপাড়া' সে-কথা জানা যায় ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের একটি পথপঞ্জী থেকে। একই পথপঞ্জীতে অঞ্চলটিকে 'কাজিপাড়া'ও বলা হয়েছে, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে জানানো হয়েছে যে, সেখানে বাঙালি কাগজ প্রস্তুতকারকদের বাস।[৬০]

৬৮. কাজিপাড়া-২—সারকুলার গার্ডেন রিচ রোড ও তারাতলা রোডের সংযোগস্থলের দক্ষিণ-পশ্চিমে তারাতলা রোডের পশ্চিমধারে অঞ্চলটির অবস্থান।[৬১]

৬৯. কাটাপুকুর—বর্তমান শচীন মিত্র লেনের (ওয়ার্ড ৭, ৮, ১০) সাবেক নাম ছিল কাটাপুকুর লেন,[৬২] সন্নিহিত বিস্তৃত এলাকা পরিচিত ছিল ঐ পল্লীনামে।

৭০. কাপাসডাঙা—শিমলা স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ২৫, ২৬) পূর্বনাম 'কাপাসডাঙা'।[৬৩]

৭১. কামরাঙাতলা—বর্তমান অন্নদা ব্যানার্জি লেনের (ওয়ার্ড ৭০) পূর্বনাম 'কামরাঙাতলা লেন'।[৬৪]

৭২. কামারডাঙা—পঞ্চান্নগ্রামের এলাকাধীন কামারডাঙা ছিল ডিহি এণ্টালির অন্তর্ভুক্ত।[৬৫] কামারডাঙা রোড (ওয়ার্ড ৫৬) এখনও সেই গ্রামের কথা স্মরণ করায়।

৭৩. কারবালা—১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের গাইডবুকে কারবালার অবস্থিতি নির্দেশ করা আছে এইভাবে, 'north corner made by the junction of Manictollah Street with the Upper Circular Road.[৬৬] ফিভার হাসপাতাল কমিটির রিপোর্টের মধ্যে রক্ষিত একটি মানচিত্রে অঞ্চলটি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত আছে।[৬৭] কারবালার বিখ্যাত পুকুরটি বুজিয়ে ফেলা হলেও এখনও বেঁচে আছে 'কারবালা ট্যাঙ্ক লেন' (ওয়ার্ড ১৬)। রমানাথ দাসের মতে, এ অঞ্চলটির নামান্তর ছিল 'কৃষ্টবাগান'।[৬৮]

৭৪. কালীঘাট—কালীঘাট ছিল পঞ্চান্নগ্রামের ডিহি মনোহরপুরের এলাকাধীন।[৬৯] স্বনামখ্যাত পীঠস্থান, অবস্থিতি নির্দেশ নিষ্প্রয়োজন।

৭৫. কালীতলা—বর্তমান মার্কাস লেনের (ওয়ার্ড ৩৯) পূর্বনাম 'কালীতলা লেন'।[৭০]

৭৬. কালীদহ—পঞ্চান্নগ্রামের ডিহি চিৎপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল 'কালীদহ' গ্রাম। বর্তমান জীবন মিত্র রোডের (ওয়ার্ড ৩) আগে নাম ছিল 'কালীদহ রোড'।

৭৭. কালীবাগান—খিদিরপুরের 'ভূকৈলাস' রাজবাড়ি ও সংলগ্ন অঞ্চল।[৭১]

৭৮. কাশিয়াবাগান-১—ক্যামাক স্ট্রিটের বিপরীত দিকে, লোয়ার সারকুলার রোডের দক্ষিণধারে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল কাশিয়াবাগান।[৭২]

৭৯. কাশিয়াবাগান-২—এখনও ৬৪ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে 'নিউ কাশিয়াবাগান লেন'।

৮০. কাশিয়াবাগান-৩—এই কাশিয়াবাগান রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট নির্মাণের ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট ও উল্টোডাঙা রোডের সংযোগস্থল বরাবর ছড়িয়ে ছিল এই পল্লীটি।[৭৩]

৮১. কাশীপুর—পঞ্চান্নগ্রামের একটি গ্রাম কাশীপুর ছিল ডিহি সিঁথির অন্তর্ভুক্ত।[৭৪] কাশীপুর রোড (ওয়ার্ড ১, ৬) এখনও তার স্মৃতিবাহী হয়ে রয়েছে।

৮২. কাঁসারিপটি-১—পি. এম. বাকচির পূর্বোক্ত ডাইরেক্টরি থেকে দেখা যাচ্ছে, পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রিটের পশ্চিমাংশ এবং এই দুই রাস্তার মাঝে আপার চিৎপুর রোডের যে অংশটি পড়ে সেটি ছিল কাঁসার জিনিস-পত্রের দোকানে ভর্তি। পল্লীটির নামও তাই 'কাঁসারিপটি' ছিল।[৭৫]

৮৩. কাঁসারিপটি-২—একই ডাইরেক্টরি থেকে দেখা যাচ্ছে, ১ থেকে ১১ নম্বর ক্রস স্ট্রিট পর্যন্ত সব ক'টি বাড়িতেই ছিল কাঁসারিদের দোকান। তাই এই পল্লীটিরও নাম ছিল কাঁসারিপটি।

৮৪. কাঁসারিপটি-৩—ঐ ডাইরেক্টরিরই বয়ান অনুসারে, মনোহর দাসের চকের একাংশ পরিচিত ছিল 'কাঁসারিপটি' নামে।

৮৫. কাঁসারিপাড়া-১—বর্তমান সীতানাথ রোডের (ওয়ার্ড ২৫) সাবেক নাম ছিল কাঁসারিপাড়া লেন,[৭৬] সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চল কাঁসারিপাড়া নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের 'সং' বিখ্যাত ছিল।[৭৭]

৮৬. কাঁসারিপাড়া-২—এখনও ৭১ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে কাঁসারিপাড়া রোড ও লেন।

৮৭. কিসমৎ শরহরপুর—টালির নালা, ময়ারপুর ও শাহপুরের মধ্যবর্তী অঞ্চল।[৭৮]

৮৮. কুচনান—পঞ্চান্নগ্রামের একটি গ্রাম 'কুচনান' ছিল ডিহি শুঁড়ার অন্তর্ভুক্ত।[৭৯] মানিকতলা মেন রোড, নারকেলডাঙা মেন রোড, নিউ ক্যানাল ও কাঁকুড়গাছি —এই চৌহদ্দির মধ্যবর্তী অঞ্চল হল কুচনান।[৮০]

৮৯. কুণ্ডুবাগান—কে. জি. বসু সরণির পশ্চিমে, চড়কডাঙা রোডের পূর্বে, রাখাল ঘোষ লেনের দক্ষিণে ও মিঞাবাগান বস্তির উত্তরে অবস্থিত অঞ্চল।

৯০. কুমেদানবাগান-১—এখনও ৬২ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে কুমেদানবাগান লেন।

৯১. কুমেদানবাগান-২—বর্তমান ডেন্ট মিশন রোডের (ওয়ার্ড ৭৭) আদিনাম কুমেদানবাগান লেন।[৮১]

৯২. কুমোরটুলি—মৃৎশিল্পের জন্য বিখ্যাত এই পল্লীর নামে রয়েছে স্ট্রিট ও স্কোয়ার (ওয়ার্ড ৮, ৯)।

৯৩. কুমোরপাড়া-১—৯১ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে 'কুমোরপাড়া লেন'।

৯৪. কুমোরপাড়া-২—সারকুলার রোডের পূর্বধারে, শিয়ালদার উত্তরবর্তী অঞ্চল।[৮২]

৯৫. কুলিয়া—পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্গত এই গ্রাম তথা ডিহির[৮৩] স্মৃতি বেঁচে রয়েছে ইস্ট কুলিয়া রোড (ওয়ার্ড ৩৪) ও কুলিয়া-ট্যাংরা ফার্স্ট এবং সেকেণ্ড লেনের (ওয়ার্ড ৫৭) মধ্যে।

৯৬. কুলিবাজার— কুলিবাজারের অবস্থিতি সম্বন্ধে ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দের গাইডবুকে রয়েছে, 'opposite Cooley Bazar gate Fort William.[৮৫] ডেশ্যামের মানচিত্রে গঙ্গা, আদিগঙ্গা ও ফোর্ট উইলিয়ামের মধ্যবর্তী ত্রিভুজাকৃতি অঞ্চল।

৯৭. কুষ্টিয়া—কুষ্টিয়া ছিল ডিহি শ্রীরামপুর তথা পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্গত।[৮৫] কুষ্টিয়া রোড ও কুষ্টিয়া মসজিদবাড়ি লেনের মধ্যে গ্রামটির নাম ধরা রয়েছে।

৯৮. কেওড়াতলা—আদিগঙ্গার তীরবর্তী এ অঞ্চলটি মহাশ্মশানের কল্যাণে সুবিখ্যাত।

৯৯. কেয়াতলা—৮৬ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে কেয়াতলা রোড।

১০০. কেরানীবাগান—বর্তমান গোলাপ শাস্ত্রী লেনের পূর্বনাম 'কেরানীবাগান ইস্ট লেন', আর রেফিউজ লেনের আদিনাম 'কেরানীবাগান নর্থ লেন'[৮৬]। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের পথপঞ্জী থেকে দেখা যাচ্ছে, কেরানীবাগানের অবস্থান ছিল বৌবাজার স্ট্রিটের দক্ষিণধারে, সেণ্ট জেমস স্ট্রিট ও হুজুরিমল লেনের মধ্যবর্তী অংশে (১০২-১০৫ বৌবাজার স্ট্রিট)। তখনই বাগানটি কুঁড়েঘর আর দোকানে ভরা বস্তিতে পরিণত।[৮৭]

১০১. কৈখালি (কৈকালিয়া)— কৈখালি ছিল পঞ্চান্নগ্রামের ডিহি মনোহরপুরের অন্তর্গত একটি গ্রাম।[৮৮] উত্তরে শিয়ালদা-বজবজ রেলপথ, দক্ষিণে প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, পশ্চিমে দেশপ্রাণ শাসমল রোড ও পূর্বে বরোজ রোড—এই হল মোটামুটি কৈখালি বা কৈকালিয়ার বর্তমান চৌহদ্দি।[৮৯]

১০২. কোম্পানিবাগান-১—বর্তমান রবীন্দ্র কানন। সন্নিহিত পল্লীর উপরেও এ নামটি আরোপিত হয়।

১০৩. কোম্পানিবাগান-২—গার্ডেন রিচের দেশজ নাম।

১০৪. খড়মপটি—পি. এম. বাকচির ডাইরেক্টরি অনুযায়ী পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিট ও আপার চিৎপুর রোডের সংযোগস্থলে, কাঁসারিপটির অব্যবহিত দক্ষিণে অবস্থিত।

১০৫. খ্যাংরাপটি—বর্তমান পুরুষোত্তম রায় স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৪২, ৪৫) সাবেক নাম।[৯০]

১০৬. খানপুর—৯৮ ও ১০০ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে খানপুর রোড।

১০৭. খালাসিটোলা-১—৭৫ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে খালাসিটোলা রোড।

১০৮. খালাসিটোলা-২—বর্তমান সেণ্ট জর্জ টেরাসের (ওয়ার্ড ৭৫) পূর্বনাম খালাসিটোলা রোড।[৯১]

১০৯. খালাসিটোলা-৩—বর্তমান এস. এন. ব্যানার্জি রোড ও রফি আহমেদ কিদোয়াই রোডের সংযোগস্থল থেকে শুরু করে চারদিকে বিস্তৃত একটি অঞ্চল।[৯২]

১১০. খালাসিপাড়া—মুন্সি সদরুদ্দিন স্ট্রিট ও সংলগ্ন এলাকা।[৯৩]

১১১. খিদিরপুর—৬৩ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে খিদিরপুর রোড।

১১২. খেজুরতলা (খাজুরতলা)—জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত একটি গলির নাম ছিল খেজুরতলার গলি।[৯৪]

১১৩. খোদাগঞ্জ—৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে খোদাগঞ্জ রোড।

১১৪. খোড়ো পোস্তা—বাগবাজারে, খালের দক্ষিণধারে।[৯৫] দরমাহাটা স্ট্রিটে আর একটি খোড়ো পোস্তা ছিল।[৯৬]

১১৫. গঙ্গারাম বস্তি (গঙ্গারামবাগান)—১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে অঞ্চলটির নাম ছিল গঙ্গারাম বাগান, কিন্তু তখনই সেটি বস্তিতে পরিণত।[৯৭] ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে দেখা যাচ্ছে তার যৌক্তিক নামান্তর ঘটেছে, তখন সেটি গঙ্গারাম বস্তি।[৯৮] পরবর্তীকালেও এ নামটিই ব্যবহৃত হয়েছে।[৯৯] লোয়ার সারকুলার রোডের দক্ষিণ ধারে উলফৎ-বাগান ও চৌরঙ্গি রোডের মাঝে ছিল অঞ্চলটির অবস্থিতি।

১১৬. গণেশপুর—গণেশপুর ছিল বর্তমান মলঙ্গা অঞ্চলের অংশবিশেষ।[১০০]

১১৭. গড়পার (গড়পাড়)—২৮ নম্বর ওয়ার্ডে 'গড়পার রোড' এখনও রয়েছে।[১০১] ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে বেলগাছিয়া রোড, উল্টোডাঙা রোড, সারকুলার রোড ও সারকুলার ক্যানালের মধ্যবর্তী অঞ্চলের নামও গড়পার।

১১৮. গড়শা (গরচা)—গড়শা ছিল পঞ্চান্নগ্রাম তথা ডিহি চক্রবেড়ের অন্তর্ভুক্ত। গরচা রোড ও গরচা ফার্স্ট লেনের (ওয়ার্ড ৮৫, ৮৬) অস্তিত্ব এখনও রয়েছে।

১১৯. গড়িয়াহাট—রাসবিহারী অ্যাভেনিউ ও গড়িয়াহাট রোডের সংযোগস্থল ও সন্নিহিত এলাকা, সম্ভবত গড়িয়া অঞ্চলের হাট হিসাবেই একদিন গড়িয়াহাটের নামকরণ হয়েছিল, কিন্তু গড়িয়া আর গড়িয়াহাটের মাঝে আজ ঢের ফারাক।

১২০. গরানহাটা—১৮ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে গরানহাটা স্ট্রিট ও লেন।

১২১. গ্যাঁড়াতলা—চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ এই পল্লীর অনেকটাই গ্রাস করেছে। বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড-চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ের সংযোগস্থল ও সন্নিহিত এলাকা।[১০২]

১২২. গাঙ্গুলিপাড়া—৪ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে গাঙ্গুলিপাড়া লেন।

১২৩. গাঙ্গুলিবাগান—ডাঃ পঞ্চানন মিত্র লেনের (ওয়ার্ড ৩৪, ৩৫) উত্তরধারে ও রেললাইনের পূর্বদিকে অবস্থিত বেলেঘাটার একটি অঞ্চল। যাদবপুরেও একটি 'গাঙ্গুলিবাগান' অঞ্চল রয়েছে।

১২৪. গার্ডেন রিচ—গার্ডেন রিচ রোড (ওয়ার্ড ৭৫, ৭৬, ৮০) এখনও পল্লীনামটি বহন করছে।

১২৫. গুড়িপাড়া—গুড়িপাড়া রোড (ওয়ার্ড ৩৬, ৫৫, ৫৭) এখনও রয়েছে।

১২৬. গুড়ের মার পুকুর—গুড়ের মার পুকুর লেন এখন বিকৃত হয়ে 'গুড়িয়ামা লেন' (ওয়ার্ড ৪৭) হয়ে টিকে রয়েছে। রমানাথ দাস গুড়ের মার পুকুর ছাড়াও গুড়ের মার আড়ার কথাও উল্লেখ করেছেন।[১০৩] শকের মানচিত্রে অঞ্চলটি পরিষ্কার-ভাবে চিহ্নিত।

১২৭. গুপ্ত বৃন্দাবন—স্ট্যাহানের ও অন্যান্য মানচিত্রে পল্লীনাম হিসাবে চিহ্নিত।[১০৪]

মোটামুটিভাবে বি. টি. রোড, দমদম রোড, রেললাইন ও উত্তরপাড়ার দ্বারা বেষ্টিত।[১০৫] নামটির জন্ম সাতপুকুরের বাগানের পোশাকি নাম থেকে।

১২৮. গুলপাড়া—বর্তমান ওয়েভারলি লেনকে (ওয়ার্ড ৫০) পি. এম. বাকচির পূর্বোক্ত ডাইরেক্টরিতে 'গুলপাড়া গলি' বলা হয়েছে।

১২৯. গেলাসপটি—সোয়ালো লেনকে ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের পথপঞ্জীতে 'চীনাবাজার কা গেলাসপটি' বলা হয়েছে।[১০৬]

১৩০. গোপালনগর—গোপালনগর রোড (ওয়ার্ড ৭৪, ৮২) তো আজও রয়েছে।

১৩১. গোবরা—গোবরা ছিল পঞ্চান্নগ্রাম তথা ডিহি এণ্টালির অন্তর্ভুক্ত।[১০৭] ৫৯ নম্বর ওয়ার্ডে গোবরা রোড ও গোবরা গোরস্থান রোড অদ্যাপি বিদ্যমান।

১৩২. গোবিন্দপুর—এ গোবিন্দপুর সুতানুটি-কলকাতার সন্নিহিত গোবিন্দপুর নয়। বর্তমান যোধপুর পার্ক ও সন্নিহিত এলাকা জুড়ে এই গোবিন্দপুরের অবস্থান ছিল।[১০৮] ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে গোবিন্দপুর রোড।

১৩৩. গোয়াবাগান—১৬ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে গোয়াবাগান স্ট্রিট ও লেন।

১৩৪. গোয়ালটুলি-১—বর্তমান টার্ফ রোডের (ওয়ার্ড ৭১) পূর্বনাম গোয়ালটুলি রোড।[১০৯]

১৩৫. গোয়ালটুলি-২—বর্তমান গোপ লেনেরও (ওয়ার্ড ৫৪) আদিনাম গোয়ালটুলি রোড।[১১০]

১৩৬. গোয়ালটুলি-৩—৫২ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে গোয়ালটুলি লেন।

১৩৭. গোয়ালাপাড়া-১—বর্তমান অবিনাশ ঘোষ লেনের (ওয়ার্ড ১৬) পূর্বনাম গোয়ালাপাড়া লেন।[১১১]

১৩৮. গোয়ালাপাড়া-২—বর্তমান যামিনী কবিরাজ রো-র (ওয়ার্ড ১২) আদিনাম গোয়ালাপাড়া লেন।[১১২] হেশ্যামের মানচিত্রে সন্নিহিত একটি অঞ্চল 'গোয়ালা-পাড়া' নামে চিহ্নিত।

১৩৯. গোয়ালাপাড়া-৩—বর্তমান মধু রায় লেনের (ওয়ার্ড ২৫, ২৬) সাবেক নাম 'গোয়ালাপাড়া'।[১১৩]

১৪০. গোয়ালাপুকুর—রাধানাথ মল্লিক লেন কিছু দলিলপত্রে 'গোয়ালাপুকুর' নামে অভিহিত হয়েছে। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের পথপঞ্জীতে সংলগ্ন শ্রীগোপাল মল্লিক লেনকে বলা হয়েছে 'গোয়ালপাড়া'।[১১৪]

১৪১. গোরাগাছা—৭৯ ও ৮০ নম্বর ওয়ার্ডে আজও গোরাগাছা রোড রয়েছে।

১৪২. গোঁসাইপাড়া—গোঁসাইপাড়া লেন এখনও রয়েছে ৯ নম্বর ওয়ার্ডে।

১৪৩. গোঁসাইবস্তি (গোঁসাইবাগান)—১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে, লোয়ার সারকুলার রোডের দক্ষিণধারে, বর্তমান এস. এস. কে. এম. হাসপাতালের অব্যবহিত পূর্বে অবস্থিত ছিল গোঁসাইবাগান।[১১৫] তখনই সে বাগান জুড়ে কাঁচা ঘর আর দোকান। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে দেখা যাচ্ছে পল্লীটির উপযোগী নামান্তর ঘটেছে, 'গোঁসাইবাগান' তখন 'গোঁসাইবস্তি'।[১১৬] ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দেও সেই নামই বহাল ছিল।[১১৭]

১৪৪. গৌরীবেড় (গৌরীবেড়ে)—পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্গত গৌরীবেড় গ্রাম ছিল ডিহি উল্টোডাঙার এলাকাধীন।[১১৮] গৌরীবেড়ে লেনের (ওয়ার্ড ১২,১৫) মধ্যে মধ্যে নামটি আজও বেঁচে রয়েছে।

১৪৫. ঘুঘুডাঙা-১—পঞ্চান্নগ্রামের অন্যতম গ্রাম 'ঘুঘুডাঙা' ছিল ডিহি শ্রীরামপুরের অন্তর্ভুক্ত।[১১৯] বর্তমান ব্রাইট স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৬৪,৬৫) সাবেক নাম ঘুঘুডাঙা রোড, আর বর্তমান পাম অ্যাভেনিউয়ের (ওয়ার্ড ৬৫) আদিনাম ঘুঘুডাঙা লেন।[১২০] ব্রড স্ট্রিট মার্কেটের চলতি নাম ঘুঘুডাঙার বাজার।

১৪৬. ঘুঘুডাঙা-২—দমদম জংশন রেলস্টেশনের পূর্বনাম ছিল ঘুঘুডাঙা। এখনও একটি ডাকঘরের নাম ঘুঘুডাঙা (ওয়ার্ড ২)।

১৪৭. ঘোষবাগান—এখনও ৬ নম্বর ওয়ার্ডে আছে ঘোষবাগান লেন।

১৪৮. ঘোড়ামারাবাগান—সারকুলার গার্ডেন রিচ রোড, রমানাথ পাল রোড (বেরাপুকুর রোড), সত্য ডাক্তার রোডের (নলুয়াপাড়া রোডের) মধ্যবর্তী অঞ্চল।[১২১]

১৪৯. চক্রবর্তীপাড়া—বাগবাজার স্ট্রিট ও কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী স্ট্রিটের মোড়ে ছিল এই নামে একটি বস্তি।[১২২]

১৫০. চক্রবেড় (চক্রবেড়ে)—চক্রবেড় ছিল পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম তথা ডিহি।[১২৩] চক্রবেড়ে লেন, চক্রবেড়ে রোড নর্থ, চক্রবেড়ে রোড সাউথ (ওয়ার্ড ৬৯,৭০,৭২) সেই গ্রামের নামবাহী।

১৫১. চট পটি—পি. এম. বাকচির পূর্বোক্ত ডাইরেক্টরি থেকে দেখা যাচ্ছে, বর্তমান রামমোহন মল্লিক লেনের সাবেক চলতি নাম ছিল 'চট পটির গলি'।

১৫২. চড়কডাঙা-১—বর্তমান টাগোর কাসল স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ২৪) পূর্বনাম চড়কডাঙা স্ট্রিট।[১২৪]

১৫৩. চড়কডাঙা-২—বর্তমান কবি সুকান্ত সরণির (ওয়ার্ড ৩৫) পূর্বনাম চড়কডাঙা রোড।[১২৫]

১৫৪. চড়কডাঙা-৩—কালীঘাট রোড ও বর্তমান শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডের সংযোগস্থল ও সন্নিহিত অঞ্চল।[১২৬]

১৫৫. চণ্ডীতলা—৯৭ নম্বর ওয়ার্ডে আজও আছে চণ্ডীতলা লেন।

১৫৬. চাউলপটি-১—বর্তমান স্কুল রো-ব (ওয়ার্ড ৭১) সাবেক নাম চাউলপটি লেন। অদূরবর্তী সুহাসিনী গাঙ্গুলী সরণির (ওয়ার্ড ৭১, ৭৩) পূর্বনাম চাউলপটি রোড।[১২৭]

১৫৭. চাউলপটি-২—বেলেঘাটায় চাউলপটি রোড (ওয়ার্ড ৩৩, ৩৪, ৩৫) আজও রয়েছে।

১৫৮. চাঁদনীচক—চাঁদনীচক স্ট্রিট আজও বিরাজমান (ওয়ার্ড ৪৬, ৪৭)।

১৫৯. চাঁপাতলা—ডাঃ ললিত ব্যানার্জি সরণির (ওয়ার্ড ৪৪, ৪৭) আদিনাম চাঁপাতলা লেন, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৪৮) সাবেক নাম চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন,

চাঁপাতলা সেকেণ্ড বাই লেন এখন হয়ে গেছে ইডেন হসপিটাল লেন (ওয়ার্ড ৪৭)।[১২৮] শুধু চাঁপাতলাফার্স্টবাই লেন বহাল রয়েছে পূর্বনামে (ওয়ার্ড ৪৮)। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের পুরনো দেশজ নাম 'চাঁপাতলার গোলদিঘি'।[১২৯] গঙ্গাতীরে একটি 'চাঁপাতলার ঘাট' আছে বটে, তবে সেটি বোধহয় পল্লীনাম নয়।

১৬০. চারাবাগান—বেলেঘাটা মেন রোডের উত্তরধারে, আলোছায়া সিনেমা ও রাসমণি বাজারের মধ্যবর্তী অংশে, রাসবাগানের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।

১৬১. চালতাবাগান—২৭ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে চালতাবাগান লেন।

১৬২. চাষাধোবাপাড়া-১—গিরিশ পার্ক নর্থের (ওয়ার্ড ২৫) সাবেক নাম চাষাধোবা-পাড়া স্ট্রিট।[১৩০]

১৬৩. চাষাধোবাপাড়া-২—বর্তমান সারপেনটাইন লেন ও সুরি লেনের (ওয়ার্ড ৫০) মধ্যবর্তী অঞ্চল।[১৩১]

১৬৪. চাষাধোবাপাড়া-৩—১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের পথপঞ্জী থেকে জানা যাচ্ছে, গড়পারে তখন একটি 'চাষাধোবাপাড়া লেন' ছিল।[১৩২]

১৬৫. চাষাধোবাপাড়া-৪—রামকমল স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৭৬) পূর্বনাম চাষাধোবাপাড়া স্ট্রিট।[১৩৩]

১৬৬. চাষাবাগান—১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে এই নামে একটি বস্তি ছিল বেনিয়াপুকুর অঞ্চলে।[১৩৪]

১৬৭. চিংড়িঘাটা—৫৮ নম্বর ওয়ার্ডে আজও আছে চিংড়িঘাটা লেন।

১৬৮. চিংড়িহাটা—রামকৃষ্ণ নস্কর লেনের (ওয়ার্ড ৩৩) পূর্বনাম চিংড়িহাটা লেন।[১৩৫]

১৬৯. চিকনপাড়া—সৈয়দ ইসমাইল লেনের (ওয়ার্ড ৬৩) এটি সাবেক দেশজ নাম।[১৩৬]

১৭০. চিৎপুর—পঞ্চান্নগ্রামের একটি গ্রাম তথা ডিহি হল চিৎপুর।[১৩৭] রবীন্দ্র সরণি চিৎপুর নয়, চিৎপুর ঘাট লেন (ওয়ার্ড ৬) যেখানে, সেই অঞ্চলটি আদি চিৎপুর।

১৭১. চিনিপটি—রামকুমার রক্ষিত লেন (ওয়ার্ড ২২) ও সন্নিহিত অঞ্চল।

১৭২. চীনাপাড়া—ড্যামজেন লেনের (ওয়ার্ড ৪৩) দেশজ নাম।[১৩৮]

১৭৩. চীনাবাজার—ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রিট (ওয়ার্ড ৪৫) এখনও রয়েছে। আর নিউ চীনাবাজারের অবস্থান ছিল ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, লায়নস রেঞ্জ ও নেতাজি সুভাষ রোড—বর্তমানের এই ত্রিসীমানা জুড়ে।[১৩৯]

১৭৪. চুনাপুকুর—চুনাপুকুর লেন এখনও বিরাজ করছে ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডে।

১৭৫. চেতলা—চেতলাহাট রোড (ওয়ার্ড ৭৪, ৮২), চেতলা সেণ্ট্রাল রোড (ওয়ার্ড ৮২) ও চেতলা রোড (ওয়ার্ড ৮১, ৮২) এই পল্লীনামটি বহন করছে।

১৭৬. চোরবাগান—বর্তমান অমর বসু সরণির (ওয়ার্ড ২৫) পূর্বনাম চোরবাগান লেন।

১৭৭. চৌবাগা—পঞ্চান্নগ্রামের অন্যতম গ্রাম চৌবাগা ছিল ডিহি শ্রীরামপুরের অন্তর্ভুক্ত।[১৪০] এখন ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডের চৌবাগা রোড গ্রামটির কথা স্মরণ করায়।

১৭৮. চৌরঙ্গি—চৌরঙ্গি রোড (ওয়ার্ড ৬৩, ৭০, ৭১), চৌরঙ্গি লেন (ওয়ার্ড ৬৩) প্রভৃতি পথনামগুলির সঙ্গে এই পল্লীনামটি জড়িত রয়েছে।

১৭৯. ছানাপটি-১—বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট ও কলেজ স্ট্রিটের সংযোগস্থলের অদূরে।

১৮০. ছানাপটি-২—প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রিটের নতুনবাজার-সংলগ্ন অংশ, খ্যাংরাপটি/ঘাটা বাই লেন ও সংলগ্ন অঞ্চল (ওয়ার্ড ২৪)।

১৮১. ছুতোরপাড়া-১—বর্তমান বিদ্যাসাগর স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৩৮) আদিনাম ছুতোরপাড়া।[১৪১]

১৮২. ছুতোরপাড়া-২—বর্তমান হরিশ সিকদার পথের (ওয়ার্ড ৪০, ৪৮) সাবেক নাম ছুতোরপাড়া লেন।[১৪২]

১৮৩. ছুতোরপাড়া-৩—বর্তমান রামকানাই অধিকারী লেন (ওয়ার্ড ৪৮) ও সন্নিহিত এলাকা।[১৪৩]

১৮৪. জহুরাবাজার—৯১ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে জহুরাবাজার লেন।

১৮৫. জাননগর-১—এখনও ৬০-৬১ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে জাননগর রোড ও সেকেণ্ড লেন।

১৮৬. জাননগর-২—কেওড়াতলা সংলগ্ন ও আদিগঙ্গার তীরবর্তী একটি অঞ্চল

১৮৭. জানবাজার—বর্তমান এস. এন. ব্যানার্জি রোডের পূর্বনাম জানবাজার স্ট্রিট। রানী রাসমণি রোড ও এস. এন. ব্যানার্জি রোডের সংযোগস্থল ও সন্নিহিত অঞ্চল এই পল্লীনামে চিহ্নিত।

১৮৮. জাকুল—উত্তরে দক্ষিণ শেরেপুর ও দক্ষিণে সোনাডাঙার মধ্যবর্তী নাতিবৃহৎ অঞ্চল।[১৪৪]

১৮৯. জিরাট—জিরাট গ্রামের বুকে আজ বিরাজ করছে আলিপুর চিড়িয়াখানা। অদূরবর্তী আদিগঙ্গার উপরের সেতুটি শুধু সেই গ্রামটির নাম আজও বহন করছে।

১৯০. জেলেটোলা—বর্তমান সুধীর চ্যাটার্জি স্ট্রিটের পূর্বনাম জেলেটোলা স্ট্রিট।[১৪৫]

১৯১. জেলেপাড়া-১—এখনও ৫১ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে জেলেপাড়া লেন।

১৯২. জেলেপাড়া-২—স্কট লেন-উইলিয়ামস লেন (ওয়ার্ড ৪৯) অঞ্চলও জেলেপাড়া নামে পরিচিত।

১৯৩. জেলেপাড়া ৩—বর্তমান গিরিশ মুখার্জি রোডের (ওয়ার্ড ৭২) পূর্বনাম জেলেপাড়া রোড।[১৪৬]

১৯৪. জেলেপাড়া-৪—পঞ্চানন মিত্র লেন ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোডের সংযোগস্থলের দক্ষিণ-পশ্চিমে।

১৯৫. জোড়াগির্জা—সেন্ট জেমস চার্চের কল্যাণে এই পল্লীনামটির জন্ম। বহুদিন

আগে থেকেই যে এ নামটি পল্লীনাম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার প্রমাণ প্রিন্স দ্বারকানাথের কনিষ্ঠা পুত্রবধূ ঠাকুর-পরিবারে 'জোড়াগির্জের দিদিমা' নামে অভিহিত হতেন। বলা বাহুল্য, তিনি থাকতেন গির্জাটির অদূরে। নামটি মোটামুটিভাবে হরেকৃষ্ণ কোঙার সরণি ও লোয়ার সারকুলার রোডের সংযোগ-স্থলসহ সন্নিহিত এলাকার উপর আরোপিত।

১৯৬. জোড়াতলাও—বর্তমান মার্কুইস স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৫২) পূর্বনাম জোড়াতলাও স্ট্রিট।[১৪৭]

১৯৭. জোড়াপুকুর—জোড়াপুকুর লেন ও জোড়াপুকুর স্কোয়ার লেন (ওয়ার্ড ২৫, ২৬) আজও রয়েছে।

১৯৮. জোড়াবাগান-১—এখনও ২১ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে জোড়াবাগান স্ট্রিট।

১৯৯. জোড়াবাগান-২—জোড়াবাগান রোডের (ওয়ার্ড ৯৯) অবস্থান শহরের দক্ষিণ প্রান্তে

২০০. জোড়াশিববাগান—জোড়াশিববাগান লেনের অবস্থান ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে।

২০১. জোড়াসাঁকো—বর্তমান বিবেকানন্দ রোড-রবীন্দ্র সরণি সংযোগস্থল ও সংলগ্ন অঞ্চল।

২০২. জোলাপাড়া—বর্তমান মারাঠা ডিচ লেন ও মহাত্মা শিশিরকুমার সরণির (গ্যালিফ স্ট্রিটের) মধ্যবর্তী অঞ্চল।[১৪৮]

২০৩. ঝাউতলা—৬৫ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে ঝাউতলা লেন।

২০৪. ঝামাপুকুর—৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে ঝামাপুকুর লেন।

২০৫. ট্যাংরা—পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্গত ট্যাংরা গ্রাম ছিল ডিহি এণ্টালির এলাকাধীন।[১৪৯] ট্যাংরা ফার্স্ট লেন, সেকেণ্ড লেন (ওয়ার্ড ৫৮), ট্যাংরা রোড সাউথ (ওয়ার্ড ৬৬) প্রভৃতি পথনামগুলি গ্রামটির স্মৃতি রক্ষা করছে।

২০৬. টালা—টালা গ্রাম ছিল পঞ্চান্নগ্রাম তথা ডিহি চিৎপুরের অন্তর্ভুক্ত।[১৫০] জলের ট্যাঙ্কের কল্যাণে পল্লীনামটি সুপরিচিত। বর্তমান তারাশঙ্কর সরণির (ওয়ার্ড ৫) পূর্বনাম টালা পার্ক অ্যাভেনিউ।[১৫১]

২০৭. টালিগঞ্জ—টালিগঞ্জ রোড, সারকুলার রোড (টালিগঞ্জ) (ওয়ার্ড ৮১, ৮৩, ৮৮) প্রভৃতি পথনাম ধরে রেখেছে পল্লীনামটিকে।

২০৮. টিকটিকির বাজার—কেশব সেন স্ট্রিটের দক্ষিণধারে, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট ও রাজা রামমোহন সরণির মধ্যবর্তী অঞ্চল। নামান্তর 'পোড়াবাজার'।[১৫২]

২০৯. টিকিয়াপাড়া (টিকেপাড়া)—বর্তমান আমহার্স্ট রো ও সন্নিহিত এলাকা।[১৫৩]

২১০. টিকেপটি—বর্তমান রমেশ দত্ত স্ট্রিটের একাংশ।[১৫৪]

২১১. টিরেট্টাবাজার (টেরিটিবাজার)—৪৩ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে এই পল্লীনামবাহী লেন ও স্ট্রিট।

২১২. টেরিপটি—পি. এম. বাকচির পূর্বোক্ত ডাইরেক্টরির মতে পগেয়াপটির নামান্তর।

২১৩. ঠনঠনিয়া—বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট-বিধান সরণির সংযোগস্থল ও সংলগ্ন অঞ্চল। কালীমন্দিরের কল্যাণে পল্লীনামটি বিখ্যাত।

২১৪. ডানকান বস্তি—ক্যামাক স্ট্রিটের দেশজ নাম ছিল 'ডানকান বস্তি কা রাস্তা'।[১৫৫] অনুমিত হয়, এ রাস্তারই একাংশে পল্লীটি অবস্থিত ছিল।

২১৫. ডালপটি (ডাউলপটি)—পি. এম. বাকচির প্রাগুক্ত ডাইরেক্টরি থেকে দেখা যায়, ১৩৬ থেকে ১৬৭ নম্বর মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের মধ্যে এই 'পটি'-র অবস্থিতি ছিল।

২১৬. ডালিমতলা—ডালিমতলা লেন (ওয়ার্ড ১১, ১৬) এখনও রয়েছে।

২১৭. ডিঙাভাঙা—ক্রীক রো ও রাজকুমার বসু লেনের (ওয়ার্ড ৫১) পূর্বনাম ডিঙাভাঙা লেন।[১৫৬] এ. কে. রায়ের মতে, ডিঙাভাঙার নামান্তর 'জলা কলিঙ্গা'।[১৫৭]

২১৮. ডুগডুগিপাড়া—বর্তমান গোরাচাঁদ লেনের (ওয়ার্ড ৬০) পূর্বনাম ডুগডুগিপাড়া লেন।[১৫৮]

২১৯. ডোমটোলা (ডোমটুলি)—এজরা স্ট্রিটের দেশজ নাম ছিল 'ডোমটুলি কা রাস্তা'।[১৫৯] পোশাকি নাম ছিল ডোমটোলা স্ট্রিট।[১৬০]

২২০. ডোমপাড়া-১—বর্তমান মহেন্দ্র গোস্বামী লেনের (ওয়ার্ড ২৬) সাবেক নাম।[১৬১]

২২১. ডোমপাড়া-২—রমেশ দত্ত স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ২৬) পূর্ব অংশ ডোমপাড়া নামে পরিচিত।

২২২. ডোমপাড়া-৩—বর্তমান গিরিশ পার্কের সামনে একটি ডোমপাড়া ছিল, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ সেটিকে ধূলিসাৎ করেছে।[১৬২]

২২৩. ঢাকাপটি—পি. এম. বাকচির পূর্বোল্লিখিত ডাইরেক্টরি অনুযায়ী শিবু ঠাকুর লেন, শিবতলা স্ট্রিট ও সন্নিহিত এলাকা।

২২৪. ঢাকুরিয়া—রেলস্টেশন ও একাধিক পথনামের (ওয়ার্ড ৯২) মাধ্যমে সুপরিচিত।

২২৫. ঢুলিপাড়া—রামচাঁদ ঘোষ লেন (ওয়ার্ড ১৮) ও সন্নিহিত অঞ্চল।[১৬৩]

২২৬. তনুপুকুর—৯২ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে তনুপুকুর রোড।

২২৭. তপসিয়া পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্গত গ্রাম ও ডিহি।[১৬৪] তপসিয়া রোড নর্থ ও তপসিয়া রোড সাউথ (ওয়ার্ড ৫৮, ৫৯, ৬৫, ৬৬) গ্রামটির নামবাহী।

২২৮. তরফদারপুকুর—বর্তমান গণেশ সরকার লেনের (ওয়ার্ড ৭৭) পূর্বনাম তরফদার ট্যাঙ্ক ফার্স্ট লেন। পার্শ্ববর্তী হরিসভা স্ট্রিটের আদিনাম তরফদার ট্যাঙ্ক সেকেণ্ড লেন।[১৬৫]

২২৯. তাঁতিপাড়া—গোপীকৃষ্ণ পাল লেনের (ওয়ার্ড ২০) একাংশ।[১৬৬]

২৩০. তাঁতিবাগান—৫৪ ও ৬০ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে যথাক্রমে তাঁতিবাগান রোড ও লেন।

২৩১. তামাপটি—পি. এম. বাকচির পূর্বোক্ত ডাইরেক্টরি অনুযায়ী ৮৬ ও ৮৭ খ্যাংরাপটি স্ট্রিটের মাঝে ছিল 'তামাপটির গলি'।

২৩২. তারাতলা—৮০ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে তারাতলা রোড।

২৩৩. তালতলা—৫৩ ও ৬২ নম্বর ওয়ার্ডে এই পল্লীনামটি বহন করছে একাধিক রাস্তা। উড ও আপজনের মানচিত্রে অঞ্চলটিকে অভিহিত করা আছে 'তালপুকুর' নামে।

২৩৪. তালপুকুর—বর্তমান কে. জি. বসু সরণির (ওয়ার্ড ৩৫) পূর্বনাম তালপুকুর রোড।[১৬৭]

২৩৫. তালবাগান—৬৪ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে তালবাগান লেন।

২৩৬. তিলজলা—তিলজলা ছিল পঞ্চান্নগ্রাম তথা ডিহি তপাসয়ার অন্তর্ভুক্ত।[১৬৮] অনেকগুলি পথনামের সঙ্গে (ওয়ার্ড ৫৯, ৬৪-৬৬) তিলজলার নামটি জড়িত।

২৩৭. তুঁতবাগান—কবি সুকান্ত সরণিতে (ওয়ার্ড ৩৫) অবস্থিত উপেন্দ্রবাজারের অদূরবর্তী বস্তি অঞ্চল।

২৩৮. তুলাপটি[১৬৯] (তুলাহাটা)[১৭০] কটন স্ট্রিট (উৎকলমণি গোপবন্ধু সরণি) ও সান্নিহিত অঞ্চল।

২৩৯. তেলীপাড়া-১—আজও ১০ নম্বর ওয়ার্ডে তেলীপাড়া লেন রয়েছে।

২৪০. তেলীপাড়া-২—তেলীপাড়া রোড রয়েছে ৭১ নম্বর ওয়ার্ডে।

২৪১. তেলীপাড়া-৩—আর একটি তেলীপাড়া লেন আছে ৯২ নম্বর ওয়ার্ডে।

২৪২. তেলেঙ্গাবাগান—অধরচন্দ্র দাস লেন (ওয়ার্ড ১৩) ও সংলগ্ন এলাকা।

২৪৩. দক্ষিণদাঁড়ি—দক্ষিণদাঁড়ি ছিল পঞ্চান্নগ্রাম ও ডিহি বাগজোলার অন্তর্গত।[১৭১] গ্রামটির একাংশ আবার 'নিজ দক্ষিণদাঁড়ি' নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে অঞ্চলটি দক্ষিণ দমদম পুরসভার এলাকাধীন।

২৪৪. দক্ষিণ শেরেপুর—পশ্চিমে সোনাই, দক্ষিণে জাকল ও বলরামপুর, পূর্বে মোমিনপুর ও উত্তরে ভূকৈলাস-রাজারামপুর-বয়েডবেড়িয়া—এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী অঞ্চল।[১৭২]

২৪৫. দত্তপাড়া-১—এখনও ২০ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে দত্তপাড়া লেন।

২৪৬. দত্তপাড়া-২—নামান্তর বেনিয়াপাড়া। বর্তমান বালক দত্ত লেনের (ওয়ার্ড ৩৯) পূবনাম দত্তপাড়া লেন।[১৭৩]

২৪৭. দত্তবাগান-১—বেলগাছিয়া মিল্ক কলোনির উত্তরদিকের একটি অঞ্চল।

২৪৮. দত্তবাগান-২—১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে এণ্টালি নর্থ রোডে এই নামে একটি বস্তি ছিল।[১৭৪]

২৪৯. দত্তাবাদ—দত্তাবাদ ছিল পঞ্চান্নগ্রাম ও ডিহি শুঁড়ার অংশ।[১৭৫] মানিকতলা মেন রোড, নারকেলডাঙা মেন রোড ও নিউ ক্যানাল—এই হল দত্তাবাদের ত্রিসীমানা।[১৭৬]

২৫০. দপ্তরিপাড়া—পি. এম. বাকচির পূর্বোল্লিখিত ডাইরেক্টরি অনুসারে করিজ চার্চ

লেন (ডাঃ কার্তিক বসু স্ট্রিট), পাঁচু খানসামা লেন (ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জি রোড) ও সংলগ্ন অঞ্চল হল দপ্তরিপাড়া। এ রাস্তা দুটি সহ বৈঠকখানা রোডের সন্নিহিত এলাকা জুড়ে আজও বিরাজ করছে দপ্তরিপাড়া।

২৫১. দমদম—স্টেশন ও পথনামের কল্যাণে সুপরিচিত (ওয়ার্ড ২, ৩, ৪)।

২৫২. দমদমা—গার্ডেন রিচের দক্ষিণপ্রান্তের গঙ্গাতীরবর্তী একটি অঞ্চল।[১৭৭] গার্ডেন রিচ রোডের আগের নাম ছিল দমদম(া) রোড।[১৭৮]

২৫৩. দয়েপটি— গুপ্ত লেন ও রবীন্দ্র সরণির সংযোগস্থল ও সন্নিহিত অঞ্চল।[১৭৯]

২৫৪. দয়েহাটা-১—দিগম্বর জৈন টেম্পল রোডের (ওয়ার্ড ২২) পূর্বনাম দয়েহাটা স্ট্রিট।

২৫৫. দয়েহাটা-২—বিবি রোজিও লেনের (ওয়ার্ড ৪৭) ও সন্নিহিত এলাকার পুরনো নাম।[১৮০] বর্তমানে দয়েহাটা 'ছানাপটি'-তে রূপান্তরিত।

২৫৬. দরজিপাড়া—১৭ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে দরজিপাড়া বাই লেন।

২৫৭. দরমাহাটা—দরমাহাটা লেন, বাই লেন ও ফার্স্ট লেন আজও রয়েছে (ওয়ার্ড ২০, ২১)।

২৫৮. দাসপাড়া—কীর্তিবাস মুখার্জি রোডের (ওয়ার্ড ১৩) পূর্বনাম দাসপাড়া রোড।

২৫৯. দুর্গাপুর-১— ৭৪ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে দুর্গাপুর লেন।

২৬০. দুর্গাপুর-২—বাগমারি রোড ও উল্টাডিঙি মেন রোডের সংযোগস্থল ও সন্নিহিত অঞ্চল।

২৬১. দেওয়ানপাড়া—বর্তমান দেওয়ান লেন ও সন্নিহিত অঞ্চল। নামটি জানা যাচ্ছে পি. এম. বাকচির প্রাগুক্ত ডাইরেক্টরিতে প্রকাশিত 'চণ্ডেশ্বর তৈলের' বিজ্ঞাপন থেকে।

২৬২. দৈবতলা—উড ও আপজনের মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে, বর্তমান শিবদাস ভাদুড়ী স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ১১) দক্ষিণে ও উল্টাডিঙি রোড এবং সারকুলার রোড সংযোগ-স্থলের পশ্চিমে এই অঞ্চলটির অবস্থিতি ছিল।

২৬৩. দৌলতপুর—বর্তমান ডুমেইন অ্যাভেনিউ (ওয়ার্ড ৮০) ও সংলগ্ন অঞ্চল।

২৬৪. ধরবাগান-১—বর্তমান জহরলাল দত্ত লেনের (ওয়ার্ড ১৩) পূর্বনাম 'ধরবাগান লেন'।[১৮১]

২৬৫. ধরবাগান-২—হারসি স্ট্রিট, গ্যাস স্ট্রিট ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের দ্বারা বেষ্টিত রাজাবাজার ট্রাম ডিপো সংলগ্ন অঞ্চল।

২৬৬. ধর্মতলা-১—যদিও ধর্মতলা স্ট্রিট আজ লেনিন সরণিতে পরিণত, তবু রাস্তাটির পশ্চিম অংশ ও সন্নিহিত অঞ্চল এখনও 'ধর্মতলা' নামেই সুপরিচিত।

২৬৭. ধর্মতলা-২ —এখনও ৬৭ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে ধর্মতলা রোড।

২৬৮. ধর্মতলা-৩—পুরসভার তালিকা অনুযায়ী ইসমাইল ম্যাডান লেনের পূর্বনাম ধর্মতলা লেন।[১৮২] কিন্তু কলকাতার পুরনো পথপঞ্জীগুলি পর পর সাজিয়ে নিলে বোঝা যায় যে. ধর্মতলা লেন আসলে জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৪৩, ৪৪)

পুরনো নাম। ইসমাইল ম্যাডান লেন শুরু হয়েছে জ্যাকেরিয়া স্ট্রিট থেকেই। গলিটির সম্ভাব্য পুরনো নাম হল ধর্মতলা সেকেণ্ড লেন।

২৬৯. ধর্মতলা-৪—১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে আহিরিটোলা ঘাটের উত্তরদিকে ছিল ধর্মতলা ঘাট।[১৮৩] সম্ভবত সন্নিহিত পল্লীটির নাম ছিল ধর্মতলা।

২৭০. ধলন্দ—বর্তমান রেস কোর্স ও সংলগ্ন অঞ্চল। এখনও রেস কোর্সের অদূরে অবস্থিত পুলিশের 'দলন্দ হাউস' গ্রামটির স্মৃতি বহন করছে।

পঞ্চান্নগ্রামের মধ্যেও 'ধলন্দ' নামে একটি গ্রাম ছিল। সেই 'ধলন্দ' কোথায়? অনেকেই উপরোক্ত 'ধলন্দ'-র সঙ্গে এ গ্রামটিকে অভিন্ন ভেবেছেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় ধলন্দ ছিল ডিহি শ্রীরামপুরের অন্তর্ভুক্ত এবং চৌবাগা-বন্দেল-বেদেডাঙা-কুষ্টিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত।[১৮৪] বর্তমানে 'ধলেন্দা' নামে পরিচিত অঞ্চলটি কিছুদিন আগেও ছিল যাদবপুর থানার (জে. এল. নম্বর ৮) এলাকাধীন। বর্তমানে এটি কসবা থানার অন্তর্ভুক্ত।

আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার। প্রথম ধলন্দ-র অদূরে ছিল 'বির্জি' নামে পরিচিত একটি অঞ্চল। এই ধলেন্দা-র অদূরেও রয়েছে 'বৃজি' নামে একটি এলাকা। যতদিন না নামগুলির অর্থ অনুধাবন করা যাচ্ছে, ততদিন এ রহস্য সমাধান করা সম্ভব নয়।

২৭১. ধাঙড়পাড়া—বর্তমান মুফিদুল ইসলাম লেনের (ওয়ার্ড ৫৪, ৬০) পূর্বনাম ধাঙড়পাড়া লেন।[১৮৫]

২৭২. ধাঙড়বাজার—বর্তমান পার্ক সার্কাস মার্কেট ও সন্নিহিত এলাকা।

২৭৩. ধানীবাগান (ধনেবাগান, ধনুবাগান)—বর্তমান ললিত মিত্র লেনের (ওয়ার্ড ১২) পূর্বনাম ধনিয়াবাগান বা ধনেবাগান রোড (লেন)।[১৮৬] বিভিন্ন মানচিত্র ও পথপঞ্জীতে নামটি বিভিন্ন নামে উপস্থাপিত হয়েছে, যেমন রমানাথ দাস বলেছেন 'ধানীবাগান'।[১৮৭]

২৭৪. ধাপা—জঞ্জাল ফেলার জায়গা হিসাবে সুপরিচিত। তাছাড়া ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে ধাপা রোড।

২৭৫. ধুকুড়িয়াবাগান—বর্তমান অমিয় হাজরা লেনের (ওয়ার্ড ৫২) আদিনাম ধুকুড়িয়াবাগান লেন।[১৮৮]

২৭৬. ধোবাপাড়া-১—বর্তমান প্রাণনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৬৯, ৭২) পূর্বনাম ধোবাপাড়া লেন।[১৮৯]

২৭৭. ধোবাপাড়া-২—বর্তমান কাউয়ি লেনের (ওয়ার্ড ৬৩) পুরনো নাম ধোবাপাড়া স্ট্রিট।[১৯০]

২৭৮. ধোবাপাড়া-৩—বেলেঘাটা মেন রোড ও কে. জি. বসু সরণির সংযোগস্থল ও সন্নিহিত অঞ্চল।

২৭৯. ধোবাপাড়া-৪—১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে গঙ্গাতীরে চাঁপাতলা ঘাটের উত্তরে ছিল ধোবাপাড়া ঘাট।[১৯১]

২৮০. ধোবাপুকুর-১—বর্তমান রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ২২, ২৩) একাংশ।[১৯২]

২৮১. ধোবাপুকুর-১—বর্তমান নতুনবাজারের পশ্চিমদিকের পল্লী। বাস্তবিকভাবে উনিশ শতকের গোড়ায় এখানে ঐ নামে একটি প্রকাণ্ড পুকুর ছিল।[১৯৩]

২৮২. নকুলেশ্বরতলা—৮৩ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে দক্ষিণাকালীর ভৈরব নকুলেশ্বরের মন্দির ও নকুলেশ্বরতলা লেন।

২৮৩. নতুন পোস্তা—পি. এম. বাকচির পূর্বোল্লিখিত ডাইরেক্টরিতে দেখা যাচ্ছে ১৯৯ ও ২০২ দরমাহাটা স্ট্রিটের মাঝে নতুন পোস্তা।

২৮৪. নন্দনবাগান—১৫ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে নন্দনবাগান স্ট্রিট।

২৮৫. নবাবপটি—৬ নম্বর ওয়ার্ডে আছে নবাবপটি স্ট্রিট।

২৮৬. নবাববাগান—বেলেঘাটা মেন রোডের দক্ষিণধারে সরকার বাজারের বিপরীতবর্তী অঞ্চল।

২৮৭. নলপুকুর—৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে নলপুকুর লেন।

২৮৮. নস্করপাড়া— ৯২ নম্বর ওয়ার্ডে নস্করপাড়া লেন আছে।

২৮৯. ন্যাড়াগির্জা—বিদ্যমান সেণ্ট জেমস চার্চ যেমন 'জোড়াগির্জা' পল্লীনামটির জন্মদাতা, তেমনি বিলুপ্ত সেণ্ট জেমস চার্চ 'ন্যাড়াগির্জা' পল্লীনাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে সুবর্ণবণিক হিতসাধনী সভার তালিকায়,[১৯৪] সাময়িকপত্রে,[১৯৫] বংশ পরিচয়ে।[১৯৬]

২৯০. নাকতলা—১০০ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে নাকতলা রোড।

২৯১. নাথের বাগান—১৯ নম্বর ওয়ার্ডে আছে এই নামবাহী লেন ও স্ট্রিট।

২৯২. নাপতেহাটা—প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ২১, ২৪) সাবেক নাম নাপতেহাটা।[১৯৭]

২৯৩. নাপিতবাগান—ইস্ট কুলিয়া রোড ও কালীতারা বসু লেনের মাঝে বারোয়ারিতলা রোডের যে অংশটি পড়ছে, সেই অংশের দক্ষিণধারে। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের পথপঞ্জী অনুযায়ী ১২৬ বৌবাজার স্ট্রিটে একটি 'নাপিতবাগান' ছিল, তবে সেটি বোধহয় পল্লীনাম নয়।[১৯৮]

২৯৪. নাপিতবাজার (নাপিতের বাজার)—বর্তমান লেনিন সরণি, এস. এন. ব্যানার্জি রোড ও আচার্য জগদীশ বসু রোডের মধ্যবর্তী একটি অঞ্চল।

২৯৫. নারকেলডাঙা—নারকেলডাঙা ছিল পঞ্চান্নগ্রাম তথা ডিহি সিমলার অন্তর্গত।[১৯৯] নারকেলডাঙা নর্থ রোড (ওয়ার্ড ২৯, ৩০) গ্রামটির স্মৃতিবাহী।

২৯৬. নারকেলবাগান-১—বর্তমান ডাঃ জগবন্ধু বসু সরণির (ওয়ার্ড ২৮) পূর্বনাম নারকেলবাগান লেন।[২০০]

২৯৭. নারকেলবাগান-২—বর্তমান গণেশ সরকার লেন (ওয়ার্ড ৭৭) ও সন্নিহিত অঞ্চল।[২০১]

২৯৮. নারকেলবাগান-৩—১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের পঞ্চপঞ্জী অনুসারে বর্তমান টিভোলি পার্ক ও সংলগ্ন অঞ্চলে ছিল নারকেলবাগান বস্তি।

২৯৯. নিকারিপাড়া-১—দেশপ্রাণ শাসমল রোডের পশ্চিমধারে, 'ভবানী' সিনেমার দক্ষিণের একটি অঞ্চল।

৩০০. নিকারিপাড়া-২—পশ্চিমে গঙ্গা, পূর্বে কাশীপুর রোড, উত্তরে গান ফাউণ্ড্রি রোড ও দক্ষিণে টার্নার রোড—এই চৌহদ্দির মধ্যবর্তী এলাকা।[২০২]

৩০১. নিকারিপাড়া-৩—বাগবাজার অঞ্চলেও একটি নিকারিপাড়া ছিল।[২০৩]

৩০২. নিকাশিপাড়া—বর্তমান যতীন মিত্র লেন ও বিপিন মিত্র লেনের (ওয়ার্ড ১২) পূর্বনাম নিকাশিপাড়া লেন।[২০৪]

৩০৩. নিজগ্রাম—নিজগ্রাম ছিল পঞ্চান্নগ্রাম ও ডিহি ভবানীপুরের এলাকাধীন।[২০৫] উত্তরে কাঁসারিপাড়া, পশ্চিমে টালির নালা, দক্ষিণে বলরাম বসু ঘাট রোড ও পূর্বে বর্তমান আশুতোষ মুখার্জি রোড মোটামুটি এই ছিল নিজগ্রামের চৌহদ্দি।[২০৬]

৩০৪. নিমকপোতা (নিমকপোক্তান)—পঞ্চান্নগ্রামের তালিকায় ডিহি এন্টালির অন্তর্গত এই গ্রামটি Neemuckpoeta নামে অভিহিত হয়েছে।[২০৭] কিন্তু মানচিত্রে গ্রামটির নাম পাওয়া গেছে নিমকপোক্তান, বর্তমান নামও তাই। কসবা থানার এলাকাধীন এই গ্রামটি কয়েক বছর আগেও ছিল যাদবপুর থানার এলাকাভুক্ত (জে. এল. নম্বর ১)। অঞ্চলটি পাগলাডাঙা ও ধাপার মধ্যবর্তী।

৩০৫. নিমতলা-১—নিমতলা ঘাট স্ট্রিট, নিমতলা লেন ও মহাশ্মশান নামটি বহন করছে।

৩০৬. নিমতলা-২—বর্তমান গগন সরকার রোডের (ওয়ার্ড ৩৩, ৩৪) পূর্বনাম নিমতলা রোড।[২০৮]

৩০৭. নিয়োগীপুকুর—৫৩ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে নিয়োগীপুকুর বাই লেন।

৩০৮. নুনগোলা—গোকুল মিত্রের ঘাট এবং গঙ্গাতীরবর্তী সন্নিহিত অঞ্চল।[২০৯]

৩০৯. নুনপটি—বড়বাজারের শাহ জুম্মা পীরের দরগার উত্তরবর্তী এলাকা।

৩১০. নেবুতলা-১—বর্তমান শশিভূষণ দে স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৪৮, ৫০, ৫১) পূর্বনাম নেবুতলা লেন।[২১০]

৩১১. নেবুতলা-২—বর্তমান পোলক স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৪৫) সাবেক নাম নেবুতলা-কা-রাস্তা।[২১১]

৩১২. নেবুবাগান—৭ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে নেবুবাগান লেন ও বাই লেন।

৩১৩. নেহারিটোলা[২১২] (নিহারিটোলা,[২১৩] নাহারিটোলা[২১৪])—কটন স্ট্রিট, আরমেনিয়ান স্ট্রিট, মল্লিক স্ট্রিট ও সিন্দূরিয়াপটির দ্বারা আবদ্ধ অঞ্চল।

৩১৪. নোঙরপটি—পি. এম. বাকচির পূর্বোক্ত ডাইরেক্টরি অনুসারে ৮০ ও ৮০/১ ক্লাইভ স্ট্রিটের ফাঁকে ছিল নোঙরপটির গলি।

৩১৫. নোনাডাঙা—পঞ্চান্নগ্রাম ও ডিহি শ্রীরামপুরের অন্তর্ভুক্ত এ গ্রামটি[২১৫] অদূর অতীতে ছিল যাদবপুর থানার অন্তর্গত (জে. এল. নম্বর ১০)। চৌবাগা ও লস্করহাটের মাঝে তার অবস্থিতি।

৩১৬. নোনাপুকুর—বিজলী রোডের (ওয়ার্ড ৬১) পূর্বনাম নোনাপুকুর রোড।[২১৬] ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের পথপঞ্জীতে দেখা যাচ্ছে, তখনই পুকুরটি ভরাট হয়ে বস্তিতে পরিণত।[২১৭]

৩১৭. নোয়াবাদ—পঞ্চান্নগ্রাম ও ডিহি বাগজোলার অন্তর্গত নোয়াবাদ গ্রামের অবস্থিতি ছিল দক্ষিণদাঁড়ি ও উল্টোডাঙার পূর্বদিকে এবং কেষ্টপুরের পশ্চিমে।[২১৮]

৩১৮. নোলোপাড়া (নলুয়াপাড়া)—খিদিরপুরের নোলোপাড়া রোড এখন ষষ্ঠিতলা রোডে রূপান্তরিত।[২১৯]

৩১৯. পগেয়াপটি—বর্তমান বসন্তলাল মুরারকা রোডের (ওয়ার্ড ৪২) পূর্বনাম পগেয়াপটি স্ট্রিট।[২২০]

৩২০. পচাবাগান—বেলেঘাটা মেন রোডের দক্ষিণধারে, রোমান ক্যাথলিক সমাধি-ক্ষেত্রের পূর্বদিকে।

৩২১. পটলডাঙা—৩৭ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও পটলডাঙা স্ট্রিট রয়েছে।

৩২২. পটুয়াটোলা—৪০ নম্বর ওয়ার্ডে পটুয়াটোলা লেন এখনও আছে।

৩২৩. পঞ্চাননতলা-১—এখনও ২ নম্বর ওয়ার্ডে আছে পঞ্চাননতলা লেন।

৩২৪. পঞ্চাননতলা-২—আর একটি পঞ্চাননতলা লেন আছে ৫১ নম্বর ওয়ার্ডে।

৩২৫. পঞ্চাননতলা-৩—পঞ্চাননতলা রোড রয়েছে ৯০ নম্বর ওয়ার্ডে।

৩২৬. পণ্ডিতিয়া—এই পল্লীনামটি বহন করছে ৮৫ নম্বর ওয়ার্ডের একটি প্লেস, একটি রোড ও একটি টেরাস।

৩২৭. পদ্মপুকুর-১—বর্তমান দেব লেনের (ওয়ার্ড ৫৫) পূর্বনাম পদ্মপুকুর লেন।[২২১]

৩২৮. পদ্মপুকুর-২—এই পদ্মপুকুরের (ওয়ার্ড ৬৯, ৭০, ৭২) নামটি বহন করছে একটি রোড ও একটি লেন।

৩২৯. পদ্মপুকুর-৩—আর একটি পদ্মপুকুর রোড রয়েছে ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডে।

৩৩০. পদ্মপুকুর-৪—চতুর্থ পদ্মপুকুরের নামে ৭৬ নম্বর ওয়ার্ডে আছে ইস্ট লেন ও স্কোয়ার।

৩৩১. পবনের বাগান—রাজা নবকৃষ্ণ দেবের বাড়ির (শোভাবাজার রাজবাড়ি) পূর্ব দিকের অঞ্চলের সাবেক নাম।[২২২]

৩৩২. পরাণনগর—পরাণনগর ছিল পঞ্চান্নগ্রাম ও ডিহি শ্রীরামপুরের অন্তর্ভুক্ত।[২২৩] পূর্বে ঝাউতলা রোড, দক্ষিণে বালিগঞ্জ সারকুলার রোড ও বর্তমান গুরুসদয় রোড, পশ্চিমে আচার্য জগদীশ বসু রোড ও উত্তরে কড়েয়া অঞ্চল—এই ছিল মোটামুটি পরাণনগরের চৌহদ্দি।[২২৪]

৩৩৩. পাইকপাড়া—পঞ্চান্নগ্রামের অন্যতম গ্রাম পাইকপাড়া ছিল ডিহি সিঁথির

অন্তর্গত।[২২৫] পাইকপাড়া রো ও পাইকপাড়া রাজা মণীন্দ্র রোড (ওয়ার্ড ৩, ৪) সেই গ্রামনামটিকে জিইয়ে রেখেছে।

৩৩৪. পাকুড়তলা-১—বর্তমান চক্রবেড়িয়া রোড সাউথ (ওয়ার্ড ৭০, ৭২) ও সন্নিহিত অঞ্চল।

৩৩৫. পাকুড়তলা-২—গার্ডেন রিচের এ অঞ্চলটি ছিল উখড়া ও গঙ্গার মধ্যবর্তী।[২২৬]

৩৩৬. পাগলাডাঙা—পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্ভুক্ত পাগলাডাঙা ছিল ডিহি এণ্টালির এলাকাধীন।[২২৭] ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও আছে পাগলাডাঙা রোড, ফার্স্ট লেন ও সেকেণ্ড লেন।

৩৩৭. পাটোয়ারবাগান—৩৭ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে পাটোয়ারবাগান লেন।

৩৩৮. পাথরটোলা (পাথরতলা ?)—মট লেনের (বর্তমান ইণ্ডিয়ান মিরার স্ট্রিট ও মণিলাল সাহা লেন) সাবেক নাম ছিল 'Puthurtola'।[২২৮]

৩৩৯. পাথুরিয়াঘাটা—এখনও পল্লীনামটি বহন করছে তিনটি রাস্তা—স্ট্রিট, লেন ও বাই লেন (ওয়ার্ড ২১, ২৪)।

৩৪০. পানপোস্তা—পি. এম. বাকচির পূর্বোল্লিখিত ডাইরেক্টরি থেকে জানা যাচ্ছে, ২০৩ ও ২০৪ দরমাহাটা স্ট্রিটের মাঝে ছিল পানপোস্তার অবস্থিতি।

৩৪১. পানবাগান—৫৪ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে পানবাগান লেন।

৩৪২. পামারবাজার—পামারবাজার রোডের (ওয়ার্ড ৫৫, ৫৬, ৫৭) নাম এখনও অপরিবর্তিত আছে।

৩৪৩. পায়রাটোলা—বর্তমান গৌরদাস বসাক লেনের (ওয়ার্ড ২২) সাবেক নাম পায়রাটোলা স্ট্রিট।[২২৯]

৩৪৪. পারশিবাগান-১—এখনও ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে পারশিবাগান লেন।

৩৪৫. পারশিবাগান-২—বেলেঘাটা মেন রোড ও হেম নস্কর রোডের সংযোগস্থলের দক্ষিণে, 'টাওয়ার অফ সাইলেন্স' সংলগ্ন এলাকা।

৩৪৬. পাহাড়পুর—৮০ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে পাহাড়পুর সাইডিং রোড

৩৪৭. পিকনিক গার্ডেন—পিকনিক গার্ডেন রোডের (ওয়ার্ড ৬৫, ৬৬, ৬৭) কল্যাণে এ নামটি বিস্তৃত অঞ্চলের উপর প্রযুক্ত।

৩৪৮. পিপুলপটি—বর্তমান এলগিন লেনের (ওয়ার্ড ৭০) পূর্বনাম পিপুলপটি ব্রাঞ্চ লেন।[২৩০] বর্তমান রায় স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৭০) আগের নাম পিপুলপটি লেন।[২৩১]

৩৪৯. পেয়ারাবাগান-১—গোরাচাঁদ বসু রোডের (ওয়ার্ড ১৬) সাবেক নাম পেয়ারাবাগান স্ট্রিট।[২৩২]

৩৫০. পেয়ারাবাগান-২—বর্তমান লাভলক স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৬৯) পুরনো নাম পেয়ারাবাগান লেন।[২৩৩] এখনও অদূরবর্তী বালিগঞ্জ গভর্নমেণ্ট হাই স্কুল সংলগ্ন অঞ্চল ঐ নামে অভিহিত হয়।

৩৫১. পোটোপাড়া-১—এখনও ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে আছে পোটোপাড়া লেন।

৩৫২. পোটোপাড়া-২—কালীঘাটের এই পল্লীটি পটশিল্পীদের কল্যাণে সুবিখ্যাত।

৩৫৩. পোড়াবাজার-১—পোড়াবাজার লেন রয়েছে ৭০ নম্বর ওয়ার্ডে।

৩৫৪. পোড়াবাজার—টিকটিকির বাজারের নামান্তর (টিকটিকির বাজার দ্র.)।

৩৫৫. ফড়িয়াপাড়া—বর্তমান তারণকৃষ্ণ নস্কর লেনের (ওয়ার্ড ৩৩) পুরনো নাম ফড়িয়াপাড়া লেন।[২৩৪]

৩৫৬. ফড়িয়াপুকুর—বর্তমান শিবদাস ভাদুড়ী স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ১১) সাবেক নাম ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিট।

৩৫৭. ফতেপুর—সারকুলার গার্ডেন বিচ রোডের দক্ষিণধারে, রামনগর ও ইন্দ্রি-র মধ্যবর্তী অঞ্চল।[২৩৫]

৩৫৮. ফলপটি—বালমুকুন্দ মকর রোড. বর্মন স্ট্রিট (ওয়ার্ড ৪১) ও সন্নিহিত এলাকা।

৩৫৯. ফুলবাগান-১—মথুর সেন গার্ডেন লেন (ওয়ার্ড ২০) ও সন্নিহিত অঞ্চল।

৩৬০. ফুলবাগান-২—শুঁড়া ও কাঁকুড়গাছির মধ্যবর্তী এলাকা।

৩৬১. ফুলবাগান-৩—বর্তমান স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ রোডের (ওয়ার্ড ৫৪) পূর্বনাম ফুলবাগান রোড।[২৩৬]

৩৬২. ফুলবাগান-৪—কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের পশ্চিমধারে এবং মেছুয়াবাজার স্ট্রিটের উত্তরধারে অবস্থিত এলাকাটি আগে পরিচিত ছিল এই নামে।[২৩৭]

৩৬৩. ফুলবাগান-৫—রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ১০) পূর্ব অংশে অবস্থিত বস্তি অঞ্চল।

৩৬৪. বকুলতলা—৬৭ নম্বর ওয়ার্ডে বকুলতলা লেন আছে।

৩৬৫. বকুলবাগান—৭২ নম্বর ওয়ার্ডে আছে বকুলবাগান রো।

৩৬৬. বটতলা (বাঁধা বটতলা)—দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট ও রবীন্দ্র সরণির সংযোগস্থলের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত ছিল বটতলার পুকুর।[২৩৮] তার পাড়ে ছিল জোড়া বটগাছ।[২৩৯] তাই থেকে সংলগ্ন পল্লীর নাম হয়ে গিয়েছিল বটতলা। অঞ্চলটি বাংলা মুদ্রিত-সাহিত্যের শৈশব-ক্রীড়াঙ্গন।

৩৬৭. বড়তলা—বড়তলা স্ট্রিট (ওয়ার্ড ২২, ২৩, ৪২) পল্লীনামটিকে ধরে রেখেছে।

৩৬৮. বড়বাজার—মহাত্মা গান্ধী রোড ও স্ট্র্যাণ্ড রোডের সংযোগস্থলের উত্তর-পূবের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। বড়বাজারের বিভিন্ন উপবিভাগের (বিভিন্ন পটি) মধ্যে বেশ কয়েকটি আলাদাভাবে উল্লিখিত হল।

৩৬৯. বন্দেল—উলুবেড়িয়ার সঙ্গে যৌথভাবে বন্দেল ছিল পঞ্চান্নগ্রাম ও ডিহি শ্রীরামপুরের অন্তর্ভুক্ত।[২৪০] বন্দেল রোড (ওয়ার্ড ৬৫, ৬৮) গ্রামনামটির স্মৃতিবাহী।

৩৭০. বয়েড়বেড়িয়া (বৈঁচবেড়িয়া ?)—উত্তরে সারকুলার গার্ডেন রিচ রোড, পশ্চিমে সোনাই. দক্ষিণে দক্ষিণ-শেরেপুর ও পূবে রাজারামপুর—মোটামুটি এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী অঞ্চল।[২৪১]

৩৭১. বলদিয়াপাড়া—১৫ নম্বর ওয়ার্ডে আছে বলদিয়াপাড়া রোড।

৩৭২. বলরামপুর—মাঝেরহাট, সোনাডাঙা ও জাক্কলের মধ্যবর্তী এলাকা।[২৪২]

৩৭৩. বসাকদিঘি—বর্তমান মার্কাস স্কোয়ারের সাবেক নাম বসাকদিঘি স্কোয়ার, কেদার ব্যানার্জি লেনের (ওয়ার্ড ৩৯) পূর্বনাম বসাকদিঘি লেন।[২৪৩]

৩৭৪. বসাকবাগান—২৫ নম্বর ওয়ার্ডে আছে বসাকবাগান লেন।

৩৭৫. বসাকাবাদ—বর্তমান উল্টোডাঙা মেন রোডের পূর্ব প্রান্তে, লবণ হ্রদের ধারে ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে ছিল বসাকাবাদ।[২৪৪]

৩৭৬. ব্যানার্জিপাড়া—৯১ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে ব্যানার্জিপাড়া লেন।

৩৭৭. ব্যাপারিটোলা—ব্যাপারিটোলা লেন রয়েছে ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডে।

৩৭৮. বাগজোলা—যে পনেরোটি ডিহির অধীনস্থ ছিল পঞ্চান্নগ্রাম, তার মধ্যে অন্যতম ছিল ডিহি বাগজোলা।[২৪৫] বাগজোলার অধীনে ছিল তিনটি গ্রাম : দক্ষিণ-দাঁড়ি, কাঁকুড়িয়া ও নোয়াবাদ। কিন্তু বাগজোলা নামে কোনো স্বতন্ত্র গ্রাম ছিল না। সম্ভবত বাগজোলা তখন অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসাবে নিহিত ছিল এই তিনটি গ্রামের কোনো একটির মধ্যে। ইংরেজ শাসনকালে ও স্বাধীন ভারতে প্রশাসনিক কারণে বারবার মৌজা ও গ্রামের গঠন ভাঙাগড়া হয়েছে। কখনও একটি গ্রামকে ভেঙে একাধিক মৌজা সৃষ্ট হয়েছে, আবার কখনও বা একই মৌজার মধ্যে আত্মবিসর্জন দিয়েছে একাধিক গ্রাম। এই ধরনের ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়েই পরবর্তীকালে বাগজোলা একটি স্বতন্ত্র গ্রাম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে (থানা দমদম, জে. এল. নম্বর ২১)। বর্তমানে অঞ্চলটি দক্ষিণ দমদম পুরসভার অন্তর্ভুক্ত।

৩৭৯. বাগবাজার—বাগবাজার স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৭, ১০) নামটি এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে।

৩৮০. বাগমারি—বাগমারি ছিল পঞ্চান্নগ্রাম ও ডিহি উল্টোডাঙার অন্তর্ভুক্ত।[২৪৬] বাগমারি রোড (ওয়ার্ড ১৪, ৩২) ও লেন (ওয়ার্ড ৩২) এখনও আছে।

৩৮১. বাদামতলা-১—পার্ক স্ট্রিট, রয়েড স্ট্রিট (ওয়ার্ড ৬১, ৬৩) ও সন্নিহিত অঞ্চলের সাবেক নাম।[২৪৭]

৩৮২. বাদামতলা-২—শকের মানচিত্রে উড স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিট ও ক্যামাক স্ট্রিটের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল বাদামতলা নামে চিহ্নিত।

৩৮৩. বাদামতলা-৩—ভূকৈলাসের পশ্চিমদিকে, সারকুলার গার্ডেন রিচ রোড থেকে 'বাদামতলা রোড' নামে যে একটি রাস্তা ঢুকেছিল, ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের পথপঞ্জী থেকে সে বিষয়টি জানা যায়।[২৪৮]

৩৮৪. বাদুড়বাগান—৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে বাদুড়বাগান লেন।

৩৮৫. বাদে রায়পুর—৯৬ নম্বর ওয়ার্ডে আছে বাদে রায়পুর রোড।

৩৮৬. বাবুবাগান-১—৯২ নম্বর ওয়ার্ডে বাবুবাগান লেনের অবস্থিতি।

৩৮৭. বাবুবাগান-২—বেলেঘাটা মেন রোডের উত্তরে, চড়কডাঙা রোডের পূর্বে ও মিঞাবাগান বস্তির পশ্চিমে।

৩৮৮. বামুনডাঙা—১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের পথপঞ্জী থেকে দেখা যাচ্ছে, হরলাল মিত্র লেনে (বর্তমান উমাচরণ মিত্র লেন) এই নামে একটি বস্তি ছিল।[২৪৯]

৩৮৯. বামুনপাড়া-১—বামুনপাড়া লেনের অবস্থান ৬৫ নম্বর ওয়ার্ডে।

৩৯০. বামুনপাড়া-২—বকুলবাগান রোড, রমেশ মিত্র রোড ও গৌরমোহন ঘোষ রোড সন্নিহিত এলাকার সাবেক নাম।

৩৯১. বামুনবস্তি—শকের মানচিত্রে লোয়ার সারকুলার রোড, ক্যামাক স্ট্রিট, থিয়েটার রোড ও হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা এই নামে অভিহিত।

৩৯২. বামুনবাগান-১—পি. এম. বাকচির প্রাগুক্ত ডাইরেক্টরি অনুসারে, জানবাজার স্ট্রিটের (এস. এন. ব্যানার্জি রোড) দক্ষিণধারে, ধর্মঠাকুরের মন্দির সংলগ্ন অঞ্চল।

৩৯৩. বামুনবাগান-২—বেলেঘাটার গুরুদাস পার্কের পূর্বদিকে, সুরেন সরকার রোড ও অবিনাশ ব্যানার্জি রোডের সংযোগস্থল ও সংলগ্ন এলাকা।

৩৯৪. বারাসাত—বর্তমান ডেন্ট মিশন রোড (ওয়ার্ড ৭৭) ও সন্নিহিত এলাকাকে শকের মানচিত্রে বারাসাত নামে চিহ্নিত করা আছে।

৩৯৫. বারোয়ারিতলা-১—বারোয়ারিতলা লেন রয়েছে ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে।

৩৯৬. বারোয়ারিতলা-২—বারোয়ারিতলা রোড আছে ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে।

৩৯৭. বালাখানা—বর্তমান অন্নদাপ্রসাদ স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ১৭) একাংশের পূর্বনাম বালাখানা স্ট্রিট।[২৫০] নামটি পল্লীনাম হিসাবে ব্যবহৃত হতো।[২৫১]

৩৯৮. বালিগঞ্জ—পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্গত বালিগঞ্জ ছিল ডিহি চক্রবেড়ের এলাকাধীন।[২৫২] ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৬৯ ও ৯০ নম্বর ওয়ার্ডের বহু পথনাম গ্রামটির স্মৃতি বহন করছে।

৩৯৯. বাঁশতলা-১—বাঁশতলা গলি এখনও রয়েছে ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে।

৪০০. বাঁশতলা-২—ক্রুকেড লেন, ড্রেপার লেন (ওয়ার্ড ৪৬) ও সন্নিহিত এলাকার সাবেক নাম বাঁশতলা।[২৫৩]

৪০১. বাঁশতলা-৩—গোবরা রোডের (ওয়ার্ড ৫৯) পুরনো নাম বাঁশতলা লেন।[২৫৪]

৪০২. বাহির জেলেপাড়া—বেলেঘাটা মেন রোডের উত্তরধারে, ফড়িয়াপাড়ার উত্তরে ও খোদাগঞ্জের উত্তর-পূর্বে।[২৫৫]

৪০৩. বাহির মির্জাপুর—হরিনাথ দে রোডের (ওয়ার্ড ২৮) পূর্বনাম বাহির মির্জাপুর রোড।[২৫৬]

৪০৪. বাহির শিমলা—বাহির শিমলা ছিল পঞ্চান্নগ্রাম তথা ডিহি শিমলার অন্তর্ভুক্ত।[২৫৭] অঞ্চলটির অবস্থিতি নিয়ে নানা মুনির নানা মত। আপজনের মানচিত্রে বর্তমান রাজাবাজার-গড়পার অঞ্চলকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'Dhee Bahar Simlah' নামে। শকের মানচিত্রে অঞ্চলটি সরে গেছে বর্তমান নীরদবিহারী মল্লিক রোড ও বিবেকানন্দ রোডের মাঝে। হেস্টামের ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের মানচিত্রে আবার বাহির শিমলা চলে গেছে দক্ষিণে, বিবেকানন্দ

রোড ও নারকেলডাঙা মেন রোডের মধ্যে। মানিকতলা অঞ্চলে এখনও রয়েছে 'শিমলা রোড'।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমস্যাটি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। এবার আবার কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের পূর্বধারের একটি অঞ্চল বাহির শিমলা নামে অভিহিত হতে লাগল। অথচ যেহেতু বাহির শিমলা পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্ভুক্ত, তাই সেটি কোনোমতেই সারকুলার রোডের পশ্চিমদিকে মূল শহরের মধ্যে অবস্থিত হতে পারে না। তবু পত্রিকার পাতায় রঘুনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রিটকে বলা হল 'বাহির সীমুলিয়া'[২৫৮]। পি. এম. বাকচির পূর্বোল্লিখিত ডাইরেক্টরিতে মানিকতলা এলাকার ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন লেনকে যেমন 'বাহির শিমলা' বলা হয়েছে, তেমনি সেই একই নামে অভিহিত করা হয়েছে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, শিবনারায়ণ দাস লেনকেও। শেষোক্ত রাস্তার ১৯ নম্বর বাড়িতে তখন রয়েছে 'বাহির শিমলা ইনফ্যান্ট স্কুল'। কাজেই সত্যিই যে অঞ্চলটি বাহির শিমলা নামে পরিচিত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কি করে সারকুলার রোডের পূর্বদিকের একটি পল্লীনাম কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের উপর আরোপিত হয়ে গেল তা এক অদ্ভুত রহস্য।

৪০৫. **বাহির শুঁড়া**—সুরেন সরকার রোডের (ওয়ার্ড ৪৪) আদিনাম বাহির শুঁড়া রোড।

৪০৬. বিবিবাগান-১—বর্তমান গ্রোভ লেনের (ওয়ার্ড ৮৪) পূর্বনাম বিবিবাগান লেন।[২৫৯]

৪০৭. বিবিবাগান-২—একটি বিবিবাগান লেন এখনও রয়েছে ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডে।

৪০৮. বির্জিতলা—নেহরু মিউজিয়াম ও নন্দনের সংলগ্ন যে পুকুরটি আছে তার নাম 'বির্জি তালাও'।[২৬০] ডিহি বির্জি গ্রামের প্রধান পুকুর, সেই হিসাবেই এই নামকরণ। মিডলটন স্ট্রিট, থিয়েটার রোড ও লোয়ার সারকুলার রোডের মধ্যবর্তী অঞ্চল জুড়ে ছিল ডিহিটির বিস্তৃতি।[২৬১] আপজনের মানচিত্রে পল্লীটি পরিষ্কার দেখানো আছে।

৪০৯. বিশ্বাসপাড়া—৮৯ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে বিশ্বাসপাড়া লেন।

৪১০. বীরপাড়া—বীরপাড়া ছিল ডিহি চিৎপুর তথা পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্ভুক্ত।[২৬২] বীরপাড়া লেন (ওয়ার্ড ৩, ৪) গ্রামটির স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে।

৪১১. বৃন্দাবনবস্তি (বৃন্দাবনবাগান)—লোয়ার সারকুলার রোডের দক্ষিণধারে, বর্তমান ক্যালকাটা ক্লাব ও সন্নিহিত এলাকা জুড়ে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে অবস্থিত ছিল বৃন্দাবনবাগান।[২৬৩] তখনই বাগানটি বস্তিতে পরিণত। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের পথপঞ্জীতে অঞ্চলটি বৃন্দাবনবস্তি নামেই অভিহিত।[২৬৪]

৪১২. বেকবাগান (বেগবাগান)—বেকবাগান রো (ওয়ার্ড ৬৪, ৬৫, ৬৯) পল্লীনামটি বহন করছে।

৪১৩. বেদেডাঙা—বেদেডাঙা ছিল পঞ্চান্নগ্রামের ডিহি শ্রীরামপুরের অন্তর্গত।[২৬৫] ৬৭ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক পথনামের সঙ্গে পল্লীনামটি যুক্ত।

৪১৪. বেদেপাড়া—শকের মানচিত্র অনুযায়ী, লোয়ার সারকুলার রোডের দক্ষিণধারে, বর্তমান এস. এস. কে. এম. হাসপাতালের অব্যবহিত পূর্বে ছিল অঞ্চলটির অবস্থিতি।[২৬৬]

৪১৫. বেনেটোলা-১—বেনেটোলা (বেনিয়াটোলা) স্ট্রিট রয়েছে ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে।

৪১৬. বেনেটোলা-২—বেনেটোলা (বেনিয়াটোলা) লেন রয়েছে ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে।

৪১৭. বেনেপাড়া-১—জগদানন্দ মুখার্জি লেনের (ওয়ার্ড ৭২) পূর্বনাম বেনেপাড়া লেন।[২৬৭]

৪১৮. বেনেপাড়া-২—বালক দত্ত লেনের (ওয়ার্ড ৩৯) সাবেক নাম বেনেপাড়া লেন।[২৬৮]

৪১৯. বেনেপাড়া-৩—শকের মানচিত্র অনুসারে, খিদিরপুরের পদ্মপুকুর ও পাকুড়তলার মধ্যবর্তী পল্লী।

৪২০. বেনেপাড়া-৪—বেনেপাড়া লেন এখনও রয়েছে ৬০ নম্বর ওয়ার্ডে।

৪২১. বেনেপুকুর—কড়েয়াসহ বেনেপুকুর ছিল পঞ্চান্নগ্রাম তথা ডিহি তপসিয়ার অন্তর্ভুক্ত।[২৬৯] বেনেপুকুর (বেনিয়াপুকুর) লেন (ওয়ার্ড ৬০, ৬১) গ্রামটির স্মৃতিবাহী।

৪২২. বেরাপুকুর (বেড়াপুকুর)—রমানাথ পাল রোডের (ওয়ার্ড ৭৬) পূর্বনাম বেরাপুকুর রোড।[২৭০]

৪২৩. বেলগাছিয়া—বেলগাছিয়া ছিল পঞ্চান্নগ্রামের ডিহি দক্ষিণ পাইকপাড়ার এলাকাধীন।[২৭১] বেলগাছিয়া রোডের নতুন নামকরণ হয়েছে ক্ষুদিরাম বসু সরণি (ওয়ার্ড ৩, ৫)।[২৭২]

৪২৪. বেলতলা—পঞ্চান্নগ্রামের অন্যতম গ্রাম বেলতলা ছিল ডিহি মনোহরপুরের অন্তর্ভুক্ত।[২৭৩] নরেশ মিত্র সরণির পুরনো নাম বেলতলা রোড।[২৭৪]

৪২৫. বেলেঘাটা—বেলেঘাটা ছিল পঞ্চান্নগ্রাম তথা ডিহি শিয়ালদার অন্তর্গত।[২৭৫] বেলেঘাটা (বেলিয়াঘাটা) রোড (ওয়ার্ড ৩৬, ৫৭) গ্রামটির স্মৃতিবাহী।

৪২৬. বৈঠকখানা—বৈঠকখানা রোড ও বৈঠকখানা সেকেণ্ড লেন (ওয়ার্ড ৩৭, ৪৯) পল্লীনামটিকে জিইয়ে রেখেছে।

৪২৭. বৈদ্যপাড়া—গৌরসুন্দর শেঠ লেনের (ওয়ার্ড ২) সাবেক নাম।[২৭৬]

৪২৮. বৈষ্ণবঘাটা—১০০ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক পথনামের সঙ্গে পল্লীনামটি যুক্ত।

৪২৯. বৈষ্ণবপাড়া—বর্ধমান রোডের (ওয়ার্ড ৭৪) পুরনো নাম বৈষ্ণবপাড়া ফার্স্ট লেন।[২৭৭]

৪৩০. বোসপাড়া—মা সারদামণি সরণির (ওয়ার্ড ৭, ৮) আদিনাম বোসপাড়া লেন।[২৭৮]

৪৩১. বোসপুকুর—বোসপুকুর রোড (ওয়ার্ড ৬৭, ৯১) পল্লীনামটি বহন করছে।

৪৩২. বোসবাগান—তাঁতিবাগান ও বেনেপুকুর সংলগ্ন একটি বস্তির নাম ছিল বোসবাগান। ১৮৫৮ ও ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের পথপঞ্জীতে তার উল্লেখ রয়েছে।[২৭৯]

৪৩৩. বৌবাজার—বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট (সাবেক বৌবাজার স্ট্রিট) ও নির্মলচন্দ্র স্ট্রিটের সংযোগস্থল ও সন্নিহিত বিস্তীর্ণ এলাকা।

৪৩৪. ব্রাহ্মণপাড়া-১—গোঁসাইপাড়া লেনের (ওয়ার্ড ৯) আদিনাম ব্রাহ্মণপাড়া লেন।[২৮০]

৪৩৫. ব্রাহ্মণপাড়া-২—এখনও ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে ব্রাহ্মণপাড়া লেন।

৪৩৬. ভবানীপুর—পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্গত একটি ডিহি ও গ্রাম।[২৮১] দেবেন্দ্রলাল খাঁ রোডের (ওয়ার্ড ৭৬, ৭৭) পুরনো নাম ভবানীপুর রোড।

৪৩৭. ভাঁটিখানা—বেলেঘাটা মেন রোড, বেলেঘাটা ক্যানাল, সারকুলার ক্যানাল ও কুলিয়ার দ্বারা বেষ্টিত অঞ্চল।[২৮২]

৪৩৮. ভালুকপাড়া—মনোমোহন বসু স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ১১) সাবেক নাম ভালুকপাড়া লেন।[২৮৩]

৪৩৯. ভিস্তিপাড়া-১—সুরেন্দ্রলাল পাইন লেন ও রাধানাথ মল্লিক লেনের মধ্যবর্তী একটি এলাকা।

৪৪০. ভিস্তিপাড়া-২—কলিন স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৫২, ৬২, ৬৩) দেশজ নাম।[২৮৪]

৪৪১. ভিস্তিপাড়া-৩—মহাত্মা গান্ধী রোড ও চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ের সংযোগস্থলের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি অঞ্চল।

৪৪২. মঠেশ্বরতলা—৫৮ ও ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে মঠেশ্বরতলা রোড।

৪৪৩. মতিঝিল—৫৬ নম্বর ওয়ার্ডে আছে মতিঝিল লেন।

৪৪৪. মদনমোহনতলা—মদনমোহনতলা স্ট্রিটের অবস্থিতি ৮ নম্বর ওয়ার্ডে।

৪৪৫. মনসাতলা-১—মনসাতলা লেন ও রো রয়েছে ৭৭ নম্বর ওয়ার্ডে।

৪৪৬. মনসাতলা-২—দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ২১, ২২, ২৪) সাবেক নাম মনসাতলা।[২৮৫]

৪৪৭. মনোহরপুকুর—সঠিক নাম মনোহরপুর। মনোহরপুর ছিল পঞ্চান্নগ্রামের একটি গ্রাম ও ডিহি।[২৮৬] মনোহরপুর মনোহরপুকুরে পরিণত হয়ে টিকে রয়েছে রোড ও সেকেণ্ড লেনের মধ্যে (ওয়ার্ড ৮৪, ৮৫)।

৪৪৮. ময়দাপটি-১—দত্ত লেনের (ওয়ার্ড ৪৬) পূর্বনাম ময়দাপটি।[২৮৭]

৪৪৯. ময়দাপটি-২—নলিনী শেঠ রোডের (ওয়ার্ড ২২) একাংশের পূর্বনাম ময়দাপটি লেন।[২৮৮]

৪৫০. ময়রাপটি—নিউ বৌবাজার লেনের (ওয়ার্ড ৪৭) সাবেক নাম।[২৮৯]

৪৫১. ময়রাপাড়া—রাজকিশোর দে লেনের (ওয়ার্ড ২০) পুরনো নাম ময়রাপাড়া লেন।[২৯০]

৪৫২. ময়রাহাটা—নলিনী শেঠ রোডের (ওয়ার্ড ২২) একাংশের পূর্বনাম ময়রাহাটা স্ট্রিট।[২৯১]

৪৫৩. ময়ারপুর—প্যারীমোহন রায় রোড ও রাখালদাস আঢ্য রোডের পুরনো নাম ময়ারপুর রোড, শ্যাম বসু রোডের পূর্বনাম মল্লারপুর লেন (ওয়ার্ড ৮২)।[২৯২]

৪৫৪. মলঙ্গা—৪৭ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে মলঙ্গা লেন।

৪৫৫. মল্লিকবাগান—রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোডের পশ্চিমধারে, আলোছায়া সিনেমা ও দাউদী বোহ্‌ড়া সমাধিক্ষেত্রের মধ্যবর্তী এলাকা।

৪৫৬. মল্লিকাবাদ—পঞ্চান্নগ্রাম ও ডিহি কুলিয়ার অন্তর্গত মল্লিকাবাদের চৌহদ্দি মোটামুটি এইরকম : উত্তরে নারকেলডাঙা মেন রোড, পূর্বে নিউ ক্যানাল, পশ্চিমে শুঁড়া, দক্ষিণে বাহির জেলেপাড়া।[২৯৩]

৪৫৭. মশারিপটি—পি. এম. বাকচির প্রাগুক্ত ডাইরেক্টরি থেকে দেখা যাচ্ছে বর্তমান রবীন্দ্র সরণির পূর্বধারে, মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট ও আদি ব্রাহ্ম সমাজের মাঝে ছিল মশারিপটির অবস্থিতি।

৪৫৮. মসলাপটি—একই ডাইরেক্টরি থেকে জানা যায় যে ২৩১ ও ২৩২ দরমাহাটা স্ট্রিটের মাঝে ছিল আলুপোস্তা ও মসলাপটি।

৪৫৯. মাঝেরহাট—শিয়ালদা-বজবজ রেলপথের স্টেশনের কল্যাণে সুপরিচিত।

৪৬০. মানিকতলা—২৬ নম্বর ওয়ার্ডের মানিকতলা লেন প্রকৃত মানিকতলা অঞ্চল থেকে বহুদূরে অবস্থিত ; বরং মানিকতলা বাজার স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ২৭) অবস্থান সঠিক জায়গায়।

৪৬১. মালপাড়া—হেশ্যামের মানচিত্রে একটি দীর্ঘ রাস্তা 'মালপাড়া রোড' নামে চিহ্নিত। মহারানী স্বর্ণময়ী রোড (ওয়ার্ড ৩৬) ও সন্নিহিত অঞ্চল এখনও বর্ষীয়ান বাসিন্দাদের কাছে 'মালপাড়া' নামে পরিচিত।

৪৬২. মালাপাড়া—গঙ্গানারায়ণ দত্ত লেন (ওয়ার্ড ২১) ও সন্নিহিত অঞ্চল।[২৯৪]

৪৬৩. মালীবস্তি—লোয়ার সারকুলার রোডের দক্ষিণধারে, কাশিয়াবাগানের পূর্বদিকে অবস্থিত অঞ্চল।[২৯৫]

৪৬৪. মালীবাগান (মালীর বাগান)—বর্তমান কাশী ঘোষ লেন (ওয়ার্ড ২৬) ও সংলগ্ন এলাকা।[২৯৬]

৪৬৫. মিছরিগোলা—মনসাতলা লেনের (ওয়ার্ড ৭৭) একাংশ।[২৯৭]

৪৬৬. মিঞাবাগান-১—আপার সারকুলার রোডের পূর্বধারে, মানিকতলা ও বর্তমান সাহিত্য পরিষৎ ভবনের মধ্যবর্তী একটি এলাকা।[২৯৮]

৪৬৭. মিঞাবাগান-২—বেলেঘাটা খালপুলের উত্তর-পূর্বে, সরকার বাজারের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বস্তি অঞ্চল।

৪৬৮. মিঠাপুকুর—ডুমেইন অ্যাভেনিউয়ের (ওয়ার্ড ৮০) পূর্বনাম মিঠাপুকুর লেন।[২৯৯]

৪৬৯. মিস্ত্রিরপাড়া (মিত্রপাড়া)—১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে শ্যামবাজার স্ট্রিটে এই নামে একটি বস্তি ছিল।[৩০০]

৪৭০. মির্জাপুর—সূর্য সেন স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৩৭, ৪০, ৪৯) পূর্বনাম মির্জাপুর স্ট্রিট।

তবে রাস্তাটি যথেষ্ট দীর্ঘ, তার সবটুকু মির্জাপুর নয়। শকের মানচিত্রে সারকুলার রোড, মেছুয়াবাজার স্ট্রিট, আমহার্স্ট স্ট্রিট ও মির্জাপুর স্ট্রিটের মধ্যবর্তী এলাকাকে মির্জাপুর বলে চিহ্নিত করা আছে।

৪৭১. মিশ্রিগঞ্জ—মারকুইস স্ট্রিট-ফ্রি স্কুল স্ট্রিট সংযোগস্থল ও সন্নিহিত এলাকা।[৩০১]

৪৭২. মিস্ত্রিপাড়া—৫৪ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে মিস্ত্রিপাড়া লেন।

৪৭৩. মীনাপাড়া—মীনাপাড়া রোড (ওয়ার্ড ৯৫, ৯৮) এই পল্লীনামটি বহন করছে।

৪৭৪. মুখার্জিপাড়া-১—মুখার্জিপাড়া লেন আছে ৮৩ নম্বর ওয়ার্ডে।

৪৭৫. মুখার্জিপাড়া-২—আর একটি মুখার্জিপাড়া লেন আছে ৯১ নম্বর ওয়ার্ডে।

৪৭৬. মুচিখোলা—গার্ডেন রিচ অঞ্চলের সাবেক নাম।[৩০২]

৪৭৭. মুচিপাড়া-১—হেশ্যামের মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে, সারকুলার ক্যানাল, বেলগাছিয়া রোড ও কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের (বর্তমান নেতাজি-মূর্তি থেকে খাল পর্যন্ত অংশ) মধ্যবর্তী ত্রিভুজাকৃতি এলাকার নাম মুচিপাড়া।

৪৭৮. মুচিপাড়া-২—বর্তমান ব্লকম্যান স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৫৩) সাবেক নাম মুচিপাড়া লেন।[৩০৩]

৪৭৯. মুচিপাড়া-৩—ইসমাইল স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৫৪) পূর্বনাম মুচিপাড়া রোড।[৩০৪]

৪৮০. মুচিপাড়া-৪—নীলরতন সরকার হাসপাতাল একটি মুচিপাড়া লেনকে গ্রাস করেছে। এটি ছিল হাসপাতালের দক্ষিণ প্রান্তে।[৩০৫]

৪৮১. মুচিবাজার—বিধাননগর রোড স্টেশনের উত্তর-পশ্চিমে।

৪৮২. মুদিয়ালি—পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্ভুক্ত মুদিয়ালি ছিল ডিহি মনোহরপুরের এলাকাধীন।[৩০৬] লেক অ্যাভেনিউয়ের (ওয়ার্ড ৮৭) পূর্বনাম মুদিয়ালি রোড।[৩০৭] গার্ডেন রিচ অঞ্চলের দক্ষিণ প্রান্তে দ্বিতীয় মুদিয়ালির অবস্থিতি।[৩০৮]

৪৮৩. মুন্সিগঞ্জ—৭৫ নম্বর ওয়ার্ডে আছে মুন্সিগঞ্জ রোড।

৪৮৪. মুন্সিপাড়া-১—মুন্সিপাড়া লেন রয়েছে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে।

৪৮৫. মুন্সিপাড়া-২—চেতলাহাট রোড ও টালিগঞ্জ সারকুলার রোডের সংযোগস্থলের দক্ষিণ-পূর্বে।[৩০৯]

৪৮৬. মুন্সিবাজার—৫৭ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে মুন্সিবাজার রোড।

৪৮৭. মুরগিহাটা—বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোডের (ওয়ার্ড ৪২, ৪৫) সাবেক নাম মুরগিহাটা স্ট্রিট।

৪৮৮. মুরারিপুকুর—মুরারিপুকুর রোডের বর্তমান নাম বিপ্লবী বারীন ঘোষ সরণি (ওয়ার্ড ১৪, ৩২)।[৩১০]

৪৮৯. মুসলমানপাড়া-১—জাস্টিস মন্মথ মুখার্জি রো-র (ওয়ার্ড ৪৯) পুরনো নাম মুসলমানপাড়া লেন।

৪৯০. মুসলমানপাড়া-২—মুলেন স্ট্রিটেরও (ওয়ার্ড ৬৯) আদিনাম মুসলমানপাড়া লেন।[৩১১]

৪৯১. মেছুয়াবাজার– ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে মেছুয়াবাজার লেন, ৪১ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে সেকেণ্ড ও থার্ড লেন।

৪৯২. মেহেন্দিবাগান—এলিয়ট লেন, রোড (ওয়ার্ড ৬১) ও সংলগ্ন অঞ্চল।[৩১২]

৪৯৩. মৈত্রবাগান—স্বরেন সরকার রোডের ধারে, বর্তমান বেলেঘাটা থানার উত্তর-পশ্চিমে।

৪৯৪. মোগলবাগান—নারকেলডাঙা মেন রোডের উত্তরধারে, বিধান শিশু হাসপাতাল ও স্যর গুরুদাস হল্টের মধ্যবর্তী এলাকা।

৪৯৫. মোমিনপুর—৭৮ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে মোমিনপুর রোড।

৪৯৬. মোহনবাগান—১১ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে এই পল্লীনামবাহী লেন ও রো।

৪৯৭. মৌলালি—এস. এন. ব্যানার্জি রোড—সারকুলার রোড সংযোগস্থল ও সংলগ্ন অঞ্চল।

৪৯৮. যাদবপুর—৯৩. ৯৫, ৯৬ ও ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডে একাধিক পথনামের সঙ্গে 'যাদবপুর' সম্পৃক্ত।

৪৯৯. যুগীপাড়া– পুরসভা আনুষ্ঠানিকভাবে পল্লীনামটিকে 'যোগীপাড়া' করেছেন।[৩১৩] ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের মেন রোড, লেন ও বাই লেনের সঙ্গে যুক্ত আছে নামটি।

৫০০. রজার্সপটি—পি. এম. বাকচির পূর্বোক্ত ডাইরেক্টরি থেকে জানা যায়, মনোহর দাসের চকের একাংশে ছিল ছুরিকাঁচির দোকানবহুল 'রজার্সপটি'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'রজার্স' কোম্পানির ছুরিকাঁচি তখন বিখ্যাত ছিল।

৫০১. রসা-পাগলা—রসা রোড ইস্ট ফার্স্ট লেন ও সেকেণ্ড লেন (ওয়ার্ড ৮৯) এবং রসা রোড সাউথ ফার্স্ট, সেকেণ্ড, থার্ড ও ফোর্থ লেন (ওয়াড ৯৪) রসা-পাগলার নামটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

৫০২. রাজাপাড়া—বাগবাজারের রাজাপাড়া লেন এই পল্লীনামটির বাহক। অদূরবর্তী একটি পল্লীর নাম রাজবল্লভপাড়া।

৫০৩. রাজাবাজার—কেশব সেন স্ট্রিট, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, গ্যাস স্ট্রিটের চৌমাথা ও সংলগ্ন এলাকা।

৫০৪. রাজাবাগান-১—রাজাবাগান স্ট্রিট রয়েছে ১১ নম্বর ওয়ার্ডে।

৫০৫. রাজাবাগান-২—রাজাবাগান লেন রয়েছে ২ নম্বর ওয়ার্ডে।

৫০৬. রাজারপাড়া—শোভাবাজারের দক্ষিণে, দরজিপাড়া ও বালাখানার উত্তরে।[৩১৪]

৫০৭. রাজারামপুর—পূর্বে ভূকৈলাস, উত্তরে সারকুলার গার্ডেন রিচ রোড, পশ্চিমে বয়েড়বেড়িয়া ও দক্ষিণে দক্ষিণ-শেরেপুর—এই চৌহদ্দির মধ্যবর্তী অঞ্চল।[৩১৫]

৫০৮. রাজাহাট—ট্যাংরার দক্ষিণ-পূর্ব ও গোবরার পূর্বদিকস্থ একটি অঞ্চল।[৩১৬]

৫০৯. রাধানগর—উত্তরে জাজেস কোর্ট রোড, পূর্বে গোপালনগর রোড, দক্ষিণে চেতলাহাট রোড ও পশ্চিমে আলিপুর রোডের মধ্যবর্তী অঞ্চল।[৩১৭]

৫১০. রাধাবাজার—৪৫ নম্বর ওয়ার্ডে আছে রাধাবাজার লেন ও স্ট্রিট।

৫১১. রামচন্দ্রপুর—একবালপুরের উত্তরে. বারাসাতের পূর্বে—বর্তমান ডায়মণ্ডহারবার রোড ও সারকুলার গার্ডের রিচ রোডের সংযোগস্থল সংলগ্ন অঞ্চল।[৩১৮]

৫১২. রামনগর—হাইড রোড ও সারকুলার গার্ডেন রিচ রোডের সংযোগস্থলের দক্ষিণ-পশ্চিমে। রামেশ্বরপুরের উত্তরে, ফতেপুরের পূর্বে।[৩১৯]

৫১৩. রামবাগান—২৫ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে রামবাগান লেন।

৫১৪. রামবাজার—আপজনের মানচিত্রে বিস্তৃত অঞ্চল এই নামে চিহ্নিত আছে। শকের মানচিত্রের সঙ্গে তুলনা করলে মনে হয়. অঞ্চলটি ছিল দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রিট সংলগ্ন বা অদূরবর্তী কোনো স্থানে।

৫১৫. রামসীতার বাগান—বেলেঘাটার গুরুদাস পার্ক ও সন্নিহিত অঞ্চলের সাবেক নাম।

৫১৬. রামেশ্বরপুর—উত্তরে রামনগর ও ফতেপুর, পশ্চিমে সিংয়ের হাট, দক্ষিণ-পূর্বে ব্রেস ব্রিজ রেল স্টেশন ও পূর্বে হাইড রোড—মোটামুটি এই চৌহদ্দির মধ্যবর্তী অঞ্চল।[৩২০]

৫১৭. রায়পাড়া—২ নম্বর ওয়ার্ডে আছে রায়পাড়া রোড, লেন ও বাই লেন।

৫১৮. রায়পুর—৯৬, ৯৯ ও ১০০ নম্বর ওয়ার্ডে 'রায়পুর' নামবাহী একাধিক রাস্তা আছে। তার মধ্যে একটি রাস্তা একই সঙ্গে বহন করছে 'রায়পুর' ও 'মণ্ডলপাড়া' নাম দুটি।

৫১৯. রায়বাগান—মহেশ ভট্টাচার্য সরণির (ওয়ার্ড ১৬) সাবেক নাম রায়বাগান স্ট্রিট।[৩২১]

৫২০. রাসবাগান—ডঃ পঞ্চানন মিত্র লেনের (ওয়ার্ড ৩৪, ৩৫) পুরনো নাম রামবাগান লেন।

৫২১. রাসমণিবাজার—৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে রাসমণিবাজার রোড। সংলগ্ন একটি পল্লীর নাম রাসমণিবাগান।

৫২২. রুইহাটা—আপজনের মানচিত্রে স্থানটি চিহ্নিত আছে। শকের মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মনে হয়, পরবর্তীকালে যেখানে 'কমলনয়নের বেড়' বা মল্লিক স্ট্রিট হয়েছে, মোটামুটি সেখানেই ছিল রুইহাটা।

৫২৩. লক্ষ্মীনারায়ণগঞ্জ—৭৬ নম্বর ওয়ার্ডে আছে লক্ষ্মীনারায়ণগঞ্জ গলি।

৫২৪. লালবাজার—পুলিশের সদর দপ্তরের কল্যাণে সুপরিচিত।

৫২৫. লালাবাগান—লালাবাগান রোডের অবস্থিতি ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে।

৫২৬. লিচুবাগান—রাজা রাজনারায়ণ স্ট্রিট, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ও গড়পার রোডের মধ্যবর্তী এলাকা।[৩২২]

৫২৭. লোহাপটি—পি. এম. বাকচির পূর্বোল্লিখিত ডাইরেক্টরি থেকে জানা যাচ্ছে, দরমাহাটা স্ট্রিটের যে অংশটি মীরবহর ঘাট স্ট্রিট ও বাঁশতলার স্ট্রিটের মধ্যবর্তী, সেই অঞ্চলটির নাম লোহাপটি।

৫২৮. শর্টবাজার—আপজনের মানচিত্রে পার্ক স্ট্রিটের দক্ষিণধারে ও সাউথ পার্ক স্ট্রিট

সিমেট্যারির পশ্চিমে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে 'শর্ট'স বাজার' দেখানো আছে। শকের মানচিত্রে দেখা যায়, শর্টবাজার থেকে ক্যামাক স্ট্রিট পর্যন্ত একটি রাস্তার নাম 'শর্টবাজার স্ট্রিট'। 'শর্ট স্ট্রিট' (ওয়ার্ড ৬৩) সেই রাস্তারই বর্তমান নাম।

৫২৯. শ্যাওড়াতলা—বাগমারি ও কাঁকুড়গাছির মধ্যবর্তী অঞ্চল।[৩২৩]

৫৩০. শ্যামপুকুর—১০ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও আছে শ্যামপুকুর লেন ও স্ট্রিট। শ্যামপুকুর জলাশয়টির অবস্থান ছিল শ্যামপুকুর স্ট্রিট ও রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের মাঝে, বর্তমান অভয় ঘোষ লেনের পশ্চিমধারে।[৩২৪]

৫৩১. শ্যামবাজার—শ্যামবাজার স্ট্রিট (ওয়ার্ড ৮, ৯, ১০) এখনও স্বনামে বহাল রয়েছে। শকের মানচিত্রে এই রাস্তার সংলগ্ন বিস্তৃত এলাকাকে শ্যামবাজার বলা হয়েছে। আপজনের মানচিত্রে এই রাস্তা ও বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের মোড়ে শ্যামবাজার।

৫৩২. শাঁখারিটোলা—৫০ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে শাঁখারিটোলা স্ট্রিট।

৫৩৩. শাঁখারিপাড়া—বিজয় বসু রোড ও ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ রোডের (ওয়ার্ড ৭১, ৭৩) পূর্বনাম শাঁখারিপাড়া রোড।[৩২৫]

৫৩৪. শাহ্‌বাগান—ডিহি মনোহরপুর তথা পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্গত শাহ্‌নগরের[৩২৬] নাম ৮৮ নম্বর ওয়ার্ডের শাহ্‌নগর রোড বহন করছে।

৫৩৫. শাহ্‌পুর—৮১ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে শাহ্‌পুর রোড।

৫৩৬. শিকারীপাড়া—শকের মানচিত্রে এ অঞ্চলটির অবস্থিতি কড়েয়ার পূবে, শ্রীরামপুরের দক্ষিণে ও ঘুঘুডাঙার উত্তরে। অন্যান্য মানচিত্রের সঙ্গে মেলালে মনে হয়, শিকারীপাড়ার অবস্থান ছিল বর্তমান পার্ক সার্কাস ময়দান বা সংলগ্ন কোনো এলাকায়।

৫৩৭. শিবতলা-১—২৩ নম্বর ওয়ার্ডে আছে শিবতলা স্ট্রিট।

৫৩৮. শিবতলা-২—ফকির হালদার লেনের (ওয়ার্ড ৮৩) পূর্বনাম শিবতলা লেন।[৩২৭]

৫৩৯. শিবতলা-৩—রবার্ট স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৪৭) পুরনো নাম শিবতলা গলি।[৩২৮]

৫৪০. শিবতলা-৪—একটি শিবতলা লেন (ওয়ার্ড ৩৬, ৫৭) আজও রয়েছে।

৫৪১. শিবতলা-৫—মানিকতলা খালপুলের উত্তরধারে, মধু মুখার্জি লেন (ওয়ার্ড ১৫) ও সন্নিহিত এলাকা।[৩২৯]

৫৪২. শিবতলা-৬—৬৫ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে তিলজলা শিবতলা লেন।

৫৪৩. শিববাগান—১, হরিনাথ দে রোডে একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। এই মন্দিরকে বেষ্টন করে যে বস্তি, তার নাম 'শিববাগান বস্তি'।

৫৪৪. শিমলা—শিমুলিয়া গ্রাম এখন 'শিমলা' পল্লীতে পরিণত। ডাঃ নারায়ণ রায় সরণির (ওয়ার্ড ২৫, ২৮) সাবেক নাম ছিল শিমলা স্ট্রিট।[৩৩০] আপজনের মানচিত্রে পুরনো শিমলা বাজারের অবস্থান মেছুয়াবাজার স্ট্রিটের উত্তরধারে,

ঠনঠনিয়ার পূর্বে। শকের মানচিত্রে শিমলা বাজার বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটের উত্তরধারে।

পঞ্চান্নগ্রামের মধ্যে একটি ডিহির নাম ছিল 'শিমলা', তার অধীনে ছিল দুটি গ্রাম : বাহির শিমলা ও নারকেলডাঙ্গা।[৩৩১] বলা বাহুল্য, ডিহি শিমলার অবস্থান সারকুলার রোডের পূর্বধারে, এই শিমলা থেকে সে অঞ্চলটি পৃথক।

৫৪৫. শিয়ালদহ (শিয়ালদা)—পঞ্চান্নগ্রামের অধীনস্থ একটি গ্রাম তথা ডিহি।[৩৩২] বর্তমানে রেলস্টেশনের কল্যাণে বিশ্ববিদিত। ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে নর্থ শিয়ালদহ রোড ও ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডে সাউথ শিয়ালদহ রোড রয়েছে।

৫৪৬. শীতলাতলা—৩০ নম্বর ওয়ার্ডে আছে শীতলাতলা লেন।

৫৪৭. শুঁটকিহাটা—স্কুকিয়াস লেন (ওয়ার্ড ৪৫) ও সংলগ্ন অঞ্চলের পুরনো নাম।

৫৪৮. শুঁড়া—পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্গত এই গ্রাম তথা ডিহিটির[৩৩৩] স্মৃতি ধারণ করে রয়েছে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের চারটি পথনাম।

৫৪৯. শুঁড়িপাড়া-১—ঘোষ লেনের (ওয়ার্ড ২৭) আদিনাম শুঁড়িপাড়া লেন।[৩৩৪]

৫৫০. শুঁড়িপাড়া ২—মণ্ডল স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ২১) পুরনো নাম।

৫৫১. শেখপাড়া—উজির চৌধুরী রোড (ওয়ার্ড ১৩) ও সংলগ্ন এলাকার সাবেক নাম।[৩৩৫]

৫৫২. শেঠপুকুর—শেঠপুকুর রোড রয়েছে ৬ নম্বর ওয়ার্ডে।

৫৫৩. শেঠবাগান—২৬ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে শেঠবাগান গলি।

৫৫৪. শোভাবাজার—স্ট্রিট ও লেন (ওয়ার্ড নম্বর ৯, ১৯) পল্লীনামটিকে ধরে রেখেছে।

৫৫৫. শ্রীরামপুর—পঞ্চান্নগ্রামের পনেরোটি ডিহির মধ্যে ডিহি শ্রীরামপুর ছিল বৃহত্তম। তার অধীনে ছিল এগারোটি গ্রাম।[৩৩৬] তাই ডিহি শ্রীরামপুর রোডের (বর্তমান রামেশ্বর সা রোড) অবস্থান ছিল একদিকে, আর ডিহি শ্রীরামপুর লেনের (বর্তমান বালিগঞ্জ প্লেস ইস্ট) অবস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নদিকে। ডিহি শ্রীরামপুরের অধীনে শ্রীরামপুর গ্রামও ছিল। উত্তরে কামারডাঙা, দক্ষিণে ঘুঘুডাঙা ও পশ্চিমে জাননগর—এই ছিল শ্রীরামপুর গ্রামের ত্রিসীমানা।[৩৩৭]

৫৫৬. ষষ্ঠীতলা-১—ষষ্ঠীতলা রোড এখনও রয়েছে (ওয়ার্ড ২৯, ৩০)।

৫৫৭. ষষ্ঠীতলা-২—৭৬ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে আর একটি ষষ্ঠীতলা রোড।

৫৫৮. সওদাগরপটি—করিম বক্স রো (ওয়ার্ড ৬) ও সংলগ্ন অঞ্চল।

৫৫৯. সচ্চাষীপাড়া—১ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে এই পল্লীনামবাহী রোড ও লেন। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের মানচিত্রে অঞ্চলটি 'চাষাধোবাপাড়া' নামে চিহ্নিত।[৩৩৮]

৫৬০. সব্জিবাগান—সাব্জবাগান লেন রয়েছে ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে।

৫৬১. স্যাকরাপাড়া—স্যাকরাপাড়া লেনের অবস্থিতি ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডে।

৫৬২. সাঁতরাপাড়া—২ নম্বর ওয়ার্ডে আছে সাঁতরাপাড়া লেন।

৫৬৩. সানকিভাঙা—পি. এম. বাকচির ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ডাইরেক্টরিতে দেখা যাচ্ছে, মদনমোহন সেন লেনের অদূরে ৫/১ ভবানীচরণ দত্ত লেনে ছিল 'সাঙ্কিভাঙ্গা

হরিসভা'। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিমদিকের পল্লীটিই ছিল সানকিভাঙা। রাধারমণ মিত্রের মতে, গোড়ায় মেডিকাল কলেজ স্ট্রিট (অধুনালুপ্ত) ও কলুটোলা স্ট্রিটের নাম ছিল সানকিভাঙা। পরে পল্লীনামটির পরিধি প্রসারিত হয়।[৩৩৯]

৫৬৪. সাপগাছি—সাপগাছি গ্রাম ছিল পঞ্চান্নগ্রাম তথা ডিহি শ্রীরামপুরের অন্তর্ভুক্ত।[৩৪০] ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাপগাছি ফার্স্ট ও সেকেণ্ড লেন গ্রামটির স্মৃতিবাহী।

৫৬৫. সাহেববাগান—উত্তরে রাজা রাজনারায়ণ স্ট্রিট, পশ্চিমে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, দক্ষিণে গ্যাস স্ট্রিট ও পূর্বে ক্যানাল ওয়েস্ট রোডের মধ্যবর্তী বস্তি অঞ্চল।[৩৪১]

৫৬৬. সাহেববাজার—নিমতলা মহাশ্মশানের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি এলাকা।

৫৬৭. সিকদারপাড়া-১—সিকদারপাড়া পল্লীনামটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের তিনটি পথনাম।

৫৬৮. সিকদারপাড়া-২—মহিম হালদার স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৮৩) সাবেক নাম সিকদার-পাড়া রোড।[৩৪২]

৫৬৯. সিকদারবাগান—১১ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে সিকদারবাগান স্ট্রিট।

৫৭০. সিঁথি—পঞ্চান্নগ্রামের একটি গ্রাম তথা ডিহি সিঁথির নামে[৩৪৩] ২ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে দুটি রাস্তা।

৫৭১. সিন্দুরিয়াপটি (সিঁদুরেপটি)—বর্তমান রবীন্দ্র সরণি—মহাত্মা গান্ধী রোডের সংযোগস্থল ও সংলগ্ন অঞ্চল।

৫৭২. সিন্দুকপটি-১—পি. এম. বাকচির পূর্বোল্লিখিত ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ডাইরেক্টরি থেকে জানা যায় যে, ৬৯/৩ ও ৭০ নম্বর ক্লাইভ স্ট্রিটের মাঝে ছিল সিন্দুকপটির গলি।

৫৭৩. সিন্দুকপটি-২—একই ডাইরেক্টরি থেকে দেখা যায়, ২১৫ ও ২২৫ দরমাহাটা স্ট্রিটের মাঝে ছিল আমপোস্তা ও সিন্দুকপটি।

৫৭৪. সিমলাইপাড়া—ডাঃ সুভাষ লেনের (ওয়ার্ড ৪) পূর্বনাম সিমলাইপাড়া লেন।

৫৭৫. সিংয়েরহাট (সিংয়ের হাটী)—ইন্দ্রি ও ফতেপুরের দক্ষিণে, রামেশ্বরপুরের পশ্চিমে, তারাতলা রোড সংলগ্ন এলাকা।[৩৪৪]

৫৭৬. সিংহীবাগান (সিংহবাগান)—৪১ নম্বর ওয়ার্ডে সিংহীবাগান লেনের অবস্থিতি।

৫৭৭. সুতাপটি—যমুনালাল বাজাজ স্ট্রিট (ওয়ার্ড ৪২) ও সন্নিহিত এলাকা।

৫৭৮. সুরতিবাগান—এখনও ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে আছে সুরতিবাগান স্ট্রিট।

৫৭৯. সুরহাটা—আচার্য জগদীশ বসু রোডের পূর্বধারে, মৌলালির দরগার উত্তরবর্তী অঞ্চল।[৩৪৫]

৫৮০. সেনবাগান—অবিনাশ শাসমল লেন (ওয়ার্ড ৩৪, ৩৫) ও সংলগ্ন এলাকা।

৫৮১. সেলিমপুর—৯২ নম্বর ওয়ার্ডে আছে সেলিমপুর রোড, লেন ও বাই লেন।

৫৮২. সোনাই—৮০ নম্বর ওয়ার্ডে সোনাই রোড আছে।

৫৮৩. সোনাগাছি (সোনাগাজী)—সোনাগাছি লেনের অবস্থান ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে।

৫৮৪. সোনাডাঙা (সোনাডাঙাপাড়া)—৭৯ নম্বর ওয়ার্ডে আছে সোনাডাঙা ফার্স্ট লেন।

৫৮৫. সোনাপটি—নলিনী শেঠ রোডের (ওয়ার্ড ২২) একাংশে।

৫৮৬. সোনারপুর—গার্ডেন রিচ অঞ্চলে সোনারপুর রোড (ওয়ার্ড ৮০) রয়েছে।

৫৮৭. হনুমানবাগান—রাজারপাড়ার সাবেক নাম (রাজারপাড়া দ্র.)।[৩৪৬]

৫৮৮. হরীতকীবাগান (হর্তুকিবাগান)—ডাঃ ধীরেন সেন সরণির (ওয়ার্ড ২৭) পুরনো নাম হরীতকীবাগান লেন।[৩৪৭]

৫৮৯. হরিণবাড়ি—৪৩ নম্বর ওয়ার্ডে তিনটি পথনাম এই পল্লীনামে চিহ্নিত।

৫৯০. হাজরাবাগান—৫৬ নম্বর ওয়ার্ডে আছে হাজরাবাগান লেন।

৫৯১. হাজিপাড়া—কাইজার স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৩৬) পূর্ব প্রান্ত ও সন্নিহিত এলাকা।

৫৯২. হাটখোলা—নাথেরবাগান স্ট্রিট থেকে আহিরিটোলা স্ট্রিট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা।[৩৪৮]

৫৯৩. হাড়িটোলা—হাড়িটোলা রোডের (ওয়ার্ড ৫৭) নামের মধ্যে রয়েছে পল্লীনামটি।

৫৯৪. হাড়িপাড়া-১—ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেন[৩৪৯] (আবদুল হালিম লেন) থেকে শুরু করে ডাক্তার লেন[৩৫০] পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সাবেক নাম হাড়িপাড়া। উডের মানচিত্রে এই পল্লীটির নাম হাড়িটোলা।

৫৯৫. হাড়িপাড়া-২—নন্দকুমার চৌধুরী লেনের (ওয়ার্ড ২৭) পুরনো নাম।[৩৫১]

৫৯৬. হাড়িপাড়া-৩—১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে লোয়ার সারকুলার রোডের পশ্চিমধারে, বর্তমান 'স্টুডেন্টস হেলথ হোমের' আশেপাশে ছিল একটি হাড়িপাড়া লেন।[৩৫২]

৫৯৭. হাড়িপাড়া-৪—স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ রোডের (ফুলবাগান রোড) পুরনো দেশজ নাম 'হাড়িপাড়া কা রাস্তা'।[৩৫৩]

৫৯৮. হাঁড়িহাটা—হরিণবাড়ি লেন, টিরেট্টাবাজার স্ট্রিট ও রবীন্দ্র সরণির মধ্যবর্তী অঞ্চলের পুরনো নাম।[৩৫৪] 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় পল্লীনামটির উল্লেখ আছে।[৩৫৫]

৫৯৯. হাতিবাগান-১—হাতিবাগান রোড নর্থ (ওয়ার্ড ৫৪, ৫৯, ৬০) আজও রয়েছে।

৬০০. হাতিবাগান-২—বাজারের দৌলতে সুপরিচিত। নলিন সরকার স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ১১) পূর্বনাম হাতিবাগান স্ট্রিট।[৩৫৬]

৬০১. হায়দ্রাবাগান (হায়দারবাগান ?)—শকের মানচিত্রে লিণ্ডসে স্ট্রিট ও চৌরঙ্গি রোডের সংযোগস্থলের সামান্য উত্তর-পূর্বে হায়দ্রাবাগান অঞ্চলটি দেখানো আছে।

৬০২. হালদারপাড়া—অমৃত ব্যানার্জি রোড, দেবনারায়ণ ব্যানার্জি রোড ও গুরুপদ হালদার রোডের (ওয়ার্ড ৮৩) সাবেক নাম হালদারপাড়া রোড।[৩৫৭]

৬০৩. হালদারবাগান—১২ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে হালদারবাগান লেন।

৬০৪. হালসিবাগান—নীরদবিহারী মল্লিক রোডের (ওয়ার্ড ১৫) পূর্বনাম হালসিবাগান রোড।[৩৫৮]

৬০৫. হাঁসপুকুর (হাসপুকুরিয়া)—২৩ নম্বর ওয়ার্ডে আছে হাঁসপুকুর লেন ও ফার্স্ট লেন।

৬০৬. হুঁকাপটি—গোলদিঘির বিপরীতে, মাধববাবুর বাজারের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে হুঁকাপটি অবস্থিত ছিল।[৩৫৯]

৬০৭. হুজুরিমলপাড়া—ফরডাইস লেন (ওয়ার্ড ৫০) ও সন্নিহিত অঞ্চল।[৩৬০]

৬০৮. হোগলকুঁড়িয়া—বর্তমান সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিটের সাবেক নাম হোগলকুঁড়িয়া গলি।[৩৬১]

৬০৯. হোসেনপাড়া—দরজিপাড়া সংলগ্ন একটি পল্লী।[৩৬২]

স্থানসংক্ষেপ করার তাগিদে পল্লীগুলির অবস্থিতি নির্দেশ করা হল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত-ভাবে। প্রতিটি পল্লীর বিস্তৃতি ও চৌহদ্দির কথা উল্লেখ করতে পারলে যে বিষয়টি স্পষ্ট ও সহজবোধ্য হয়ে উঠত, সে-কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার্য। তাছাড়া একেকটি পল্লী বিভিন্ন মানচিত্র ও পথপঞ্জীতে কিভাবে নির্দেশিত হয়েছে তার তুলনামূলক আলোচনাও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পরিসরের খাতিরে আমাদের লেখনী সংবরণ করতে হল।

পল্লীগুলির আরও দুটি তালিকা এইসঙ্গে যুক্ত করার বাসনা আমাদের ছিল। একটি তালিকায়—পুকুর, —বাগান, —পটি, —পাড়া প্রভৃতি অন্ত্যাংশ অনুযায়ী নামগুলিকে সাজিয়ে দিলে সুধী পাঠকদের সুবিধা হতো, পরিষ্কার হতো কলকাতার পল্লীবিন্যাস। আর একটি তালিকায় গাছপালা, জাতপাত প্রভৃতি বিষয় অনুযায়ী পল্লীনামগুলিকে সাজালে পুরনো কলকাতার উদ্ভিদবৈচিত্র্য, অধিবাসীদের বর্ণবিন্যাস ইত্যাদি পরিস্ফুট হয়ে উঠত। কিন্তু স্থানান্তরে বিষয়গুলি আলোচনা করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।

বর্তমান তালিকায় সংকলিত নামগুলির বাইরেও আমরা বেশ কিছু পল্লীনাম পেয়েছি। কিন্তু ইংরেজি সূত্র থেকে সেগুলির সঠিক বাংলা রূপ নির্ধারণ করা যায়নি। অনেকগুলির অবস্থান আবার যথাযথভাবে বোঝা যাচ্ছে না। তাই সেই নামগুলি তালিকায় গৃহীত হল না।

শেষের কথা

আমাদের এই অসম্পূর্ণ তালিকা যে নিছক একটি নমুনা সংগ্রহ, তা আমরা শুরুতেই স্বীকার করেছি। কলকাতার পল্লীনামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণীত হওয়া প্রয়োজন বেশ কয়েকটি কারণে। কলকাতার পল্লীনামের সঙ্গে বাংলার গ্রামনামগুলির তুলনা করলে বেশ কিছু সাদৃশ্যের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। এই সাযুজ্য থেকে অনুভব করা যায় যে, বাংলার গ্রামনাম ও কলকাতার পল্লীনামের উৎস-সন্ধান একই পদ্ধতিতে করতে হবে। কোনো অভিনব অনুমান বা খটমট সূত্র থেকে কলকাতার পল্লীনামের জন্মকথা খুঁজতে গেলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তিকর হয়ে দাঁড়াবে। পল্লীনামের জন্মকথা আবিষ্কার করতে

হলে নামটির অর্থ অনুধাবন করা জরুরি। কলকাতার বেশ কিছু পল্লীনামের অর্থ কিন্তু স্পষ্ট নয়, যেমন—কড়েয়া, নেহারিটোলা, ধুকুড়িয়াবাগান।

কলকাতার পল্লীনামগুলি বহু ভাবনার রসদ যোগায়। শিমলা ও বাহির শিমলা নাম দুটি থেকে বোঝা যাচ্ছে, এখানে শিমুল তুলোর গাছের অভাব ছিল না। কাপাসডাঙা নামটি বুঝিয়ে দিচ্ছে, এখানে কাপাস তুলোর চাষও হতো। অতএব তুলোচাষের ক্ষেত্র হিসাবে এ অঞ্চলের মাটি ছিল প্রশস্ত। তাই কি শেঠ-বসাক সম্প্রদায় এখানে ডেরা বেঁধেছিলেন? নাকি নিজেদের চাহিদা মেটানোর জন্য এই তন্তুবায়রাই তুলোচাষ প্রবর্তন করেছিলেন? তালিকায় চোখ বোলালে এ-রকম বহু প্রশ্নের উদয় হয় মনে।

পল্লীনামের ফর্দে শ্রমজীবী সম্প্রদায়, এমনকি হাড়ি-ডোম প্রভৃতি অন্ত্যজ বর্ণের যথেষ্ট উল্লেখ রয়েছে। বর্ণহিন্দুদের উল্লেখ তুলনায় কম। নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীনামের বদলে শুরু হয়েছে পথনামের প্রয়োগ। পল্লীনামে নিম্নবর্গের স্বীকৃতি থাকলেও পথনামে তাঁরা প্রায় গরহাজির। পথনামের সিংহভাগ উচ্চবর্ণের সদস্যদের দ্বারা অধিকৃত। নিম্নবর্গের মানুষকে নগরায়ণ কিভাবে স্থানচ্যুত ও গৌরবচ্যুত করে, এ যেন তার পরোক্ষ ইঙ্গিত।

অদূর ভবিষ্যতে কলকাতার পল্লীনামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণীত হোক, যোগ্যভাবে বিশ্লেষিত হোক এইসব বিষয়, এই কামনা নিয়েই শেষ হোক আমাদের নিবন্ধ।

উল্লেখপঞ্জী

১. A. K. Ray, 'A Short History of Calcutta : Town and Suburbs' (Rddhi, 1982), pp. 66-67. [পরবর্তী টীকাগুলিতে 'A. K. Ray' নামে উল্লিখিত]
২. A. K. Ray, pp. 75-76.
৩. Ibid., pp. 110-112
৪. Ibid., pp. 116-119.
৫. Ibid., p. 111.
৬. 'List of Streets in the City of Calcutta including the Tollygunge area (corrected upto 1981)', Calcutta Corporation, n. d., pp. 36-37. [পরবর্তী টীকাগুলিতে 'List' নামে উল্লিখিত]
৭. রাস্তাটির প্রাণপুরুষ রাধানাথ বসু মল্লিক থাকতেন ঐ রাস্তারই আঠারো নম্বর বাড়িতে। উইলে তিনি নিজের সাকিম 'পটলডাঙা' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বংশধররাও 'পটলডাঙার বসু মল্লিক' নামে পরিচিত (দ্র. দেবেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক, 'বংশ গৌরব', গ্রন্থকার, ১৩৪৭)। অথচ 'সুবর্ণবণিক হিতসাধনী সভা'-র তালিকায় রাস্তাটি 'চাঁপাতলা' নামে অভিহিত (দ্র. নরেন্দ্রনাথ লাহা, 'সুবর্ণ-

বণিক কথা ও কীর্তি', দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৪১, পৃঃ ১৭৬)। আবার বসু মল্লিক পরিবারের দলিলপত্রে এলাকাটি 'আড়পুলি' ও গোয়ালাপুকুর' নামে উল্লিখিত।

৮. List.

৯. A. K. Ray, p. 112.

১০. 'The City and Environs of Calcutta, Including the Government Estate of Punchunnogram, With Allipoor, Khiderpoor, Garden Reach, Seebpoor, Howrah and Sulkea 1852 to 1856' (Surveyor General's Office, Calcutta, January 1861). [পরবর্তী টীকাগুলিতে 'Map 1861' নামে উল্লিখিত]

১১. Map of 'Calcutta—South Division : 1887-1892', Sheet No. H7, ('Surveyed under the direction of···Deputy Surveyor-Generals, by···Superintendents of Calcutta Survey, appointed under Act I of 1887...Published under the direction of Colonel H. R. Thuillier,...Surveyor General of India'). [পরবর্তী টীকায় 'Smart's Plan' নামে উল্লিখিত]

১২. List, p. 23.

১৩. 'Map of Calcutta and its Environs with the latest improvements, 1845, For Mendes Book Direction'. [পরবর্তী টীকাগুলিতে 'Mendes' Map' নামে উল্লিখিত]

১৪. 'Cones & Co.'s Calcutta Directory for 1874' (Calcutta, 1874), p. 5. এই পথপঞ্জীতে 'আড়কুলি লেন' রয়েছে। পরবর্তীকালের পথপঞ্জীর সঙ্গে মেলালে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এই রাস্তাটিই বর্তমান 'মদনগোপাল লেন'। কিন্তু পুরসভার তালিকায় ভুল করে লেখা হয়েছে যে, মদনগোপাল লেনের পূর্ব-নাম 'আড়পুলি লেন' (List, List of Streets : Old and New, p. 8).

১৫. List, List of Streets : Old and New, p. 57.

১৬. প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত' (পুস্তক বিপণি, ১৯৮১), পৃঃ ৫৬। [পরবর্তী টীকায় 'প্রাণকৃষ্ণ' নামে উল্লিখিত]

১৭. Lokenath Ghose, 'The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars &c.', Part II (Calcutta, 1881), p. 235.

১৮. List, List of Streets : Old and New, p. 3.

১৯. 'Plan of the Town of Calcutta' (Thacker, Spink & Co., 2nd ed., 1877). [পরবর্তী টীকাগুলিতে 'Thacker-77' নামে উল্লিখিত]

২০. Mendes' Map.

২১. ডাইরেক্টরিটির আখ্যাপত্র বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় প্রথাসিদ্ধভাবে উল্লেখ করা গেল না।

২২. Map 1861.

২৩. 'The Bengal and Agra Annual Guide and Gazetteer for 1841', Vol. I, (William Rushton & Co., Calcutta, 3rd ed.), part III, p. 89. [পরবর্তী টীকাগুলিতে 'Guide' নামে উল্লিখিত]

২৪. 'The New Calcutta Directory for 1863' (আখ্যাপত্র বিনষ্ট), p. 72. [পরবর্তী টীকাগুলিতে 'New Calcutta' নামে উল্লিখিত]

২৫. John Lewis, 'The Bengal Directory and Annual Register for 1858' (Samuel Smith & Co., Calcutta, n. d.), Part IX, p. 187. [পরবর্তী টীকাগুলিতে 'Bengal Directory' নামে উল্লিখিত] ।

২৬. 'Plan of the City of Calcutta and its environs Surveyed by the late Major J. A. Schalch for the use of the Lottery Committee and containing all their Improvements with additions from the Surveyor Generals Office and from Recent Surveys by Captain T. Princep, Engraved by E. D. La Combe.' [পরবর্তী টীকাগুলিতে 'Schalch' নামে উল্লিখিত]

২৭. 'City of Calcutta' (Map) (Thacker, Spink & Co., February 1910). [পরবর্তী টীকাগুলিতে 'Thacker-10' নামে উল্লিখিত]

২৮. List, List of Streets : Old and New, p. 10.

২৯. Ibid., p. 11.

৩০. Ibid., p. 6.

৩১. 'Cones & Co.'s Calcutta Directory for 1874' (Calcutta, 1874), p. 47. [পরবর্তী টীকাগুলিতে 'Cones' নামে উল্লিখিত] । অঞ্চলটির অবস্থিতি তুলনা করে দেখার জন্য দ্র. Bengal Directory, p. 103 ও New Calcutta, p. 87.

৩২. A. K. Ray, p. 112.

৩৩. Map 1861.

৩৪. List, List of Streets : Old and New, p. 5.

৩৫. A. K. Ray, p. 111.

৩৬. Ibid., p. 112.

৩৭. List, List of Streets : Old and New, p. 7.

৩৮. Ibid., p. 8.

৩৯. A. K. Ray, p. 112.

৪০. Ibid., p. 194.

৪১. সমর দত্ত, 'ইতিহাসে খিদিরপুর' (কলকাতা, ১৯৯০), পৃঃ ২৩ । [পরবর্তী টীকাগুলিতে 'খিদিরপুর' নামে উল্লিখিত]

৪২. List, List of Streets : Old and New, p. 13.

৪৩. Schalch.

৪৪. Cones, pp. 111, 179. তখন সদ্য রাস্তাটি নামান্তরিত হয়েছে বলে উভয় নামে রাস্তাটি বর্ণিত হয়েছে।

৪৫. Somendra Chandra Nandy, 'History of the Cossimbazar Raj', Vol. I (Dev-all, 1986), p. 117.

৪৬. 'The Bengal Almanac for 1856' (আখ্যাপত্র বিনষ্ট), Part VIII, p. 47.

৪৭. 'Thacker's Indian Directory, 1895' (Thacker, Spink & Co., Calcutta, 1895), p. 438. [পরবর্তী টীকায় 'Directory-95' নামে উল্লিখিত]

৪৮. পঞ্চানন রায়, 'বাংলার মন্দির' (বাসুদেবপুর, ১৯৭৪), পৃঃ ২৭।

৪৯. New Calcutta, p. 84.

৫০. Ibid., p. 96.

৫১. নগেন্দ্রনাথ বসু 'বিশ্বকোষ', তৃতীয় খণ্ড (বিশ্বকোষ কার্যালয়, ১২৯৯), পৃঃ ২৮৩। [পরবর্তী টীকায় 'বিশ্বকোষ' নামে উল্লিখিত]

৫২. Guide, pp. 90-91.

৫৩. H. E. A. Cotton, 'Calcutta : Old and New' (General, 1980, ed. N. R. Ray), p. 250.

৫৪. New Calcutta, p. 151.

৫৫. A. K. Ray, p. 111.

৫৬. Map 1861.

৫৭. A. K. Ray, p. 111.

৫৮. 'District Census Handbook', Part XIII B, Twenty four Parganas District, (Calcutta, n. d., Census of 1981), pp. 227, 245.

৫৯. Cones, p. 50.

৬০. New Calcutta, pp. 141, 168.

৬১. Thacker-10.

৬২. List, List of Streets : Old and New, p. 13.

৬৩. Ibid., p. 12.

৬৪. Ibid., p. 3.

৬৫. A. K. Ray, p. 112.

৬৬. Guide, p. 92.

৬৭. 'Report of the General Committee of the Fever Hospital and Municipal Improvements', Appendix D, map facing p. 228.

৬৮. রমানাথ দাস, 'কলিকাতার মানচিত্র' (কলকাতা, ১৮৮৪), পৃঃ ২২ [পরবর্তী টীকায় 'মানচিত্র' নামে উল্লিখিত]

৬৯. A. K. Ray, p. 112.

৭০. List, List of Streets : Old and New, p. 8.

৭১. খিদিরপুর, পৃঃ ২৩।

৭২. Schalch.

৭৩. সরলা দেবী চৌধুরাণী, 'জীবনের ঝরাপাতা' (রূপা, ১৩৮৮), পৃঃ ২১৪।

৭৪. A. K. Ray, p. 111.

৭৫. রাস্তার বিপরীত পারেও (শেঠবাগান লেন সংলগ্ন অঞ্চল) যে অজস্র 'Brazier's Shops' ছিল সে-কথা জানা যাচ্ছে ভিন্ন সময়ের অন্য একটি পথপঞ্জী থেকে (Bengal Directory, p. 30)। বোঝা যায়, সমগ্র অঞ্চল জুড়ে কাঁসারিদের দোকান থাকায় 'কাঁসারিপটি' নাম হয়েছিল।

৭৬. List, List of Streets : Old and New, p. 12.

৭৭. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে' (এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭২), পৃঃ ২৩-২৯।

৭৮. Map 1861.

৭৯. A. K. Ray, p. 111.

৮০. Map 1861.

৮১. List, List of Streets : Old and New, p. 4.

৮২. Schalch ; J. B. Tassin, 'The City and Environs of Calcutta' (Map).

৮৩. A. K. Ray, p. 111.

৮৪. Guide, p. 23.

৮৫. A. K. Ray, p. 112.

৮৬. List, List of Streets : Old and New, pp. 5, 11.

৮৭. Bengal Directory, p. 18.

৮৮. A. K. Ray, p. 112.

৮৯. Thacker-10.

৯০. List, List of Streets : Old & New, p. 10.

৯১. Ibid., p. 13.

৯২. Thacker-77.

৯৩. New Calcutta, p. 95.

৯৪. 'সমাচার দর্পণ', ১৯ ডিসেম্বর ১৮৩৫ [দ্র. হরিপদ ভৌমিক (সম্পা.), 'সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতা', দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা-চর্চা কেন্দ্র, ১৯৮৮, পৃঃ ২৬২]। অবশ্য জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি সংলগ্ন অঞ্চলটি সংবাদে মেছোবাজার নামে

অভিহিত হয়েছে। তখন অঞ্চলটি ঐ নামেই পরিচিত ছিল। দ্র. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র জীবনী', প্রথম খণ্ড (বিশ্বভারতী, ২য় সং. ১৩৫৩), পৃঃ ৪।

৯৫. A. K. Ray, p. 15.

৯৬. New Calcutta, p. 51.

৯৭. Bengal Directory, p. 103.

৯৮. Cones, p. 47.

৯৯. 'Thacker's Indian Directory, 1886' (Thacker, Spink & Co., Calcutta 1886), p. 302. [পরবর্তী টীকায় 'Directory-86' নামে উল্লিখিত]

১০০. A. K. Ray, p. 110.

১০১. A. K. Ray, p. 112.

১০২. মধুসূদন মজুমদার, 'গানের যাদুকর কৃষ্ণচন্দ্র', 'দক্ষিণীবার্তা', শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৭, পৃঃ ৮৮-৯১। এছাড়া দ্র. নির্মলকুমার রায়, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থপরিক্রমা' (নবভারতী, ১৯৮৫), পৃঃ ২২১-২২৩।

১০৩. মানচিত্র পৃঃ ৫, ২৩।

১০৪. 'Skeleton Map of Calcutta, Town and Suburbs and Baranagore (Section B)' [পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগারে রক্ষিত এই মানচিত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট সারভেয়ার জেনারাল C. Strahan-এর সই থাকলেও প্রকাশকালের উল্লেখ নেই। পরবর্তী টীকায় 'Strahan' নামে উল্লিখিত]।

১০৫. Map 1861.

১০৬. 'Thacker's Indian Directory, 1907' (Thacker, Spink & Co., Calcutta, 1907), p. 1080. [পরবর্তী টীকায় 'Directory 1907' নামে উল্লিখিত]

১০৭. A. K. Ray, p. 112.

১০৮. Map. 1861.

১০৯. List, List of Streets : Old and New, p. 13.

১১০. Ibid., p. 5.

১১১. Ibid., p. 1.

১১২. Ibid., p. 6.

১১৩. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, 'কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা' (মহেন্দ্র পাবলিশিং, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৭৫), পৃঃ ১। [পরবর্তী টীকায় 'মহেন্দ্রনাথ' নামে উল্লিখিত]

১১৪. New Calcutta, p. 114.

১১৫. Bengal Directory, p. 103.

১১৬. New Calcutta, p. 87.

১১৭. Cones, p. 47.

১১৮. A. K. Ray, p. 111.

১১৯. Ibid., p. 112.
১২০. List, List of Streets : Old & New, pp. 2, 10
১২১. Thacker-10.
১২২. New Calcutta, p. 76.
১২৩. A. K. Ray, p. 112.
১২৪. Cones, p. 44.
১২৫. List, List of Streets : Old & New, p. 7.
১২৬. সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'কালীক্ষেত্র দীপিকা' (পুস্তক বিপণি, ১৯৮৬, হরিপদ ভৌমিক সম্পাদিত সং), পৃঃ ৮৭ ও মানচিত্র।
১২৭. List, List of Streets : Old & New, p. 13.
১২৮ Ibid., pp. 4, 5, 10.
১২৯. ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহারা' (ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ১৩৩৪), পৃঃ ১৩০।
১৩০. List, List of Streets : Old & New, p. 5.
১৩১. Thacker-77.
১৩২. New Calcutta, p. 141.
১৩৩. খিদিরপুর, পৃঃ ২৫।
১৩৪. New Calcutta, p. 150.
১৩৫. List, List of Streets : Old & New, p. 11.
১৩৬. Directory 1907, p. 1080.
১৩৭. A. K, Ray, p. 111.
১৩৮. Cones, p. 63.
১৩৯. Ibid., p. 139.
১৪০. A. K. Ray, p. 112.
১৪১. List, List of Streets : Old and New, p. 2.
১৪২. Ibid., p. 5.
১৪৩. Cones, p. 173.
১৪৪. Map 1861.
১৪৫. 'Calcutta Municipal Gazette', January 5, 1957, p. 243.
১৪৬. List, List of Streets : Old and New, p. 5.
১৪৭. Ibid., p. 8.
১৪৮. 'Map of Calcutta Shewing the Latest Improvements As Existing in 1856,...By W. Heysham'. [পরবর্তী টীকাগুলিতে 'Heysham' নামে উল্লিখিত]
১৪৯. A. K. Ray, p. 112.
১৫০. Ibid., p. 111.

১৫১. List, List of Streets : Old and New, p. 13.

১৫২. প্রাণকৃষ্ণ, পৃঃ ৮৩।

১৫৩. বসন্তকুমার বসু, 'কায়স্থ পরিচয়', কলিকাতা খণ্ড (কলকাতা, ১৩২৮), পৃঃ ১১৪।

১৫৪. নগেন্দ্রনাথ শেঠ, 'কলিকাতাস্থ তন্তুবণিক জাতির ইতিহাস' (কলকাতা, ১৯৫০), পৃঃ ১৪৪। [পরবর্তী টীকায় 'নগেন্দ্রনাথ শেঠ' নামে উল্লিখিত]

১৫৫. Cones, p. 30.

১৫৬. List, List of Streets : Old & New, pp. 3, 14.

১৫৭. A. K. Ray, p. 111.

১৫৮. List, List of Streets : Old & New, p. 5.

১৫৯. Cones, p. 77.

১৬০. List, List of Streets : Old & New, p. 5.

১৬১. মহেন্দ্রনাথ, পৃঃ ১।

১৬২. প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'প্রাণকুমারের স্মৃতিচারণ' (আনন্দধারা, ১৩৭৪), পৃঃ ১৫০।

১৬৩. Cones, p. 163. [রাস্তাটির সঠিক নাম 'রামচন্দ্র ঘোষ লেন' নয়, 'রামচাঁদ ঘোষ লেন']

১৬৪. A. K. Ray, p. 112.

১৬৫. List, List of Streets : Old & New, pp. 5, 6.

১৬৬. Bholanath Chunder, 'Calcutta Its Origin and Growth', 'Calcutta University Magazine', Vol. IV, nos. 4, 6-10, April, June-October, 1897. As reprinted in Alok Ray (ed.), 'Calcutta Keepsake' (Rddhi, 1978), p. 55.

১৬৭. List, List of Streets : Old & New, p. 7.

১৬৮. A. K. Ray, p. 112.

১৬৯. 'Thacker's Calcutta Directory, 1939-40', Calcutta Streets, p. 111.

১৭০. Cones, p. 57.

১৭১. A. K. Ray, p. 111.

১৭২. Map 1861.

১৭৩. List, List of Streets : Old & New, pp. 2, 4.

১৭৪. New Calcutta, p. 154.

১৭৫. A. K. Ray, p. 111.

১৭৬. Map 1861.

১৭৭. Ibid.

১৭৮. List, List of Streets : Old & New, p. 5.

১৭৯. সুবর্ণবণিক হিতসাধনী সভার তালিকায় কুমার দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ঠিকানা

রয়েছে 'জোড়াসাঁকো দয়েপটী'। দীনেন্দ্রনারায়ণের বাড়ির (জোড়াসাঁকো রাজবাড়ি) কল্যাণে অঞ্চলটি শনাক্ত করা যাচ্ছে।—দ্র. নরেন্দ্রনাথ লাহা, 'সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি', ২য় খণ্ড (কলকাতা, ১৯৪১), পৃঃ ১৬৬। [পরবর্তী টীকায় 'সুবর্ণবণিক' নামে উল্লিখিত]

১৮০. Cones, p. 15.
১৮১. List, List of Streets : Old & New, p. 6.
১৮২. List, List of Streets : Old & New, p. 6.
১৮৩. Cones, p. 191.
১৮৪. A. K. Ray, p. 112. এছাড়াও দ্র. Map. 1861.
১৮৫. List, List of Streets : Old & New, p. 8.
১৮৬. Ibid., p. 7.
১৮৭. মানচিত্র, পৃঃ ৩৫।
১৮৮. List, List of Streets : Old & New, p. 1.
১৮৯. Ibid., p. 10.
১৯০. Ibid., p. 3.
১৯১. Cones, p. 191.
১৯২. নগেন্দ্রনাথ শেঠ, পৃঃ ৩৮।
১৯৩. Schalch.
১৯৪. সুবর্ণবণিক, পৃঃ ১৭৫, ১৭৬।
১৯৫. 'ভারত-সংস্কারক', ৩০ শ্রাবণ ১২৮১, পৃঃ ২০৫।
১৯৬. জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, 'বংশ-পরিচয়', ২৬ খণ্ড (কলকাতা, ১৩৫৬), পৃঃ ১৬১।
১৯৭. New Calcutta, p. 113.
১৯৮. Ibid., p. 20.
১৯৯. A. K. Ray, p. 111.
২০০. List, List of Streets : Old & New, p. 4.
২০১. খিদিরপুর, পৃঃ ২৫।
২০২. Strahan.
২০৩. বিশ্বকোষ, পৃঃ ২৮২।
২০৪. List, List of Streets : Old & New, p. 1, 6.
২০৫. A. K. Ray, p. 112.
২০৬. Thacker-10.
২০৭. A. K. Ray, p. 112.
২০৮. List, List of Streets : Old & New, p. 5.
২০৯. রাজেন্দ্রকুমার মিত্র, 'গোকুলচন্দ্র মিত্র ও সেকালের কলিকাতা', প্রথম ভাগ (আর. কে. পাবলিশিং, ১৩৫৮), পৃঃ ৪৬।

২১০. List, List of Streets : Old & New, p. 12.
২১১. Cones, p. 153.
২১২. মানচিত্র, পৃঃ ২৭।
২১৩. Thacker-77.
২১৪. Map 1861.
২১৫. A. K. Ray, p. 112.
২১৬. List, List of Streets : Old & New, p. 2.
২১৭. Bengal Directory, p. 103.
২১৮. Map 1861.
২১৯. List, List of Streets : Old & New, p. 13.
২২০. Ibid., p. 3.
২২১. List, List of Streets : Old & New, p. 4.
২২২. প্রাণকৃষ্ণ, পৃঃ ৬১।
২২৩. A. K. Ray, p. 112.
২২৪. Heysham.
২২৫. A. K. Ray, p. 111.
২২৬. Schalch.
২২৭. A. K. Ray, p. 112.
২২৮. 'The Bengal Almanac for 1856', part VIII, p. 4.
২২৯. Bengal Directory, p. 137.
২৩০. List, List of Streets : Old & New, p. 5.
২৩১. Ibid., p. 11.
২৩২. Ibid., p. 5.
২৩৩. Ibid., p. 8.
২৩৪. Smart's Plan, Sheet No. A-19.
২৩৫. Thacker-10.
২৩৬. List, List of Streets : Old & New, p. 12.
২৩৭. Cones, p. 128.
২৩৮. Ibid., p. 38.
২৩৯. Sarat Chandra Mitra. 'Old Calcutta', 'National Magazine', New Series, no. 12, December 1889. As reprinted in Alok Ray (ed.), 'Nineteenth Century Studies', No. 5 (Calcutta, 1974), p. 102.
২৪০. A. K. Ray, p. 112.
২৪১. Thacker-77.

২৪২. Map 1861.
২৪৩. List, List of Streets : Old & New, pp. 7, 8.
২৪৪. Mendes' Map.
২৪৫. A. K. Ray, p. 111.
২৪৬. Ibid.
২৪৭. Guide, pp. 93-94.
২৪৮. Directory-86, p. 300.
২৪৯. New Calcutta, p. 70.
২৫০. List, List of Streets : Old & New, p. 1.
২৫১. বিশ্বকোষ, পৃঃ ২৮২।
২৫২. A. K. Ray, p. 112.
২৫৩. List, List of Streets : Old & New, pp. 3, 4.
২৫৪. Ibid., p. 5.
২৫৫. Map 1861.
২৫৬. List, List of Streets : Old & New, p. 6.
২৫৭. A. K. Ray, p. 111.
২৫৮. 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১ বর্ষ ২ সংখ্যা, আশ্বিন ১২৭০, পৃঃ ২৮।
২৫৯. List, List of Streets : Old & New, p. 5.
২৬০. Schalch.
২৬১. H. Blochmann, 'Calcutta during last Century' (Calcutta, 1868). As reprinted in Alok Ray (ed.), 'Calcutta Keepsake' (Rddhi, 1978), p. 79.
২৬২. A. K. Ray, p. 111.
২৬৩. Bengal Directory, p. 103.
২৬৪. Directory-86, p. 302.
২৬৫. A. K. Ray, p. 112
২৬৬. Schalch.
২৬৭. List, List of Streets : Old & New, p. 7.
২৬৮. Ibid., p. 2.
২৬৯. A. K. Ray, p. 112.
২৭০. List, List of Streets : Old & New, p. 11.
২৭১. A. K. Ray, p. 111.
২৭২. List, List of Streets : Old & New, p. 7.
২৭৩. A. K. Ray, p. 112.
২৭৪. List, List of Streets Old & New, p. 9.

২৭৫. A. K. Ray, p. 111.
২৭৬. List, List of Streets : Old & New, p. 5.
২৭৭. Ibid., p. 2.
২৭৮. Ibid., p. 8.
২৭৯. Bengal Directory, p. 187 ; New Calcutta, p. 150.
২৮০. List, List of Streets : Old & New, p. 5.
২৮১. A. K. Ray, p. 112.
২৮২. Thacker-10.
২৮৩. List, List of Streets : Old & New, p. 8.
২৮৪. Ibid., p. 3.
২৮৫. New Calcutta, p. 52.
২৮৬. A. K. Ray, p. 112.
২৮৭. 'Thacker's Calcutta Directory, 1939-40', Calcutta Streets,-p. 131.
২৮৮. List, List of Streets : Old & New, p. 9.
২৮৯. New Calcutta, p. 100.
২৯০. List, List of Streets : Old & New, p. 11.
২৯১. Ibid., p. 9.
২৯২. Ibid., pp, 10, 11, 13.
২৯৩. Map 1861.
২৯৪. নগেন্দ্রনাথ শেঠ, পৃঃ ১০৯।
২৯৫. New Calcutta, p. 87.
২৯৬. Cones, p. 106.
২৯৭. খিদিরপুর, পৃঃ ৮৬।
২৯৮. Cones, p. 50.
২৯৯. List, List of Streets : Old & New, p. 4.
৩০০. New Calcutta, p. 125.
৩০১. Thacker-77.
৩০২. Directory-86, p. 317.
৩০৩. List, List of Streets : Old & New, p. 2.
৩০৪. Ibid., p. 6.
৩০৫. Cones, p. 48.
৩০৬. A. K. Ray, p. 112.
৩০৭. List, List of Streets : Old & New, p. 8.
৩০৮. Map 1861.

৩০৯. Thacker-10.
৩১০. List, List of Streets : Old & New, p. 2.
৩১১. Ibid., p. 8.
৩১২. 'Thacker's Calcutta Directory, 1939-40', Calcutta Streets, p. 134.
৩১৩. List, List of Streets : Old & New, p. 14.
৩১৪. বিশ্বকোষ, পৃঃ ২৮৫।
৩১৫. Thacker-77.
৩১৬. Mendes' Map.
৩১৭. Thacker-10.
৩১৮. Map 1861.
৩১৯. Thacker-10.
৩২০. Ibid. [বর্তমান মানচিত্রের সঙ্গে তুলনীয়]
৩২১. List, List of Streets : Old & New, p. 8.
৩২২. 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ৭ কল্প ২ ভাগ, ৩৯ বর্ষ, ৪৪১-৪৪২ সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৮, পৃঃ ১৭১। এছাড়াও দ্র. হরিশচন্দ্র কবিরত্ন, 'সেকালের সংস্কৃত কলেজ', 'প্রবাসী', ভাদ্র ১৩৩২, পৃঃ ৬৪৯।
৩২৩. Schalch.
৩২৪. Ibid.
৩২৫. List, List of Streets : Old & New, pp. 2, 3.
৩২৬. A. K. Ray, p. 112.
৩২৭. List, List of Streets : Old & New. p. 5.
৩২৮. Ibid., p. 11.
৩২৯. বাণী নাগ (মুখোপাধ্যায়), 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়' (কলকাতা, ১৯৯০), পৃঃ ১১, ২৫।
৩৩০. List. List of Streets : Old & New, p. 4.
৩৩১. A. K. Ray, p. 111.
৩৩২. Ibid.
৩৩৩. Ibid.
৩৩৪. List, List of Streets : Old & New, p. 5.
৩৩৫. Heysham.
৩৩৬. A. K. Ray, p. 112.
৩৩৭. Schalch.
৩৩৮. Map 1861.
৩৩৯. রাধারমণ মিত্র, 'কলিকাতা-দর্পণ', প্রথম পর্ব (সুবর্ণরেখা, ১৯৮০), পৃঃ ১১৮-১১৯।

৩৪০. A. K. Ray, p. 112.

৩৪১. Uma Guha, 'A Short Sample Survey of the Socio-economic Conditions of Saheb-bagan Bustee, Rajabazar, Calcutta' (Govt. of India, Dept. of Anthropology, 1958), p. 1.

৩৪২. List, List of Streets : Old & New, p. 9.

৩৪৩. A. K. Ray, p. 111.

৩৪৪. Thacker-10.

৩৪৫. রাধানাথ মল্লিক লেনের চারুচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও ক্ষেত্রচন্দ্র মল্লিকের মধ্যে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল সম্পাদিত সম্পত্তি বিভাজনের দলিল।

৩৪৬. বিশ্বকোষ, পৃঃ ২৮৫।

৩৪৭. List, List of Streets : Old & New, p. 3.

৩৪৮. New Calcutta, p. 52.

৩৪৯. Cones, p. 76.

৩৫০. List, List of Streets : Old & New, p. 4.

৩৫১. মহেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৫৪।

৩৫২. Directory-95, p. 369.

৩৫৩. Directory 1907, p. 1046.

৩৫৪. Cones, p. 198.

৩৫৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.) 'হুতোম পঁ্যাচার নক্শা ও অন্যান্য সমাজ-চিত্র' (সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৯১, চতুর্থ মুদ্রণ), পৃঃ ৩৬।

৩৫৬. List, List of Streets : Old & New, p. 9.

৩৫৭. Ibid., pp. 1, 4, 5.

৩৫৮. Ibid., p. 9.

৩৫৯. ত্রৈলোক্যনাথ দেব, 'অতীতের ব্রাহ্মসমাজ' (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ১৯৭৯), পৃঃ ১৩।

৩৬০. New Calcutta, p. 57.

৩৬১. List, List of Streets : Old & New, p. 12.

৩৬২. বিশ্বকোষ, পৃঃ ২৮২।

স্বীকৃতি : পল্লীনামের জন্য সরেজমিন অনুসন্ধানকালে বহু ব্যক্তি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। গড়পার-রাজাবাজার অঞ্চলের পল্লীনামের ব্যাপারে শ্রীঅমল দে ও বেলেঘাটা অঞ্চলের পল্লীনামের জন্য 'নাগরিক সমাচার' পত্রিকার কর্মীবৃন্দ, শ্রীদীপক সেনগুপ্ত ও প্রয়াত হিতেশরঞ্জন সান্যাল বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

উদয়ন মিত্র

কোম্পানির চিঠিপত্রে কলকাতার নগরায়ণ

একটি বিষয়ভিত্তিক তালিকা

উনিশ শতকে বিশ্ব-মানচিত্রে যেসব উল্লেখযোগ্য ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে শহর হিসাবে কলকাতার আত্মপ্রকাশ অন্যতম। উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে একদিকে যেমন কলকাতার বহিরঙ্গ বিকশিত হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি এ শহরকে কেন্দ্র করে ঘটে গিয়েছিল এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পালাবদল। কলকাতার গ্রাম্য চরিত্র অবশ্য বদলাতে শুরু করে আঠারো শতকের সত্তরের দশক থেকেই। তখন থেকেই কোম্পানির উদ্যোগে গড়ে ওঠে রাস্তাঘাট, হাট-বাজার, নিশ্চিত করা হয় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে এইভাবে যে নগরায়ণ-পর্ব শুরু হয়, তা সুসংহত হয়ে ওঠে লর্ড ওয়েলেসলির সময়ে। ওয়েলেসলি ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে গঠন করেন লটারি-কমিটি। কলকাতার নাগরিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই কমিটির ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ওয়েলেসলির অনুবর্তী শাসকদেরও সজাগ দৃষ্টি ছিল কলকাতার নগরায়ণের দিকে। অর্থাৎ কোম্পানির শাসনকালেই কলকাতার নাগরিক রূপ ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে আরম্ভ করে।

কোম্পানির কোর্ট অফ ডিরেক্টরসের প্রাপ্ত ও প্রদত্ত চিঠিপত্রে তৎকালীন নগরায়ণ-পদ্ধতির প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টে সেগুলিকে হয়তো খণ্ডচিত্র মনে হবে। কিন্তু কালক্রম অনুসারে চিঠিগুলিকে সাজালে, কোম্পানির শাসনকালে কলকাতার যে ক্রমিক নগরায়ণ সঙ্ঘটিত হয়েছিল, তার রূপরেখা বেরিয়ে আসে। চিঠিগুলি থেকে কলকাতার উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলা ও পুলিশি-ব্যবস্থা, পৌরজীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, গঙ্গার ঘাট-রাস্তা-জলাশয় নির্মাণ ও সংস্কারের বিবরণ ইত্যাদি বিষয় জানা যায়। সীমিত পরিসরের কোনো প্রবন্ধে এই বিপুলসংখ্যক চিঠিপত্রের সার-সঙ্কলন করা সম্ভব নয়। আমরা তাই কলকাতা-বিষয়ক চিঠিগুলির একটি বিষয়ভিত্তিক তালিকা করে দিলাম। মূল নথিগুলি রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগারে।

কোর্ট অফ ডিরেক্টরসের প্রাপ্ত চিঠি : ১৮০০-১৮৫৬

এই শ্রেণীর চিঠিগুলি রয়েছে কালানুক্রমিক ছেচল্লিশটি খণ্ডে। তার মধ্যে ১০, ২৯,

৩০, ৪১, ৪৪, ৪৫ এবং ৪৬ সংখ্যক খণ্ডগুলিতে কলকাতা-বিষয়ক কোনো চিঠিপত্র নেই। বাকি খণ্ডগুলির কলকাতা-বিষয়ক চিঠির তালিকা দেওয়া হল।

১ম খণ্ড : অক্টোবর ২৭, ১৭৯৩—সেপ্টেম্বর ৩০, ১৮০২

১. সেপ্টেম্বর ৫, ১৮০০=ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।

২য় খণ্ড : ফেব্রুয়ারি ২৮, ১৮০৩—ডিসেম্বর ৩০, ১৮০৯

১. সেপ্টেম্বর ৩০, ১৮০৩=কলকাতার উন্নয়ন।
২. মার্চ ১, ১৮০৫ =কলকাতায় মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা। রাস্তাঘাট নির্মাণ।
৩. অক্টোবর ১৭, ১৮০৫=কলকাতার উন্নয়ন।
৪. ফেব্রুয়ারি ৭, ১৮০৭= ঐ । মানসিক হাসপাতাল।
৫. জুলাই ৩১, ১৮০৭ =কলকাতার পৌর রাজস্ব।
৬. জানুয়ারি ৩০, ১৮০৮=কলকাতার উন্নয়ন।
৭. সেপ্টেম্বর ১৫, ১৮০৮= ঐ ।
৮. এপ্রিল ৭, ১৮০৮ = ঐ । উন্নয়ন-প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহের জন্য লটারির সাহায্য গ্রহণ।

৩য় খণ্ড : জানুয়ারি ৭, ১৮১০—অক্টোবর ২, ১৮১৩

১. ফেব্রুয়ারি ২৮, ১৮১০=লটারি তহবিল ও শহরের উন্নয়ন।
২. নভেম্বর ২৪, ১৮১০ =কলকাতার উন্নয়ন।
৩. অক্টোবর ২৯, ১৮১১ = ঐ ।
৪. ডিসেম্বর ৩১, ১৮১১ = ঐ ।
৫. এপ্রিল ২৫, ১৮১২ = ঐ ।
৬. জানুয়ারি ৩০, ১৮১৩ = ঐ । কলকাতার 'হাউস ট্যাক্স'।

৪র্থ খণ্ড : মার্চ ১, ১৮১৪—অক্টোবর ১৭, ১৮১৫

১. মে ২০, ১৮১৪ =কলকাতার সীমানাবৃদ্ধির পরিকল্পনা ও তৎসংক্রান্ত আইন।
২. অক্টোবর ৭, ১৮১৫ =নব্য পুলিশ-প্রশাসন। কলকাতার উন্নয়ন প্রকল্প। কলকাতার পুলিশ।

৫ম খণ্ড : জানুয়ারি ১৩, ১৮১৬—অক্টোবর ২৯, ১৮১৭

১. মার্চ ১, ১৮১৭ =কলকাতার পুলিশ।

২. জুলাই ৪, ১৮১৭ =কলকাতার উন্নয়ন।
৩. অক্টোবর ২৯, ১৮১৭ =কলকাতার উন্নয়ন-প্রকল্প। কলেরার প্রকোপ বৃদ্ধি। জলাশয় খনন।

৬ষ্ঠ খণ্ড : জুন ১, ১৮১৮—ডিসেম্বর ২৯, ১৮২০

১. জুলাই ২২, ১৮১৮ =পুলিশ প্রশাসন। কলেরার প্রকোপ। জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থব্যয়।
২. ডিসেম্বর ১, ১৮১৯ =কলেরা। জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম।
৩. ফেব্রুয়ারি ১, ১৮২০ =রাস্তাঘাট নির্মাণ ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজ।
৪. নভেম্বর ৩, ১৮২০ = ঐ । কলেরা।

৭ম খণ্ড : ডিসেম্বর ৭, ১৮২১—সেপ্টেম্বর ২৯, ১৮২৫

১. ডিসেম্বর ৭, ১৮২১ =কলকাতায় জুয়াখেলা বন্ধে ব্যবস্থা। কলেরা মহামারী।
২. এপ্রিল ১০, ১৮২৩ =কলকাতার ইউরোপীয় ও আমেরিকান অধিবাসী।
৩. সেপ্টেম্বর ২৫, ১৮২৫ =লটারি কমিটির সংবিধান ও কার্যাবলী। কলকাতার উন্নয়নের হিসাব। হিন্দু কলেজ। কলকাতা মাদ্রাসা। কলকাতার রাস্তাঘাট : ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও স্ট্রিট, কলেজ স্কোয়ার ও স্ট্রিট, ওয়েলেসলি স্কোয়ার ও স্ট্রিট, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, স্ট্র্যাণ্ড রোড।

৮ম খণ্ড : মে ১১, ১৮২৬—ডিসেম্বর ৭, ১৮২৬

১. জুলাই ২৬, ১৮২৬ =কলকাতার পুলিশ ও লালবাজার পুলিশ দপ্তর।

৯ম খণ্ড : ফেব্রুয়ারি ২২, ১৮২৭—ডিসেম্বর ৬, ১৮২৭

১. এপ্রিল ১২, ১৮২৭ =কলকাতার উন্নয়নে লটারি কমিটির কাজে নজরদারির জন্য গঠিত কমিটির কার্যবিবরণী [এখানে পাওয়া যাবে পুরনো পথঘাট সংস্কার এবং নতুন পথঘাট নির্মাণের বিবরণ]।
২. অগাস্ট ৩০, ১৮২৭ =লটারি কমিটির কার্যাবলী।
৩. ডিসেম্বর ৬, ১৮২৭ =রাস্তাঘাট, সেতু ও পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ।

১১শ খণ্ড : ফেব্রুয়ারি ৫, ১৮২৯—ডিসেম্বর ৩০, ১৮২৯

১. নভেম্বর ৬, ১৮২৯ =কলেরা মহামারী। মানসিক হাসপাতাল। পুলিশ-প্রতিবেদন। উন্নয়ন পরিষদের ব্যয়। রাস্তাঘাট নির্মাণ

ও সংস্কারে লটারি কমিটির ব্যয়। জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়।

১২শ খণ্ড : মে ২৮, ১৮৩০—ডিসেম্বর ২৮, ১৮৩০

১. নভেম্বর ৯, ১৮৩০ =রাজচন্দ্র দাসের স্নানের ঘাটের প্রসঙ্গ। জনকল্যাণমূলক কাজ।

২. ডিসেম্বর ২৮, ১৮৩০ =কলকাতার পুলিশি-ব্যবস্থার বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য নতুন কমিটি গঠন এবং এই কমিটির প্রস্তাবিত নতুন ব্যবস্থাসমূহ।

১৩শ খণ্ড : জানুয়ারি ৪, ১৮৩১—নভেম্বর ১, ১৮৩১

১. অক্টোবর ১৮, ১৮৩১ =চৌরঙ্গি অঞ্চলে পশুচারণের অধিকার নিয়ে সরকারি নির্দেশ।

১৪শ খণ্ড : জানুয়ারি ৩, ১৮৩২—ডিসেম্বর ৩১, ১৮৩২

১. জুলাই ৩১, ১৮৩২ =লটারি কমিটির প্রতিবেদন।

১৫শ খণ্ড : জানুয়ারি ২৯, ১৮৩৩—নভেম্বর ৩০, ১৮৩৩

১. নভেম্বর ৩০, ১৮৩৩ =লটারি কমিটির প্রতিবেদন।

১৬শ খণ্ড : জানুয়ারি ২১, ১৮৩৪—অক্টোবর ২৬, ১৮৩৪

১. সেপ্টেম্বর ১৫, ১৮৩৪ =অবৈধ মুদ্রা প্রস্তুতকারকদের শনাক্তকরণের জন্য পুরস্কার। জল দিয়ে কলকাতার রাস্তাঘাট পরিষ্কার করার পরিকল্পনা।

১৭শ খণ্ড : মার্চ ১৭, ১৮৩৫—নভেম্বর ১৫, ১৮৩৬

১. জুলাই ১২, ১৮৩৬ =অবৈধ মুদ্রা প্রস্তুতকারকদের বিচার। গঙ্গার ধারে স্নানের ঘাট নির্মাণ। কলকাতার জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় বরাদ্দ। লটারি কমিটি। নিমতলা শ্মশানঘাট।

২. জুলাই ১৯, ১৮৩৬ =ফিভার হাসপাতাল।

৩. সেপ্টেম্বর ৮, ১৮৩৬ =কলকাতার পুলিশ। জনকল্যাণমূলক কাজ। লটারি কমিটি।

৪. সেপ্টেম্বর ২৪, ১৮৩৬ =লটারি কমিটি।

৫. নভেম্বর ৮, ১৮৩৬ =কলকাতার জন্য বিবিধ ব্যয়। জোড়াবাগান পুলিশ থানা। লটারি কমিটি।

৬. নভেম্বর ১০, ১৮৩৬ =১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের প্রথম তিন মাসের জনকল্যাণমূলক কাজের বর্ণনা। টাউন হল।

১৮শ খণ্ড : জানুয়ারি ১৭, ১৮৩৭—অক্টোবর ৪, ১৮৩৭

১. জানুয়ারি ৩, ১৮৩৭ =ফিভার হাসপাতাল, পুলিশ হাসপাতাল ও অন্যান্য চিকিৎসালয়।

২. এপ্রিল ১১, ১৮৩৭ =জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়। সংরক্ষণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত পরিষদের জন্য ব্যয়। লটারি কমিটি।

৩. এপ্রিল ২৫, ১৮৩৭ ='রোড ওয়ার্কস'-এর তিন মাসের প্রতিবেদন।

৪. অগাস্ট ৮, ১৮৩৭ =কলকাতার 'ওয়াটারিং ফাণ্ড'। রামমোহন মল্লিককে স্ট্র্যাণ্ড রোডে স্নানের ঘাট নির্মাণের অনুমতি।

৫. অগাস্ট ১২, ১৮৩৭ =কলকাতা-ঢাকা রাজপথ। রাস্তাঘাট, সেতু ও পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ।

১৯শ খণ্ড : জানুয়ারি ৩, ১৮৩৮—নভেম্বর ২০, ১৮৩৮

১. জানুয়ারি ৩, ১৮৩৮ =বিদেশী-আইনের প্রয়োগ থেকে অব্যাহতি ও পৌর অধিকারের দাবিতে কলকাতার আরমানি অধিবাসীদের আবেদন।

২. জানুয়ারি ৫, ১৮৩৮ =কলকাতা শহরের পৌর উন্নতি। স্কটিশ মিশনের জন্য কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে জমি ক্রয়। জোড়াবাগান, বাগবাজার (২ নম্বর) ও পার্ক স্ট্রিট পুলিশ থানা। লটারি কমিটি।

৩. জুন ৩, ১৮৩৮ =কলকাতায় আগুন ও তা নির্বাপণের ব্যবস্থা। পুলিশ কর্মচারী প্রসঙ্গ। লটারি ও মিউনিসিপ্যাল কমিটি।

৪. জুন ৮, ১৮৩৮ =আলিপুর সেতুর কাছে 'রাইডিং স্কুলের' জন্য জমির ব্যবস্থা।

৫. অগাস্ট ২৩, ১৮৩৮ =সারকুলার খালের উপর সেতু (উল্টাডাঙা সেতু নামে পরিচিত) নির্মাণ।

৬. নভেম্বর ১৭, ১৮৩৮ =কলকাতা সংরক্ষণ সমিতি।

২০শ খণ্ড : জানুয়ারি ২০, ১৮৩৯—ডিসেম্বর ৩০, ১৮৩৯

১. ফেব্রুয়ারি ১২, ১৮৩৯=কলকাতায় কলেরার প্রাদুর্ভাব।

২. সেপ্টেম্বর ১৯, ১৮৩৯ =কলকাতার পুলিশ প্রশাসন।
৩. ডিসেম্বর ৪, ১৮৩৯ =কলকাতার উন্নতির জন্য লটারি।

২১শ খণ্ড : জানুয়ারি ১৮, ১৮৪০—ডিসেম্বর ২৯, ১৮৪০

১. জুন ২২, ১৮৪০ =কলকাতার সংরক্ষণ ব্যবস্থা।
২. জুলাই ২১, ১৮৪০ =১৮৪০ খ্রীস্টাব্দের প্রথম ও দ্বিতীয় লটারি।
৩. জুলাই ২৭, ১৮৪০ =জল দিয়ে রাস্তাঘাট পরিষ্কারের প্রসঙ্গ।

২২শ খণ্ড : জানুয়ারি ২১, ১৮৪১—নভেম্বর ১২, ১৮৪১

১. ফেব্রুয়ারি ২৭, ১৮৪১ =পুলিশ প্রশাসন। লটারি কমিটির কার্যাবলীর বিবরণ।
২. মার্চ ১৭, ১৮৪১ =আসাম টি কোম্পানি থেকে কয়েকজন চৈনিক কর্মচারীর পদচ্যুতি [এই চৈনিকরা কলকাতার অধিবাসী ছিলেন]।
৩. জুন ২২, ১৮৪১ =সাধারণ নগর পরিষদ গঠনের জন্য কলকাতার ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর প্রস্তাব। লটারি কমিটির তত্ত্বাবধানে ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দের প্রথম ও দ্বিতীয় লটারি।
৪. অক্টোবর ২৯, ১৮৪১ =রসা-পাগলার মানসিক হাসপাতাল।

২৩শ খণ্ড : জানুয়ারি ৮, ১৮৪২—ডিসেম্বর ২৯, ১৮৪২

১. ফেব্রুয়ারি ৫, ১৮৪২ =নতুন পৌর আইনের কার্যকারিতা। পুলিশ প্রতিবেদন (১৮৪০)। শহরের ধর্মীয় ও দাতব্য অট্টালিকাগুলির মূল্য নিরূপণ। উপযুক্ত অঞ্চলে লালবাজার থানা সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব।
২. ফেব্রুয়ারি ২৮, ১৮৪২ = কলকাতায় দমকল।
৩. মে ১৭, ১৮৪২ =রসা-পাগলার মানসিক হাসপাতাল। কলকাতায় কলেরা-রোধে বিশেষ ব্যবস্থা। ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দের পুলিশ-প্রতিবেদন। লটারি কমিটি।

২৪শ খণ্ড : মার্চ ১৭, ১৮৪৩—ডিসেম্বর ২৭, ১৮৪৩

১. মে ১৬, ১৮৪৩ =কলকাতায় অপরাধ-বৃদ্ধি প্রসঙ্গে রামকমল সেন ও অন্যান্যদের আবেদন। পুলিশ বিভাগে প্রশাসনিক পরিবর্তন।
২. মে ২৩, ১৮৪৩ =কলেরা ও তার প্রতিষেধক ব্যবস্থা। লটারি কমিটির বিবরণ।

৩. জুন ৮, ১৮৪৩ =কলকাতার জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্বন্ধে হেনরি উডের প্রতিবেদন। এসপ্ল্যানেড অঞ্চলের ইজারা।

২৫শ খণ্ড : জানুয়ারি ১৫, ১৮৪৪—ডিসেম্বর ৩১, ১৮৪৪

১. অগাস্ট ২৮, ১৮৪৪ =এলেনবোরা রাইডিং কোর্সের জন্য খরচ। কলকাতার 'হাউস ট্যাক্স'।

২. ডিসেম্বর ১২, ১৮৪৪ =সরকারি লটারির বিষয়ে নগরাধ্যক্ষের প্রতিবেদন। জল-বসন্তের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা।

২৬শ খণ্ড : জানুয়ারি ১০, ১৮৪৫—নভেম্বর ৪, ১৮৪৫

১. মার্চ ২২, ১৮৪৫ =কলকাতার রাস্তাঘাটের অবস্থা।

২. অক্টোবর ১৩, ১৮৪৫ =জল-সরবরাহের জন্য চাঁদপাল ঘাটে 'ওয়াটার ওয়ার্কস' নির্মাণ।

৩. নভেম্বর ৪, ১৮৪৫ =কলকাতার পয়ঃপ্রণালী প্রসঙ্গে ফিভার হাসপাতাল ও মিউনিসিপ্যাল কমিটির প্রতিবেদন।

২৭শ খণ্ড : জানুয়ারি ৭, ১৮৪৬—ডিসেম্বর ১১, ১৮৪৬

১. সেপ্টেম্বর ২১, ১৮৪৬ =পুলিশ : লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্তৃক ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে নিযুক্ত কমিটির প্রতিবেদন।

২৮শ খণ্ড : জানুয়ারি ৭, ১৮৪৭—ডিসেম্বর ২৮, ১৮৪৭

১. জানুয়ারি ২০, ১৮৪৭ =কুলিবাজারে পুলিশের কার্যকলাপ। কলকাতার পুলিশ বাহিনী। কলকাতায় অপরাধের পরিসংখ্যান (১৮৪৫-৪৬)।

২. মে ১, ১৮৪৭ =জনগণের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় আইন।

৩১শ খণ্ড : জুলাই ৭, ১৮৪৯—ডিসেম্বর ২৪, ১৮৪৯

১. সেপ্টেম্বর ১১, ১৮৪৯ =কলকাতার রাস্তায় গ্যাসের আলো।

৩২শ খণ্ড : ফেব্রুয়ারি ১, ১৮৫০—জুন ২৬, ১৮৫০

১. ফেব্রুয়ারি ৯, ১৮৫০ =ফিভার হাসপাতাল কমিটির অবসান।

২. মে ২০, ১৮৫০ =কলকাতার 'ইউরোপীয় অঞ্চলে' দেশীয়দের মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি।

৩৩শ খণ্ড : জুলাই ১, ১৮৫০—ডিসেম্বর ৩১, ১৮৫০

১. অগাস্ট ৮, ১৮৫০ =এসপ্ল্যানেড, পুলিশ থানা ও অন্যান্য অঞ্চলে আলোর ব্যবস্থা করার প্রসঙ্গে জি. এইচ. স্ট্যাথামের প্রস্তাব।

২. অক্টোবর ২, ১৮৫০ =কলকাতায় শান্তিস্থাপনের জন্য বিশেষ কমিশন গঠন। রাস্তাঘাট সংস্কারে ব্যয়। কলকাতায় জলবসন্তের প্রকোপ।

৩. ডিসেম্বর ৩১, ১৮৫০ =কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে বাষ্প-চালিত নৌ-পরিবহণে সরকারি সাহায্য। পৌর প্রশাসন। যানবাহন, ঘোড়া, বাড়িঘর থেকে সংগৃহীত কর।

৩৪শ খণ্ড : জানুয়ারি ২৮, ১৮৫১—জুন ২৭, ১৮৫১

১. এপ্রিল ১৭, ১৮৫১ =পুলিশ প্রশাসন ও পরিচালন-পদ্ধতি সম্পর্কিত নিয়মাবলী। কুলিবাজার ও ফোর্ট উইলিয়াম অঞ্চলের অধিবাসীদের দায়দায়িত্ব।

২. জুন ২৭, ১৮৫১ =বাড়িঘর ও যানবাহনের উপর নতুন কর আরোপের প্রস্তাব। ঘোড়ার গাড়ির উপর কর আরোপের বিরুদ্ধে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিবাদ। হাউস ট্যাক্স বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কয়েকজনের প্রতিবাদ।

৩৫শ খণ্ড : জুন ২৮, ১৮৫১—ডিসেম্বর ৪, ১৮৫১

১. সেপ্টেম্বর ২৪, ১৮৫১ =এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে আলোর ব্যবস্থা।

৩৬শ খণ্ড : জানুয়ারি ৫, ১৮৫২ জুন ২৮, ১৮৫২

১. ফেব্রুয়ারি ১৬, ১৮৫২ =কলকাতার জনগণনা।

২. মার্চ ১৬, ১৮৫২ =খিদিরপুর থেকে আলিপুর পর্যন্ত রাস্তাঘাটের সংস্কার।

৩৭শ খণ্ড : জুলাই ১, ১৮৫২—ডিসেম্বর ২৯, ১৮৫২

১. অক্টোবর ৩০, ১৮৫২ =পুলিশ : নিয়মনীতি।

২. ডিসেম্বর ২৪, ১৮৫২ =কলকাতার পৌর উন্নতি।

৩৮শ খণ্ড : জানুয়ারি ৭, ১৮৫৩—ডিসেম্বর ৩১, ১৮৫৩

১. সেপ্টেম্বর ৩০, ১৮৫৩ =কলকাতার পুলিশ-হাসপাতালের উন্নতি।

৩৯শ খণ্ড : জানুয়ারি ১৮, ১৮৫৪—ডিসেম্বর ৩০, ১৮৫৪

১. ফেব্রুয়ারি ১৭, ১৮৫৪ =কলকাতায় চৌকিদার-বাহিনী গঠনের জন্য প্রস্তাবিত আইনের খসড়া।

২. অক্টোবর ৩১, ১৮৫৪ =জল-সরবরাহের জন্য ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানির প্রস্তাব।

৪০শ খণ্ড : জানুয়ারি ৪, ১৮৫৫—সেপ্টেম্বর ৭, ১৮৫৫

১. জানুয়ারি ১৯, ১৮৫৫ =গ্যাসের আলো দিয়ে কলকাতার রাস্তা আলোকিত করার ব্যবস্থা। কলকাতার পয়ঃপ্রণালী থেকে ক্ষতিকর গ্যাস নিষ্কাশনের জন্য ব্যবস্থা।

২. মে ১৮, ১৮৫৫ =কুলিবাজারের সংরক্ষণ ব্যবস্থা। পুলিশের বিগত তিন মাসের কার্যবিবরণী।

৪২শ খণ্ড : জানুয়ারি ৮, ১৮৫৬—জুন ২৮, ১৮৫৬

১. জানুয়ারি ১২, ১৮৫৬ =কলকাতার মধ্যভাগে রাস্তা নির্মাণ।

২. জানুয়ারি ২৬, ১৮৫৬ =রাস্তায় গ্যাসের আলো ও সরকারি ঋণ।

৩. মে ১২, ১৮৫৬ =চিৎপুরে নতুন থানা।

৪৩শ খণ্ড : জুলাই ১৭, ১৮৫৬—ডিসেম্বর ২৬, ১৮৫৬

১. অগাস্ট ১৫, ১৮৫৬ =কলকাতার পয়ঃপ্রণালী। শহরের উন্নতির বিষয়ে পুর-কমিশনারদের প্রতিবেদন। ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি কর্তৃক অধিগৃহীত জমির জন্য মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব।

কলকাতার উন্নতিবিধানের জন্য ইংরেজ কোম্পানির চিন্তাভাবনা কোন কোন খাতে প্রবাহিত হয়েছিল, তা এই তালিকা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতার যে ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছিল, তার আভাস মেলে 'কলকাতার উন্নয়ন'-এর অজস্র উল্লেখ থেকে। চিঠিপত্রে বারেবারে স্থান পেয়েছে লটারি কমিটির প্রসঙ্গ। বোঝা যায়, কলকাতার তৎকালীন উন্নয়ন-যজ্ঞে ঐ কমিটির ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একদিকে যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ বা অন্যান্য পূর্তবিভাগীয় কাজকর্মের দিকে নজর দিয়েছিল কোম্পানি, অন্যদিকে তেমনি প্রশাসনকে সুসংহত করে তোলার দিকেও তার সজাগ দৃষ্টি ছিল। জুয়াড়ি, জাল মুদ্রা প্রস্তুতকারী প্রভৃতি অপরাধীদের দৌরাত্ম্যে বিব্রত কোম্পানি পুলিশ প্রশাসন নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিল। সেইজন্যই পুলিশি প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে আলোচিত হয়েছে চিঠিপত্রগুলিতে। অপরাধের মতো মহামারীর প্রকোপও প্রশাসকদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। জলবসন্ত ও অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল ঠিকই, তবে কোম্পানিকে যে কলেরার প্রকোপই সবচেয়ে বেশি চিন্তায় ফেলেছিল, তা চিঠির তালিকা থেকে অনুভব করা যায়। কলেরা-নিরোধের জন্যই বোধহয় পয়ঃপ্রণালী, নিষ্কাশনব্যবস্থা, জলাশয়ের দিকে বেশি নজর

দিতে প্রশাসন বাধ্য হয়েছিল। এইসব বিষয় চিঠিপত্রে প্রাধান্য পেলেও মানসিক হাসপাতাল, যানবাহন, করব্যবস্থা, অগ্নিকাণ্ড এবং কলকাতার অভারতীয় অধিবাসীদের (চৈনিক, আরমানি, আমেরিকান, ইউরোপীয়) বিষয়ে নানা আকর্ষণীয় প্রসঙ্গের হদিসও তালিকাটি থেকে পাওয়া গেল।

কোর্ট অফ ডিরেক্টরসের প্রদত্ত চিঠি : ১৭৯৫—১৮৫৪

এই শ্রেণীর চিঠিগুলি রয়েছে কালানুক্রমিক বাইশটি খণ্ডে। তার মধ্যে ৪, ৫, ১০, ১১, ১২, ১৫, ১৯ এবং ২০ সংখ্যক খণ্ডগুলিতে কলকাতা-বিষয়ক কোনো চিঠিপত্র নেই। বাকি খণ্ডগুলির কলকাতা-বিষয়ক চিঠির তালিকা দেওয়া হল।

১ম খণ্ড : এপ্রিল ১৫, ১৭৯৫—জুন ২, ১৮১২

১. জুন ৩০, ১৮০২ =ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ। কলকাতার পুলিশ প্রশাসনের উন্নতি।

২. এপ্রিল ২৫, ১৮০৬ =পৌর কর সংগ্রহ। মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা।

৩. সেপ্টেম্বর ১৪, ১৮০৮ =কলকাতায় ডাকাতির কারণ অনুসন্ধান। নগর ও পৌর প্রশাসনের উন্নতিকল্পে করবৃদ্ধি।

৪. ফেব্রুয়ারি ১৪, ১৮১২ =লটারির মাধ্যমে কলকাতার উন্নয়নের ব্যয়ভার বহন।

২য় খণ্ড : ফেব্রুয়ারি ২৩, ১৮১৩—মে ১৯, ১৮১৫

১. অক্টোবর ১২, ১৮১৪ =গভর্নমেণ্ট হাউসের পার্শ্ববর্তী রাস্তাঘাট জল দিয়ে পরিষ্কার করানোর জন্য অর্থব্যয়। পুলিশি অবস্থা। হাউস ট্যাক্স সংগ্রহ।

২. অক্টোবর ২৮, ১৮১৪ =পুলিশ প্রশাসন। দমকল। কলকাতার উন্নতি।

৩. মে ১৯, ১৮১৪ =কলকাতার উন্নতি।

৩য় খণ্ড : এপ্রিল ১০, ১৮১৬—নভেম্বর ১৭, ১৮১৯

১. ফেব্রুয়ারি ২, ১৮১৯ =কলকাতায় ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ। কলকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত রাস্তা।

২. নভেম্বর ১৭, ১৮১৯ =কলকাতার পুলিশ-ব্যবস্থা। কলকাতার উন্নতি।

৬ষ্ঠ খণ্ড : ডিসেম্বর ১৩, ১৮২০—জুন ১৭, ১৮২৩

১. ডিসেম্বর ১৩, ১৮২০ =কলকাতায় সহকারী-সারভেয়ার নিয়োগ। লটারি তহবিল গঠন।

২. জুন ২৭, ১৮২১ =দমকল-প্রতিষ্ঠা। রাস্তাঘাট সংক্রান্ত ও অন্যান্য

জনকল্যাণমূলক কাজ। রসা-পাগলা মানসিক হাস-পাতাল।

৭ম খণ্ড : এপ্রিল ২৮, ১৮১৪—মে ৩১, ১৮২৬

১. এপ্রিল ১১, ১৮২৬ =লটারি কমিটি ও কলকাতার উন্নয়ন। জুয়াখেলা বন্ধে ব্যবস্থা। কলকাতার বিচার-ব্যবস্থা।

৮ম খণ্ড : এপ্রিল ৬, ১৮৩০—ডিসেম্বর ১৫, ১৮৩০

১. জুলাই ২০, ১৮৩০ =কলকাতার পুলিশি ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রাতিবেদন (১৮২২-১৮২৭)। সংরক্ষণ বিভাগে ক্ষমতার অপব্যবহার। কলকাতার নগর-শুল্ক ও লটারি তহবিল। লটারি কমিটির অবসান।

৯ম খণ্ড : জানুয়ারি ১২, ১৮৩১—মে ৪, ১৮৩১

১. ফেব্রুয়ারি ২, ১৮৩১ =কলকাতা মাদ্রাসা ও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের চাকরির ব্যবস্থা।

১৩শ খণ্ড : জুন ২৬, ১৮৩৫—নভেম্বর ২৫, ১৮৩৫

১. জুন ২৬, ১৮৩৫ =লটারি কমিটির জন্য অর্থ বরাদ্দ। কলকাতার একাধিক পুকুর ও তৃণভূমির ইজারাদারদের কাছ থেকে প্রাপ্য বকেয়া কর সংগ্রহ।

১৪শ খণ্ড : জানুয়ারি ২০, ১৮৩৬—সেপ্টেম্বর ১৪, ১৮৩৬

১. জুন ২৯, ১৮৩৬ =কলকাতার পুলিশ প্রশাসন।

১৬শ খণ্ড : জানুয়ারি ৪, ১৮৩৯—ডিসেম্বর ২৩, ১৮৪০

১. জুলাই ২৪, ১৮৩৯ =নিমতলা ঘাট 'মেসনরি ওয়ার্কস' : কিছু হিন্দু ভদ্রলোকের সামাজিক চেতনা।

২. জানুয়ারি ২৯, ১৮৪০=কলকাতায় ফিভার হাসপাতাল স্থাপনের ব্যবস্থা। কলকাতার স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতিকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা।

৩. অক্টোবর ৭, ১৮৪০ =কলকাতায় কলেরার প্রকোপ। ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের 'ফায়ার অ্যাক্ট' প্রয়োগ।

৪. অক্টোবর ২৮, ১৮৪০ =আলিপুরে 'রাইডিং স্কুল' প্রতিষ্ঠা।

১৭শ খণ্ড : ফেব্রুয়ারি ৩, ১৮৪১—নভেম্বর ২৭, ১৮৪৪

১. জুন ২১, ১৮৪১ =কলকাতার উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত লটারি-প্রথার অবসান।

১৮শ খণ্ড : জানুয়ারি ২২, ১৮৪৫—ডিসেম্বর ১৫, ১৮৪৭

১. এপ্রিল ২, ১৮৪৫ =কলকাতার সংরক্ষণ-ব্যবস্থা। জল সরবরাহের জন্য চাঁদপাল-ঘাটে নতুন বাষ্পীয় ইঞ্জিন।

২. জানুয়ারি ৬, ১৮৪৭ =ফিভার হাসপাতাল কমিটির প্রতিবেদন।

২১শ খণ্ড : জানুয়ারি ২২, ১৮৫১—নভেম্বর ১৯, ১৮৫১

১. ফেব্রুয়ারি ৫, ১৮৫১ =শহরে গ্যাসের আলো।

২. সেপ্টেম্বর ১০, ১৮৫১ =কলকাতার ইউরোপীয় অধিকৃত অঞ্চলে ভারতীয়দের মিছিলের উপর পুলিশের নিষেধাজ্ঞা [২০ মে, ১৮৫০-এর ১৮ নম্বর চিঠির উত্তর]।

৩. অক্টোবর ২৩, ১৮৫১ =শহরের জনগণনা।

২২শ খণ্ড : জানুয়ারি ২, ১৮৫২—অক্টোবর ২৫, ১৮৫৪

১. মার্চ ৩, ১৮৫২ =এসপ্ল্যানেডের উপর কলকাতার 'চিফ ম্যাজিস্ট্রেটে'র কর্তৃত্ব।

২. অক্টোবর ২০, ১৮৫২ =কুলি ক্যান্টনমেন্ট বাজারের উপর টাউন মেজর ও পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের অধিকারের সীমারেখা।

৩. অক্টোবর ২৫, ১৮৫৪ =প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্নানের ঘাট নির্মাণ।

কোর্ট অফ ডিরেক্টরসের প্রাপ্ত চিঠিতে কলকাতা সংক্রান্ত যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তার পরিপূরক উপাদান পাওয়া যাচ্ছে কোর্টের প্রদত্ত পত্রাবলীর মধ্যে। উভয় শ্রেণীর চিঠিতেই স্থান পেয়েছে অপরাধ, মহামারী, লটারি, উন্নয়ন, গঙ্গার ঘাট, দমকল, গ্যাসের আলো প্রভৃতি প্রসঙ্গ। আদান-প্রদানের এই বুনোটে বাঁধা পড়েছে তৎকালীন কলকাতার একটি বিশ্বস্ত ছবি। সময়ের সঙ্গে সে ছবি যেভাবে বদলেছে, সেই পরিবর্তনের মধ্যেই নিহিত আছে কলকাতার নগরায়ণের রূপরেখা।

অশোক উপাধ্যায়

বাংলাভাষায় কলকাতা-চর্চা

১৩৪ বছরে প্রকাশিত গ্রন্থের খতিয়ান

প্রাক্-মুদ্রণ বাংলা সাহিত্যে কলকাতার উল্লেখ যৎসামান্য, মুদ্রণ-পরবর্তী চার দশকের অবস্থাও সমরূপ। মুদ্রণারম্ভের (১৭৭৮) প্রায় ৪৫ বছর পরে, গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে, প্রকাশিত হয় প্রথম কলকাতা-বিষয়ক বাংলা বই 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩)। সাংবাদিক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এই বইটি সমকালীন কলকাতার সমাজজীবনের ছবি সংবলিত একটি নকশা। ভবানীচরণের আরও দুটি বই 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫) ও 'নববিবিবিলাস' (১৮৩১ ?) একই ধারার অনুবর্তী। এই রীতির সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য বই কালীপ্রসন্ন সিংহের ছদ্মনামী রচনা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬১)। ভবানীচরণ থেকে কালীপ্রসন্ন—চার দশকব্যাপী নকশা-সাহিত্যে কলকাতা-সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে। একইভাবে সৃজন-সাহিত্যের অন্য প্রকরণগুলিতেও (নাটক-প্রহসন-উপন্যাস প্রভৃতি) পাওয়া যায় কলকাতার সামাজিক চরিত্রের নানান ছবি।

সৃজনধর্মী সাহিত্যে কলকাতার পরিচয় স্বতন্ত্র তালিকা বা গবেষণাপত্রের বিষয় হতে পারে। বর্তমান তালিকায় সেগুলি বর্জন করে শুধু কলকাতার ইতিহাস-ভূগোল সম্পর্কিত বইয়ের বিবরণ গৃহীত হয়েছে। তার সঙ্গে স্থান পেয়েছে ছড়া-কবিতা-কড়চা জাতীয় বইয়ের পরিচিতি। কিছু বই আমরা স্বচক্ষে দেখিনি, পরোক্ষ সূত্র থেকে সেগুলির বিবরণ সংগৃহীত। জোড়া তারকাচিহ্ন (**) সহ সে-বইগুলি উল্লিখিত হয়েছে। তিনটি বই একক তারকা চিহ্নিত (*), নকুল চট্টোপাধ্যায়ের তালিকা সেগুলির বিবরণের উৎস।

নকুল চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'তিন শতকের কলকাতা' (১৯৬৬) গ্রন্থে কলকাতার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা সহায়ক একটি নির্বাচিত পাঠ্যতালিকা প্রকাশ করেছিলেন। সেই তালিকা আমরা ব্যবহার করেছি। 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার ২৪ অগাস্ট ১৯৮৯ তারিখের বিশেষ কলকাতা সংখ্যায় কলকাতার ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কিত বইয়ের একটি তালিকা মুদ্রিত হয় বাংলায় 'কলকাতা-চর্চা ১৮৫৭-১৯৮৯ : নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী' নামে। বর্তমান খতিয়ান ঐ তালিকার সংশোধিত ও পরিবর্ধিত রূপ। কালক্রমিক এই তালিকা থেকে বাংলাভাষায় কলকাতা-চর্চার গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করা সহজ হবে।

এই তালিকা সঙ্কলনের প্রাথমিক প্রেরণা পাই শ্রীদিব্যজ্যোতি মজুমদারের কাছে। যাঁদের সক্রিয় সাহায্যে এই তালিকা রচনা সম্ভব হল, শ্রীমজুমদারের সঙ্গে সেই বন্ধু-বর্গকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

১৮৫৭

রিচার্ডসন, ক্যাপ্টেন ডি এল—কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ এবং অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস। কলিকাতা. লালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং : সুচারু যন্ত্র, সংবৎ ১৯১৪। [২]+ ৯৪ পৃষ্ঠা।

'রামগতি ন্যায়রত্ন সংকলিত' এই বইটি লেখকের *History of the Old Fort of Calcutta and Calamity of the Black Hole*-এর স্বাধীন অনুবাদ।

১৮৬৬

জয়ন্তীচন্দ্র সেন দাস—শ্রীনন্দরাম সেনের জীবনোপাখ্যান। কলিকাতা. লালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানী : সুচারু যন্ত্র, ১২৭৩। ২৪ পৃষ্ঠা (অসম্পূর্ণ)।

পদ্যে লেখা। আখ্যাপত্রের পিছনের পৃষ্ঠায় সূচি ('নির্ঘণ্ট')।

১৮৭২

** তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়—কলিকাতা প্রকাশ, ১ম ভাগ। কলিকাতা. নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, ১৮৭২। ৩৬ পৃষ্ঠা।

১৮৭৫

রাজনারায়ণ বসু—হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত। কলিকাতা, বাল্মীকি যন্ত্র, ১৭৯৭ শক। [১]+১৮-৫৭ [৩০] পৃষ্ঠা।

'বর্ত্তমান পুস্তিকা একটি যন্ত্রস্থিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশিত হইল বলিয়া তাহার যেরূপ পত্রাঙ্ক হওয়া উচিত তাহা না হইয়া অন্য প্রকার হইয়াছে।' (বিজ্ঞাপন)

সংস্করণ : দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত—হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত। কলিকাতা, এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৌষ ১৩৬৩। [২]+(১২) +২৩ পৃষ্ঠা।

কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ সঙ্কলিত—দত্তবংশমালা; ২য় সংস্করণ। কলিকাতা, ২৮শে ফাল্গুন ১৩০৬। [১]+(৪)+২৩২ পৃষ্ঠা।

প্রথম প্রকাশ ১৮৭৫।

পৃ ১—২০০ : বংশাবলী ('কুলজ নাম'), পৃ ২০১—২৩০ : দত্তবংশঃ (১৬ অধ্যায়)—সংস্কৃত শ্লোকে লেখা বংশপরিচয়।

গ্রন্থন (দত্তবংশঃ) : নিশীথরঞ্জন রায় অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত—প্রাচীন কলিকাতা। কলিকাতা, সাহিত্যলোক, কার্তিক ১৩৯০। পৃ ২৫৫—২৭২।

১৮৮৪

রমানাথ দাস—কলিকাতার মানচিত্র। কলিকাতা. বি. পি. এম'স প্রেস, ১৮৮৪। (২)+৪৪ পৃষ্ঠা।

বইটি আসলে কলিকাতার মানচিত্রের সংকেত-ব্যাখ্যা।

১৮৯০

অজ্ঞাত—কলিকাতা-দর্শক : ইতিহাস, বর্ণনা, দর্শনীয়স্থান, রাস্তা ও ডাইরেক্টারী। কলিকাতা, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : নূতন কলিকাতা প্রেস ডিপজিটারী, ১২৯৭। ॥৶০+১৩২ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

১৮৯১

সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়—কালীক্ষেত্র দীপিকা বা কালীঘাটের পুরাতত্ত্ব। কলিকাতা, পার্থিব যন্ত্র, [১ জুলাই] ১৮৯১। [১]+ক-ঘ [৪]+৮।০+১৪০ পৃষ্ঠা। সচিত্র, মানচিত্র।

সংস্করণ : হরিপদ ভৌমিক সম্পাদিত—কালীক্ষেত্র দীপিকা; ২য় সংস্করণ। কলিকাতা, দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, মে ১৯৮৬। [২]+[১]+[১]+[৩]+[৩]+১৮১ পৃষ্ঠা। সচিত্র, মানচিত্র।

'সংযোজন' অংশে ৪টি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত—৩টির লেখক সম্পাদক, চতুর্থটি দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা : 'সাবর্ণ চৌধুরী লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার'।

১৮৯৩

* প্যারীমোহন দাস—কলিকাতা পথ প্রদর্শক ও ডাইরেক্টরী পঞ্জিকাসহ। কলিকাতা, ১৮৯৩।

১৮৯৪

**হরিচরণ প্রামাণিক—কলিকাতার বেশ্যা সঙ্গীত। কলিকাতা, ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত, [১৬ জুলাই ১৮৯৪]। ৭২ পৃষ্ঠা।

'The songs collected in this work are obscene and vulgar.' দ্র. *Bengal Library Catalogue*, quarter ending on 30th September 1894, pp. 16-17, serial no. 2404.

১৯০০

কুঞ্জবিহারী ধর সংগৃহীত—"ধর" বংশের কুলজীপত্র। অর্থাৎ কলিকাতা বড়বাজার আমড়াতলা-গলিনিবাসী শাণ্ডিল্য-গোত্রজ সুবর্ণ-বণিক্ জাতীয় অনন্তরাম ধরের বংশ-বিবরণ। কলিকাতা, সংগ্রাহক, ১৩০৭। [১]+[১]+ক-চ [৬]+৶০+২+৮৯ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

১৯০২

* পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা পুরাদ্রব্যালয়। কলিকাতা, ১৩০৯।

১৯০৪

গোপেশ্বর মল্লিক—শ্রীশ্রীভগবতী সিংহবাহিনী দেবীর সেবাধিকারিগণের সমূল বংশবল্লী। কলিকাতা, গ্রন্থকার, ১৩১১। ৪৯ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

১৯০৭

বিনয়কৃষ্ণ দেব—কলিকাতার ইতিহাস: অতি প্রাচীনকাল হইতে কলিকাতা মহানগরী সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিবরণ। কলিকাতা, নটবর চক্রবর্তী: 'বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন' প্রেস, ১৩১৪। [২]+৩৪৮ পৃষ্ঠা।

'সুবলচন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত' এই বইটি লেখকের *The Early History and Growth of Calcutta*-র সংক্ষেপিত অনুবাদ। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে 'সাহিত্য-সংহিতা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত (আশ্বিন ১৩১২—অগ্রহায়ণ ১৩১৩)।

সংস্করণ: বিনয়কৃষ্ণ দেব—কলিকাতার ইতিহাস। কলিকাতা, সপ্তর্ষি, ১৫ এপ্রিল ১৯৮২, ১লা বৈশাখ ১৩৮৯। ২৩৬ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

ভূমিকা: কমল চৌধুরী।

১৯১৩

যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার—ইংরাজের কথা, ১ম খণ্ড। মোরাদপুর (পাটনা), নলিনাক্ষ রায়, ১৩২০। ৷৷৶০+১১৯ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

১৯১৪

অজ্ঞাত—ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের পরিচয়-পত্র। কলিকাতা, দি ট্রাস্টীস অব ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, ১৯১৪। ১৩৩ পৃষ্ঠা।

কলিকাতা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের বিভিন্ন বিভাগের প্রদর্শবস্তুর পরিচয়।

১৯১৫

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা সেকালের ও একালের: উপন্যাস আকারে গঠিত ইতিহাস। কলিকাতা, পি. এম. বাগচি এণ্ড কোং, [ফেব্রুয়ারি] ১৯১৫। [৩]+[3]+১।৶০+১০২০+৶০ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

সংস্করণ: নিশীথরঞ্জন রায় ও অরবিন্দ ভট্টাচার্য সম্পাদিত—কলিকাতা সেকালের ও একালের, ৩য় সংস্করণ। কলিকাতা, পি. এম. বাকচি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫। এগার+৬৮০ পৃষ্ঠা। সচিত্র, মানচিত্র।

১৯২১

বসন্তকুমার বসু—কায়স্থ পরিচয় (সচিত্র). কলিকাতা খণ্ড, ১ম ভাগ—অ হইতে ড পর্য্যন্ত। শ্রীরামপুর (হুগলী), গ্রন্থকার: কায়স্থ-পরিচয় কার্য্যালয়, ১৩২৮, ১৯২১। [১]+৵০+৶০+১৪৪ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

১৯২৬

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সার্বভৌম—কালীঘাট-ইতিবৃত্ত। কলিকাতা, জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, ফাল্গুন ১৩৩২। ।৹+[১৬]+১১৫ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

১৯৩০

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কলিকাতায় চলাফেরা (সেকালে আর একালে)। কলিকাতা, ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : আদি ব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্র, ২০ শ্রাবণ ১৩৩৭, ১৯৩০। ॥০+১৩৮ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

স্মৃতিকথা।…'কলিকাতার রাস্তাঘাট সম্বন্ধে সেকাল ও একালের অবস্থা তুলনা করিয়া…আমোদ দেবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক জ্ঞাতব্য কথা জানাইবার চেষ্টা করিয়াছি।' ('ভূমিকা')।

গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত (বৈশাখ—মাঘ ১৮৪৯ শক)।

পুনর্মুদ্রণ: ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কলিকাতায় চলাফেরা ; ১ম কল্লন সংস্করণ। কলিকাতা, কল্লন, জুন ১৯৮৮। viii+৭২ পৃষ্ঠা।

১৯৩১

প্রমথনাথ মল্লিক—কলিকাতার কথা (আদিকাণ্ড)। কলিকাতা, প্রবোধকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৩১, ১৩৩৮। [৪]+৪+২৪৮+২৪ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

১৯৩৩

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ১৭৯৫—১৮৭৬ ; ৫ম সংস্করণ। কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, চৈত্র ১৩৮৬। (৯)+২১৬ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০। ভূমিকা : সুশীলকুমার দে।

শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী—কলিকাতার পারিবারিক ইতিহাস, ১ম খণ্ড, রাজা দিগম্বর মিত্র ও তাঁহার বংশকথা। কলিকাতা, রামকৃষ্ণ-সাহিত্য-কুটীর, [১৩৪০]। [২]+১৪৪ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

১৯৩৪

[হরিহর শেঠ]—কলিকাতা পরিচয়। কলিকাতা, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ : প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন, ১৩৪১। [১]+১৩০ পৃষ্ঠা। সচিত্র, মানচিত্র।

কলিকাতা ও তাহার নাগরিকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ১২শ বার্ষিক অধিবেশন (কলিকাতা, ১৩৪১) উপলক্ষে প্রকাশিত।

ভূমিকা : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

১৯৩৫

সতীশচন্দ্র মতিলাল—বহুবাজারের মতিলাল বংশ। কলিকাতা, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, [বৈশাখ] ১৩৪২। [২]+[১]+৶০+১৮১ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

প্রমথনাথ মল্লিক—সচিত্র কলিকাতার কথা, মধ্যকাণ্ড। প্রবোধকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৩৫, ১৩৪২। ॥০+২১৬+১২৮ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

১৯৩৬

*পাঁচকড়ি সরকার—ছোটদের কলিকাতা—সেকাল ও একাল: কলিকাতা, ১৯৩৬।

১৯৩৭

শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী—আহিরীটোলা (পূর্বে বেজড়া) মিত্র-বংশ। [কলিকাতা, গ্রন্থকার, ১৯৩৭]। ১৬ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

লেখকের 'বাঙ্গালার পারিবারিক ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—হুগলী ও হাওড়া' গ্রন্থের 'বেজেডা (sic) মিত্র-বংশ' প্রবন্ধের (পৃ ১৮৫—২০০) স্বতন্ত্র পুস্তিকা আকারে পুনর্মুদ্রণ।

পূর্ণচন্দ্র দে কবিভূষণ কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর, বি-এ—মদনমোহন ঠাকুর ও গোকুলচন্দ্র মিত্র। কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, বৈশাখ ১৩৪০, ১৯৩৭। [২৪]+১৮১ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

১৯৩৯

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত—পরিষৎ-পরিচয়। কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কার্তিক ১৩৪৬। ৵০+২০২+৩৪+[২]+(১৬) পৃষ্ঠা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাবলী—৮৮।

সংস্করণ: পরিষৎ পরিচয় (১৩০০—১৩৫৬): কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ফাল্গুন ১৩৫৬। ৵০+৯৫ পৃষ্ঠা।

১৯৪০

দেবেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক—বংশগৌরব: কায়স্থ-তত্ত্ব ও পটলডাঙ্গা বসু মল্লিক বংশের ইতিহাস: কলিকাতা, গ্রন্থকার, [শারদীয়া বাসর] ১৩৪৭। [১]+[১]+॥০+৫৩২+১৶০ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

১৯৪১

সতীশচন্দ্র গুহ দেববর্মা শাস্ত্রী—গল্পে বিশ্ববিদ্যালয়। কলিকাতা, বরেন্দ্র লাইব্রেরী, বৈশাখ ১৩৪৮। [৪]+২০২ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

১৯৪৪

উপেন্দ্রনাথ বসু—কলিকাতা ও উহার কর্পোরেশন। কলিকাতা, শংকররঞ্জন বসু, ১৩৫১। ৶০+১৩১ পৃষ্ঠা।

ভূমিকা: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

১৯৪৫

বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়—ছুটিতে কলকাতায়। কলিকাতা, বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স্ লিমিটেড, পৌষ ১৩৫২। [৪]+১১৫ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

১৯৪৮

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস (কলেজের ১২৫ বৎসর উপলক্ষে জয়ন্তী গ্রন্থ), ১ম খণ্ড: ১৮২৪-১৮৫৮। কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ, [২রা অক্টোবর ১৯৪৮]। [১]+[১]+[১]+৯০ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

ভূমিকা: যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী।

১৯৪৯

শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতা (ভৌগোলিক কাহিনী)। কলিকাতা, সিটি বুক কোম্পানী, [২১শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৬]। ৷৷/০+১৯৫ পৃষ্ঠা। সচিত্র, মানচিত্র।

১৯৫০

নগেন্দ্রনাথ শেঠ—কলিকাতাস্থ তন্তু-বণিক জাতির ইতিহাস। কলিকাতা, অজিত-কুমার বসাক, ১৩৫৭। [৪]+১৯৬ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

১৯৫১

রাজেন্দ্রকুমার মিত্র—গোকুলচন্দ্র মিত্র ও সেকালের কলিকাতা (১ম ভাগ)। কলিকাতা, আর-কে-পাব্লিশিং কোং, আষাঢ় ১৩৫৮। [১]+[১৩]+২+১৬৪ পৃষ্ঠা। সচিত্র

১৯৫১

হরিহর শেঠ—প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়: কথায় ও চিত্রে। কলিকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৫২ [ভাদ্র ১৩৫৯]। ৷৶০+[১]+১৭৮ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

ভূমিকা: যদুনাথ সরকার।

১৯৫৩

কালপেঁচা [বিনয় ঘোষ]—কলকাতা কালচার। কলিকাতা, বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ, শ্রাবণ ১৩৬০। ১৬৭ পৃষ্ঠা।

বিমলচন্দ্র মিত্র রবীন্দ্রচন্দ্র মিত্র—দর্জিপাড়া-মিত্রবংশ-পরিচয়ের কয়েক অধ্যায়। কলিকাতা, ৺দুর্গাচরণ মিত্রের ঠাকুর-বাটী, দুর্গাসপ্তমী ১৩৬০, ১৫ই অক্টোবর ১৯৫৩। ৷/০+৬ +[১] পৃষ্ঠা। সচিত্র।

১৯৫৫

ইন্দ্র মিত্র [অরবিন্দ গুহ]—অন্য জন্ম। কলিকাতা, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১লা বৈশাখ ১৩৬২। [১]+১৫১ পৃষ্ঠা।

আরবি [রাখাল ভট্টাচার্য]—কলকাতার ফুটবল। কলিকাতা, ইষ্টলাইট বুক হাউস, আষাঢ় ১৩৬২। [৮]+২০৮ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

[ভূমিকা] : গোষ্ঠ পাল।

১৯৫৬

সমুদ্রগুপ্ত [পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী]—শহর কলকাতার আদিপর্ব; ২য় সংস্করণ। কলিকাতা, নতুন সাহিত্য ভবন, ফাল্গুন ১৩৬৩। ২২০+[২] পৃষ্ঠা। সচিত্র।

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬৩।

প্রাণতোষ ঘটক—কলকাতার পথ-ঘাট। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৩। [১]+।০+[২]+২১৫ পৃষ্ঠা।

পুনর্মুদ্রণ : কলকাতার পথঘাট; ২য় মুদ্রণ। কলিকাতা, নয়া প্রকাশ, ১৯৭৯। [২০]+১৬৩ পৃষ্ঠা।

ভূমিকা : নিশীথরঞ্জন রায়।

১৯৫৭

বিমলেন্দু কয়াল—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭-১৯৫৭) শতাব্দীর আলেখ্য। কলিকাতা, কয়াল পুস্তক-প্রকাশনী, [জানুয়ারি ১৯৫৭]। [২]+৵০+৵০+১০৪+৪০ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য—বাংলাদেশের গ্রন্থাগার, ১ম খণ্ড। কলিকাতা, দেবদত্ত এণ্ড কোম্পানী, ফাল্গুন ১৩৬৩, মার্চ ১৯৫৭। [১]+[১]+[১]+[২]+২৬৪ পৃষ্ঠা।

*নিধুলাল ভট্টাচার্য—কালীঘাটের ঐতিহাসিক কথা। কলিকাতা, নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৩৬৪। ১৫২ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

ইন্দ্র মিত্র [অরবিন্দ গুহ]—পশ্চাৎপট। কলিকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪। [১]+১৫৬ পৃষ্ঠা।

১৯৫৯

যোগেশচন্দ্র বাগল—কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র। কলিকাতা, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, আষাঢ় ১৩৬৬। ৵০+২৬৪ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

ভূমিকা : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রফুল্লচন্দ্র কর সংগৃহীত ও সম্পাদিত—কলুটোলার কর-বংশের ইতিবৃত্ত, কলিকাতা, সম্পাদক ১৩৬৬, ১৯৫৯। [২]+৭৬ পৃষ্ঠা।

১৯৬০

**ইন্দ্র মিত্র [অরবিন্দ গুহ]—সাজঘর। কলিকাতা, ত্রিবেণী প্রকাশন, ১৩৬৭। ধ+৪০০+[২] পৃষ্ঠা। সচিত্র।

১৯৬১

গোপিকামোহন ভট্টাচার্য—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ২য় খণ্ড :

১৮৬৮—১৮৯৫। কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ, ১৯৬১। [২]+৶০+[১]+ ৬৭ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক ১৮।

ভূমিকা : গৌরীনাথ শাস্ত্রী।

যোগেশচন্দ্র বাগল—বেথুন সোসাইটি। কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, [২০-১ ৬১ প্রেস-মার্ক]। ১২৬ পৃষ্ঠা।

শ্রীপান্থ [নিখিল সরকার]—শ্রীপান্থের কলকাতা। কলিকাতা, ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, [২৬শে জানুয়ারী ১৯৬১]। [১]+[১]+[১]+২৬৩+[১৩] পৃষ্ঠা। সচিত্র।

বিনয় ঘোষ—টাউন কলিকাতার কড়চা। কলিকাতা, বিহার সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড, আশ্বিন ১৩৬৮, অক্টোবর ১৯৬১। ২২৪ পৃষ্ঠা।

'…কলকাতা শহরের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিকের চিত্র।'

১৯৬২

বিনয় ঘোষ—সুতানুটি সমাচার। কলিকাতা, বাক্-সাহিত্য, মার্চ ১৯৬২। ৩৭৫ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

উইলিয়াম হিকি, এলিজা ফে, ফ্যানি পার্কস ও ভিক্‌তর জ্যাকমোঁর স্মৃতিকথা ও ভ্রমণকাহিনী অবলম্বনে রচিত। কালসীমা ১৭৭৫—১৮৩০ খ্রীস্টাব্দ।

'হিকি, ফে, ফ্যানি ও জ্যাকমোঁ মিলিয়ে হেষ্টিংস-ফ্রান্সিসের কাল পর্যন্ত কলকাতা শহরের সামাজিক জীবনযাত্রার বিবরণ…।' (ভূমিকা)

পরিব্রাজক [আশীষ বসু]—শিক্ষায়তন। কলিকাতা, কলিকাতা পুস্তকালয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯। ৮০ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

১৯৬৪

অমিতাভ চৌধুরী—অচেনা শহর কলকাতা ; ২য় সংস্করণ। কলিকাতা, গ্রন্থপ্রকাশ, আষাঢ় ১৩৭৩। [৪]+১৭৬ পৃষ্ঠা।

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৭০।

১৯৬৫

রূপচাঁদ পক্ষী [শক্তি চট্টোপাধ্যায়]—রূপকথার কলকাতা। কলিকাতা, নতুন প্রকাশক, শ্রাবণ ১৩৭২। ১৬০ পৃষ্ঠা।

সংস্করণ : শক্তি চট্টোপাধ্যায়—রূপকথার কলকাতা। কলিকাতা, রূপায়ণী প্রকাশনী, রথযাত্রা, আষাঢ় ১৩৮৭। ১৫৬ পৃষ্ঠা।

এই সংস্করণকেও 'প্রথম সংস্করণ' লেখা হয়েছে। বিষয়টি বিভ্রান্তিজনক।

১৯৬৬

চণ্ডী লাহিড়ী—বিদেশীদের চোখে বাংলা। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৮৮৮ শকাব্দ। [৮]+১৭৮ পৃষ্ঠা।

শ্রীপান্থ [নিখিল সরকার]—আজব নগরী ; রবীন্দ্র প্রথম প্রকাশ। কলিকাতা, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩। [৪]+২০২ পৃষ্ঠা।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়—ঠাকুরবাড়ীর কথা। কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, সেপ্টেম্বর ১৯৬৬। সাত+২৮০ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

নকুল চট্টোপাধ্যায়—তিন শতকের কলকাতা ; ২য় সংস্করণ। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, চৈত্র ১৩৭৯। ॥৶০+২০৮ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র ১৩৭২।

গ্রন্থপঞ্জী অংশের দুটি ভাগ--কলকাতার ইতিহাস—গবেষণা সহায়ক : নির্বাচিত পাঠ্যতালিকা (পৃ ১২০—১৫০) এবং The Story of Calcutta : A Select Bibliography (পৃ ১৫১—২০৮)।

রীড. আর—ইংরেজ ডিটেকটিভের চোখে প্রাচীন কলকাতা। কলকাতা, ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩। [৬]+১৮১ পৃষ্ঠা।

লেখকের *Every Man His Own Detective* (১৮৮৭) গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ। অনুবাদক . পরিমল গোস্বামী।

১৯৬৭

সাদত আলী আখন্দ—তেরো নম্বরে পাঁচ বছর ; ২য় সংস্করণ। ঢাকা. সাগর পাবলিশার্স, ১৯৮৫। ১৬০ পৃষ্ঠা।

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭৪, মে ১৯৬৭ (রাজশাহী, মিত্র সংঘ)।

স্মৃতিকথা। লেখক কলকাতায় গোয়েন্দা পুলিশের সদর দপ্তরে (১৩ নম্বর লর্ড সিনহা রোড) পাঁচ বছর চাকরি করেন তিনের দশকের শেষদিকে—সেই অভিজ্ঞতার বিবরণ।

অমল মিত্র--কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়। কলিকাতা, প্রকাশ ভবন, শ্রাবণ ১৩৭৪। ॥০+২২৪ পৃষ্ঠা।

১৯৬৮

প্রদ্যোত গুপ্ত—সেকালের কোলকাতা। কলিকাতা, কমলকৃষ্ণ পাল, অক্ষয়-তৃতীয়া ১৩৭৫। [১]+১০৮ পৃষ্ঠা।

নকুল চট্টোপাধ্যায়--চিরকুমারী-সভা। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, অগ্রহায়ণ ১৩৭৫। [৪]+১১৫ পৃষ্ঠা।

১৯৬৯

রাসবিহারী মল্লিক—বংশ গৌরব। কলিকাতা, আর. মল্লিক, ১৩৭৬। ।৶০+১২০ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

১৯৭০

শ্যামল চক্রবর্তী—ছাপা হরফের হাট। কলিকাতা, সাহিত্য সদন. এপ্রিল ১৯৭০, বৈশাখ ১৩৭৭। [১৫]+৯৬ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

ভূমিকা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুবীর রায়চৌধুরী—সেযুগের কেচ্ছা একালের ইতিহাস। নবদ্বীপ (নদীয়া), করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্তিক ১৩৭৭, নভেম্বর ১৯৭০। ।৩)+১০৫ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

'…একটি ছাড়া আর সবগুলিরই প্রধান ঘটনাস্থল কলকাতা।'

পঙ্কজকুমার দত্ত—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কলিকাতা : প্রদর্শ পরিচিতি। কলিকাতা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, নভেম্বর ১৯৭০। ৪১ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

লেখকের ইংরেজি পুস্তিকার অনুবাদ।

চিন্মোহন সেহানবীশ—৪৬নং। হালতু (২৪ পরগণা), মীরা সেন, নভেম্বর ১৯৭০, ২৯ পৃষ্ঠা।

স্মৃতিকথা। 'আন্তর্জাতিক' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (১৯৫৮)।

গ্রন্থন : চিন্মোহন সেহানবীশ—৪৬নং : একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে। কলিকাতা, রিসার্চ ইণ্ডিয়া পাবলিকেশনস্, নভেম্বর ১৯৮৬। পৃষ্ঠা ১-২৫।

১৯৭১

যোগেশচন্দ্র বাগল—বঙ্গসংস্কৃতির কথা। কলিকাতা ওয়ার্লড প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারী ১৯৭১। [১১]+১৭১ পৃষ্ঠা।

১৯৭২

শঙ্কর ভট্টাচার্য—কলকাতার থিয়েটার। কলিকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, মাঘ ১৩৭৮। ২৮/০+১৪৪ পৃষ্ঠা।

পূর্ণেন্দু পত্রী—কী করে কলকাতা হলো। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, অগাস্ট ১৯৭২। ৭১ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

শঙ্কর ভট্টাচার্য--কলকাতার থিয়েটার, ২য় পর্ব। কলিকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, অগ্রহায়ণ ১৩৭৯, ডিসেম্বর ১৯৭২। [৬]+[চার]+১৫৯ পৃষ্ঠা।

১৯৭৩

মহেন্দ্রনাথ দত্ত--কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা ; ২য় সংস্করণ। কলিকাতা, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, ৫ই অক্টোবর ১৯৭৫, ১৫ই আশ্বিন ১৩৮২। ।৶০+১৪৮ পৃষ্ঠা।

স্মৃতিকথা। প্রথম প্রকাশ : ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩, শ্রীপঞ্চমী, ২৫ মাঘ ১৩৭৯। রচনাকাল ২৯শে এপ্রিল—৩০শে ডিসেম্বর ১৯২৯। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে 'কলিকাতার পুরাতন কথা' নামে 'প্রবর্তক' মাসিক পত্রে অংশত মুদ্রিত (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৩৭)।

শিশির বসু—একশ বছরের বাংলা থিয়েটার ১৮৭২—১৯৭২, ১ম খণ্ড। কলিকাতা, নাভানা, ১ বৈশাখ ১৩৮০, ১৪ এপ্রিল ১৯৭৩। ষোল+৫২৭ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

ভূমিকা : অহীন্দ্র চৌধুরী।

প্রণবকুমার ঘোষ—কলিকাতা-সমাচার। কলিকাতা, পার্থসারথি প্রকাশন, রথযাত্রা, আষাঢ় ১৩৮০। [৭]+১২৫ পৃষ্ঠা।

ভূমিকা : নিশীথরঞ্জন রায়।

পূর্ণেন্দু পত্রী—গত শতকের প্রেম ; ১ম এষা সংস্করণ। কলিকাতা, এষা, মে ১৯৮২। ১৬০ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা, ভাবনা, নভেম্বর ১৯৭৩।

সংস্করণ : গত শতকের প্রেম ; ১ম দে'জ সংস্করণ। কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ১৯৮৭। [১৬]+১৫২ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

পূর্ণেন্দু পত্রী—ছড়ায় মোড়া কলকাতা। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ডিসেম্বর ১৯৭৩। ৫৬ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

১৯৭৪

সুনীল মুন্সী—ঠিকানা : কলকাতা। কলিকাতা, চলতি দুনিয়া প্রকাশনী, মার্চ ১৯৭৪। ১০৪ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

কলকাতার কিছু পুরনো ও বিশিষ্ট বাড়ির পরিচয়, লেখকের আঁকা স্কেচ সহ।

ভূমিকা : নিরঞ্জন সেনগুপ্ত।

মদনমোহন কুমার—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস, ১ম পর্ব, The Bengal Academy of Literature, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ [১৩০০-১৩০১ বঙ্গাব্দ ॥ ১৮৯৩-১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দ]। কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ৮ শ্রাবণ ১৩৮১। ২৬+১১৬ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

ভূমিকা : রমেশচন্দ্র মজুমদার ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অসীম মুখোপাধ্যায়—ফুটপাতের বাসিন্দা। কলিকাতা, শঙ্খ প্রকাশন, আশ্বিন ১৩৮১। [৪]+১৪৪ পৃষ্ঠা।

তাপস গঙ্গোপাধ্যায়—মানুষ গড়ার ইতিকথা। কলিকাতা, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, ডিসেম্বর ১৯৭৪। [৮]+৩৩০ পৃষ্ঠা।

১৯৭৫

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়—পুরনো কলকাতার নায়িকা। মধ্যমগ্রাম (২৪ পরগনা), দীনেশ দাশগুপ্ত, ফাল্গুন ১৩৮১, মার্চ ১৯৭৫। [৬]+১৭০ পৃষ্ঠা।

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়—বাবু গৌরবের কলকাতা। কাচড়াপাড়া (২৪ পরগনা), শাওন ঘোষ, এপ্রিল ১৯৭৫, বৈশাখ ১৩৮২। ২১৪ পৃষ্ঠা।

বিনয় ঘোষ—কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত। কলিকাতা, বাক্-সাহিত্য, আশ্বিন ১৩৮২ অক্টোবর ১৯৭৫। ৭০২ পৃষ্ঠা। সচিত্র, মানচিত্র।

'বইখানি চারটি ভাগে বিভক্ত : সুতানুটি সমাচার, কলকাতা কালচার, টাউন কলকাতার কড়চা, কলকাতার ক্রমবিকাশ। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ভাগ পৃথক তিনটি

গ্রন্থাকারে যথাক্রমে ১৯৬২, ১৯৫৩ (১৯৫৬ ও ১৯৬১ পরবর্তী সংস্করণ। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়।' ভূমিকা)

১৯৭৬

নারায়ণ দত্ত—জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারী। কলিকাতা, নবপত্র প্রকাশন, জানুয়ারী ১৯৭৬। ২৬০ পৃষ্ঠা।

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়—ভিটি কলকাতা ছাড়িয়ে। কাঁচড়াপাড়া (২৪ পরগনা), শাওনী ঘোষ, মার্চ ১৯৭৬, চৈত্র ১৩৮২। [২]+[২]+১৬২ পৃষ্ঠা।

অমরেন্দ্র দাস—রাজনারায়ণের কলকাতা। কলিকাতা, বর্ণালী, মার্চ ১৯৭৬। xii+১৮০+ii+[১] পৃষ্ঠা।

ভূমিকা ও সম্পাদনা : শিউলি দাস।

১৯৭৭

রাধারমণ মিত্র—কলিকাতায় বিদ্যাসাগর। কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১২ অক্টোবর ১৯৭৭। [১]+৬৮ পৃষ্ঠা।

কমল চৌধুরী—কলকাতা '৭৭ (শ্রীশ্রী ৺কালীপূজা স্মারক গ্রন্থ)। কলিকাতা, নব যুবক সংঘ, [১৯৭৭]। [৮]+১৭৬ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

১৯৭৮

রাধারমণ মিত্র—গঙ্গার ঘাট। কলিকাতা, ঐতিহাসিক, বৈশাখ ১৩৮৫, মে ১৯৭৮। [২]+৭১ পৃষ্ঠা।

'ঐতিহাসিক' পত্রিকার শারদীয় ১৩৮৪ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংশোধিত ও পরিবর্তিত পুনর্মুদ্রণ।

কলিকাতার ইতিহাস গ্রন্থমালা ১।

কমল চৌধুরী—কলকাতা বণিক সমাজ (শ্রীশ্রী ৺কালীপূজা স্মারক গ্রন্থ)। কলিকাতা, নব যুবক সংঘ, [১৯৭৮]। [৮]+৫২+২৪+৪৮ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

সুভাষ সমাজদার—পুরানো কলকাতার ভুতুড়ে বাড়ি। কলিকাতা, শঙ্খ প্রকাশন, অগ্রহায়ণ ১৩৮৫। [৪]+১১৬ পৃষ্ঠা।

১৯৭৯

জয়ন্ত দত্ত—ভিক্টোরিয়াস মোহনবাগান [ফুটবল : হকি : ক্রিকেট]। কলিকাতা, সাহিত্য প্রকাশ, রথযাত্রা, আষাঢ় ১৩৮৬। ১৩২ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

পূর্ণেন্দু পত্রী—পুরনো কলকাতার কথাচিত্র। কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, কার্তিক ১৩৮৬, নভেম্বর ১৯৭৯। ৪২৬ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

লেখকের 'শহর কলকাতার আদিপর্ব' (১৯৫৬) গ্রন্থের পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত সংস্করণ।

পূর্ণেন্দু পত্রী—কলকাতার রাজকাহিনী। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নভেম্বর ১৯৭৯। ৬৩ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

কমল চৌধুরী পারমল চৌধুরী—কলকাতার ছাপাখানা (শ্রীশ্রী ৺কালীপূজা স্মারক গ্রন্থ)। কলিকাতা, নব যুবক সংঘ, [১৯৭৯]। [৮]+১০২ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

[ভূমিকা]: নিশীথরঞ্জন রায়।

১৯৮০

চিত্রা দেব—ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫ বৈশাখ ১৩৮৭। [৮]+২৭৩ পৃষ্ঠা। সচিত্র। স্বতন্ত্র ভাঁজ করা বংশলতিকা।

পুনর্মুদ্রণ: ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল; ১৫শ মুদ্রণ। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২২ চৈত্র ১৩৯৩। [৮]+৩১১ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

আবদুল মোমিন—কলকাতার গাড়োয়ান ধর্মঘটের চারদিন (১—৪ এপ্রিল ১৯৩০)। কলিকাতা, মনীষা, ১৫ আগস্ট ১৯৮০। [৪]+৭৮ পৃষ্ঠা।

ভূমিকা: চিন্মোহন সেহানবীশ।

স্মৃতিকথা। লেখক এই ধর্মঘটের প্রধান সংগঠক ছিলেন। রচনাটি 'মূল্যায়ন' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল।

কমল চৌধুরী সম্পাদিত—কলকাতার নটনটী (শ্রীশ্রী ৺কালীপূজা স্মারক গ্রন্থ)। কলিকাতা, নব যুবক সংঘ, [১৯৮০]। [৮]+৯২+৪৬+৫৬ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

শঙ্করপ্রসাদ দে সম্পাদিত—জেলেপাড়ার সঙ্; ২য় সংস্করণ। কলিকাতা, কলিকাতা কৈবর্ত সমিতি, ৫ মে ১৯৮০। [৮]+২৭ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

প্রথম প্রকাশ: ২৫ ডিসেম্বর ১৯৮০।

রাধারমণ মিত্র—কলিকাতা-দর্পণ, ১ম পর্ব। কলিকাতা, সুবর্ণরেখা, ডিসেম্বর ১৯৮০, অগ্রহায়ণ ১৩৮৭। ক—ঞ[১০]+৩৫৫ পৃষ্ঠা।

সংস্করণ: কলিকাতা-দর্পণ, ১ম পর্ব; ৩য় সংস্করণ। কলিকাতা, সুবর্ণরেখা, জুন ১৯৮৮। ক-ঠ[১২]+৩৫৬ পৃষ্ঠা।

১৯৮১

অতুল সুর—কলকাতা: চার্নক থেকে সি. এম. ডি. এ. পর্যন্ত এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স, [২৬ জানুয়ারী ১৯৮১]। ৭+২৮৭ পৃষ্ঠা। সচিত্র, মানচিত্র।

প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়—আমার দেখা কোল্‌কাতা। কলিকাতা, দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীপঞ্চমী ১৩৮৭। ॥০+২৪৫+৵০ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

স্মৃতিকথা। অধিকাংশ বিষয় লেখকের চোখে দেখা, সেইসঙ্গে 'বিশ্বস্ত লোকের কাছে শোনা' বিষয়গুলিও স্থান পেয়েছে।

পিনাকরুদ্র সেন—বাবু কোলকাতার বিবিবিলাস। কলিকাতা, মৌসুমী প্রকাশনী, ১লা বৈশাখ ১৩৮৮, এপ্রিল ১৯৮১। ২১৬ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

প্রাণকৃষ্ণ দত্ত—কলিকাতার ইতিবৃত্ত। কলিকাতা, পুস্তক বিপণি, ২৪ আগস্ট ১৯৮১। তেরো+[১]+২২৩ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

ভূমিকা : নিশীথরঞ্জন রায়।

সাময়িকপত্রে প্রথম প্রকাশ : 'নব্যভারত' আশ্বিন ১৩০৮ – মাঘ ১৩১০।

শিবপ্রসাদ সমাদ্দার—আমি আপনি কলকাতা। কলিকাতা, ভারতী বুক স্টল, ১০ আশ্বিন ১৩৮৮, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮১। [১৮]+৩৮৪ পৃষ্ঠা।

ভূমিকা : নীহাররঞ্জন রায়।

কাজল মিত্র—কালে কালে কলকাতা। কলিকাতা, দীপ প্রকাশন, আশ্বিন ১৩৮৮। [১]+৩+২+২+৯৩ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

গ্রন্থ-প্রসঙ্গ : নিশীথরঞ্জন রায়।

কমল চৌধুরী—কলকাতার মানুষ (শ্রীশ্রী ৺কালীপূজা স্মারক গ্রন্থ)। কলিকাতা, নব যুবক সংঘ, [১৯৮১], ৭২+২৪ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

১৯৮২

* কান্তিরঞ্জন ঘোষ—গোরাদের কলকাতা। কলিকাতা, ১৯৮২। ৯৬ পৃষ্ঠা।

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য—কলকাতার কালচার। কলিকাতা, বিশ্ববাণী, বৈশাখ ১৩৮৯, এপ্রিল ১৯৮২। ১১২ পৃষ্ঠা।

প্রদীপ রায়—উনিশ শতক : প্রথমার্ধ, কলকাতা সমাজ দ্বন্দ্ব ও মিলন। কলিকাতা, বুক ট্রাস্ট, আষাঢ় ১৩৮৯, জুন ১৯৮২। ১২৩ পৃষ্ঠা।

ভূমিকা : অরবিন্দ পোদ্দার।

শঙ্কর ভট্টাচার্য—বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান। কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, আগস্ট ১৯৮২। [৬]+(ix)+৫৩৫+[১] পৃষ্ঠা।

মুখবন্ধ : অজিতকুমার ঘোষ।

রমাপদ চৌধুরী সম্পাদিত—অচেনা এই কলকাতা। কলিকাতা, সংবাদ ১লা আশ্বিন ১৩৮৯। ২৫০ পৃষ্ঠা।

বিভিন্ন লেখকের লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন।

প্রদ্যোত গুহ—কলকাতার ভূত। কলিকাতা, অয়ন, অক্টোবর ১৯৮২। ৯৮ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

কমল চৌধুরী—চেনা-অচেনা কলকাতা (শ্রীশ্রী ৺কালীপূজা স্মারক গ্রন্থ)। কলিকাতা, নব যুবক সংঘ, [১৯৮২]। [৪]+২৪+৫৮+১৬+৪[৮] পৃষ্ঠা। সচিত্র।

চিত্রগুপ্ত [রমেন গুপ্ত]—বরণীয় যাঁরা আদালতে। কলিকাতা, যোগমায়া প্রকাশনী, রাসপূর্ণিমা ১৩৮৯, ডিসেম্বর ১৯৮২। [৬]+১০৪ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

অতুলকৃষ্ণ রায়—কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কলিকাতা, ঋদ্ধি-ইণ্ডিয়া, ১৯৮২। [৬]+৩৩৮ পৃষ্ঠা। সচিত্র, মানচিত্র।

লেখকের *A Short History of Calcutta* (Census 1901, vol. 7, pt. 1) গ্রন্থের অনুবাদ। ভাষান্তর : শুদ্ধোদন সেন [অর্ধেন্দুভূষণ রায়চৌধুরী]।

১৯৮৩

প্রদ্যোত গুহ—যোব চার্নক : কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা। কলিকাতা, প্রতিভা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩। ৬০ পৃষ্ঠা।

রমা মহিন্তা—হগ মার্কেটের ইতিকথা। কলিকাতা. মালঞ্চ প্রকাশনী, ১লা বৈশাখ ১৩৯০। [৮]+১২৩ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

ভূমিকা : নবকুমার শীল।

অতুল স্বর—কলকাতার চালচিত্র। কলিকাতা. সাহিত্যলোক, ১লা বৈশাখ ১৩৯০। [৮]+১৮০ পৃষ্ঠা।

অশোককুমার চক্রবর্তী—প্রিয়দর্শীর নগরদর্শন। কলিকাতা, মিনতি চক্রবর্তী, রম্য-রচনা, ২৬ আগস্ট ১৯৮৩। [৬]+১৭৮ পৃষ্ঠা।

নারায়ণ দত্ত—সুরাট থেকে সুতানুটি। কলিকাতা, বর্ণালী, কার্তিক ১৩৯০, অক্টোবর ১৯৮৩। [৮]+২৭৭+(৩) পৃষ্ঠা।

নিশীথরঞ্জন রায় অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত—প্রাচীন কলিকাতা। কলিকাতা, সাহিত্যলোক, কার্তিক ১৩৯০। [১৬]+২৮৭ পৃষ্ঠা।

বিভিন্ন লেখকের লেখা ২৯টি প্রবন্ধের সংকলন। শেষ রচনাটির (কেদারনাথ দত্তের লেখা 'দত্তবংশঃ') ভাষা সংস্কৃত।

লোকনাথ ঘোষ—কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত। কলিকাতা. অয়ন. ডিসেম্বর ১৯৮৩, পনের+২৮১ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

লেখকের *The Modern History of Indian Chiefs, Rajas, Zamindars Ec.* গ্রন্থের ২য় খণ্ড The Native Aristocracy and Gentry of Bengal (১৮৮১)-এর ১ম বিভাগের ৫ম পরিচ্ছেদ থেকে কলকাতা-কেন্দ্রিক জীবনীগুলির অনুবাদ। অনুবাদক : শুদ্ধোদন সেন [অর্ধেন্দুভূষণ রায়চৌধুরী]।

১৯৮৪

বীরেন রায়—গাঁ থেকে মহানগরী কলিকাতা। পাঁচ শতকের ইতিবৃত্ত। কলিকাতা, নিউ এরা পাবলিশার্স. জানুয়ারি ১৯৮৪। ৩৮০ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

**শীতাংশুকুমার চক্রবর্তী—কলকাতার ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগী। কলিকাতা, সমতট প্রকাশন, ১৯৮৪। ১৪৬ পৃষ্ঠা।

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত—কলকাতার ফিরিওয়ালার ডাক আর রাস্তার আওয়াজ বা টক-নোনতা-মিষ্ট-ঝাল-কষায়-তিক্ত রস মিশ্রিত সখের জলপান। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড. ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪। [৮]+১২৬ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

পূর্ণেন্দু পত্রী- কলকাতার গল্পস্বল্প। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১ বৈশাখ ১৩৯১। [৪]+৬০ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়—অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্। কলিকাতা, শঙ্খ প্রকাশন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১, মে ১৯৮৪। ১৯৫ পৃষ্ঠা।

নায়র, পি. তংকপ্পন—কলকাতার সৃষ্টি ও জবচার্নক। কলিকাতা, এম এল দে এণ্ড কোং, লক্ষ্মীপূজা ১৩৯১। X+১৮০ পৃষ্ঠা। সচিত্র, মানচিত্র।

ভূমিকা: নিশীথরঞ্জন রায়।

'আদি কলকাতার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।' লেখকের চারটি প্রবন্ধের অনুবাদ। অনুবাদক: গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনন্দা ঘোষ, অরূপ রুদ্র।

১৯৮৫

পূর্ণেন্দু পত্রী—এক যে ছিল কলকাতা। কলিকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ১ জানুয়ারি ১৯৮৫। ৭২ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

অমিয় রায়—কলকাতা রাজভবনের অন্দরমহল। কলিকাতা, শম্ভু রায়, ১ বৈশাখ ১৩৯২, ১৪ এপ্রিল ১৯৮৫। [৮]+১৯৮ পৃষ্ঠা।

স্মৃতিকথা।

জ্যোতির্ময়ী দেবী—শ্রীশ্রীসংসারেশ্বর শিবমন্দির [একজন প্রবাসিনী মহিলা প্রতিষ্ঠিত]। কলিকাতা, লেখিকা, বৈশাখী পূর্ণিমা, ২০শে বৈশাখ ১৩৯২ (৩।৫।৮৫)। ৮ পৃষ্ঠা।

আখ্যাপত্র (১-২), মূল রচনা (৩-৭), বংশ পরিচয় (৮)।

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়—হাজার প্রশ্নে কলকাতা। কলিকাতা, মডার্ন কলাম, শ্রাবণ ১৩৯২, আগস্ট ১৯৮৫। ১২০ পৃষ্ঠা।

নানা বিষয়ে ভাগ করে ১০৮৯টি প্রশ্ন ও তার উত্তর দেওয়া হয়েছে।

প্রতাপ মুখোপাধ্যায়—কলকাতার গুপ্তসমিতি: উনিশ শতক। কলিকাতা, প্রৈতি প্রকাশন, শুভ মহালয়া ১৩৯২। [৬]+২৬২ পৃষ্ঠা।

সুধীরকুমার মৈত্র—রাইটার্স বিল্ডিংএর অন্দরমহল। সোদপুর (২৪ পরগণা), অরুণা দেবী, অগ্রহায়ণ ১৩৯২। [৬]+১২১ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

ভূমিকা: হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। স্মৃতিকথা।

১৯৮৬

পূর্ণেন্দু পত্রী—কলকাতার প্রথম। কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, বইমেলা ১৯৮৬। ৮০ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

পূর্ণেন্দু পত্রী—জোব চার্নক যে কলকাতায় এসেছিলেন। কলিকাতা, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, বইমেলা ১৯৮৬, মাঘ ১৩৯২। ১১৫ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

অরুণ সেন সম্পাদিত—কবিতার কলকাতা। কলিকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ১৯৮৬। ৮০ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়—অন্য কলকাতা। কলিকাতা, বাউলমন প্রকাশন, ১৫ মাঘ ১৩৯২। [৪]+১২৪ পৃষ্ঠা।

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়—কলকাতায় প্রথম। কলিকাতা, এ পি পি, মার্চ ১৯৮৬। ১৩১ পৃষ্ঠা।

ভূমিকা : ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

তপন চট্টোপাধ্যায়—লালবাজার সেকাল ও একাল। কলিকাতা, গ্রন্থপ্রকাশ, ২১ মার্চ ১৯৮৬। ১২৮ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

বিষ্ণু বসু—বাবু থিয়েটার। কলিকাতা, প্রতিভাস, ১৫ এপ্রিল ১৯৮৬। ১১৬ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

অশোককুমার চক্রবর্তী—কলকাতার কড়চা-বিচিত্রা। কলিকাতা, আনন্দধারা, অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৯৩, ১২ মে ১৯৮৬। ১০৪ পৃষ্ঠা।

বিষ্ণু বসু সম্পাদিত—কলিকাতা কল্পলতা কলিকাতা কমলালয়। কলিকাতা, প্রতিভাস, সেপ্টেম্বর ১৯৮৬। ১৫৫ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

'কলিকাতা কল্পলতা'র (পৃ ১৩-১০৬) লেখক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। রচনাকাল আনুমানিক ১৮৫০-৬০-এর মধ্যে। সাময়িকপত্রে প্রথম প্রকাশ (আংশিক : 'গল্পভারতী', দীপাবলী ১৩৬৫। শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত 'রঙ্গলাল-রচনা-সংগ্রহ' গ্রন্থে (ভাদ্র ১৩৬৬) পূর্ণ পাঠ মুদ্রিত। রচনাকালের বিচারে এটিই বাংলায় লেখা কলকাতার প্রথম ইতিহাস।

নিশীথরঞ্জন রায়—প্রসঙ্গ : কলকাতা। কলিকাতা, নাভানা, অক্টোবর ১৯৮৬, আশ্বিন ১৩৯৩। [২]+[১]+[১]+১০৩ পৃষ্ঠা।

পূর্ণিমা ঠাকুর—ঠাকুরবাড়ির রান্না ; ২য় সংস্করণ। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, নভেম্বর ১৯৮৮। ৯৭ পৃষ্ঠা।

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৮৬।

১৯৮৭

এম. আর. আখতার মুকুল—কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী। ঢাকা (বাংলাদেশ), সাগর পাবলিশার্স, ১ ফাল্গুন ১৩৯৩, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭। ৩১৫ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

ভূমিকা : সৈয়দ আলী আহসান।

পূর্ণেন্দু পত্রী—সেনেট হলের স্মৃতিচিত্র। কলিকাতা, অরুণা প্রকাশনী, নববর্ষ ১৩৯৪, এপ্রিল ১৯৮৭। ২০৪ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

সুশীলকুমার রায়চৌধুরী—লবণহ্রদের ইতিকথা। কলিকাতা, সুজন পাবলিকেশন, বৈশাখ ১৩৯৪, এপ্রিল ১৯৮৭। ১৫৭ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়—নদীর তীরে নগরী ; ২য় সংস্করণ। কলিকাতা, বর্ণালী, জুন ১৯৮৭, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪। [৬]+১৬৯ পৃষ্ঠা।

শঙ্কর রুদ্র সম্পাদিত ও সংকলিত—সমকালীনদের চোখে কলকাতার নানা এলাকা। কলিকাতা, গ্রন্থাঞ্জলি, রথযাত্রা, আষাঢ় ১৩৯৪। [৮]+১০৯+(৩)+(৮) পৃষ্ঠা।

বিভিন্ন আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা ও উপন্যাস থেকে আহৃত কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের বিবরণ।

ভূমিকা : অরিন্দম সেন।

লেবেদেফ, গেরাসিম স্তেপানোভিচ— কলকাতায় আমি ও আমার থিয়েটার। কলিকাতা, লোকমত প্রকাশনী, [সেপ্টেম্বর ১৯৮৭]। ৮৮ পৃষ্ঠা।

বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকা ও চিঠিপত্র থেকে আহৃত আত্মকথার সংকলন। সংগ্রহ ও সম্পাদনা : তন্দ্রা চক্রবর্তী। অনুবাদকের নাম নেই। গোড়ায় সম্পাদিকার ভূমিকা : 'লেবেদেফ ও বাংলা থিয়েটার'।

হরিপদ ভৌমিক সংকলিত—সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতা, ১ম খণ্ড, সমাচার দর্পণ, ১৮১৮—১৮২২। কলিকাতা, লোকনাথ প্রিন্টার্স, ৩০ অক্টোবর ১৯৮৭। চাব্বিশ + ২২৭ পৃষ্ঠা।

ভূমিকা : নিশীথরঞ্জন রায়।

১৯৮৮

রথীন মিত্র—রথীন মিত্রের শাশ্বত কলকাতা, ১ম পর্ব : গঙ্গার ঘাট। কলিকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ১৯৮৮। ১১৯ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

কলকাতার ৫০টি ঘাটের সচিত্র পরিচিতি। ছবি রথীন মিত্র, লেখা রাধারমণ মিত্র।

ভূমিকা : নিশীথরঞ্জন রায়।

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—কলকাতা প্রসঙ্গে : ছড়া-গান-কবিতা। কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারী ১৯৮৮। [৮] + ১৩২ পৃষ্ঠা।

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—শ্রীশ্রী৺রাজরাজেশ্বরী দেবী (দুই শতাধিক বৎসর পূর্বে রামনারায়ণ মিশ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত)। কলিকাতা, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ২রা মাঘ ১৩৯৪ : ১৭ই জানুয়ারি '৮৮। ১৯ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

অমিতা ঠাকুর—জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি প্রচলিত রান্না, ১ম পর্ব। কলিকাতা, অসীমা প্রকাশনী, মাঘ ১৩৯৪, জানুয়ারি ১৯৮৮। [১৮] + ১৩৬ + [২] পৃষ্ঠা। সচিত্র।

বারিদবরণ ঘোষ, সংকলন ও সম্পাদনা— অন্ধকূপ হত্যা (বাঙালীর দৃষ্টিতে)। কলিকাতা, কলেজ স্ট্রিট পাবলিকেশন, [জানুয়ারি ১৯৮৮]। ১৪ + ১৭৩ পৃষ্ঠা।

বিভিন্ন লেখকের লেখা অন্ধকূপ হত্যা সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন।

অশোক কুণ্ডু—চলো যাই : কলকাতা। অমৃতপুর (হাওড়া), শিশুবিকাশ কেন্দ্র, ১ বৈশাখ ১৩৯৬, ১৪ এপ্রিল ১৯৮৯। ৪৮ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়—এই কলকাতায়। কলিকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর, বৈশাখ ১৩৯৫, এপ্রিল ১৯৮৮। [২] + ৭৯ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

কলকাতার হিন্দু-জৈন মন্দির, মসজিদ, বৌদ্ধ বিহার ও গির্জার ইতিহাস।

রথীন মিত্র—রথীন মিত্রের শাশ্বত কলকাতা, ২য় পর্ব : ইংরেজ আমলের স্থাপত্য। কলিকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, জুন ১৯৮৮। ১২০ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

ইংরেজ আমলের কলকাতার ৫০টি স্থাপত্য নিদর্শনের সচিত্র পরিচিতি। ছবি রথীন মিত্র, লেখা নিশীথরঞ্জন রায়।

ভূমিকা : মুলকরাজ আনন্দ।

বিকাশকান্তি সাহা—বিষয় : কলকাতা। কলিকাতা, পাত্র বুক হাউস, উল্টোরথ ১৩৯৫। ৮৬ পৃষ্ঠা।

অজিতকুমার ঘোষ—ঠাকুরবাড়ীর অভিনয়। কলিকাতা, রবীন্দ্র-ভারতী সোসাইটি, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৯৫, জুলাই ১৯৮৮। [৮]+৮৮ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

ভূমিকা : প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র।

হরিপদ ভৌমিক সংকলিত—সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতা, ২য় খণ্ড, সমাচার দর্পণ, ১৮৩৫। কলিকাতা, কলকাতা-চর্চা কেন্দ্র, ২৪ আগস্ট ১৯৮৮। [১]+[৩]+ ১]+[ছয়]+৩০৭ পৃষ্ঠা।

ভূমিকা : অতুল সুর।

১৯৮৯

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—কলকাতার মাটি ও মানুষ। কলিকাতা, বি. বি. প্রকাশন [বনমালা-বিশ্বনাথ প্রকাশন], জানুয়ারি ১৯৮৯। [৪]+viii+১৮৮ পৃষ্ঠা।

ভূমিকা : নিশীথরঞ্জন রায়।

নিশীথরঞ্জন রায়—কলকাতা : ইতিহাসের উপাদান। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, জানুয়ারি ১৯৮৯। ৮৭ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়—কফির কাপে সময়ের ছবি। কলিকাতা, ক্যাম্প (কমিউনিকেশন এণ্ড মিডিয়া পিপল্), জানুয়ারি ১৯৮৯। ৮৮ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

স্মৃতিকথা। কলকাতার কফিহাউসকে ঘিরে চার থেকে সাতের দশকের নানা আড্ডা ও আড্ডাধারীর বৃত্তান্ত।

শ্যামলেন্দু চৌধুরী—দেখার শহর কলকাতা। কলিকাতা, অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, কলিকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি ১৯৮৯। [৮]+১১২ পৃষ্ঠা।

শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী—যাচ্ছো কোথায়, যাদুঘরে। কলিকাতা, পুনশ্চ, গ্রন্থমেলা ১৯৮৯। ৬৪ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

প্রসিতকুমার রায়চৌধুরী—ছড়ায় ছড়ায় কলকাতা। কলিকাতা, মডেল পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা বইমেলা ১৩৯৫, ২৫ জানুয়ারি ১৯৮৯। [৪]+৩৮ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

অমিতাভ চৌধুরী সরল দে সম্পাদিত—একশো কবির কলকাতা। কলিকাতা, মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা বইমেলা ১৩৯৫, ২৫ জানুয়ারি ১৯৮৯। [১২]+১০৯ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

কবিতা সংকলন। নির্বাহী সম্পাদক পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রীতিভূষণ চাকী—ছড়া কথা কলকাতা। নৈহাটি (উত্তর ২৪ পরগণা), আনন্দরূপ, বইমেলা ২৫ জানুয়ারি '৮৯। ৯২ পৃষ্ঠা।

দৈনিক সংবাদপত্রের কড়চা জাতীয় লেখা ও ছড়ার সংকলন। প্রচ্ছদ ব্যতীত স্বতন্ত্র

আখ্যাপত্র নেই, ই টাইটেলে উৎসর্গ, তার পিছনে প্রকাশ সম্পর্কিত বিবরণ। জ্যাকেটে অন্নদাশংকর রায়ের অভিমত। পৃষ্ঠাগুলি সংখ্যাঙ্কচিহ্নিত নয়।

রথীন মিত্র—রথীন মিত্রের শাশ্বত কলকাতা, ৩য় পর্ব : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কলিকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯। ১২০ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

কলকাতার ৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সচিত্র পরিচিতি। ছবি রথীন মিত্র, লেখা অলোক রায়।

ভূমিকা : রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত।

অতুল সুর—৩০০ বছরের কলকাতা : পটভূমি ও ইতিকথা। কলিকাতা, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, মাঘ ১৩৯৫, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯। ২২৬+[২] পৃষ্ঠা।

সংস্করণ : ৩০০ বছরের কলকাতা ; ২য় সংস্করণ। কলিকাতা, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, মাঘ ১৩৯৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। ২২০ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

দিব্যেন্দু সিংহ—কলিকাতা তারিখ অভিধান। কলিকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, মাঘ ১৩৯৫। [১২]+২৯১ পৃষ্ঠা।

ভূমিকা : নিশীথরঞ্জন রায়।

রমেন দাস—ইতিহাসের কলকাতা। কলিকাতা, অনন্য প্রকাশন, এপ্রিল ১৯৮৯। ১০২ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

পূর্ণেন্দু পত্রী—কলকাতা কলকাতা। কলিকাতা, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, বৈশাখ ১৩৯৬। ৮০ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

অতুল সুর—শিক্ষাপীঠ কলকাতা। কলিকাতা, জ্যোৎস্নালোক, রথযাত্রা, জুলাই ১৯৮৯। ১২৬ পৃষ্ঠা।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়—সেকালে বড়লোকদের খেয়াল-খুশি। কলিকাতা, যোগমায়া প্রকাশনী, জুলাই ১৯৮৯, আষাঢ় ১৩৯৬। ১০৮ পৃষ্ঠা।

কৃষ্ণ ধর—কলকাতা : তিন শতক। কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বাংলা আকাদেমি, ১৫ আগস্ট ১৯৮৯। [৪]+৮২ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

বসন্তকুমার মণ্ডল—কনকলতা কলকাতা (কলকাতার সেকাল একাল এবং আগামীকাল) : কাব্যে ইতিহাস। কলিকাতা, সুরভি সেন, ১৫ আগষ্ট ১৯৮৯। [১২]+৬৪+[৪] পৃষ্ঠা। সচিত্র, মানচিত্র।

ভূমিকা : অতুল সুর।

দিলীপকুমার মিত্র সম্পাদিত—অরূপ নগরী কলকাতা। কলিকাতা, প্রভিন্সিয়াল বুক এজেন্সি, সেপ্টেম্বর ১৯৮৯। [৪]+[৪]+১৫০+৮০ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

'কলকাতার ইতিহাসের সাহিত্য দলিল'—কলকাতা নিয়ে লেখা প্রবন্ধ, ইতিহাস, রম্যরচনা, কবিতা ও নাটিকার সংকলন।

বিষ্ণুপদ রায়—ছড়ায় কলকাতার ইতিহাস। কলিকাতা, এস. রায়, আশ্বিন ১৩৯৬, অক্টোবর ১৯৮৯। ৩৬ পৃষ্ঠা (সংখ্যাঙ্কহীন)। সচিত্র।

স্বপনকুমার ভট্টাচার্য—কলকাতাকে জানো ; ৪র্থ সংস্করণ। কলিকাতা, টিচার্স কনসার্ন, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। ৪৮ পৃষ্ঠা।

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৮৯।

নন্দলাল ভট্টাচার্য—কলকাতা কবে কোথায়। কলিকাতা, রানার, শ্যামাপূজা ১৩৯৬। [৮]+৭২ পৃষ্ঠা।

অসিতকৃষ্ণ দে—ঐতিহাসিক কলকাতার অঞ্চল। কলিকাতা, অতিথি, ডিসেম্বর ১৯৮১, অগ্রহায়ণ ১৩৯৬। [৪]+১৮২ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

বিষ্ণুপদ দাস ও অন্যান্য, সংগ্রাহক--কলকাতার পরিচয়। কলিকাতা, চতুর্ভুজ পুস্তকালয়, ২৫ ডিসেম্বর [১৯৮৯]। ৪৮ পৃষ্ঠা।

অন্যান্য সংগ্রাহক : শম্ভুনাথ বণিক, কালীপদ সাহা, টি. কে. রায়।

নিশীথরঞ্জন রায় সুনীল দাস সম্পাদিত—পুরনো কলকাতার কথা। কলিকাতা, জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স, গ্রন্থমেলা, ডিসেম্বর ১৯৮৯। [৮]+১৫৯ পৃষ্ঠা।

৪টি প্রবন্ধের সঙ্কলন। প্রথমটি নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও প্রকাশিত 'বিশ্বকোষ' ৩য় খণ্ডে (১২৯৯) মুদ্রিত 'কলিকাতা' প্রবন্ধ। এই অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধটিকে সম্পাদকেরা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনারূপে চিহ্নিত করেছেন, যদিও এ মতের সমর্থনে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করেননি।

বিষ্ণুপদ রায়—কলকাতার ছড়া। কলিকাতা, এ. সরকার, [১৯৮৯ ?]। ১৬ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

১৯৯০

কমল সরকার—কলকাতার স্ট্যাচু। কলিকাতা, পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ১৯৯০। [১৫]+২৩১ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

নন্দলাল ভট্টাচার্য—সম্মুখ সমরে কলকাতার সংবাদপত্র। কলিকাতা, রানার, জানুয়ারি ১৯৯০। [১০]+১৮৬ পৃষ্ঠা।

প্রাক্-পরিচয় : নিশীথরঞ্জন রায়।

দীপ্তিকুমার শীল—কলকাতার কালী। কলিকাতা, কথামৃত প্রকাশনী, কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯০। ২৪ পৃষ্ঠা।

দীপ্তিকুমার শীল—শ্রীরামকৃষ্ণের কেল্লা কলকাতা। কলিকাতা, কথামৃত প্রকাশনী, কলকাতা বইমেলা ১৯৯০। [৪]+৩৬ পৃষ্ঠা।

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক—কলকাতা কল্পতরু। কলিকাতা, কথামৃত প্রকাশনী, কলকাতা বইমেলা ১৩৯৬, জানুয়ারি ১৯৯০। [৬]+১১৩ পৃষ্ঠা।

প্রতাপ মুখোপাধ্যায়—বিষয় কলকাতা। কলিকাতা, প্রৈতি প্রকাশন, ২৩ জানুয়ারি ১৯৯০। [৮]+২০৪ পৃষ্ঠা।

সত্য চক্রবর্তী—ছোটদের কলকাতা ৩০০। কলিকাতা, মৌসুমী প্রকাশনী, কোলকাতা বইমেলা, ৩০ জানুয়ারি ১৯৯০। ৭২ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

সমর দত্ত—ইতিহাসে খিদিরপুর। কলিকাতা, মৈত্রী দত্ত, জানুয়ারি ১৯৯০, মাঘ ১৩৯৬। [১২]+১৬৪ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

ভূমিকা : নিশীথরঞ্জন রায়।

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়—পালকি থেকে পাতালরেল। কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, বইমেলা, মাঘ ১৩৯৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। ১১১ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

সুভাষ সমাজদার—কলকাতা কলহকথা। কলিকাতা, সাহিত্য প্রকাশ, মাঘ ১৩৯৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। [৪]+২১৩ পৃষ্ঠা।

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার—ছন্দে গাঁথা এ কলকাতা। কলিকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। ১৬ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য—কলিকাতার টুকিটাকি। কলিকাতা, পূর্বাচল, কলিকাতা বইমেলা ১৯৯০। [৪]+৮৪ পৃষ্ঠা।

হরা ধর—ক্যালকাটা কুইজ। কলিকাতা, ডেল্টা ফার্মা, কলিকাতা পুস্তকমেলা ১৯৯০। ৮৪ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

কুইজ গ্রন্থমালা ৫।

ভূমিকা : নিশীথরঞ্জন রায়।

ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—আমি চার্নক বলছি। কলিকাতা, মহাদেব চ্যাটার্জি, বইমেলা ১৯৯০। [৪]+২৭ পৃষ্ঠা।

ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—জানা অজানা কলকাতা। কলিকাতা, বিদ্যামন্দির, বইমেলা ১৯৯০। [৫]+২৪৮ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

১০৭০টি প্রশ্ন ও তার উত্তর।

জ্যোতিষগোবিন্দ জানা—কলকাতার কড়চা। কলিকাতা, প্রকাশক, বইমেলা ১৯৯০। ১৬ পৃষ্ঠা।

কবিতা ও ছড়া।

অনিলকুমার দত্ত সম্পাদিত—কবিতা কলকাতা। কলিকাতা, মুক্তপত্র পাবলিকেশন ও কলাভারতী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। [১৪]+৭৯+২১ পৃষ্ঠা।

কলকাতা নিয়ে লেখা বাংলা ও হিন্দী কবিতার সংকলন।

ভূমিকা : নিশীথরঞ্জন রায়।

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়—আকাশপথের কলকাতা। কলিকাতা, প্রমা প্রকাশনী, বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। [৮]+৯২ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

কলকাতার আকাশপথের ২০৫ বছরের ইতিহাস (১৭৮৫—১৯৯০)। সেইসঙ্গে দমদম বিমানবন্দরের ইতিহাস এবং কলকাতায় বিমান চলাচল ও বিমান দুর্ঘটনাসমূহের বিবরণ।

সাধনা মুখোপাধ্যায়—পুরনো কলকাতার রান্নাবান্না। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১ বৈশাখ ১৩৯৭। ৭৮ পৃষ্ঠা।

অমিয় রায়—কলকাতা রাজভবনের মন্ত্রিনিবাস। কলিকাতা, টিচার্স কনসার্ন, ১লা বৈশাখ ১৩৯৭ (১৫ এপ্রিল ১৯৯০)। ১৬০ পৃষ্ঠা।

স্মৃতিকথা।

সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত—কবিদের কলকাতা। কলিকাতা, প্রতিভাস, এপ্রিল ১৯৯০। ৩১৭ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

কবিতা সংকলন।

নীরদবরণ হাজরা—প্রশ্নোত্তরে কলকাতা ৩০০। কলিকাতা, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, বৈশাখ ১৩৯৭, মে ১৯৯০। [৪]+১২৪ পৃষ্ঠা।

প্রসাদ সেনগুপ্ত [অনুবাদ ও সম্পাদনা]—বিশপ হেবারের কলকাতা ১৮২৩-২৪। কলিকাতা, মণ্ডল বুক হাউস, বৈশাখ ১৩৯৭, মে ১৯৯০। ১৪৪ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

বিশপ হেবার (১৭৮৩—১৮২৬) লিখিত 'ইণ্ডিয়ান জার্নাল'-এর একাংশের অনুবাদ, কলকাতা থেকে লেখা কয়েকটি চিঠি ও সম্পাদকীয় টীকা সহ।

কমল চৌধুরী—কলকাতার তিনশ বছরের ইতিহাস : সংস্কৃতি কেন্দ্র। কলিকাতা, প্রতিভাস, মে ১৯৯০। ২৫৬ পৃষ্ঠা।

সাগর বিশ্বাস—ছড়াছড়ি কলকাতা। কলিকাতা, সাংস্কৃতিক খবর, জুন ১৯৯০। ৪৮ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

ছড়া সংকলন।

সৌরভ বাগচী—শহর কলকাতার ৩০০ বছর। কলিকাতা, নন্দিতা পাবলিশার্স, [জুলাই ১৯৯০]। [৪]+৭৬ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

সুকুমার সেন—কলিকাতার কাহিনী। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, জুলাই ১৯৯০। ৮৭ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

অমরেন্দ্র দাস—এই শহরের ইতিকথা কলকাতা। কলিকাতা, শ্রীগুরু পাবলিকেশন, আগস্ট ১৯৯০। ১৯২ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

শ্রীপান্থ [নিখিল সরকার] —মেটিয়াবুরুজের নবাব। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ২৪ আগস্ট ১৯৯০। ১৩১ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

গণেশ পাইন চিত্রিত ও অলংকৃত।

হরিপদ ভৌমিক—কলির শহর কলকাতা। কলিকাতা, কলকাতা-চর্চা কেন্দ্র, ২৪ আগস্ট ১৯৯০। [১২]+১০৭ পৃষ্ঠা।

ভূমিকা : বিষ্ণু বসু।

নির্দেশিকা

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	আছে	হবে
১২	২৯	'তাদা'	'তার্দা'
৩৫	৩৫	নম্র	নয়
৭১	১৫	১৮৭৬	১৮৪৭
৭৩	১৩	চন্দ্রপ্রভু-মন্দির (১৮৯৫)	চন্দ্রপ্রভু-মন্দির (১৮৯৬)
৯৪	সারণি-৫	রমানাথ মণ্ডল	রামনাথ মণ্ডল
		তৃতীয় মন্দিরের নির্মাণকাল : ১৮৪৬	১৮৪৭
৯৯	১০	'শ্রীরামপুর-ভক্তমালিকা'	'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা'
৯৯	১৬	'শঙ্খনির্মিত'	'পদ্মনির্মিত'
৯৯	২১	নীলমণি	নিলমণি
১০০	১৬	হৃদয় মাজে	হৃদয় মাঝে
১০০	৩৩	হৃদেয়ে	হৃদয়ে
১০১	২১	পশু	পশু
১০১	২৬	রত্নকর	রত্নাকর
১০১	৩২	পত্নী শ্রীমতী	পত্নী / শ্রীমতী
১০২	২৬	বাওয়ালি	বাওালি
১২১	২২	ফ্রি চার্ট	ফ্রি চার্চ
১৪৮	সারণি-২	১৬. শামুক চূর্ণ	১৬. শামুক চুন
১৫২	সারণি-৫	৮ (টীকাসংখ্যা)	৪৮
১৫৭	৩	Midnapore Papers	Midnapore Salt Papers
১৬১	৪	মার্টিনা ব্লাকিয়ার	মার্টিন, ব্লাকিয়ার
১৯২	২৫	বারওরেল	বারওয়েল
২০৬	৩	উদাহরণ	উপকরণ
২৬০	৩০	যদুমতি	যাদুমতি
২৬০	৩০, ৩৩	লর্ড উইলিয়ামস	লট-উইলিয়ামস
২৮৭	৯	অবস্থিত	অবস্থিত ছিল
৩১৮	৩	ধোবাপুকুর-১	ধোবাপুকুর-২
৩২০	৩১	২০৩ (টীকাসংখ্যা)	২২৩
৩৩২	১৬	৫৩৪. শাহ্‌বাগান	৫৩৪. শাহ্‌নগর
